শারদীয়

পরিচয়

১৪১২

৭৫ বর্ষ

P-39

নির্মাণে

অনন্য

ম্যাকিনটস বার্ণ লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান

127

ডি ১/১ গিলেন্ডার হাউস ☐ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা-১

ফোন ঃ ২২২০-৭৮০৫, ২২১০-২১৭৫
ডিডি ১৮/৮, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা-৬৪
২৩৫৮-১৪১৮, ২৩৫৮-১৪২০, ২৩৩৭-১৬৫৪

কারুকথা-র বই

অরবিন্দ গুহ

দেখাসাক্ষাৎ ৪০.০০

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

রাত তিনটের কবিতা ৪০.০০

সুদর্শন সেংশর্মা

আতারাণী সর্দার ও অন্যান্য গল্প ৫০.০০

সমীর চৌধুরী

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অথবা বিন্দুমাধব ভট্টাচার্যের লণ্ঠন ৫০.০০

কালো রুটি ৫০.০০

অজয় চট্টোপাধ্যায়

কথকতা ৩৫.০০

অনাদি আচার্য

অনাদি আচার্যর কবিতা ২৫.০০

দুলাল ঘোষ

আমার অমীমাংসিত ২৫.০০

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

মানচিত্রের লোকজন ৩৫.০০

নির্মাল্য সেনগুপ্ত

ছোটো বড়ো মাঝারি টিফিন বাক্স ৪০.০০

অরূপ সেনগুপ্ত

তোমার কাছেই ফিরে আসবো ৪০.০০

কারুকথা

৫ অরুণাচল ইস্ট, সোদপুর, কলকাতা-১১০

কারুকথা-র বই দি স্টার বুক হাউস, দে বুক স্টোরস্ ও

বামা পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

With best compliments from :

WEST BENGAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BF-142, SALT LAKE, SECTOR-1, KOLKATA-700 064

Phone . (033) 2321-0731/1327 Fax (033) 2321-7578

Website www.wbut.net

UNIVERSITY COURSES

BBA, BCA, HM, Bachelor in Media Sciences, Bachelor in Hospitality Management, Bachelor in Travel & Tourism Management, Bachelor in Insurance & Risk Management, Bachelor in Supply Chain Management, B.OPTM, B.E. *(Information Technology),* **B.Tech** *(Applied electronics & Instrumentation Engg Architecture and Urban Planning, Automobile Engg , Bio-Medical Engg , Biotechnology, Ceramic Technology, Chemical Engg., Civil Engg , Computer Science & Engg., Electronics & Communication Engg , Electrical & Electronics Engg., Electrical Engg , Food Technology, Information Technology, Leather Technology, Marine Engg , Mechanical Engg., Power Engg , Production Engg , Textile Engg),* **B. Pharm, BHM, MCA, MBA** *(Full Time),* **MBA** *(Part Time),* **M.Sc** *(Bio-Informatics),* **M.E.** *(Computer Sc & Engg , Information Technology),* **M.Tech** *(Leather Technology, Manufacturing Technology, Production Engg, Textile Technology, Biotechnology, Software Engg , Bio-Informatics), Integrated Post B Sc Ph D in Physical Sciences,* ***Integrated Post B.Sc Ph.D in Life Sciences, Integrated Post B.Sc Ph. D in Molecular Biology/Bio-Informatics, Bachelor of Sports Management, Bachelor of Nautical Science.***

Collection of short stories in English/English translation

Contemporary Indian Short Stories *(Series I-IV)* per set	180 00
Contemporary Indian Short Stories in English Compiles by *Shiv K Kumar*	75 00
Anthology of Hindi Short Stories Compiled by *Bhishma Sahni*	150 00
Selected Kannada Short Stories Edited by *G S Amur*	75 00
The Drought and Other Stories (Reprinted 2004) by *Saratchandra Chattopadhyay*	50 00
Anandibai and Other Stories by *Parashuram*	50 00
Krishan Chander : Selected Short Stories Compiled by *Gopi Chand Narang*	80 00
Rajinder Singh Bedi : Selected Short Stories Compiled by *Gopi Chand Narang*	80 00
The Prayer Room and Other Stories by *Kishori Charan Das*	80 00
The Night of the Full Moon by *Kartar Singh Duggal*	75 00
The Bird of Gold and Other Stories by *OM Goswami*	30 00
Indian Short Stories (1900-2000) Ed by *E V Ramakrishnan*	200 00 PB 250 00 HB
Short Stories from Pakisthan Ed by *Intizar Hussain and Asif Farrukhi*	150 00

SAHITYA AKADEMI

Head Office
Rabindra Bhavan
35 Ferozeshah Road
New Delhi 110 001

Regional Office
Jeevan Tara
23A/44X, D H Road
Kolkata 700 053

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প, কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রকল্পে,
গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে,
ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে,
শর্তসাপেক্ষে চাকুরীজীবীদের ব্যক্তিগত ঋণের সুযোগ নিন।

যোগাযোগ করুন
দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড
রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
২৫/ডি, সেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-১৭
ফোন ঃ ২২৪০ ১১৩৮/১৭৮৬/২২৮০/৬৬৮১

আঞ্চলিক অফিস
স্পন্দন, বর্ধমান (৫৬৭ ৯৭৭)
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি (৪৩২ ৮৮৬)

শাখা অফিস
পুরুলিয়া (২২২২৬৪)
দার্জিলিং (৫২৫৭৮)
কলকাতা (২২৮১১৭৫৮)

এ ছাড়া জেলা ও মহকুমাস্তরে গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সমূহ

খাদি বিশুদ্ধতার প্রতীক

সুন্দব ◻ বিশুদ্ধ ও রুচির পরিচয়ে

উৎসব মুখর দিনগুলির সাথে তাল মিলিয়ে......

গ্রামীণ

পূজোর নতুন

সাজে সেজে নতুন

শোরুমে আসুন

আপনার মনের

মতো নানা

রঙে, নানান

দামে 'গ্রামীণ'-এ

পাবেন

সবকাবী ঘোষণা অনুসাবে 'বিবেট'-এব সুযোগ গ্রহণ কবুন

তসর • বালুচরী • গরদ • কড়িয়াল • জামদানী কাঁথাস্টিচ • মুর্শিদাবাদ সিল্ক • মসলিন গরদ • স্বর্ণচরী • স্পানসিল্ক সার্টিং

সেই সাথে সুতিখাদি ও পলিবস্ত্র পোষাকেব

বিপুল সম্ভার। মধু এবং গ্রামীণ শিল্পসামগ্রী।

বিক্রয় কেন্দ্র

মহাকরণ ◻ ১১নং বি.বা.দি বাগ (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নতুন শোরুম) ◻ গোলপার্ক ◻ বেহালা (ম্যান্টন) ◻ ভবানীপুব (যদুবাবুব বাজাব) ◻ বোলপুর (সুপার মার্কেট) ◻ হলদিয়া ◻ মালদহ (নেতাজী মার্কেট) ◻ রায়গঞ্জ ◻ দুর্গাপুব (বেনাচিতি)

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্যদ

(পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব একটি অধীনস্থ সংস্থা)

১২ নং বি. বা দি বাগ, কলকাতা-৭০০ ০০১

আসানসোল পৌর নিগম

আসানসোল

জঞ্জাল অপসারণ, প্রতিটি রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা,
স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল সরবরাহ ও
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ

আমরা আছি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই।

বামফ্রন্ট সরকারের নগর উন্নয়ন কর্মসূচীর সার্থক লক্ষ্যে গঠিত আসানসোল পৌর নিগম পৌর পরিষেবা সুষ্ঠভাবে বজায় রাখতে নিয়মিত পৌরকর জমা দেওয়ায় নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করে।

তাপসকুমার রায়
মেয়র
আসানসোল পৌর নিগম

Space donated by :

UNIGUARDIAN

With best compliments of :

North Suburban Wholesale Consumer's Co-operative Society Ltd.

458/B, JESSORE ROAD

KOLKATA-700074, W.B

প্রচ্ছদ
দীপ্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সবকাব বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয ধব

সম্পাদনা সহাযতা
অজয চট্টোপাধ্যায

দপ্তর সচিব
দুলাল ঘোয

উপদেষ্টামণ্ডলী
রাম বসু সিদ্ধেশ্বর সেন শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওযার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোযাবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তব ৩০/৬, ঝাউতলা বোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

With best compliments of :

W. C. SHAW PVT. LTD.

HUTTON ROAD
HAWKERS MARKET
ASANSOL

ডিভিসি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্ব দেয়

আবও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনে সচেষ্ট হলেও ডিভিসি কখনই পবিবেশ সংবক্ষণকে অবহেলা কবেনি।

বর্জ্যপদার্থ হিসেবে ফ্লাই অ্যাশ ও চিমনীব ধোঁযাব দূষণ বোধ কবায ডিভিসি বাস্তবে সফল হযেছে। দূষণেব হাব কমাতে ইতিমধ্যে অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বসানো হযেছে 'ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটব' (ইএসপি) এবং বাকি কেন্দ্রে বসানোব কাজও চলেছে। এছাড়াও বিদ্যুতকেন্দ্র এবং বাঁধগুলিব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সবুজাযনেব প্রযাসে সামিল হযেছে ডিভিসি।

ফ্লাই অ্যাশ থেকে ইঁট তৈবী, ছাই ফেলাব পুকুব নির্মাণ, বর্জ্য পবিশোধনেব জন্য 'নিউট্রালাইজিং পিট' তৈবীব কাজও হচ্ছে সমান গতিতে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমি, জল ও জলবিভাজিকাব সদ্ব্যবহাব কবা, ভূমিক্ষয বোধেব জন্য 'চেক ড্যাম' নির্মাণ এবং মৃত্তিকা সংবক্ষণেব কাঠামো তৈবী ও পবিকল্পিত বনসৃজনেব কাজও চলেছে পাশাপাশি।

পবিবেশেব ভাবসাম্য বক্ষায ডিভিসি সতত যত্নশীল।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

ডিভিসি উপত্যকায আপনার শিল্প গড়ে তুলুন

P 22373

সম্পাদকীয়

১৯৩১-এব শবৎ থেকে ২০০৫-এর শবৎ—পরিচয ৭৫ বছব স্পর্শ কবল। বাংলা সংস্কৃতি, মননচর্চা ও সৃজনশিল্পের বহুমাত্রিকতাকে এই দীর্ঘ পদযাত্রাব প্রতিটি পর্বে পবিচয শুধু সাধ্যমত ছুঁতে চাযনি, বিশ্বমানেব সাহিত্যকেও যতদূব সম্ভব এ-দেশেব পাঠকদের সামনে অনুবাদকর্মের মাধ্যমে পবিচিত করার প্রযাস নিযেছে। তাছাড়া বাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান-ও সবসময়ই পরিচয-এ গুরুত্ব পেযেছে। নানা স্মবণীয় ঘটনাকে চিহ্নিত কবে বাখাব জন্য পবিচয এমন অনেকগুলি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ কবেছে, বাংলা পত্র-পত্রিকার ইতিহাস যার কোনও তুলনা নেই।

এই কঠিন ব্রত পালনে রবীন্দ্রনাথ থেকে এমন কোনও লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী নেই, যাঁবা অংশগ্রহণ কবেননি। পরিচয প্রবর্তন কবেছিলেন মনস্বী কবি ও প্রাবন্ধিক এবং সংস্কৃতিব জগতে বিশ্বনাগবিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এক দশকেবও ওপব তিনিই ছিলেন পত্রিকাটিব প্রথম সম্পাদক। তিনি তাঁব বিপুল মেধা ও আবেগ দিযে যে পত্রিকাব গোডাপত্তন কবেছিলেন, সেই বহতা মানসকেই এই দীর্ঘ সময ধরে যাবতীয সুসময-দুঃসময়েব জোযার-ভাটা পেবিযে বাঁচিযে বাখতে প্রযাসী ও সক্ষম হযেছেন তাঁব অনুজ পবিচযপত্রি-বা, কালেব নিকষে পবীক্ষিত এই সত্যকে কেউ অস্বীকাব কবতে পাবেন না। এবই ফলে পবিচয কখনও এমন কোনও ব্যক্তিতান্ত্রিক পত্রিকা হযে ওঠেনি, যাঁব আগমন ও নিষ্ক্রমণেব সঙ্গেই একটি প্রচেষ্টাব উদ্ভব ও বিলয়। এমন কি পবিচয-এর অর্বাচীন সম্পাদক-হিসেবেও আমাব পক্ষে দীর্ঘ একুশ বছব ধবে মান বজায বেখে পবিচয চালিযে যাওযা আদৌ সম্ভব হত না, যদি আমাব সহযোগীবৃন্দ তাঁদেব শ্রম ও ভালোবাসাকে নিঃশর্তভাবে নিযোগ না কবতেন। এই সঙ্গে পরিচয-এব লেখক-পাঠক-গ্রাহক ও অনুবাগীদেবও ৭৫ বছবেব পুণ্যাহে আন্তবিক ধন্যবাদ জানাই।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

Space donated by :

Shakespeare Fee Car-Parking Servicing & Construction Co-operative Society Ltd.

57/4A, COLLEGE STREET
KOLKATA-700 073

ফোন ঃ ২২৫২২২৭

আসানসোল মাইনস্ বোর্ড অফ্ হেলথ

জমা জল রাখবেন না—
—ম্যালেরিয়া হতে পারে।
শোওয়ার সময় মশারী ব্যবহার করুন
না হলে ম্যালেরিয়া হতে পারে।
জ্বর হয়েছে?—
ম্যালেরিয়া হতে পারে।

সত্বর নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্ত পরীক্ষা করান।
ম্যালেরিয়া দূর করুন।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে—হেলথ্ অফিসার
আসানসোল মাইনস্ বোর্ড অফ হেলথ কর্তৃক প্রচারিত।

পরিচয়

আগস্ট-অক্টোবর ২০০৫
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২
১-৩ সংখ্যা ৭৫ বর্ষ

স্মৃতি-আলেখ্য

সেকালেব কথা ❑ রবীন্দ্রকুমাব দাশগুপ্ত ১

প্রবন্ধ

'আমি যে বাংলা দেশের ইতিহাস'—রাম বসু ❑ সবোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
বুদ্ধদেব বসু ২০০৫ ❑ অমিয় দেব ২৬৯
পুশকিনের সময়ের কশসাহিত্যে ভারত ❑ সঞ্জয় চন্দ্র ২৭
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার নারী : মহিলা আত্মবক্ষা সমিতির ভূমিকা ❑ সুস্নাত দাশ ৩১
কথাসাহিত্যেব তিনদশক : নানা মাত্রিক অন্বেষণ ❑ শুভঙ্কব ঘোষ ৪২
'রক্তকরবী' : পঞ্চাশ বছর ❑ সন্ধ্যা দে ৫০

গল্পগুচ্ছ—১

সুখ দুঃখেব রাত ❑ কার্তিক লাহিড়ী ৭৫
কথোপকথন ❑ সাধন চট্টোপাধ্যায় ৮১
পলাতক আলো-ছাযা ❑ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ৮৫
ট্রেনেব সময় ❑ সুব্রত সেনগুপ্ত ৯২
আজকের দিনটা ❑ আশিস ঘোষ ৯৫
এসো সুসংবাদ, এসো ❑ স্বপ্নময চক্রবর্তী ৯৯
গোযেবলসের স্ত্রী ❑ বাবিদবরণ চক্রবর্তী ১০৭
সুধাসিন্ধুব মূর্তি ❑ ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায ১১৬

গল্পগুচ্ছ—২

সুখ ❑ লীনা গঙ্গোপাধ্যায ১৫০
বিদ্যাধরীর মৃত টাওয়াব ❑ শচীন দাশ ১৫৮
এই যে শুনছেন! ❑ অভিজিৎ তবফদাব ১৬৭
সমুদ্রেব মানুষ ❑ অনিশ্চয় চক্রবর্তী ১৭৬
ভিখাবিনী বেশে ❑ অজয চট্টোপাধ্যায় ১৮২

গল্পগুচ্ছ—৩

খচ্চর ❑ পার্থপ্রতিম কুণ্ডু ২১৭
মহাবাজাধিরাজেব সন্তানেবা ❑ সোহারাব হোসেন ২২৮
এ ধ্বংসভূমে ❑ অনিল ঘোষ ২৩৭
ছবি, জলছবি ❑ সুদর্শন সেনশর্মা ২৪৮
শ্রেণীশত্রু ❑ মলয দাশগুপ্ত ২৫৬

কবিতাগুচ্ছ—১ ৫৫—৭৪

বাম্ বসু ❑ মৃগাঙ্ক রায় ❑ যুগান্তর চক্রবর্তী ❑ তরুণ সান্যাল ❑ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ❑ অমিতাভ দাশগুপ্ত ❑ শ্যামসুন্দর দে ❑ মণিভূষণ ভট্টাচার্য ❑ শিবশম্ভু পাল ❑ পবিত্র মুখোপাধ্যায ❑ বত্নেশ্বব হাজবা ❑ প্রণব চট্টোপাধ্যায ❑ বেণু দত্তরায ❑ সিদ্ধেশ্বর সেন ❑ অববিন্দ গুহ

কবিতাগুচ্ছ—২ ১২৭—১৪৯

বাসুদেব দেব ❑ অরুণাভ দাশগুপ্ত ❑ নন্দদুলাল আচার্য ❑ শুভ বসু ❑ পার্থ বাহা ❑ মৃণাল বসুচৌধুবী ❑ নীরদ রায ❑ মল্লিকা সেনগুপ্ত ❑ চৈতালী চট্টোপাধ্যায ❑ প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ ❑ সুশান্ত বসু ❑ দীপেন রায ❑ বাণা চট্টোপাধ্যায ❑ বেণুকা পাত্র ❑ প্রদীপচন্দ্র বসু ❑ রূপক চক্রবর্তী ❑ গোবিন্দ ভট্টাচার্য ❑ অনির্বাণ দত্ত ❑ জিয়াদ আলী ❑ সুবোধ সরকার ❑ গৌবশংকব বন্দ্যোপাধ্যায ❑ দীপা বিশ্বাস ❑ প্রভাকর চক্রবর্তী ❑ অনন্ত দাশ ❑ আনন্দ ঘোষ হাজরা ❑ ব্রততী ঘোষরায় ❑ বাহুল পুবকাযস্থ ❑ ব্রত চক্রবর্তী ❑ প্রবীর ভৌমিক ❑ উৎপলকুমাব গুপ্ত ❑ আসিশ সান্যাল ❑ বীরেন্দ্রনাথ বক্ষিত

কবিতাগুচ্ছ—৩ ১৯৭—২১৬

আবদুস সামাদ ❑ নমিতা চৌধুরী ❑ রমেন আচার্য ❑ ঋজুবেখ চক্রবর্তী ❑ সৌমনা দাশগুপ্ত ❑ দুলাল ঘোষ ❑ শ্বেতা চক্রবর্তী ❑ অমিতাভ চক্রবর্তী ❑ শঙ্কব বসু ❑ অজিত বাইবী ❑ বমা চট্টোপাধ্যায ❑ সুমিত্র দত্ত চৌধুরী ❑ সৌগত চট্টোপাধ্যায ❑ নাসেব হোসেন ❑ ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায ❑ শ্যামল সেন ❑ সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায ❑ কাজল চক্রবর্তী ❑ অলোক সেন ❑ কানাইলাল জানা ❑ রমা সিমলাই ❑ সুস্নেলী দত্ত ❑ শ্রাবণী ঘোষ ❑ অত্রি ভৌমিক ❑ জযতী বায ❑ ঋত্বিক ঠাকুব ❑ প্রবালকুমার বসু ❑ চিত্রাঙ্গদা চক্রবর্তী ❑ তাপস বায় ❑ বিশ্বজিৎ বায় ❑ অভিজিৎ সেনগুপ্ত/২৮২

সেকালের কথা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

প্রেসিডেন্সি কলেজে দুইমাস কাজ করিয়া আবার বেকার হইলাম। সাত বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা হইল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মূল্য কোনো কলেজ আমাকে দিবে বলিয়া মনে হইল না। কোনো বিজ্ঞাপনও চোখে পড়িল না। তবে আমি একটু লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিবার সময়ই এই কাজ আরম্ভ করিলাম। তবে সে-যুগে লিখিয়া কিছু আয় করিবার তেমন সুযোগ ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন বিমল কয়াল। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীচন্দ্র সেন আমার সঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের টিউটর ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিমলবাবুর আলাপ ছিল। একদিন শ্রীচন্দ্রবাবুকে সঙ্গে লইয়া বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। এখন ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার দপ্তর ছিল সেনেট হাউসের একতলায়। বিমলবাবু সজ্জন এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত করিলেন। তবে লেখাটি সম্পাদকমণ্ডলীর কোনো সদস্যকে প্রথমে দেখাতে হইবে। তিনি লেখাটি পড়িয়া স্থির করিবেন উহা ছাপাইবার যোগ্য কিনা। তবে বিমলবাবু বলিলেন আমার সম্পাদকমণ্ডলীর কোনো সদস্যের সঙ্গে দেখা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি প্রবন্ধটি বিমলবাবুর হাতে দেব এবং তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর কোনো সদস্যকে তাহা দেখাইবেন। কিন্তু মুশকিল হইল কী লিখিব। এই পত্রিকা কোনো লেখার জন্য কাহাকেও কোনো পারিশ্রমিক দেন না। তবে ইহার অধিকাংশ লেখকই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ক্যালকাটা রিভিউর জন্য কোনো প্রবন্ধ লিখিতে সাহস হইল না। শ্রীচন্দ্রবাবু বলিলেন, আমার এম.এ.-র থিসিসের কোনো পরিচ্ছেদ পেশ করিলে তাহা সম্পাদকমণ্ডলী গ্রহণ করিতে পারেন। বিমলবাবুও এই বিষয়ে শ্রীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে একমত হইলেন। আমার Thesis-এর শেষ দুইটি পরিচ্ছেদ ছিল T S Eliot-এর *Murder in the Cathedral* এবং Gilbert-এর *Andromache*। ইহার কিছুদিন পরে আমি T S Eliot-এর *Murder in the Cathedral* সম্বন্ধে প্রবন্ধটি টাইপ করিয়া বিমলবাবুর হাতে দিলাম। ইহার কিছুদিন পরে বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া জানিলাম যে, প্রবন্ধটি নির্বাচিত হইয়াছে। বিমলবাবুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। একালে এত সহজে কোনো বিদগ্ধ পত্রিকায় কিছু ছাপানো যায় না। বিমলবাবু লেখাটি ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এত শীঘ্র প্রবন্ধটি পড়িয়া উঠিতে পারিতেন না। যাহা হউক T S Eliot সম্বন্ধে প্রবন্ধটি ক্যালকাটা রিভিউতে ছাপা হইলে পণ্ডিত সমাজে আমার একটু স্থান হইল। অচিরেই বিমলবাবু আমার প্রবন্ধের বিশ খণ্ড Reprint আমার হাতে দিলেন। আমি উহা

আমাব পরিচিত অধ্যাপকদের মধ্যে বিতরণ কবিলাম। ইহাব পর Gilbert Murray-এর সম্বন্ধে প্রবন্ধটিও ছাপা হইল। তখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের ইংরেজিব টিউটর হিসাবে কর্মরত। ভাবিলাম Thesis হইতে আর কোনো পরিচ্ছেদ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায পাঠাইব না। একটি প্রবন্ধ লিখিব। ভাবিলাম English Poets of India সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলে তাহা সম্পাদকমণ্ডলীর দষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। এই বিষযে বিশ্ববিদ্যালযেব লাইব্রেরিতে কিছু পড়াশোনা কবিলাম। Sencouert-এব *India in English Literature* বইখানি যত্ন করিয়া পড়িলাম। ১৯৪৮ সালে Poems of Freedom নামে একখানি সংকলন গ্রন্থ বাহিব হয়। W H Auden এই সংকলনের ভূমিকা লিখিযাছিলেন। কলেজ স্কোয়ারে একটি বই-এর দোকানে গ্রন্থখানি দেখিলাম এবং তাহা কিনিযা আবিষ্কার করিলাম যে, ইহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি কবিতাও নাই। আমি ভাবিলাম আমাব প্রবন্ধে আমি ইহার উল্লেখ কবিব। তবে প্রবন্ধের মূল বিষয় হইবে Cowper এবং Campbell লিখিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কবিতাগুলি। যাহা হউক এই বিষযে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বিমলবাবুব হাতে দিলাম। এটিও ছাপা হইল। নবেশচন্দ্র বায ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর Secretary। তাঁহাব সঙ্গে আমাব প্রাযই আশুতোষ বিল্ডিং-এর Staff room-এ দেখা হইত। ক্যালকাটা রিভিউ প্রথম বাহিব হয ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে। নবেশবাবু ঠিক কবিলেন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে উনি এই পত্রিকাব একটি শতবার্ষিকী সংখ্যা বাহির করিবেন। এবং আমাকে ওই সংখ্যাব জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন।

আমি British Periodical press in the Nineteenth Century সম্বন্ধে একট প্রবন্ধ লিখিযা তাঁহাব হাতে দিলাম। উহা ছাপা হইল। কিন্তু যে প্রবন্ধটি লিখিযা আমাব একটু খ্যাতি হইল সেই প্রবন্ধটি ছাপা হইল 'দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'। উক্ত পত্রিকাব সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅমল হোম। তিনি আমাব বাবাব বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহাকে কাকামণি ডাকিতাম। তিনি আমাকে তাঁহার কাগজেব জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ কবিলেন এবং বিষযটিও ঠিক কবিযা দিলেন— Calcutta and English Literature। এই প্রবন্ধ লিখিতে হইলে কী কী বই পডিতে হইবে, কোন ছবি কোথায় পাওযা যাইবে আমাকে বুঝাইযা দিলেন। কিন্তু আমাব ভয় হইল এই গবেষণা করা আমাব পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু তিনি আমাকে ভরসা দিলেন এবং তাঁহাব গ্রন্থসংগ্রহ হইতে কিছু বই আমাকে পড়িতে দিলেন। এবং বলিলেন, যে সব ঘরবাডি অথবা স্মৃতিস্তম্ভেব ছবি প্রয়োজন হইবে তাহাব জন্য তিনি এক ক্যামেবাম্যান ঠিক কবিযা দিলেন। এই ক্যামেবাম্যান ছিলেন সেকালেব এক বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহা। যাহাহউক, আমি সভযে এই কার্যে মন দিলাম। এক মাসেব মধ্যে আমি সব বই পডিযা এবং নানা সমাধিক্ষেত্র পবিদর্শন করিযা প্রবন্ধ লিখিতে আবম্ভ কবিলাম। আটখানি ছবি-সহ এই প্রবন্ধ ছাপা হইল। কযেক বৎসব পূর্বে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে প্রকাশিত প্রবন্ধেব একটি সংগ্রহ বাহিব হইযাছে। ইহা আমি দেখি নাই। শুনিলাম এই সংগ্রহে আমার ওই প্রবন্ধটি স্থান পাইয়াছে। অমল হোম এই প্রবন্ধেব জন্য আমাকে কুডি টাকা পাবিশ্রমিক দিযাছিলেন। আব বিশ খণ্ড অফপ্রিন্টও আমি পাইযাছিলাম। সাহস কবিযা তাবকনাথ সেনকে একখণ্ড অফপ্রিন্ট দিযাছিলাম। তিনি ইহা পড়িযা যে একখানি চিঠি দিযেছিলেন। তাহা আমি

আজও হাবাই নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'I have found it extraordinary interesting—the illustrations on less than the text' বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুবেন্দ্রনাথ সেনকেও একখণ্ড অফপ্রিন্ট পাঠাইয়াছিলাম। অবশ্য তিনি আমার গ্রামের মানুষ এবং আমাব পিতার বিশেষ বন্ধু। দিল্লি হইতে লিখিত ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৪ তাবিখে তিনি একখানি চিঠিতে স্নেহভরে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'ইংরাজি খাসা হইযাছে'—এই চিঠিখানিও হাবাই নাই।

কিন্তু এইসব লেখা দেখিযা কোনো কলেজ আমাকে ডাকিয়া চাকুবী দিবে না।—তাহা জানিতাম। সেইজন্য লেখায মন না দিয়া একটি চাকুরীব অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। পরম বন্ধু অধ্যাপক অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযের সঙ্গে দেখা কবিলাম। তিনি ঐতিহাসিক হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। দুই নম্বর কলেজ স্কোয়ারে গোলদিঘির পাড়ে একটি বাড়িতে থাকিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিযা চাকুরী সম্বন্ধে তাঁহার পবামর্শ চাহিলাম। তিনি বলিলেন মণীন্দ্র নন্দী কলেজে একটি ইংরাজিব পদ খালি আছে। আমি মণীন্দ্র নন্দী কলেজে অধ্যক্ষ ড. পঞ্চানন নিযোগীর সঙ্গে দেখা কবিলাম। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রিব অধ্যাপক হিসেবে সম্প্রতি অবসব গ্রহণ কবিযাছেন বুঝিলাম, এই চাকুরীর জন্য কোনো Selection Committee-তে ইন্টারভিউ দিতে হইবে না। ড. নিযোগী আমাকে তাঁহাব কলেজে সন্ধ্যা বিভাগে কাজ আবম্ভ করিতে বলিলেন।

মাহিনা সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিল না। আমি পবেব দিন ওই কলেজে উপস্থিত হইযা ইংবাজি বিভাগেব প্রধানেব সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলাম। জানিলাম, তাঁহাব সঙ্গে দেখা করিবাব প্রযোজন নাই। হেড ক্লার্কেব সঙ্গে দেখা কবিলেই চলিবে। হেড ক্লার্ক মহাশয অবশ্য মাহিনাব অঙ্কটি বলিযা দিলেন। মাসিক মাহিনা পঞ্চাশ টাকা। তবে পাইব চল্লিশ টাকা। দশ টাকা কলেজ ফান্ডে প্রতি মাসে দিতে হইবে। সপ্তাহে ৬দিন দুটি কবিয়া ক্লাস নিতে হইবে। আমি বাজি হইলাম এবং পবের দিন সন্ধ্যায় কাজ আরম্ভ কবিলাম। কলেজেব ক্লাসঘর এবং আসবাবপত্র মোটেই চিত্তাকর্ষক ছিল না। তবে সেকালে ছাত্রবা খুব ভদ্র ছিল ক্লাসে ডিসিপ্লিন ছিল। একদিন অবশ্য একটু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ বাতি বন্ধ হইয়া গেল। তবে কিছুক্ষণেব মধ্যেই একটি ছাত্র একটি হ্যাবিকেন যেন কোথা হইতে লইযা আসিল। আমি পড়াইতে শুরু কবিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পবেই দেখি একটি লোক ক্লাসঘরের দবজায দাঁড়াইযা আছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম—তিনি কী চান? তিনি বলিলেন, আপনার একটি ছাত্র আমার পানেব দোকানেব হাবিকেনটি লইযা আসিযাছে। আমি বলিলাম, এই হাবিকেনটি আপনি লইযা যান। কোন ছাত্রটি এই অন্যায কাজটি কবিযাছে তাহা অনুসন্ধান করিলাম না। তবে একটি ছাত্র উঠিয়া বলিল, ওই দোকানে দুইটি হাবিকেন ছিল, আমি একটি লইয়া আসিযাছি। আমি বলিলাম, নিশ্চযই দুইটি হাবিকেন ছাডা দোকানেব কাজ চলে না। ছাত্রটি এই কথাব কোনো উত্তব দিল না। লক্ষ করিলাম, তখন কলিকাতাব মানুযেব একটা সহনশীলতা ছিল। একালে কলিকাতায় এই হারিকেন লইয়া একটি তুমুল কাণ্ড ঘটিত। যাহাহউক বাতি আসিয়া গেল। আমি আমাব কাজ শেষ কবিলাম।

যদিও আমাব মেজোভাই এবং ছোটোভাই দুইজনেই রোজগার করে, তবু ভাবিলাম যৌথ পবিবাবে মাসে চল্লিশ টাকা পিতামহীর হাতে দিলে চলিবে না। আমি আবেকটি কাজের অনুসন্ধান করিলাম। তবে পিতামহী টাকাব অঙ্ক সম্বন্ধে আমাকে কিছুই বলিলেন না।

অমৃতবাজাব পত্রিকা রিপোর্টাব কালিপদ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার পবিচয ছিল। তিনি খুব বন্ধুবৎসল ছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম তিনি আমাকে কোথাও একটি কাজ দিতে পাবেন কিনা? তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া একটি কাজেব সন্ধান দিলেন, তাঁহাব এক বন্ধু মি. বায় সম্প্রতি একটি ইংবাজি সাপ্তাহিক Saturday Mail বাহিব করিতেছেন। তিনি একজন অ্যাসিস্টেন্ট এডিটব খুঁজিতেছেন। কোনো কাগজে অ্যাসিস্টেন্ট এডিটর হইতে পারি এমন যোগ্যতা যে আমাব নাই, তাহা বুঝিযাও Saturday Mail-এব প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মি. বাযেব সঙ্গে দেখা কবিলাম। আমহার্স্ট স্ট্রিটে তাঁহাব দপ্তবে উপস্থিত হইযা তাঁহাব সাক্ষাৎ পাইলাম, কালিপদ বিশ্বাসের কোনো চিঠি অবশ্য ছিল না। তবে তাঁহাব নাম উল্লেখ কবিলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, আমাব সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে ফোনে কথা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, কোনো কাগজেব অ্যাসিট্যান্ট এডিটব হইবাব যোগ্যতা আমাব নাই। তবে ইংবাজি লেখাব অভ্যাস আছে, ক্যালকাটা মিউনিসিপল গেজেটে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটির উল্লেখ করিলাম। আমি ইংবেজিতে প্রেমচাঁদ-বাযচাঁদ বৃত্তি লাভ কবিযাছি তাহাও বলিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব যে সাত বছব টিউটব ছিলাম—তাহাও উল্লেখ কবিলাম। তিনি আমাব সকল কথা শুনিয়া আমাকে তখনই নিযোগ-পত্র দিলেন। বোধ করিলাম এত টাকা ইতিপূর্বে কোথাও পাই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়েব মাহিনা ছিল মাসে ১৪০ টাকা, প্রেসিডেন্সি কলেজে পাইতাম ১৫০ টাকা। আব ওই সময়ে মণীন্দ্র কলেজের মাহিনা ছিল মাসে ৪০ টাকা।

Saturday Mail-এব জন্য যাহা লিখিতাম তাহা সম্পাদক মহাশযেব মনঃপূত হইত। এই কাগজের আব দুইজন লেখক ছিলেন গিবিজা গাঙ্গুলী এবং অমল ভট্টাচার্য। তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ কবিযা বিশেষ আনন্দ পাইযাছি। অমল ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে আমাব ছাত্র ছিলেন। টিউটরিযাল ক্লাসে তাঁহাব বচনা পড়িযা আমি চমৎকৃত হইতাম। Saturday Mail-এ প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলিও অসাধাবণ হইত। শেক্সপীযবেব জন্মদিনে তিনি ওই পত্রিকার জন্য *Shakespear and We* নামে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন। গিবিজাবাবু বড সুন্দব লিখিতেন। Saturday Mail-এর আমাদেব আড্ডা বেশ জমত। সম্পাদক মহাশয়ও সেই আড্ডায যোগ দিতেন।

এইখানে অমল ভট্টাচার্যেব সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে তিনি আমাব ক্লাসে বসিতেন। তাঁহার একটি রচনা পডিযা আমি মুগ্ধ হইযা ছিলাম। তাঁহাব খাতা ফেবত দিবাব সময বলিলাম, তোমাব লেখা অপূর্ব হইযাছে। অমল ভট্টাচার্য বলিলেন, আপনি তো এই বচনাব জন্য আমাকে কোনো নম্বব দেন নাই। আমি বলিলাম, নম্বব ইচ্ছা কবিযাই দিই নাই। কাবণ এইবকম ইংবেজি আমি লিখিতে পাবি না।

আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব ইংবাজিব টিউটব ছিলাম, তখন এইরকম একটি ব্যাপাব ঘটিযাছিল। আমি পড়াইতাম, কিন্তু আমাকে প্রেমচাঁদ-রাযচাঁদ বৃত্তি লাভেব পবেও

পবীক্ষক নিযুক্ত কবা হয নাই, কথাটি আমি আমার পিতাকে একদিন বলিলাম। তিনি কোনো সমালোচনা প্রকাশ করিলেন না। ববং বলিলেন, তোমার ভাগ্য ভালো এম.এ ক্লাসে পড়াও। কিন্তু পবীক্ষক হইতে আরো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সে অভিজ্ঞতা তুমি এখনও অর্জন কবো নাই। যাহা হউক, ১৯৪৫ সালে আমি এম.এ.-ব পবীক্ষক নিযুক্ত হইলাম। সেই বৎসবই জানুয়ারি মাসে আমি বিশ্ববিদ্যালয়েব কাজে ইস্তফা দিযাছি। শুনিয়াছি, শ্রীকুমাব বন্দোপাধ্যায় মহাশযেব প্রস্তাবেই আমি এম.এ.-ব পরীক্ষক নিযুক্ত হইযাছিলাম। সেকালে এম এ পবীক্ষার একটি বিষয ছিল Foreign Classics in translation। অর্থাৎ ইংরাজি অনুবাদে কযেকখানি গ্রিক ও ল্যাটিন নাটক। এই পবীক্ষায় আমি একটি ছাত্রকে ৮০ পার্সেন্ট নম্বর দিলাম। Board of Examiners সভায় এইজন্য আমি তিবস্কৃত হইযাছিলাম। ওই বোর্ডের সদস্যগণ সকলেই ছিলেন আমার অধ্যাপক। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, ববি, উত্তব ভালো হইলে আমবা ফার্স্ট ক্লাস নম্বব দিই অর্থাৎ ৬০ পার্সেন্ট। যদি এই ছাত্রের উত্তর তোমার খুব বেশি ভালো লাগিযা থাকে তুমি ৬৫ পার্সেন্ট নম্বব দিতে পারিতে, যদি আবো ভালো হইযা থাকে ৭০ পার্সেন্ট দিতে পাবিতে। ৮০ পার্সেন্ট কেন দিলে? অন্যান্য কযেকজন সদস্যও এই কথা বলিলেন। আমি নত মস্তক হইযা সব কথা শুনিলাম। আমাব অধ্যাপকদের সঙ্গে কোনো তর্ক করিলাম না। তবে আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম, এই বিষযে আমি দু-একটি কথা বলিতে পারি কিনা? কথা বলিবাব অনুমতি পাইয়া আমি বলিলাম স্যাব আপনারা কেহই ৮০ পার্সেন্ট দিতেন না, তাহা জানি। আমি কেন দিয়াছি? সেই কথা বলি। ছাত্রটি হলে বসিযা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহা লিখিযাছিলেন আমি আমাব ঘবে বসিযা সমস্ত বই ঘাটিয়া বহু সময লইয়াও তাহা লিখিতে পাবিতাম না। এইজন্যই আমি উহাকে ৮০ পার্সেন্ট দিযাছি। এই ছাত্রটিব ইংবাজি সরল এবং সুন্দর। বিচার-বিশ্লেষণও চিত্তাকর্ষক সেইজন্যই আমি ইহাকে ৮০ পার্সেন্ট নম্বব দিয়াছি। আপনাবা দিতেন না। আমাব কথা শুনিয়া একজন প্রবীণ সদস্য বলিযা উঠিলেন, কথায় বৃহস্পতি। যাহা হউক, ছাত্রটির নম্বব কমানো হইল না। পরে জানিলাম ছাত্রটিব নাম অশোক বায়। তবে তিনি এম.এ পবীক্ষায প্রথম স্থান লাভ কবিলেন না। প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পাইলেন। সেই বৎসব প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইযাছিলেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত। ইনি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাব প্রথম বাঙালি সম্পাদক নিযুক্ত হইযাছিলেন। তাঁহাব মতো ইংবাজি আমি কোনোদিন লিখিতে পাবি নাই।

যাহাহউক, আমাব এখন প্রথম চিন্তা একটি কলেজে লেকচাবাব নিযুক্ত হওযা। Saturday Mail-এব মাহিনা ভালোই ছিল। এই পত্রিকাব সম্পাদক ফণী বায আমাব লেখা পছন্দ কবিতেন। কিন্তু আমি পেশা হিসেবে সাংবাদিক হইতে চাহিলাম না। এইক্ষেত্রে সফল হইবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। কিছুদিন পরে শুনিলাম জযপুবিযা কলেজে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবে। ওই কলেজের অধ্যক্ষ মহাশযকে আমি চিনিতাম না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের ইকনমিকসের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালযেব পি এইচ ডি লাভ করিযা দেশে ফিরিয়া তিনি জয়পুবিযা কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইযাছেন। ইহাব পর ইনি Special Recruitment-এ I A S-এর জন্য নির্বাচিত হইযা Inspctor General

of Prisons নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জযপুরিয়া কলেজে Governing body-র চেযাবম্যান ছিলেন কালীপ্রসাদ খৈতান। আমার সঙ্গে তাঁহাব কোনো পরিচয় ছিল না। যাহাহউক, আমি লেকচারার পদের জন্য দরখাস্ত করিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপকের প্রশংসাপত্র পাইবার চেষ্টা করিলাম না। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের তৎকালীন বেজিস্ট্রাবের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি ঈশ্বব মিল লেনে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটি প্রশংসাপত্র প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, কালীপ্রসাদ তাঁহার বিশেষ বন্ধু। তিনি তাঁহাকে একখানি চিঠি দিলেন। সেই চিঠিখানি আমার প্রশংসাপত্র। আমি তাহা জযপুরিয়া কলেজে পাঠাইয়া দিলাম। ইন্টারভিউতে বুঝিলাম কালীপ্রসাদ খৈতান অনুপস্থিত। কোনো ইংবাজির অধ্যাপকও সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। কলেজের ইকনমিকসেব অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বোর্ডের সদস্য-হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অতএব আমার ইংরাজি বিদ্যার কোনো পরীক্ষা হইল না। অনুমান কবিলাম, আমি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের টিউটব ছিলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইযাছি এবং তখন মণীন্দ্র নন্দী কলেজে পড়াইতেছি এবং ইংরেজিতে PRS বৃত্তি লাভ কবিযাছি ইহা জানিযা বোর্ড আমাকে আর ইংবাজি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিলেন না। তবে অধ্যক্ষ মহাশয জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আমার PRS-এর Thesis তাঁহাকে পডিতে দিতে পারি কিনা? আমি বলিলাম, আপনি যদি পড়িতে ইচ্ছা কবেন তাহা হইলে অবশ্যই আমি আপনাকে Thesis-এর এক কপি পাঠাইযা দিব। কিন্তু এই নিয়োগেব সম্পর্কে আমি সেই Thesis পেশ করিব না। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। অচিরেই আমি নিযোগপত্র পাইলাম। মাসিক মাহিনা দুইশত টাকা। ১৯৪৬ সালে ইহা অনেক টাকা। আমি জয়পুবিযা কলেজে কাজ আবম্ভ করিলাম। ওই কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন আমার পরম সুহৃদ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে BA এবং MA পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইযাছিলেন। এবং পবে PRS এবং PHD অর্জন করিযাছিলেন তাঁহাবও মাহিনা ছিল দুইশত টাকা। আমাদেব দুইজনের মাহিনা সমান সমান বলিযা আমি একটু অস্বস্তিবোধ কবিযাছিলাম। জযপুবিযা কলেজে অনার্স ছিল না। IA. এবং BA পাস ক্লাসে পডাইতাম। ক্লাসে ছাত্রেব সংখ্যাও বেশ কম ছিল। একটি শান্ত পরিবেশে কাজ করিতাম। IA ক্লাসে ছাত্রদেব মধ্যে কাজি নজরুল ইসলামেব এক পুত্র ছিলেন। তাঁহাব নাম ছিল সব্যসাচী। সহকর্মীদেব মধ্যে ইংবাজির অধ্যাপক ছিলেন নীতিশ বসু। তাঁহাব সঙ্গে কথা বলিয়া আনন্দ পাইতাম। এখনও তাঁহার সঙ্গে ফোনে আলাপ হয়।

একদিনে কলেজে একটি বেশ মজার ঘটনা ঘটিল। কলেজেব ইকনমিকসেব অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের Griffith memorial prize এবং প্রেমচাঁদ-রাযচাঁদ বৃত্তি লাভ কবিযাছেন বলিযা কলেজে একটি চা পার্টি হইবে। আমবা সকলেই নিমন্ত্রিত হইলাম। দ্বারিক ঘোষের দোকান হইতে প্রচুব মিঠাই আসিল, অধ্যক্ষ মহাশযও আসিলেন। পার্টি শুরু হইল। এমন সময অনিলচন্দ্র ব্যানার্জী মহাশয আমাকে ডাকিযা নিম্নস্ববে বলিলেন, এই অধ্যাপক PRS বা Griffith কিছুই পান নাই। তিনি আবো বলিলেন যে, অধ্যাপক মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়েব একটি চিঠি আমাকে দেখাইযাছে সেই চিঠিতে কোথাও লেখা নাই যে, তিনি

এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। বস্তুত উনি যে কাগজখানি পাইয়াছেন সেখানি চিঠি নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটেব রিজুলেশনের কপি। আমিও আমার PRS সম্বন্ধে এইবকম রিজুলেশনের কপি পাইযা ছিলাম। উনি যে কাগজখানা পাইয়াছেন তাহাতে লিখিত হইয়াছে, Read a report on the PRS Thesis of আর কিছু লিখিত হয় না। উনি যদি PRS লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে লেখা হত And Resolved that the candidate be awarded Premchand Raichand studentship আমাব চিঠিতে তাহা লিখিত হইয়াছিল। Griffith সম্বন্ধেও কাগজখানিতে লিখিত হয় নাই যে, Candidate-কে ওই পুরস্কাব দেওযা হোক, অবশ্য ফণীবাবু বলিলেন, এই পার্টিতে আমরা যোগ দিব এবং চা-মিষ্টি গ্রহণ করিব। আমরা সকলেই Staff room-এ একত্রিত হইলাম, এবং অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায ভদ্রলোককে আমাদের সকলেব পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাইলেন।

জয়পুবিযা কলেজে এক বৎসর কাজ কবিয়াছিলাম। কলেজেব পরিবেশ বড়ো সুন্দর ছিল। Staff room-এ গল্প হইত। অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে বেশ সুসম্পর্ক হইত। তিনি সময় পাইলেই Staff room-এ আসিয়া আমাদেব সঙ্গে গল্প কবিতেন। কাজ শেয হইলে পদব্রজেই বাড়ি ফিবিতাম।

জয়পুবিয়া কলেজের কাজ পাকা ছিল। কিন্তু এম.এ.পাশ করিয়াই সাত বৎসর এম.এ.ক্লাসে পড়াইয়াছি বলিয়া মনে হইল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পাইলেই ভালো হইত।

জয়পুরিয়া কলেজে অনার্স ছিল না। এবং কলেজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও যেন কোনো ধাবণা করিতে পারিতেছিলাম না। তবে বঙ্গদেশে কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ই তখন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয। শুনিলাম মধ্যপ্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। এই বিশ্ববিদ্যালযের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভাইস চ্যান্সেলাব ছিলেন Sir Hari Singh Gour। তিনি পালি সাহিত্যের এক বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি Viceroy Executive Council-এর সদস্য ছিলেন। আমি তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়া একটি লেকচাবাব পদ প্রার্থনা কবিলাম। আমি ভাবি নাই, এই চিঠির কোনো উত্তব পাইব। কিন্তু পাইলাম। একটি টেলিগ্রাম পাইলাম। যাহাতে লেখা ছিল— Appointed lecturer on English on a salary of 200-400 আমি সগব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম সে, আমি এই পদ গ্রহণ কবিলাম এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সগরে উপস্থিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিব। আমার পিতামহী ১৯৪৬ সারে ৮ ফেব্রুযাবি ৮৬বছর বযসে পবলোক গমন কবেন। তিনি আমাকে বিদেশে যাইতে অনুমতি দিতেন না। পিতাঠাকুরেব সঙ্গে এই বিষযে আলাপ করিযা বুঝিলাম তাঁহাব আপত্তি নাই। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেব প্রথম সপ্তাহে সগব বওনা হইলাম। সগরে পৌঁছাইলাম তখন বাত্রি এগাবোটা। স্টেশন হইতে বিশ্ববিদ্যালয অনেক দূর। আব তখন কোনো ঘোড়াব গাড়িও পাওযা গেল না। বাত্রিটা স্টেশনেই কাটাইলাম। স্টেশন মাস্টার তখন স্টেশনে নাই। একজন কর্মচাবী আমাকে স্টেশনের আপিসঘবে রাত্রি কাটাইবাব অনুমতি দিলেন। কোনোমতে রাত্রি কাটিল। সকালে উঠিযা ঘোড়ার গাডিতে বিশ্ববিদ্যালয। অভিমুখে বওনা হইলাম। কিন্তু কোথায় যাইব? বিশ্ববিদ্যালয একটি পর্বতে অবস্থিত। সেই পর্বতে উপস্থিত হইয়া একজনকে জিজ্ঞাসা কবিলাম

অধ্যাপকদের কোয়ার্টার্স কোথায? তিনি আমাকে বাঙালি জানিয়া ড অরুণ দে-ব বাড়িতে যাইতে বলিলেন। ড. অরুণ দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালযে কেমিস্ট্রিব পি এইচ ডি। সগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রির লেকাচাবার নিযুক্ত হইযা সম্প্রতি সগবে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন কোনো বাড়ি খালি নাই। তবে তিনি যে বাডিতে থাকেন সেখানে আমার স্থান হইতে পারে। তাঁহার বাড়িতে দুইখানি ঘব। একটি ঘরে তিনি থাকিবেন। তিনি অবিবাহিত। আরেকটি ঘবে থাকেন মল্লিকার্জুন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালযে ইংবেজিব অধ্যাপক। সম্প্রতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয হইতে এম এ.পাশ করিয়া ইংরেজিব অধ্যাপক হইযা এই বিশ্ববিদ্যালযে আসিয়াছেন। তাঁহাব কোনো আপত্তি হইবে না আমাকে কেবল আহাবেব জন্য খবচ বহন কবিতে হইবে। রান্নার জন্য একটি লোক আছে। আমি দেখিলাম, আমাব বাসস্থানের সুব্যবস্থাই হইল। ঠিক হইল, আমি আহাবেব জন্য প্রতি মাসে ৬০ টাকা দিব। আমি স্নান করিযা এবং প্রাতঃরাশ সাবিযা বিশ্ববিদ্যালযেব বেজিস্ট্রারেব সঙ্গে দেখা কবিলাম। দেখিলাম, ইংবাজি বিভাগের বিডাব এবং বিভাগীয় প্রধান এস আব স্বামীনাথন মহাশয়ই বিশ্ববিদ্যালযের বেজিস্ট্রার, তিনি আবাব Dean of the Faculty of Arts তখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালযেব কাজকর্ম উপাচার্যের নির্দেশ অনুসাবে হইতেছে। স্বামীনাথনের সঙ্গে দেখা কবিযা বুঝিলাম, তিনি একজন কর্তব্যপবাযণ যোগ্য রেজিস্ট্রাব। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালযেব এই কৃতী ছাত্র তখন এই বিশ্ববিদ্যালযের যেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বুঝিলাম, বিশ্ববিদ্যালযেব উপাচার্য স্যাব হরি সিং গৌব অধ্যাপক স্বামীনাথনকে আমাব চিঠিখানি দেখাইছেন। এবং তিনি আমাকে আমার পদেব জন্য সুপাবিশ করিযাছেন। অধ্যাপক স্বামীনাথন আমাকে একটি টাইম টেবিল দিলেন এবং বলিলেন ওই দিনই সন্ধ্যায তিনি আমাব ঘরে আসিযা আমাব সঙ্গে আলাপ কবিবেন। যিনি বিশ্ববিদ্যালযেব ইংরাজিব প্রধান, বেজিস্ট্রাব, এবং আর্টস্ ফ্যাকালটির ডিন তিনি আমাকে দেখা কবিতে বলিলেন না। আমাব ঘবে আসিযা আমাব সঙ্গে আলাপ করিলেন। ইহা আমাকে মুগ্ধ কবিল। এই বিশ্ববিদ্যালযে কোনো বিষযেই অনার্স ছিল না। আই এ ক্লাসে চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী ছিলেন। বি এ ক্লাসে পাঁচজন আর এম এ ক্লাসে একজন। আমাব এই তিন ক্লাসই লইতে হইবে।

কাজে যোগ দিবার এক সপ্তাহব মধ্যে সগব শহবে প্লেগ লাগিল। শহবে এই রোগ বেশ ছড়াইল। কিন্তু আমাদেব কাহাবো এই রোগ হইল না। আমবা সকলে প্লেগ নিবোধক ইনজেকশন লইলাম। কিছুদিন পব শুনিলাম, আমাদেব এম এ ক্লাসেব একমাত্র ছাত্রটি শহবের প্লেগ বোগে আক্রান্ত হইযা প্রাণ হাবাইযাছে। তাহাব মৃত্যুসংবাদ পাইযা অধ্যাপক স্বামীনাথনেব সঙ্গে দেখা কবিলাম। তিনি বলিলেন, মাত্র তিনদিন পূর্বে ছেলেটি তাঁহাব ক্লাসে আসিযাছিল এবং এক পৃষ্ঠা Anglo-Saxyon পড়িযাছিল। যাহাহউক, অল্পদিনেব মধ্যেই শহব হইতে প্লেগ দূব হইল।

ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালযের অনেক অধ্যাপকেব সঙ্গে পবিচয হইল। স্বামীনাথন প্রায প্রত্যহ সন্ধ্যায আমাদেব বাডিতে আসিতেন। তাঁহাব ইংবাজি সাহিত্যে জ্ঞান আমাকে চমৎকৃত কবিত। ইংরাজি কাব্যেব আবৃত্তি আমাকে মুগ্ধ কবিত। এমন স্মবণশক্তি বিরল। কিছুদিনের মধ্যেই ইংবাজির একজন নতুন অধ্যাপক আসিলেন। তিনি ছিলেন কাশ্মীবী, শ্রীনগব

বিশ্ববিদ্যালয়েব এক কৃতী ছাত্র। তাঁহার সঙ্গে আমি প্রাতঃভ্রমণ শুরু কবিলাম। পাহাড়েব বাস্তাগুলি বড় সুন্দব। রাস্তার দইধারে দীর্ঘশির পলাশগাছ এবং অন্যান্য গাছ। এবং আমাদের দুইদিকে সাতপুরা পর্বতমালা। এই পাহাড়ে ঘব-বাড়ি, রাস্তাঘাট যে এত সুন্দর তাহাব একটি কারণ ছিল। কমান্ডার ইন চিফ Auchinlek-এইখানে একটি Jungle orphan school প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালযে সব ঘববাড়ি সেই স্কুলের ঘববাড়ি। ক্লাসে বিশেষ মেধাবী ছাত্রের অভাব ছিল। একদিন আই.এ ক্লাসে মজার ব্যাপাব হইল। আমি মিলটনেব On his Blindness সনেটটি পড়াইলাম। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বুঝাইলাম। মনে হইল ক্লাসের সকলেই আমাব ব্যাখ্যা অনুধাবন কবিযাছে। ক্লাস শেষ হইলে একটি ছাত্র আমাব কাছে আসিযা বলিল, স্যাব এক লভ্জ কা মতলব নেহি বাতাযা, আমি বলিলাম, কোন সে লভ্জ কহ? ছাত্রটি বলিল, পার্টিযেনস, আমি শব্দটি কী, তাহা বুঝিলাম না, ছাত্রটি তাহাব বই খুলিযা আমাকে শব্দটি দেখাইল। শব্দটি Patience। আমি ছেলেটিকে শব্দটিব যথার্থ উচ্চাবণ বুঝাইযা দিলাম, এবং ইহাব অর্থও বাতলাইলাম।

আমাব অধ্যাপনা সম্বন্ধে আব কোনো কাহিনী মনে পড়িতেছে না। তবে স্বামীনাথনের সঙ্গে কথা বলিযা খুব আনন্দ পাইতাম। তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পব আমাদেব বাড়িতে আসিতেন। ড. অরুণ দে-ব ঘবে আড্ডা বসিত। কখনো কখনো মল্লিকার্জুনও থাকিতেন। স্বামীনাথনের বিষয ছিল সাহিত্য। তাঁব স্মৃতিশক্তি আমাদেব মুগ্ধ কবিত। সেক্সপীযারের নাটক হইতে দীর্ঘ প্যাসেজ তিনি আবৃত্তি কবিতেন। ওযাডর্সওয়ার্থ, শেলী, কীটস্ প্রভৃতি কবিব কাব্য হইতেও অনেক অংশ তিনি আবৃত্তি করিযা শুনাইতেন। মল্লিকার্জুন স্বামীনাথনেব খ্যাতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন। তিনি আমাদের সেইসব কথা বলিতেন। বযসে তিনি তখন আমাব সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু বিদ্যায তিনি আমাব গুরুস্থানীয বলিযা মনে হইত। সগব বিশ্ববিদ্যালযেব উপাচার্য হরি সিং গৌব বিশ্ববিদ্যালযেব বড আসিতেন না। বিশ্ববিদ্যালযেব প্রশাসনিক কাজকর্ম সব স্বামীনাথনই করিতেন। বিশ্ববিদ্যালযেব পর তিনি স্যাব হবি সিং গৌরের বাড়িতে যাইযা তাঁহাব সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালযের প্রশাসনিক সমস্যা লইযা আলোচনা কবিতেন। সগর বিশ্ববিদ্যালযের প্রশাসনিক সমস্যা লইযা স্বামীনাথনেব দিল্লি যাইতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়েব স্বামীনাথনেব এই প্রাধান্য লইযা কোনো আলোচনা হইত না, সকলেই স্বামীনাথনের এই প্রাধান্য সর্বান্তঃকবণে মানিযা লইতেন। একালে যেন ইহা দেখি না। যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালযের একটা power struggle দেখি, অধ্যাপকদেব মধ্যেও একটা ক্ষমতালাভেব চেষ্টা।

আমি সগব বিশ্ববিদ্যালযে এক বছব কাজ কবিযাছি, বিশ্ববিদ্যালযে কোনো বিভাগে তখন কোনো প্রফেসব ছিল না। সব বিভাগেব প্রধানই বীডাব ছিলেন। ইতিহাসেব বিভাগেব প্রধান ছিলেন একজন লেকচারাব। যাইহোক প্রশাসনিক ব্যাপাবে আমাব কোনো দাযিত্ব ছিল না। লেকচাবাব হিসেবে আমি কযেকটি কমিটিব মেম্বাব নিযুক্ত হইযাছিলাম। আমি এই সদস্যপদ গ্রহণ করি নাই। তখন বিশ্ববিদ্যালযেব ছাত্রসমাজেব মধ্যেও কোনো পলিটিক্স দেখি নাই। এখন সগব বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের পলিটিক্স

অবশ্যই প্রবেশ করিয়াছে। স্বামীনাথন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েব D Phil উপাধি লাভ কবিয়া আমেবিকাব একটি বিশ্ববিদ্যালযে ইংরেজিব অধ্যাপক হইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ কবেন। সম্প্রতি তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। তাঁহাব কন্যা ইংরাজির অধ্যাপিকা হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এবং তিনি স্বামীনাথনেব রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ কবিতেছেন।

সগরে আমাদের এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন গোকুলেশ্বব ভট্টাচার্য। তাঁহাব সঙ্গে গল্প কবিযা আনন্দ পাইতাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালযের আসবাব রক্ষণাবেক্ষণ কবিতেন। তবে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালযেব খবর তিনি রাখিতেন। উজ্জ্বল, গৌববর্ণ, দীর্ঘদেহী এই ভদ্রলোকটিকে বিশ্ববিদ্যালযেব সকলেই পছন্দ করিতেন। বিশ্ববিদ্যালযেব তখন দ্বিতীয় বৎসব চলিতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালযের বিজ্ঞান বিভাগের Dean তখন ছিলেন ড. অক্ষয়কুমাব ভট্টাচার্য। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালযের কেমিস্ট্রি রীডারেব পদ ছাড়িযা সগবে আসিয়াছিলেন। তাঁহাব সঙ্গে আমাব পরিচয হইয়াছিল। আমি সগবে ধুতি-পাঞ্জাবি পবিতাম। এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডাব জন্য আমাকে অনেকে গবম কোর্ট, প্যান্ট ব্যবহার কবিতে বলিতেন। অক্ষযবাবু এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে, ভারতবর্ষে বাঙালিরাই প্রথম য়ুরোপীয পোশাক ব্যবহাব করেন সেইজন্য রবিবাবু বোধহয প্যান্ট-কোর্ট বর্জন করিযাছেন।

সগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিবাব সময দুইটি ঘটনার কথা এখন প্রাযই স্মবণ কবি। একটি হল—১৫ আগস্ট আমাদেব স্বাধীনতা অর্জন, আরেকটি—১৯৪৮ সালের ৩০ জানুযাবি গান্ধী হত্যা। স্বাধীনতা লাভেব প্রথম দিন সগব বিশ্ববিদ্যালযে স্বাধীন ভারতেব পতাকা উত্তোলন কবা হইল। আমি ভাবিয়াছিলাম স্যাব হরি সিং গৌব উত্তোলন কবিবেন। শুনিলাম তিনি এই উপলক্ষ্যে তখন দিল্লি গিযাছেন। পতাকা উত্তোলন কবিলেন স্বামীনাথন সাহেব, তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালযেব শ্রেষ্ঠ পুরুষ। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে এক বিভ্রাট ঘটিল। পতাকা উত্তোলিত হইল কিন্তু উহা খুলিল না। পতাকায যে ফুলগুলি বাঁধিযা দেওয়া হয, সেগুলিও পড়িল না, এই সময স্বামীনাথন একটি সুন্দব কথা বলিলেন Let us go home, God breathe we do the rest

গান্ধী হত্যার দিন বিশ্ববিদ্যালযে এক তুমুল কাণ্ড ঘটিল। বহু পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়েব বিশাল প্রাঙ্গণে একত্রিত হইযা RSS অনুগামীদের গ্রেপ্তাব কবিবাব জন্য তৎপব হইলেন। কিছু ছাত্র গ্রেপ্তার হইলেন। একজন অধ্যাপককেও থানায লইয়া যাওয়া হল। তবে বিশ্ববিদ্যালযেব কোনো ত্রাসেব সৃষ্টি হইল না। আমার ইচ্ছা হইল এলাহাবাদে যাইযা প্রয়াগে গান্ধীব অস্থি বিসর্জন দেখিযা আসি। অরুণবাবু এলাহাবাদেব মানুয। তিনি বলিলেন আমি তাহাদেব বাড়িতে ওই দিন থাকিতে পারি। সংবাদপত্রে অস্থি বিসর্জনেব তাবিখ প্রকাশিত হইলে আমি এলাহাবাদ যাত্রা কবিলাম। থার্ড ক্লাসে অস্বাভাবিক ভিড়েব মধ্যে কোনোমতে একটু স্থান পাইযা বসিযা বহিলাম। অধিকাংশ যাত্রী এলাহাবাদে গান্ধীজীব অস্থি বিসর্জন দেখিতে যাইতেছেন। এলাহাবাদে স্টেশনে পৌঁছিযা একটি টাঙা কবিযা লবেন্স গঞ্জে অরুণবাবুব বাড়িতে পৌঁছিলাম। বাড়িব সকলেই আমাব খুব আদব যত্ন করিলেন। পরদিন সকালে স্নানাহার সাবিয়া এলাহাবাদ স্টেশনে যাইযা দেখি সেখানে এক বিশাল জনতা। তবে কোথাও

কোনো গোলমাল দেখিলাম না। এবং সর্বত্র এক বিষাদময় নীরবতা। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি স্পেশাল ট্রেন এলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছিল। তাহার পর শোকযাত্রা আরম্ভ। আমি ঠিক করিলাম প্রয়াগ পর্যন্ত যাইব না। ভাবিলাম অস্থি বিসর্জন এই প্রচণ্ড ভিড়ে দেখিতে পারিব না। অতএব মিছিলের অর্ধেক পথ এই জনতার সঙ্গে হাঁটিব ঠিক করিলাম। যে শকটে মহাত্মার অস্থি রাখা হইয়াছিল, সেই সকটে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং বল্লভভাই প্যাটেলকে দেখিলাম। শোকযাত্রা যখন একটি গীর্জার কাছে উপস্থিত হইল তখন দেখি ওই গীর্জার সামনে কিছু ইংরাজ গীর্জার অর্গ্যান বাস্তায় আনিয়া Cardinal Newman-এর Lead Kindly light, Lead down be on The night is dark and I am far from home এই গানটি শুনিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। যে দেশের সঙ্গে আমাদের বিরোধ সেই দেশের মানুষ গান্ধীর তিরোভাবে বিরোধ একটি শান্তি গীত গাহিতেছে। আবার সেই মিছিলের অন্যপ্রান্তে আমাদের মিলিটারি Band বাজিতেছে আর যখন গান্ধীজী তাঁহার দেশের একজন মানুষের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন, তখন বলিতে পারি I am far from home' আমার এলাহাবাদে আসা সার্থক হইল।

সগরের এক প্রতিবেশীর রেডিওতে নেহেরুর দুইটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। একটি ১৯৪৮-এর ১৫ অগাস্ট মধ্যরাত্রির বক্তৃতা। আরেকটি গান্ধী হত্যার দিনের বক্তৃতা। দুইটি বক্তৃতা শুনিয়া অভিভূত হইয়াছিলাম। দুইটি বক্তৃতাটিকেই বলি, ইহা এক মহৎ প্রাণের মহৎ উচ্চারণ। এখন ভাবি যে, আমাদের রাজনীতিতে এই মহত্ত্ব এখনও বাঁচিয়া আছে কিনা? বোধহয় নাই। সগরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ১৯৪৬-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। স্বভাবতই এরা মুসলমানবিরোধী, অধ্যাপকের মধ্যেও এই বিরোধিতার ভাব ছিল। অতএব, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রভাব ইহাদের মধ্যে খুব প্রবল। অবশ্য ইহা লইয়া আমি কোনো ছাত্রের সঙ্গে বা কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতাম না। রাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে তখন বিশেষ আলোচনা অবশ্যই হইত। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাডেমিক কাউন্সিলে এই প্রশ্ন উঠিল। আকাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা হিন্দিই হইবে—এই প্রস্তাব পাশ করিলেন। আকাডেমিক কাউন্সিলের সভাপতি হইলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার হরি সিং গৌর। তিনি উঠিয়া বলিলেন, It should be recorded in the proceedings of the Assembly that the Chairman of the Council said that English should be language of instruction and administration of this University for all time আমি আকাডেমিক কাউন্সিলের এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। যাহা হউক, ইহা লইয়া কাউন্সিলের কোনো তর্ক হইল না। সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি বন্ধ ছিল না। দেখিলাম, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু, আমি কোনো গবেষণা আরম্ভ করিলাম না। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির একটি শর্ত ছিল এই যে, এই বৃত্তির প্রাপক দুই বৎসরের মধ্যে দুইটি প্রবন্ধ পেশ করিবেন এবং সেই দুইটি প্রবন্ধ গৃহীত হইলে তিনি মৌট স্বর্ণপদক এবং এই স্কলারশিপের বাকি টাকা পাইবেন। আমি এই দুটি প্রবন্ধ সগরে বসিয়া লিখিয়া ফেলিব, ঠিক করিলাম। বিভাগীয় প্রধানের সাহায্যে কিছু বই

আনাইলাম। এই প্রবন্ধেব বিষয ছিল—Anti Acquisitive tradition and Anti Chivalric tradition in Elizabethan comedy এই দুইটি প্রবন্ধ সগব হইতে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয অধ্যাপক ড উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশযকে পবীক্ষক নিযুক্ত কবিলেন। দেশে ফিবিযা আমি মৌট স্বর্ণপদক এবং স্কলারশিপেব বাকি টাকা পাইলাম। সগব বিশ্ববিদ্যালযেব এক বৎসবে ইহাই আমাব একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ। দুঃখেব বিষয এই যে, এই কাজেব সঙ্গে আমাব অধ্যাপনাব কোনো সম্পর্ক ছিল না।

গলদা চিংড়ি

একদিন ড অরুণ দে বলিলেন যে, অক্ষযবাবু আপনাকে একটি বিশেষ কাজ কবিবার কথা বলিযাছেন। কাজটি হইল এই, স্যাব হবি সিং গৌব গলদা চিংড়ি খাইবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবিযাছেন। তিনি জানেন কলিকাতায এই মাছ পাওযা যায। সম্প্রতি একজন বাঙালি ইংবাজিব অধ্যাপক নিযুক্ত হইযাছে শুনিযা তিনি তাহাকে দিযা গলদা চিংড়ি আনাইতে চান। আমি বলিলাম, এই গলদা চিংড়ি আনা অসম্ভব নহে কিন্তু একটি সমস্যা আছে। আমি অধ্যাপক হিসেবে এখনও Confirmation পাই নাই। এক বৎসব পূর্ণ হইলে তাহা পাইব। এখন যদি আমি উপাচার্য মহাশযকে গলদাচিংড়ি খাওযাই তাহা হইলে নানা লোকে নানা কথা বলিবে। অতএব, আমি এই গলদাচিংড়িব জন্য সমস্ত খবচ চাহিব। অরুণবাবু এই কথা অক্ষয ভট্টাচার্যকে জানাইলেন এবং তিনি এই খবচ উপাচার্য মহাশযেব কাছ হইতে লইযা আমাকে অবশ্যই দিবেন। আমি আমাব পিতাকে সব কথা জানাইযা চিঠি দিলাম। তিনি কুড়িটি গলদাচিংড়ি খুব সুন্দব কবিযা প্যাক কবাইযা পাঠাইলেন। খরচ কুড়ি টাকা। গলদাচিংড়ি আসিল এবং ব্যানার্জি মহাশয ইহা খাইযা তৃপ্তি লাভ কবিলেন। অক্ষযবাবু আমাকে কুড়ি টাকা পাঠাইযা দিলেন। এই টাকা অক্ষযবাবু দিলেন না উপাচার্য দিলেন—তাহা আমি বুঝিতে পাবি নাই।

সগব বিশ্ববিদ্যালযেব কার্যকালে আমাব মধ্যম ভ্রাতা নলিনাক্ষ দাশগুপ্তেব বিবাহ হইল। পাত্রী আদিনাথ সেনেব একমাত্র কন্যা সুনীলা সেন। আমাব ভাই তখন স্কটিশচার্চ কলেজে ফিজিক্সেব লেকচাবাব। এবং সুনীলা (সোনা) ওই কলেজেবই বি এস সি-র ছাত্রী। কিন্তু সুনীলাব সঙ্গে আমাব ভ্রাতাব কোনো পবিচয হয নাই। তাহাদেব মধ্যে কোনো বাক্যবিনিময হয নাই। সোনা আমাব স্ত্রীব পিসতুতো বোনেব কন্যা। এই সম্বন্ধেব প্রস্তাব আদিনাথবাবুই কবিযাছিলেন। যাহাহউক আমি এই বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পাবিযাছিলাম। সগব বিশ্ববিদ্যালয ডিসেম্বব মাসে আমাকে সাত দিনেব ছুটি দিযাছিলেন। বিবাহে খুবই ঘটা হইযাছিল। আদিনাথবাবুব দুই ছেলে। দ্বিতীয ছেলে দিবানাথ সেন। দিবানাথেব স্ত্রী বমা অভিনেত্রী হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ কবিযাছিলেন। তিনি বাঙালির গৌবব সুচিত্রা সেন।

সগব বিশ্ববিদ্যালযে কোনো সেমিনাব হয নাই এবং কোনো বিশেষ বক্তৃতাব ব্যবস্থাও হইত না। এম এ ক্লাসে একমাত্র ছাত্রেব মৃত্যুব পব কোনো এম এ ক্লাসও হইত না। বি এ পাস ক্লাসেব জন্য বিশেষ অধ্যযনেব প্রযোজন ছিল না। আমাব একমাত্র কাজ ছিল প্রেমচাঁদ-

বাষচাঁদ প্রবন্ধ দুটি বচনা কবা। তবে সগব বিশ্ববিদ্যালযে এক বৎসব আমাব জীবনেব এক ব্যর্থ বৎসব তাহা বলিতে পাবি না। স্বামীনাথনেব মতো একজন মানুষেব সান্নিধ্য একটি বড লাভ। ড অরুণ দে এবং মল্লিকার্জুনেব সংসর্গ আমি এখনও স্মবণ কবি। ড অরুণ দে-ব সঙ্গে পত্রালাপ হইত। তিনি সত্তব বৎসর বযসে এলাহাবাদেই পবলোক গমন কবেন। মল্লিকার্জুনেব সংবাদ বাখি না। অক্ষয ভট্টাচার্য আব জীবিত নাই। কিন্তু সগবেব জীবন আমি ভুলি নাই। প্রত্যেকেব কথাই স্মবণ কবি এবং স্মবণ কবিযা দুঃখ পাই। সেক্সপীযাব জীবনকে একটা Walking shadow বলিযাছেন। আবো বলিযাছেন, মনুষ্য জীবন হইল—A tale full of sound and fury signifyng nothing আমি এমন কথা বলি না। আমি বলি, আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিবহ দহন লাগে, তবুও শান্তি তবুও আনন্দ তবুও অনন্ত জাগে। আমি মনে কবি, ঈশ্বব যাহা একবাব সৃষ্টি কবেন তাহাব লয নাই। যাহাবা আছেন এবং যাহাবা চলিযা গিযাছেন, এই সকলকে লইযাই আমাদেব জীবন। যদি তাহাদেব নিত্য স্মবণ নাও কবি তাহা হইলেও তাহাবা আমাদেব জীবনে উপস্থিত। ববীন্দ্রনাথ বলিযাছেন, নাই আব আছে, এক হযে মিশিযাছে—এই কথা সর্বৈব সত্য। আমাদেব জীবনেও যাহা নাই এবং যাহা আছে, তাহা একত্রে বিবাজমান।

যখন সগবে ছিলাম তখন কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখিযা আমি সাড়া দিযাছিলাম। দিল্লিব সেন্ট্রাল কলেজ অফ এগ্রিকালচাবেব অ্যাসিটেন্ট প্রফেসব অফ ইংলিশ নিযুক্ত হইবে। মাহিনা ২৭৫ হইতে ৮০০। ক্লাস II অফিসাবেব ব্যাংক। সগব হইতে কলিকাতা ফিবিযা আমি এই পদেব জন্য ইন্টাবভিউ চিঠি পাইলাম। ১৯৪৮-এব যেব্রুযাবিতে দিল্লিতে Federal Service Commission এই ইন্টাবভিউ লইবে। তখন ভাবত স্বাধীন কিন্তু Federal Service Commission তখনও Union Service Commission-এ ৰূপান্তবিত হযনি। Federal Service Commission-এব সভাপতি তখন ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজেব ইতিহাসেব প্রাক্তন অধ্যাপক জ্যাকাবাযা সাহেব। Federal Service Commission-এব দপ্তবে পৌঁছিযা দেখিলাম ইন্টাবভিউ-এব জন্য চল্লিশ জন উপস্থিত, Surname-এব আদ্যাক্ষব অনুসাবে তাহাদেব ডাকা হইবে। আমি এক ঘণ্টাব মধ্যেই ডাক পাইলাম। ঘবে প্রবেশ কবিযা জ্যাকাবাযা সাহেবকে চিনিলাম। আবেকজন সদস্য কোনো কাবণে অনুপস্থিত। জ্যাকাবাযা সাহেব আমাকে দু-একটি প্রশ্ন কবিলেন। এগ্রিকালচাব কলেজেব ইংবাজিব পাঠ্য কী হইতে পাবে? তাহা জিজ্ঞাসা কবিলেন। এইবকম একটি প্রশ্ন কবা হইতে পাবে, তাহা অনুমান কবিযাছিলাম। এবং সেইজন্য কযেকখানি গ্রন্থেব নাম ঠিক কবিযাছিলাম। আমি বলিলাম বেকনেব Of Gardens প্রবন্ধটি অবশ্যই ছাত্রদেব পডা উচিত। উনি এই প্রসঙ্গ ছাডিযা আমাকে PRS-এব Thesis-এব বিষয কী ছিল? আমি বলিলাম Medieval Heritage of Elezabathean comedy। তখন তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন আমি নিশ্চযই মধ্যযুগেব ইংবাজি সাহিত্য খুব পডিযাছি। আমি বলিলাম সমগ্র মধ্যযুগেব ইংবাজি সাহিত্য পডি নাই। তবে Chaucer, Langland প্রভৃতি পড়িযাছি। তিনি তখন জিজ্ঞাসা কবিলেন, ইংবাজি সাহিত্যেব মধ্যযুগেব শেষ কবি কে? এই প্রশ্ন কবিবাব সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিলেন, ইহা তিনি জানেন না। জ্যাকাবাযা

সাহেবেব প্রশ্ন কবিবাব Style লক্ষ কবিবাব মতো। তিনি কখনও বকযাত্রী ঠকানোব মতন প্রশ্ন কবেন না। তবে Chaucer-এব মৃত্যু তারিখটি আমি জানি কিনা—তাহা বুঝিতে চাহিলেন। তাহাব পব বলিলেন, Chaucer-এব মৃত্যু তাবিখটি মনে রাখিতে হইবে। আমি বলিলাম, ১৪০০। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আমাবও মনে হয ১৪০০-ই Chaucer-এব মৃত্যুব তাবিখ। আব কোনো প্রশ্ন কবিলেন না। কেবল বলিলেন, Thank You। ইন্টাবভিউ কেমন হইল, আমি তাহা বুঝিলাম না। নিযোগপত্রটি পাইযা বুঝিলাম ইন্টাবভিউ মন্দ হয নাই।

সেন্ট্রাল কলেজ অফ এগ্রিকালচাবেব অবস্থান আনন্দ পর্বতে। ওই পর্বতেই অধ্যাপকদেব বাসস্থান। সগরে আমি স্ত্রী ও কন্যাকে আনিতে পাবি নাই। কিন্তু সেন্ট্রাল কলেজ অফ এগ্রিকালচাবেব কাজ আবম্ভ কবিযা কিছুদিনেব মধ্যেই স্ত্রী ও কন্যাকে আনাইলাম। আমাব ছোটোভাই বিমলাক্ষ দাশগুপ্ত—তাহাদেব লইযা আসিল। বাসস্থনে দুইটি শযনঘর, বান্নাঘব, স্নানঘব এবং একটি বৃহৎ বাবান্দা, সেই বাবান্দাব দক্ষিণদিকে পর্বতমালা। স্থানটি সুন্দব হইলেও আমি এখানে বেশিদিন কাজ কবিতে পাবি নাই। ১৯৪৮-এব অগাস্ট মাসে কাজে যোগ দিলাম। ১৯৪৯ সালেব ফেব্রুযাবি মাসে আমি চাকুবীতে ইস্তফা দিলাম। তাহাব কাবণ বলি। এই কলেজে কেমিস্ট্রিব অধ্যাপক ছিলেন সুধীব বসু। তিনি Liverpool বিশ্ববিদ্যালযে কেমিস্ট্রিব পি এইচ ডি। তাঁহাব বাসস্থান ছিল আমাব বাসস্থানেব খুব কাছেই, আব এগ্রিকালচাবেব অধ্যাপক একজন পাঞ্জাবি। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডেব কোনো বিশ্ববিদ্যালযেব বি এস সি, তাঁহাব সঙ্গে আমাব কোনো পবিচয় নাই। একদিন শুনিলাম এই দুইজনকে ডিসমিস কবা হইয়াছে। কাবণ শুনিলাম অধ্যাপনায ইঁহাদেব অযোগ্যতা। আমি ইহা মানিতে পাবিলাম না। দুইজনেই ক্লাস I অফিসাব অর্থাৎ প্রফেসব। দুইজনেই Federal Public Service Commission দ্বাবা নির্বাচিত। এই দুইজনকে যখন ডিসমিস কবা হয তখন কলেজেব ছাত্রদেব সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষেব একটা বিবোধ চলিতেছে. ছাত্রদেব অনেক দাবি ছিল। তাহাব মধ্যে একটি দাবি ছিল—অধ্যাপনাব মান আবো উন্নত কবিতে হইবে। বিশেষ কবিযা কেমিস্ট্রি এবং এগ্রিকালচাব বিভাগে। কলেজে কর্তৃপক্ষ তখন কোনো দাবি মানিতে পাবিলেন না। কেবল দুইজন অধ্যাপককে ডিসমিস কবিলেন। ইহা আমাব কাছে ঘোব অন্যায বলিযা মনে হইল। আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা কবিযা সেই কথা বলিলাম। প্রিন্সিপাল ছিলেন Murchandani। তিনি বলিলেন, তোমাব সম্বন্ধে ছাত্রদেব কোনো অভিযোগ নাই, তুমি ইহাতে বিবক্ত হইতেছ কেন? আমি বলিলাম, আমাব আপত্তি, ছাত্রদেব কথায কোনো অধ্যাপককে ডিসমিস কবা অন্যায, তাঁহাদেব যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠলে একটা বিশেষ enquiry-ব প্রযোজন। ছাত্রদের কথায অধ্যাপক বিতাড়ন অনৈতিক। Murchandani সাহেব আমাব পদত্যাগপত্র withdraw কবিতে বলিলেন। আবো বলিলেন, আপনি Confirmation-এব পূর্বে পদত্যাগ কবিতেছেন সেইজন্য আপনাব কোনো Notice দিবাব প্রযোজন নাই। কিন্তু পদত্যাগ কবিলে সাতদিনের মধ্যে আপনাব বাসস্থান ছাডিযা দিতে হইবে। আমি বলি কালই বাসস্থান পবিত্যাগ কবিতে পাবি। উনি বাধ্য হইযা আমাব পদত্যাগপত্র গ্রহণ কবিলেন। আমাব স্ত্রী অবশ্য এ বিষযে কোনো মন্তব্য কবিলেন না। তিনি অল্প সমযেব মধ্যেই বাডি ছাডিবাব

জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমার কন্যার বযস তখন মাত্র দুই বৎসব। অতএব আমি ক্যালকাটা রেলের একখানি ফার্স্ট ক্লাস টিকিট ক্রয কবিয়া তাহাদের গাড়িতে উঠাইয়া দিলাম। সৌভাগ্যবশত আমাদের এক নিকট আত্মীয কলিকাতায যাইতেছেন। একদিক দিয়া আমার স্ত্রী অপর্ণার কলিকাতায় প্রত্যাগমন তখন বাঞ্ছনীয়। কযেকদিন মধ্যেই আমাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলাক্ষ দাশগুপ্তর বিবাহ। আমি একটি স্যুটকেস লইযা আমাব বিশেষ বন্ধু সুধীরবঞ্জন দাসেব বাড়িতে চলিযা গেলাম। তিনি বলিলেন, আমার যতদিন ইচ্ছা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পাবি। আমি স্যুটকেসটি রাখিযা একটি চাকুরীব অনুসন্ধান কবিতে বাহিব হইলাম। বামজাস কলেজ তখন দারীযাগঞ্জে। আমি সেই কলেজের অধ্যক্ষ গুবমুখনিহাল সিং-এব সঙ্গে দেখা করিযা একটি লেকচাবারশিপ পাওযা যায কিনা—জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে এই চাকুবীব জন্য একটি দবখাস্ত করিতে বলিলেন। আমি অধ্যক্ষব ঘরে বসিযাই একখানি আবেদনপত্র লিখিলাম। তিনি বলিলেন, আনন্দ পর্বতে একটি সভায তিনি ওই দিনই সভাপতিত্ব কবিবেন। আমি যেন সেই সভায উপস্থিত থাকি। আমি সেই সভায় উপস্থিত হইলে অধ্যক্ষ মহাশয তাঁহার চেযাব হইতে উঠিযা আমাকে একটি পত্র দিলেন। সেই পত্রে দুই মাসের জন্য বামজাস কলেজে লেকচাবাবশিপেব নিযোগপত্র। অধ্যক্ষ মহাশয়েব এই বদান্যতা আমাব হৃদয স্পর্শ কবিল। আমাব চোখে জল আসিল। সুধীববাবুব বাড়িতে গিযা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন একটি বিশিষ্ট কলেজেব এক বিশিষ্ট অধ্যক্ষ গুরুমুখনিহাল সিং, তিনি তাঁহার মহত্ত্বেব পরিচয দিলেন। সুধীববাবু থাকিতেন তাঁহাব এক বন্ধুব সঙ্গে। সেই বন্ধুটি ছিলেন দিল্লিব এক বিশিষ্ট সাংবাদিক। তিনি এবং তাঁহাব স্ত্রী আমাকে তাঁহাদের বাড়িতে থাকিবার জন্য অনুবোধ কবিলেন। তাঁহাদেব এই সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ করিল। সেকালেব সমাজেব যে চিত্র দেখিলাম সে চিত্র এখন আর দেখি না। তবে সরকাবেব হৃদযহীনতা তখন যেমন, এখনও তেমন। সুধীববাবু এবং তাঁহার বন্ধুব সঙ্গে দুইমাস বড় সুখে ছিলাম। দিল্লিতে আমাদেব কিছু আত্মীয ছিল তাঁহাদের সঙ্গে দেখা কবিলাম। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ আত্মীয ছিলেন ড সুবেন্দ্রনাথ সেন। তিনি আমাদেব গ্রামের মানুয এবং আমাব পিতাব বিশেষ বন্ধু। ১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব Ashutosh Professor of Modern Indian History। ১৯৩৯ সালে তিনি ভাবত সবকাবেব Keeper of Records হইযা দিল্লি গেলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পব এই Indian Records-এব নাম হইল Indian Archives এবং সুবেন সেন এই প্রতিষ্ঠানেব Director নিযুক্ত হইলেন। আমাদের গ্রামের অশ্বিনীকুমাব মুখোপাধ্যায তখন দিল্লিব হিন্দু কলেজে ইংবাজিব অধ্যাপক। উনি আমাদেব গ্রামে প্রথম বিলাত ফেবত। ১৯২৩ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালযে ইংবাজিতে B A অনার্স ডিগ্রি লাভ কবেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালযে এই শেষ পবীক্ষা। বি.এ পাশ কবিবাব তিন বছব পব কিছু টাকা দিযা এম.এ.-ব সার্টিফিকেট লইতে হয। ইনি ছাড়া দিল্লিতে আরো কযেকজন মাহিলাড়াব লোক ছিলেন। তবে আমি বেশি যাতাযাত কবিতাম না। সুধীববাবুব বাড়িতেই বেশ আড্ডা জমিত। বামজাস কলেজে লেকচারার হিসাবে ২৭৫+DA ৬০। ফেব্রুযারি মাসেব ২৮ তাবিখে রামজাস কলেজের কাজ শেষ হইলে আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। কিন্তু

পথে দুই জাযগায় দুই আত্মীযের বাড়িতে একদিন করিযা কাটাইযা গেলাম। প্রথমে গেলাম শ্বশুববাড়ির দিক হইতে আমার আত্মীয় প্রফেসব বিনয দাশগুপ্তব বাড়ি। তিনি তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালযে কমার্সেব প্রফেসব এবং কমার্স ফ্যাকালটির Dean। তিনি এবং তাঁহাব স্ত্রী আমার বিশেষ আদর যত্ন কবিলেন। আমি ইংবাজিব প্রেমচাঁদ-বাযচাঁদ বলিয়া তিনি আমাকে বেশ পণ্ডিত মানুষ বলিযা ঠাওবাইলেন। এবং আমাকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েব বাড়িতে লইযা গেলেন। ধূর্জটিবাবু তখন বঙ্গদেশে সর্ববিদ্যাবিশাবদ বলিয়া পবিচিত। এবং তিনি সবসময কথাবার্তায় তাঁহাব বিদ্যাবত্তাব পবিচয দিতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাব PR S -এর Thesis-এব বিষয় কী ছিল? আমি বলিলাম, Medieval Heritage of Elizabethan Comedy। এই বিষযে তিনি আমাব বিদ্যার পবীক্ষা কবিলেন না। কবিলে ফেল কবিতাম। মধ্যযুগেব সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যেসব বই পড়িযাছেন সেইসব বইযেব নাম উচ্চাবণ কবিলেন। আমি এইসব গ্রন্থেব নামই জানিতাম না। তবে বিনযবাবুব কথা ভাবিযা আমি যে সেইসব বই পড়ি নাই, তাহা প্রকাশ কবিলাম না। ধূর্জটিবাবু যে একজন পণ্ডিত, সে বিষযে আমাব কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে তাঁহাব পাণ্ডিত্যেব সঙ্গে তাঁহাব পণ্ডিতমন্যতাবও পবিচয পাইলাম। ইহাব পব বিনযবাবু আমাকে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালযেব লাইব্রেবিতে লইযা গেলেন তিনি বলিলেন, এই লাইব্রেবিব বই পাঠকেব কাছে উপস্থিত কবিবাব তিনি একটি নতুন প্রণালীব প্রবর্তন কবিযাছেন। সেই প্রণালীব কার্যকাবিতা আমাকে দেখাইবাব জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, তুমি বইখানিব নাম ও নম্বব এই বাটিতে বাখিবে। এবং কিছুক্ষণ পবে তোমার বই উপবে চলিযা আসিবে। আমি একটি গ্রন্থেব নাম ও নম্বব লিখিযা কাগজখানি ওই বাটিতে বাখিলাম। অল্পক্ষণেব মধ্যে একখানি বই উপবে উঠিযা আসিল। কিন্তু আমি যে বইখানি চাহিযাছিলাম, সেই বই আসিল না। বিনযবাবু বলিলেন, কোথাও একটা গোলমাল হইযাছে। যাহা হোক ইহাব পব আমবা মধ্যাহ্নভোজনেব জন্য বিনযবাবুব বাড়িতে ফিবিলাম। বাড়িটি যেমন সুন্দব তেমন সুসজ্জিত। অতিথি স্বাধীনভাবে তাহাব খণ্ডে থাকিতে পাবিত। ওই বাত্রেই বিনযবাবু আমাকে লক্ষ্ণৌ স্টেশন আসিয়া গাড়িতে উঠাইযা দিলেন। তাঁহাব এবং তাঁহাব স্ত্রীব আতিথেযতা আমাকে চমৎকৃত কবিল।

ইহার পব গেলাম বেনারসে। সেখানে বিখ্যাত অমিযকুমাব দাশগুপ্তব বাড়িতে একদিন ছিলাম। তিনি তখন বেনাবসেব যুনিভার্সিটিব অর্থনীতিব প্রফেসব এবং বিভাগীয প্রধান। London School of Economics-এব ছাত্র ছিলেন। Concept of Surplas সম্বন্ধে Thesis লিখিযা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালযেব পি এইচ ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাব সঙ্গে আমাব প্রথম পবিচয ঢাকায ১৯৪৩ সালে। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব অর্থনীতিব অধ্যাপক। ১৯৪৯ সালে তাঁহাব সঙ্গে আমাব দেখা হইল। তিনি তখন আলিগড বিশ্ববিদ্যালযেব অর্থনীতিব প্রধান অধ্যাপক। মাঝে মাঝে দিল্লিতে তাঁহাব ছাত্র পবিমল রাযেব বাড়িতে দু'একদিন কাটাইযা যাইতেন। আমি তখন দিল্লিব হিন্দু কলেজে ইংবাজিব অধ্যাপক। পবিমল রায়েব সঙ্গে আমাবও বন্ধুত্ব হইযাছে। তাঁহাব বাড়িতেই অমিয দাশগুপ্তব সঙ্গে পুনবায দেখা।

প্রতি সন্ধ্যায় পবিমল বায়েব বাড়িতে প্রচণ্ড আড্ডা। পবিমল বায তখন I A S Training Academy-ব Economics-এব রিডাব। যমুনাব পাবে মেটকাফ হাউসে তাঁহাব বাসস্থান। অমিযবাবুব সহজ সবল ভাব আমাকে চমৎকৃত কবিত। সেই দিনগুলিব কথা মনে কবিযা কাশীতে অমিয়বাবুর বাড়িতে আসিলাম। তিনি আমাকে সাবনাথে বৌদ্ধস্তূপ দেখাইতে লইযা গেলেন। পথে বিস্তায অনেক গল্প হইল। কোনো গল্পেই তাঁহাব নিজেব কথা ছিল না। এমন মানুষ একালে বিরল। অমিযবাবুর একমাত্র ছেলে পার্থসাবথি দাশগুপ্ত এখন ইংল্যান্ডেব এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্। তিনি নাইটহুড লাভ কবিযাছেন। অমিযবাবু ও তাঁহাব স্ত্রী শান্তি অবশ্য এখন জীবিত নাই।

যথাসময়ে দেশে ফিবিলাম। তখন আমি বেকাব। কোথাও কোনো কলেজে ইংবাজির অধ্যাপকেব পদ খালি নাই। একদিন কাগজে দেখিলাম দিল্লির হিন্দু কলেজে একজন ইংবাজিব অধ্যাপক লওযা হইবে। আমি এই পদেব জন্য দবখাস্ত কবিলাম এবং ইন্টারভিউযেব জন্য চিঠি পাইলাম। ইন্টাবভিউযেব দিন আমাব বেশ ভয হইল। নিশ্চযই ইংবাজিব কোনো বিশেষজ্ঞ বোর্ডে থাকিবেন, এবং বিশাল ইংবাজি সাহিত্য হইতে কোনো একটি বিষযে প্রশ্ন কবিবেন এবং আমি সেই বিষযে কিছুই বলিতে পাবিব না। হিন্দু কলেজ তখন কাশ্মীবি গেটে। ঘবে প্রবেশ কবিযা দেখিলাম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযেব প্রতিনিধি ড B N Ganguly উপস্থিত। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালযে অর্থনীতিব বিডার। কলেজেব Governing Body-ব সভাপতি স্যার শ্রীরাম উপস্থিত। তাঁহাব পাশে কলেজেব অধ্যক্ষ অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ইংবাজিব অধ্যাপক এবং অক্সফোর্ডে ইংবাজিব গ্রাজুযেট। ভাবিলাম ইংবাজি সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি আমাকে প্রশ্ন কবিবেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন কবিলেন না। আমি বাঁচিযা গেলাম। স্যাব শ্রীরাম আমাকে কোনো প্রশ্ন কবিলেন না। তিনি অধ্যক্ষ মহাশযকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই Candidate বামজাস কলেজে কিছুকাল পডাইযাছে। বামজাস কলেজেব অধ্যক্ষ তাঁহাব যোগ্যতা সম্বন্ধে কী বলেন? অধ্যক্ষ মহাশয বলিলেন, আমি গুরুমুখনিহাল সিং-কে ইহাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিযাছিলাম। তিনি বলিলেন দাশগুপ্ত ভালো পডাইত। এইখানেই ইন্টাবভিউ শেষ হইল। আমি কিছুক্ষণ ওই কলেজে অপেক্ষা কবিলাম ইহা ভাবিযা যে, এই পদটি কে পাইল তাহা বোধহয অধ্যাপক মহাশয বলিযা দিবেন। ঠিক তাহাই হইল। কিছুক্ষণেব মধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে তাঁহাব ঘবে আসিতে বলিলেন। আমি তাঁহাব ঘবে যাইতে তিনি বলিলেন, আমি নির্বাচিত হইযাছি। আগামীকাল হইতেই কাজ শুরু কবিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল থাকিব কোথায? এত অল্প সমযেব মধ্যে বাড়ি খুঁজিযা বাডি ভাডা কবা সম্ভব হইবে না। দিলীপকুমাব সান্যাল তখন দিল্লি পলিটেকনিকে ইংবাজিব অধ্যাপক। তিনি হিন্দু কলেজের খুব কাছে Lancers Road-এ থাকেন। তাঁহাব বাড়িতে পেযিং গেস্ট হিসাবে থাকিবাব ব্যবস্থা হইল। হিন্দু কলেজে কাজ শুরু কবিলাম। ইংরাজি বিভাগেব প্রধান ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদালযে ইংবাজি গ্র্যাজুযেট। আচাব-আচবণে খুব ভদ্র। কিন্তু ইংবাজি ভাষাব জ্ঞান পবিমিত। অধ্যক্ষ মহাশয কলেজে অনুপস্থিত থাকিলে তিনিই তাঁহাব নির্দেশে

নোটিশ লিখিয়া নোটিশবোর্ডে লাগাইয়া দিতেন। একদিন ফুটবল ম্যাচেব জন্য একটাব সময় ছুটি দেওযা হইল। নোটিশ বোর্ডে পড়িলাম যে College will remain close to see the match। এই ইংবাজি বাক্যটিব ব্যাকবণদোষ সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিলেন না। আমিও নীবব হইলাম। তবে PC Sood-এব সঙ্গে আমাব বেশ বন্ধুত্ব ছিল।

দিলীপ সান্যালেব বাড়িতে আমি সুখে ছিলাম। তাঁহার দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা। সকলেই শিশু। তাঁহাব ভাগ্নে গোবা তখন দিল্লির পলিটেকনিকেব ছাত্র ছেলেটি আমাকে মামা বলিযা ডাকিত। আমিও উহাকে খুব স্নেহ কবিতাম। দিলীপবাবুও খুব গল্প করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই পবিমল বাযেব সঙ্গে আলাপ হইল। মেটকাফ হাউসের বাড়িতে নিত্য আড্ডা। যেখানে দিল্লিব অনেক অধ্যাপক আসিতেন দিল্লি কলেজে ইংবাজিব অধ্যাপক মন্মথনাথ ঘোষেব সঙ্গে আমাব বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে এম এ. পবীক্ষায প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পাইযাছিলেন।

সঙ্গিন খোঁচানো মুখেব মতো বিকৃত সে মাটিব মুখ
স্পষ্ট নখের চাপে ক্ষত-বিক্ষত সে মাটিব বুক

সে দেখে ছাই বং সন্ধ্যাব মতো সমস্ত খামাব জুড়ে ভৌতিক শূন্যতা। কথায কথায মনে পড়ে যায সেদিনের পুবানো কথা। অসীম, বাম, সমরেশ এবং আমি আতপুরে গঙ্গার ধাবে বেড়াচ্ছি। বিকেল ঘনিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যাব দিকে। আমাদেব সেই তখনকাব আলাপচাবণের বিষযগুলি আজ আর যথাযথ মনে নেই। শুধু মনে আছে বিষ্ণু দেব কথা উঠেছিল। আমি তখন অনর্গল বিষ্ণু দে-ব কবিতা আবৃত্তি করতে পাবতাম। ভালো লেগেছিল অসীম এবং বাম দুজনেই আমার দিকে সকৌতুকে তাকাচ্ছিল। তাবপব যেমন হয় এরকম বাত্মায পদচারণাব মাঝখানে হঠাৎ নেমে আসে অধিকতব বাত্মায এক নৈঃশব্দ্য। আমি অসীমকে ববাবরই 'আপনি' বলেছি—কিন্তু বামকে সেদিনই আমি 'তুমি' বলে ফেললাম। অসীম এবং আমাব মধ্যে দূবত্বটা কোনোদিন ঘোচেনি। কিন্তু রামেব সঙ্গে অন্তবঙ্গতা মুহূর্তে অর্জিত এবং তা হযেছে পাবস্পবিক প্রীতিব চিবস্থাযী পবিণাম। বাম কবিতায এক নাটকীয ভূমিকায আসীন—অথচ সেখানে নাটুকেপনা নেই।

'রাম বসুব সমগ্র কবিতা' হাতে এলে যে- কোনো কাব্যপাঠকেবই আনন্দিত হবাব কথা। একজন সৎকবিব কাব্যসৃষ্টিব সঙ্গে দেখা হয বলেই এই আনন্দ। আত্মচৈতন্যেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাবেব নানা ইতিবৃত্ত ও বৃত্তান্ত ছড়িয়ে বযেছে এই কবিব গত পঁচিশ বছবেব কাব্যরচনাব অধ্যাযে অধ্যাযে। বস্তুত তাঁকে সে কাবণেই কোনো দশকেব কবি বলে চিহ্নিত কবা যায না—কোনো যথার্থ কবিকেই কবা যায না। কাবণ স্বল্পায়ু কবিত্বই দশকের পবিমিত পবিসীমায ভাঙচুব কবে দম হাবিযে ফেলে, তাবপব সে কোনো গেট খোলা দেখলেই সেখানে ভিড়ে পড়ে। যথার্থ কবিত্ব সেই পবম অভিজ্ঞেব কাছেই শিক্ষাগ্রহণ কবে—যে 'যুগযুগান্তে ফোটায মুকুল তাব তাড়াহুড়ো নাই।' বাম বসুব কাব্যরচনাব প্রথম দশকে তাই কোনো দৃষ্টি আকর্ষণেব জন্য আকস্মিক চমক ছিল না। আপন কণ্ঠকে সজোবে সবার ওপবে তোলাব চেষ্টায কণ্ঠ বিদীর্ণ বা বিকৃত কবাব প্রযাস ছিল না, অথচ তিনি কাবো সঙ্গে গলাও মেলালেন না। বিদেশ থেকে মহাজন সংগ্রহ কবে বাংলা-কাব্যেব ধাবা বদলেব অলীক সাধনাও তাঁব ছিল না। তিনি একবাবেই চোখ মেলেছেন আকাশ-নদী-মৃত্তিকাব মাঝখানে, সেখানে মানুষকে পেযেছেন তিনি তাব প্রাকৃত মূর্তিতে। প্রকৃতি এবং মানুষেব যে রূপ তিনি ধ্যানে তুলে নিলেন সে রূপটিব অভিনবত্ব আজকে আবো স্পষ্ট। বাম বসুব মানুষ যেমন দেশজ মানুষ, সে মানুষের চাবপাশে যেমন অতীত বর্তমানেব রূপবলয ও অগ্নিবলয, তাঁব প্রকৃতি চেতনাব তেমনি বিষণ্ণ মিষ্টতাকে প্রশ্রয দিল না বাবেকেব জন্য। প্রথম পর্যাযে তাঁব দৃষ্টি ছিল বহির্মুখ। দেশ কালেব ছন্দকে তিনি কান পেতে ধবতে চেযেছেন, সে নৃত্যভঙ্গিমাকে দু-চোখ ভবে দেখতে চেযেছেন। এই পথেই তিনি বচনা কবেছেন এমন কতকগুলি কবিতা যেগুলি কালের স্পর্শকে অঙ্গীভূত কবেও উত্তীর্ণ হয়েছে কালোত্তবে। 'পরাণ মাঝি হাঁক দিযেছে' কবিতায শুধুই বাংলাব কৃষক আন্দোলনেব এক অধ্যায যদি ধৃত হত কাব্যবন্ধনে তা হলে অবশ্যই এ কবিতাব মূল্য বেশি হত না। কিন্তু মর্মোৎসাবিত চিত্রকল্পবাজিব সমাবেশে, এক নাট্যময বাকস্পন্দেব প্রযোগে এ কবিতা হযেছে চিবকালেব কবিতা। আজ বিশ বছব পবেও এ কবিতা

'অগ্রণী'র বিবর্ণ পাতায় প্রকাশিত প্রথম দিনের মতোই জীবন্ত। অনুরূপ আর একটি কবিতাকেও আমি এই সংকলনে খুঁজছিলাম—'দ্বীপান্তরেই যদি চলে যায় গজেন মালী'। পেয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত। হয়তো পরাণ মাঝি'র মতো শিল্পোত্তীর্ণ নয়, হয়তো একটু বেশি ভাবপ্রবণতাগ্রস্ত—তা হোক, তবু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তার আবেগ বৌদ্ধিকতার হাত ধরে চলে।

যে দিন তিনি বললেন অ্যাবস্কন্ডার জীবনে একবুক শস্যের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে

আজ আবার এই পথে পা দিলাম
সেদিনের সম্রাট
ভিখারীর মতো চুপি চুপি।

দূরে দেখছি
সেপাই ছাউনি ফেলেছে
মন্দিরের মাঠে
বাঘের পিছনে ফেউয়ের মতোন সেবাদল
তাদের চাপা চাপা কথা ভেসে আসছে,
আমি চলেছি।

তখনই বোঝা গেছে আমরা এক বিস্ফোরক নাটকীয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই দুর্ভাগার দশকের বীর্যবন্ত কবিতার দেখা পাবো আমরা—পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে। অনেক পরে রাম বসু বেশ কয়েকটি কাব্যনাটক লিখবেন—তার সূত্রপাত এখান থেকে। পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে একটি বিদারক নাটকীয় একোক্তি। কবিতাটির ভাবে ভাষায় চিত্রকল্পে চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের এক বিশেষ সময়—দেশ কাল পাত্র। কবিতাটি অবশ্যই সংগ্রামের কবিতা। প্রথম চার পংক্তিতে পরিস্থিতির ভূমিকা। মাত্র এই খবরটুকু দেওয়া হল—বৃষ্টি ধরে গেছে। চালের ফুটো দিয়ে ঘরে আর জল পড়বে না। তারপরেই দ্বিতীয় স্তবক থেকে তৈরি হতে থেকেছে এক টান টান শ্বাসরোধী পরিস্থিতি। কৃষক যুবক তার বৌকে বলছে ছেলেটাকে তোমার বুকের ওম্ থেকে এবার নামিয়ে রাখবে। কথায় বোঝা যায় এ এক অভাবী সংসার। কিন্তু এও বোঝা যায় কিছু একটা ঘটবে। বলতে হবে না, কথাগুলি রাম বসু বলছে না। বলছে ওই কৃষক যুবক। একটা চরম অ্যাক্শনের মুখোমুখি তারা এসে পড়েছে। Readiness is all—জীবন মরণ ঝড়ে আমরা প্রস্তুত। সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় সার্চলাইট জ্বালিয়ে স্টিমার এসেছে—গ্রাম থেকে সব ধান তুলে নিয়ে যাবে বলে। ঠিক এমন সময় পরাণ মাঝি যেন ইতিহাসের কালপুরুষ হয়ে হাঁক দেয় আর ওদিকে বিন্দার বৌ শাঁখে ফুঁ দিয়েছে। ভূমিকম্পের আগে, ঝড়ের সময় যেমন শাঁখ বাজে, গ্রামবাংলার রূপান্তরের আগেও তেমনি যেন শাঁখ বাজছে। বোঝা যায় এতক্ষণ যাকে মনে হচ্ছিল আপাত ঘুমন্ত সে উৎকর্ণ হয়েছিল প্রতীক্ষায়। এবার আর তারা মুখ বুজিয়ে মরবে না। এবার তারা বলছে .

বাঁকের মুখে কে যাও, কে?

P 22373

লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও!

এই লণ্ঠন যেন নিবু নিবু অবস্থা থেকে জেগে উঠতে চায়—তাদের চেতনার মতো, তাদেব সংকল্পের মতো, সেই মুহূর্তে আমরা শুনতে পাই ·

আমাদেব হাঁকে রূপনাবাণেব স্রোত ফিবে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধাব ফর্সা হযে যাক

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কবিতাটাই যেন হযে ওঠে আগুনেব ফলা—হৃৎপিণ্ডে বেজে ওঠে দামামাব তাল, গতিতে জাগে ঝড়েব বেগ। ওবা স্বামী-স্ত্রী হাত ধবাধবি কবে বাইবে এসে দাঁড়ায় পবাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে। ববীন্দ্রপববর্তী বাংলা কবিতায উত্তেজক কবিতা আছে, উদ্দীপক কবিতা আছে, ক্রোধেব কবিতা—কিন্তু যে কবিতাব স্থাযীভাব উৎসাহ, সেই বীরবসের কবিতার সংখ্যা খুব কম। যে দু-একটি আছে বাম বসুব পবাণ মাঝি হাঁক দিযেছে সে তালিকাব শিবোভাগে স্থান পাবাব যোগ্য।

পবাণ মাঝি হাঁক দিযেছে কবিতায় চিত্রকল্প এসেছে নদীর স্রোতেব ফসল হিসাবে। প্রথম স্তবকটিতে কোনো চিত্রকল্প নেই। দ্বিতীয স্তবকে দেখা গেল স্রোতেব মুখে ভেসে আসা ফুলেব মতো একটি মর্মগ্রাহী বোম্যান্টিক চিত্রকল্প :

মেঘের পাশ দিযে কেমন সরু চাঁদ উঠেছে
তোমার ভুরুব মতো সরু চাঁদ
তোমার চুলেব মতো কালো আকাশে,

কিন্তু এই বোম্যান্টিকতায় ওই যুবক, যে বউটিব সঙ্গে কথা বলছে সে ভেসে গেল না। ঘটনা প্রবল, বাস্তব কঠিন—তাব অঙ্গীকার চাই যুবকটির সংলাপে। সে বলে ·

বর্ষাব ঘোলা জল মাঠ ছাপিযে নদীতে মিশে গেছে
কুমোবপাড়াব বাঁশেব সাঁকোটা ভেঙে গেছে বোধ হয
বোধ হয ভেসে গেছে জলেব তোড়ে
অভাবেব টানে যেমন আমাদেব আনন্দ ভেসে যায।

রোম্যান্টিক চিত্রকল্প এ কবিতায বাস্তবতাব ধোঁযাশাব বুকে জেগে ওঠা বামধনুব মতো অতর্কিত এবং অনিবার্য

গঞ্জেব স্টীমাবেব আলো—
আলো পড়েছে ঘোলা জলে
বামধনুব মতো,
বামধনুব মতো এই বাত্তিব বেলা।
ধানক্ষেত ভাসিযে জল গড়ায নদীতে
স্টীমাবের তলায
আমাদেব অভাবেব মতো
ঠিক আমাদের কপালেব মতো।

তারপরেই দুরন্ত জিজ্ঞাসা এই বাঙ্ময় মূর্তি ধরে :

আমাদের পেটে ত ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই,
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও
তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই স্টীমার শস্যেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায়?

কেউটে আঁধারের প্রতিমুখ সড়কির ফলার কঠিন সংকল্প উচ্চারিত হবার পরেই জেগে ওঠে অমোঘ সংকল্পের আগ্নেয় ঘোষণা :

আমরা হেরে যাব না,
আমরা মরে যাব না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে।

কোনো চিত্রকল্প এখানে আমন্ত্রিত নয়, তারা আবির্ভূত—তরোয়ালে তরোয়ালে সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি যেমন অনিবার্য এবং সুনিশ্চিত, এরাও তেমনি। কবিকে ধন্যবাদ তিনি নিজে কোথাও কবিতার মধ্যে ঢুকে পড়েননি। তাহলে সে অনধিকার প্রবেশ কবিতাটি দ্বিভাষিক করে ফেলত। কবিতাটি হয়েছে ওই যুবকের স্বভাষা—তার জীবনের বর্ণপরিচয়ে সেই ভাষার নির্মিতি। তারপর সে যখন তার বৌকে বলে হাত ধর, বাইরে চল, তখন আর তারা শুধুই স্বামী-স্ত্রী নয়—কমরেড।

কোনো সন্দেহ নেই যে সেদিনের যুবকের অকৃত্রিম মর্মবেদনার সাক্ষ্য এইসব কবিতা। ওপর চালাকির আমডাগাছিতে সেদিনও বাঙালি যুবকের স্মার্ট হবার প্রয়াস তৎপর হয়ে ওঠেনি, রাম বসু সেদিনেরই হৃদয়বান কবি যুবক।

রাম বসুর কবিতার শিল্পিত লাবণ্য বক্তব্য-বিরহিত নয় বলেই 'লাবণ্য'—কবিতার কোনো বক্তব্য নেই একথায় তাঁর প্রত্যয় নেই। 'যখন যন্ত্রণা' কবিতার দীর্ঘ অনবচ্ছিন্ন বাক্যের আবেগ তরঙ্গ, 'বিদ্যুৎ-কৃপাণ হাতে কাপালিক মেঘ পাহাড় চূড়ায়'-এর মতো চিত্রকল্প, পংক্তিবিন্যাসের চাতুর্য—এগুলিই সেই বক্তব্যের ধারক। রাম বসুর কবিতায় টেকনিককে ছাড়িয়ে কোনো বক্তব্য নেই। তিনি টেকনিককেও খুঁজেছেন জীবনেরই উৎসে—তাই তাঁর কবিতায় জীবন এবং আঙ্গিক রীতির সমাদৃত একাসন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাবে 'রক্তাক্ত বাঘিনী' কবিতাটি। ভাস্কর্য-কল্প সুদৃঢ় গঠনের এই কবিতাটি প্রকৃতি-সন্দর্শনের রূপকে কথিত জীবনের আদিম আবেগের বার্তা। এমন এক বলিষ্ঠ জীবন সৌন্দর্য, ভাষার এবং বাকরীতির এমন এক সজীব প্রাণময় কঠিনতা এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে, যা সচরাচর বাংলা কবিতায় নজরে পড়ে না। ব্যঞ্জনা-সঞ্চারী নানা মৌখিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, কথ্যরীতির সঙ্গে গম্ভীর শব্দ সম্পদের সহজ ও অনিবার্য সংযোগ-সাধনে কবিতাটি রাম বসুরই শুধু নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে

একটি স্মবণীয কবিতা। 'যখন যন্ত্রণা' থেকে 'দৃশ্যেব দর্পণে' বেশি দূব নয়—কিন্তু 'দৃশ্যেব দর্পণে' কাব্যগ্রন্থে বাম বসুর আবেক স্তব উন্মোচিত হল। 'থলকাবাদেব বাংলোয'-এব মতো কবিতাব এক অন্তবদ্রষ্টা কবি-পুরুষেব জাগবণ ঘটেছে। 'পবাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে' কবিতায যে স্বরেব ধ্বনি মনকে উতলা কবে, 'থলকাবাদেব বাংলোয়' সেই স্বব থাকে না, থাকতে পাবে না। এখানে যে স্বব ধ্বনিত হল, তা আমাকে আবিষ্ট করে, হঠাৎ একটা আত্মগত গাম্ভীর্যে ডুব দিতে হয। এই কবিতাটি বাম বসুব কবি জীবনেব একটি অধ্যায জ্ঞাপক কবিতা—একটি দূবত্ববাচক মাইল ফলক। এর পবেই 'অবণ্যেব অন্ধকাবে' কবিতায একথা উচ্চারিত হতে পাবে আত্মস্থ গাম্ভীর্যে, 'আমি এই অবণ্যেব অন্ধকাব উল্লাস হযে যাবো'। এই কবিতা থেকে বোঝা গেল যে, 'পবাণ মাঝি হাঁক দিযেছে' কি 'একবুক শস্যের ভিতবে' ইত্যাদি কবিতা তিনি আব লিখবেন না। 'অধিকৃত' বা 'যখন যন্ত্রণা'ব দিনগুলিও অবসিত। এখন বোধ হয নিজেব দিকে ফেবা। কিন্তু এই ফেবাব জন্য ব্যর্থ হযে যায না 'তোমাকে' বা 'যখন যন্ত্রণা'ব দিনগুলি। ববং সেদিনেব নোনা জলে ভবা ঘাম অশ্রু সমুদ্রেব স্বাদ এই কবিব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে পেযেছিল বলেই, আজ তাব নিজেকে খুঁজে ফেবা আবো সফলতা পায। সত্যের বৃহির্মহলে ঘোবাঘুরি সারা হযেছে, কুড়িযে নিযেছেন সমযেব ঢেউ থেকে ছড়িযে ছিটিযে পড়া অনেক ঝিনুক আজ গভীবেব ডাকে সাড়া দেবাব পালা। বড়ো কবিই জানেন একটাকে মিথ্যা কবে আবেকটাকে সত্য করে তোলাব দবকাব হয না। ববীন্দ্রনাথেব কাছ থেকেই এ শিক্ষা তাঁদেব পাওযা হয যে, অস্তিত্বেব শিশুশাল সব ঝড় সব বর্ষা শবৎকে অঙ্গীভূত কবে, কবতে কবতে মহীরুহে পবিণত হয। একদিন রাম বসুব কবিতায গ্রামীণ জীবন পটেব সঙ্গে জড়িত দেশজ কাব্য সংস্কাবেব নানা অনুষঙ্গ কাজ কবেছে। সে বলিষ্ঠতা এবং গীতলতাব সম্মিলিত বেখাপাতে তাঁব কবিতাকে উজ্জ্বলতা দিযেছে। দিযেছে স্বাতন্ত্র্য। প্রথমাবধি তিনি স্বভাষী কবি। এক স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতাব জল হাওযাতেই তাঁব মেজাজ গঠিত হল। তাই দেখা যায বিষ্ণু দে বাংলা কাব্যে যে ঐতিহ্যেব স্রষ্টা বাম বসু সে ঐতিহ্যেব অনুবর্তী হলেও, তিনি পৃথকভাবে আমাব প্রিয কবি এই কাবণে যে, তাঁর কবিতা প্রাথমিক পর্যাযে বিষ্ণু দে-কে অথবা জীবনানন্দকে মনে কবিযে দিযেছে—এমন কথা মনে পড়ে না। মেজাজ, স্ববক্ষেপ, বাক্‌স্পন্দেব রূপাযণে বাম বসুব বিশিষ্টতাই শক্তিব চিহ্ন। আজ পবিণতিব প্রাবন্ত সীমায পৌঁছে তিনি এই বৈশিষ্ট্যগুলিব সহাযতায আধুনিক বাঙালি কবিদেব অগ্রগণ্যদেব অন্যতম হতে পেবেছেন। জীবনেব মানে খুঁজতে গিযেই তাঁব এইসব প্রাপ্তি।

পবিণতিব অধুনাতন পর্যাযে এসেও এই কবি হাবিযে ফেলেননি মানুষেব সত্তাসংক্রান্ত গভীব জিজ্ঞাসাকে। 'যখন নিতাই-এব ঘবে বাজ পড়েছিল' বা 'স্বগতোক্তিব'-ব মতো কবিতায বাচনিক স্পষ্টতা তাই এক প্রত্যযেব গভীবতা থেকে উৎসাবিত। মৃদু অথচ পবিশীলিত কণ্ঠে উচ্চাবিত হয জীবনেব মুমুক্ষু অভিলায অন্য কবিতায।—

যা আমি এবাব তাই হতে চাই
পরিপূর্ণ ফল, পাখি, জল
এবং সৌবভ, ক্ষমা শুশ্রূষু আঁধাবে

এবং এই কবিতাব (বঙ্গমঞ্চে) শেষতম চবণে এই আকাঙ্ক্ষাটির শেষ উন্মোচন ঘটেছে ব্যবহৃত উপমানের মতো স্থিব জ্যোতি উদ্ভাসে—'নির্জনে পুষ্পিত হবো ঈশ্বরের মুখেব মতন'। আমবা বেশ বুঝতে পাবি এইবাবে কবিব অধিমানসিক স্তবে একটা অন্য অধ্যাযের সূচনা হতে চলেছে।

'পাহাড়েব ডাক' বা 'হৃদয় বাডাব'-এর মতো কাব্য-নাটিকা বা দীর্ঘ কবিতায বাম বসু কাম্য অভিব্যক্তি নিশ্চয় খুঁজে পান, কিন্তু তাঁর যে সব অনুবাগী আমাব মতো তাঁবা ভালোবাসবেন সেইসব কবিতা, যেখানে সাহস ভবে সমস্ত উৎকণ্ঠা রূপান্তবিত হতে পাবে স্বযম্ভর আত্মস্থতায .

অসমর্থ বলে ক্ষমা চাইবো না, পিতৃপুরুষ,
বরং শিক্ষিত কবো বিপুল নিঃস্বতায
যেন শেষ অঙ্কেব নিবিড় স্বগতোক্তি
রাত্রিব মতো মিশে থাকে আদি মাতার চবণে।

তিনি গূঢ় গহনকে খুঁজতে চেযেছেন—সেই জটিল গহনকে, যার আলো আঁধাবিতে চলে জীবনেব সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কাব যাত্রা। আমি জানি কোথায বাম বসুব সীমাবদ্ধতা—জানি তিনি ব্যাঙ্গাত্মক স্ববেব সঙ্গে গুরুত্ব গম্ভীব স্ববকে মেশাতে পাবেন না জানি, তিনি যে পবিমাণ গীতল, সে পবিমাণে নাট্যভাবান্বিত, জানি তাই তাঁব ইদানিন্তন দীর্ঘকবিতা প্রাযই আত্ম বিবৃতিমূলক। কিন্তু এও তো জানি যে, এগুলি তাঁব কবি পবিচযেব নেতিমূলক দিক। চিত্রকল্পে প্রতীকে যেখানে গভীবেব ডাক শোনাবাব কথা, সেখানে বাম বসু অসামান্য। অবণ্য পাহাড় স্তব্ধতা—এই কবিব আবেগেব প্রিয বোহভূমি। সেইসব আদিমতম নিসর্গ-স্মৃতির সহাযতায তিনি পূর্ণতা দিযেছেন তাঁব বক্তব্যকে। যে অন্ধকাব জাদুকরী তাঁব নিযতি, আমাদেবও দেখার ইচ্ছেকে তাঁকে সংঘাতের কোন্ কুলান্তবে নিযে যায। যেদিন 'যখন যন্ত্রণা'য সিংভূম কবিতায তিনি দেখেন .

যদি চোখ দুটো গেলে দিলে
যদি পাঁজব কটা খুলে দিলে
এই যন্ত্রণাব গাবদ থেকে মুক্তি পাওযা যেত
আমি তাই দিতাম
আমি তাই দিতাম
যদি বাঁচাব অহঙ্কাব পাওযা যেত।

এই বাঁচাব অহঙ্কাবই তো তাব অনুসন্ধেয কিন্তু তিনি যে দেখেন পলাশেব শাড়ি পবা বাজেশ্বরী সন্ধ্যায স্বর্ণচাঁপা আলোব মধ্যেই, হবিযাল মযনাব ডাকেব পাশেই হত্যা এবং কান্নাব করুণ বৃত্তান্তকে। তিনি দেখেন 'অপমানিতা সিংভূম বধূববণ গোধূলিতে অচৈতন্য'। এবার আমবা লক্ষ না কবে পাবি না, তাঁব প্রত্যেক কবিতায কথা কইছে একটি চবিত্র। এ শুধু তাঁব কাব্যনাটকেবই বৈশিষ্ট্য নয—তাঁর কবিস্বভাবেবই বৈশিষ্ট্য।

যখন তিনি অন্তবালে প্রতিমা'য পৌঁছলেন তখন থেকেই তাঁব কবিতায় এসেছে এক

অন্যতর রূপবন্ধের টান। টেকনিক এবং কনটেন্টের অদ্বয বন্ধনে সিদ্ধহস্ত কবি তখন জীবনকে দেখেছেন প্রকৃতিব দর্পণে, দেখেছেন বেঁচে থাকার আশ্চর্য বিস্ময়ে। দেখা গেল তিনি তাঁর সময়েব ফ্যাশনকে প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি স্পৃষ্ট হলেন না কাবো দ্বাবা। তিনি প্রথমাবধি স্বকণ্ঠ নির্ভর। কাবো সাধুবাদের প্রত্যাশী তিনি হলেন না। তিনি বললেন 'ভালোবেসো আবও কিছুক্ষণ', বললেন .

একদিকে বন্যামেঘ, অন্যদিকে হ্রদ, চন্দ্রালোক
পচা কাঠে হিমগন্ধ, তার পাশে ক্রীতদাস কবি
নিজেকে জ্বালিযে বলি : তোমার ইচ্ছাব জয হোক।
ভালোবেসো যতদিন আমাদের জীবন জাহ্নবী।

তিনি যে শুধু স্পৃষ্ট হলেন না বা প্রভাবিত হলেন না তাইই নয, তিনি প্রবোচিতও হলেন না। তিনি তাঁব সমস্ত আবেগ এবং আগ্রহের কেন্দ্রে রাখলেন তাঁব জীবনকে। যথোচিত প্রচাব পেলেন, কি পেলেন না এ নিযে তাঁব কোনো মাথাব্যথা ছিল না, আজও নেই। তিনি যদি কারো কাছে অপবিচিত থেকে যান তাহলে সেটা সেই পাঠকেব দুর্ভাগ্য। আমরা জানি আজও তিনি চলছেন। এই চির চলিষ্ণু কবিকে নমস্কাব।

পুশকিনের সময়ের রুশসাহিত্যে ভারত

সঞ্জয় চন্দ্র

ভারতচন্দ্র রুশভাষায় অনুবাদ হয়েছিল পুশকিনের জন্মের কিছু আগে। জোন্‌সের অভিজ্ঞানশকুন্তলম ও অংশত সে সময়েই। তবে এর প্রভাব বিশেষ পড়ে নি পরের রুশসাহিত্যে। প্রথম ১৮২৬ সালে ফিওদর তিউতচেভের কবিতা 'শকুন্তলা (গ্যেটে থেকে)' রুশভাষায় মনে করায় ভারতীয় সাহিত্যকে। সমসাময়িক কবি পুশকিন রুশভাষায় এখনও প্রধানতম হলেও তাঁর লেখায় ভারতপ্রসঙ্গ বিরল। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর আগেই সংগৃহীত ও মৃত্যুর বেশ পরে প্রকাশিত 'পিটার দি গ্রেটের ইতিহাসে'র তথ্যে ভারত বারবার হাজির হয়েছে। যেমন, ১৭২৩ সালে[১] পিটার বাংলার মুঘলের কাছে পাঠান (গুপ্তভাবে?) ৫ ডিসেম্বর তিনটি জাহাজে মাদাগাস্কার ছুঁয়ে ভাইস-অ্যাডমিরাল উইলস্টার, ক্যাপ্টেন মিয়াস্নভ আর লেফটেনান্ট-কর্ণেল কশেলেভকে আর ১৭২৫ সালে[২] ক্যাপ্টেন বেরিংকে ভার দেন উত্তরের বরফসাগর থেকে প্রণালী কেটে পূর্বভারতে যাবার জলপথ তৈরি করার।

স্থলপথে রুশ ও ভারতের যোগাযোগ বেশ সীমিত থাকায় দুই সাহিত্যের অপরিচয় পারস্পরিক। তাছাড়াও রুশসাহিত্যের টান অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ছিল পশ্চিমের দিকে। মডার্ন রিভিউতে ১৯২৫ সালে আলোচিত মিরস্কির রুশসাহিত্য পরিক্রমা এ ব্যাপারে আজও প্রাসঙ্গিক। আলোচক জানাচ্ছেন (পৃ ৪৮৬), পশ্চিমে অনুরাগ রুশজীবনে প্রবেশ করেছিল ঠিক ভারতের মতোই। স্লাভপ্রেমী (স্লাভোফিল) আর পশ্চিম-অনুকরণে উৎসুক রুশ সাহিত্যিকদের সামনে মডেল ছিল ফরাসি ক্লাসিসিজম ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক লন্ডনসভের কালেই। পুশকিনও এ ধারারই। তবে তাঁর সময়ে জর্মন প্রভাবের একটি ধারা বইতে থাকে, যার প্রতিনিধি হলেন গোগোল, লেরমন্তভ, তিউতচেভ।

তিউতচেভের কবিতাটির অনুবাদ রাখা যাক ১৯৬৫-তে সংকলিত দশখণ্ড পুশকিন—লেখায় ভারত প্রসঙ্গ অবতারণার আগে :

শকুন্তলা (গ্যেটে থেকে)
ফিওদর তিউতচেভ, ১৮২৬

নবীন বৎসর যে আনে ফুলেতে—
কুমারীর লাজ,
প্রবীণ বৎসর যে আনে ফলেতে—
লালিমার রাজ,
কোমল যে দৃষ্টি আনন্দিত করে,
যেন মুক্তা সাগরতলায়,
আর উষ্ণতায় উজ্জীবিত করে,

যেন অমৃত ক্লান্তবেলায়।
স্বপ্নের ভাণ্ডারে বর্ণ যা কুড়িয়ে
সৃষ্টির বর্ণালী সবখানি।
সৌন্দর্য আকাশে, কথা না বাড়িয়ে
কল্পনার সব হাতছানি,—
সব, সব কবিতা তোমাতে ঢালা
একমাত্র তোমাতেই—শকুন্তলা!

অ্যান্টিক পেন্টামিটারে লেখা গ্যেটের চৌপদীর অন্য বাংলা অনুবাদ হয়েছে অবশ্যই ছন্দ বাদ দিয়ে—ভাব কোথায় কতটা রক্ষিত, বিবেচনার জন্য মূল কবিতাটি নীচে দেওয়া হল :

Will ich die Blumen das fruhen, die Fruchte das spateren Jahres,
Will ich, was reizt and entzuckt, will ich, was sattigt and nahrt,
Will ich den Himmel, die Erde mit einem Namen begreifen,
Nenn' ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt
(Goethes Werke, I s, 206 Hamburger Ausgabe, 1948)

পুশকিন গ্যেটেকে স্মরণ করেছেন একাধিকবার, তবে 'শকুন্তলা' কবিতাটি নয়। পুশকিনের ১৮১৮ তে লেখা 'ভাখ-উৎসব' কবিতাতে পাই : 'শান্ত থাকুস, সদা তরুণ! ঐ যে উনি, ভারতের বীর' আর ১৮৩০[৪]-এ পাই : 'আমাদের প্রান্তে ত ভাবতীয় ব্যাধি' বা 'ত্রিদেব মনে হল সর্বব্যাপী বোধি'। ভারতপ্রসঙ্গ সরাসরি না থাকলেও পুশকিন আলোচনায় আসবেই তাঁর কাব্য 'রুসলান ও লুদমিলা' বা 'ইযেভগেনি ওনেগিন',

রুশদেশে সাধারণ মানুষ এখনো 'রুসলান ও লুদমিলা'[৫] আঁকড়ে থাকে, যার পূর্বমুখে পুশকিন লিখেছেন, 'সবুজ ওকগাছ সমুদ্রতীরে / সোনার শেকলে বাঁধা / জ্ঞানী বেড়াল সেথায় ঘোরে / গান গায় একদিকে ঘুরে / অন্যদিকে ঘুরে শোনায় গাথা'। দুশো বছর পরেও রুশদেশে সাধারণ মানুষ এই চরণগুলি ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণে আনে। এই গাথাটি খ্রিস্টধর্ম সেদেশে আসার আগের সময় ঘিরে · ভালো জাদুকর আর তার প্রণয় প্রত্যাখ্যাতা মন্দ জাদুকরী নয়নার দ্বন্দ্ব, বাসরঘর থেকেই বধূ লুদমিলার অন্তর্ধান, তার খোঁজে বর রুসলানের কিযেভ থেকে কৃষ্ণসাগর অবধি প্রান্তরের পর প্রান্তর বীরের সাজে ঘোরা, বামনকে হারিয়ে সংজ্ঞারহিতা বধূকে নিয়ে ফেরার পথে মৃত্যুবরণ, জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় বেঁচে কিযেভকে শত্রুমুক্ত করে লুদমিলার সংজ্ঞা ফেরানো। লখিন্দর-বেহুলার কথা মনে পড়ায়, হেতালের লাঠি হাতে চাঁদকেও। তবে নদীর বদলে প্রান্তর, নৃত্যের বদলে সংগ্রাম। ইউক্রেন আর দক্ষিণ রুশ স্তেপে হেঁটে বুঝেছি অন্য দেশ, অন্য ভূগোল।

১৮৩০ অবধি রুশদেশে কবিতার সোনার দিনগুলো ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী অভিজাত আধুনিকদের পরিবর্তনে উন্মুখ নিঃসঙ্গ ঐকান্তিকতার ট্রাজেডি। তখনই লেখা হয় 'ইয়েভগেনি ওনেগিন' ওনেগিন আর লেনস্কি দুজনেই বিদেশফেরত, দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাতিয়ানার

বোনকে নিয়ে। ইযেভগেনির প্রণয চেয়ে প্রত্যাখ্যাতা তাতিযানা তার খাতাপত্তর ঘেঁটে, যখন লেনস্কির মৃত্যুর পর সে স্থানত্যাগী, স্বগতোক্তি বাখে, 'এ প্যারডি নয় ত!' কিছু বছর পরে ইযেভগেনি যখন বিবাহিতা তাতিযানার প্রণয়ভিক্ষা করে, তাতিযানা জানায় : 'তোমাবে ভালোবাসি। কেন লুকোব?/ তবে আমি অন্যে দত্তা/তাঁহাতেই হব স্থিতা।' এবং চলে যায। কাব্যের শেষদিকের এই চরণগুলি মনে পড়ায, 'ভালোবাসি কি না তর্কে কি বা ফল?' অন্য দেশ, অন্য পবম্পরা। কিন্তু মানুষ! উত্তর রাশিযায ওনেগা হ্রদেব ধারেপাশে ঘুরে মিলই চোখে পড়েছে বেশি প্রাচ্যের সঙ্গে। ওনেগিন তো ওনেগার স্মৃতি-জড়ানো বংশেব।

অকালে প্রযাত পুশকিনকে ভুলে যাবার কথাও হযেছে। কারণ উনি তো বেজেছেন 'চরণে চরণে', নতর্কীব পা কবিতায় বিশেষভাবে বন্দনা করে। আসলে, 'বিনা দেব' রুশকবিরা কেউই ঋষি ছিলেন না। মনে আসে, ক্ষিতিমোহন সেন 'বলাকা কাব্য পবিক্রমা'য ভাগবত উদ্ধৃত করেছিলেন, 'ন ঋষিঃ কুরুতে কাব্যম্'।

পুশকিনের লেখা 'পিটার দি গ্রেটেব আরাপ'-এ উল্লেখ[৭] আছে John Lawব, যিনি প্রতিষ্ঠাতা এক ভারতীয কোম্পানিব যা ১৮২০র দশকের মাঝামাঝি সর্বস্বান্ত হযেছিল। উল্লেখ[৮] আছে অন্যত্র ভাবতে ইংবেজ স্বৈরতন্ত্রেব। জিপসিদের নিযে পুশকিনের লেখাব ওদেব সম্পর্কে সমীহ জানাতে গিযে লিখেছেন[৯], ওরা ভাবত হতে বিতাড়িত 'পাবিয়া'। স্মৃতিচারণায কলেরা নিযে লিখেছেন[১০], 'ভারতে এব বাতাস শুধু মানুষকে নয, পশুদেব গাছগাছড়াদেবও আক্রমণ করে, হলুদ ফিতেব মত এ নদীপ্রবাহে উৎসমুখে চলে, অনেকেব মতে পচা ফল থেকেই এব উদ্ভব'।

পিটাব দি গ্রেটেব ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পুশকিন জানাচ্ছেন, ১৬৯৫ সালেই[১১] সবকারি খরচে ভাবতে পাঠানো-হয বণিক মালিক্কিকে (বেঁটে?) ইউফ্ত (রাশিযান চামড়া), শুকনো মাছ আব সূতীবস্ত্র সমেত; সে আগ্রা ও দিল্লি ঘুবে সম্রাটেব সঙ্গে দেখা কবে পাঁচ বছবেব ভ্রমণশেষে ফিরতিপথে মারা যায। তখনই শুরু হয জলপথে ভারতের সঙ্গে সংযোগ অন্যভাবে কবা যায কিনা দেখার। ১৭০৪ সালে[১২] বাল্টিক আর কাশ্যপসাগর যুক্ত হয, যাতে পিটাববুর্গেব পথ খোলে ভাবত থেকে। আমুদবিযাব পাশে গ্রেট বোখারায জলপথ খোঁজা হযেছিল খিবা থেকে ভাবত যাবার ১৭১৪-১৭১৬ সালে[১৩]। এই জলপথ বের কবাব সম্ভাবনা পিটাবেব মাথায ছিল ১৭১৭-১৭১৮ সালেও[১৪], যখন পারস্য দিযে ভাবতে বণিক পাঠানোব আদেশ হয, ১৭২২ সালে[১৫] পিটাব জডিযে পড়েন আফগান-পারস্য বিবোধে, যেখানে কান্দাহারেব মিরওযাইস তৈমুবলংগের বংশেব . উপজাতিবা শিবওযান অঞ্চলে মেবে ফেলে সব ভারতীয আর রুশ-বণিকদেব। এর পবই বাংলা ও পূর্বভাবত প্রধান হযে ওঠে পিটারেব চিন্তায।

পুশকিনের লেখা থেকে বেশ বোঝা যায, রুশ ও ভাবতের স্থলপথে যোগাযোগ সহজ দিল না। তাই সাহিত্যেও না। জলপথে যোগাযোগেব যে ভাবনা পিটাবের, তা তো পশ্চিমের দেখাদেখি তবে স্বতন্ত্রপথে, নেপোলিযনেব একশো বছব আগেই। তাই রুশ ও ভাবত সাহিত্যের আদানপ্রদানে পুশকিনের সময় (বেশ কিছুটা আজও) পশ্চিমী দেশগুলো তো মধ্যস্বত্বভোগী।

তথ্যসূত্র

১. পুশকিন আ. সে. দশখণ্ডে সংকলিত বচনাসংগ্রহ, নাউকা, মস্কো, ১৯৬৫, নবম খণ্ড, পৃ ৪৪৮ (মূল ঃ কশ থেকে)
২ পুশকিন, নবম খণ্ড, পৃ ৪৬০
৩ পুশকিন, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩০
৪. পুশকিন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৯০,৪০৬
৫ পুশকিন, চতুর্থ খণ্ড
৬ পুশকিন, পঞ্চম খণ্ড
৭ পুশকিন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১০, ৭৫৩
৮ পুশকিন, সপ্তম খণ্ড, পৃ ৬৩৭
৯. পুশকিন, সপ্তম খণ্ড, পৃ ১৯
১০ পুশকিন, অষ্টম খণ্ড, পৃ ৭২
১১ পুশকিন, নবম খণ্ড, পৃ ৪৯
১২. পুশকিন, নবম খণ্ড, পৃ ১২৯
১৩ পুশকিন, নবম খণ্ড, পৃ ৩৩২, ৩৫৭
১৪ পুশকিন, নবম খণ্ড, পৃ ৩৮২,
১৫. পুশকিন, নবম খণ্ড, পৃ ৩৯২

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার নারী : মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা

সুস্নাত দাশ

বিশ্বের যে-কোনো দেশেই কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাঠামোতে তার নিয়ন্ত্রণাধীন গণ-সংগঠনগুলি (Mass Organisations) পার্টিব তত্ত্ব, আদর্শ ও কর্মসূচিকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়াব প্রধান মাধ্যম রূপে কাজ কবে। কমিউনিস্ট পার্টি গণ-সংগঠনগুলিব দ্বারা শুধু জনমত গঠন বা জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিলই করে না; এগুলিব মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ পার্টিকর্মী ও সদস্য নির্বাচিত ও সংগ্রহ কবা হয। তাই গণ-সংগঠনহীন কমিউনিস্ট পার্টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন এক অচল মস্তিষ্কসার পঙ্গু জীবদেহেব মতোই।

ফ্যাসিবাদ-বিবোধী জনযুদ্ধ পর্যায়ে ভাবতের কমিউনিস্ট পার্টি যে প্রতিকূল বাজনৈতিক পরিস্থিতির বিকদ্ধে দাঁড়িযেও দেশের অধিকাংশ মানুষেব কাছে প্রায় 'অগ্রহণীয়' এক রাজনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন, প্রচার ও অনেকাংশে কার্যকব কবতে সমর্থ হযেছিল তাব প্রধান ভিত্তি ছিল বিভিন্ন ধরনের গণ-সংগঠনগুলিব সক্রিযতা ও কার্যকবী ভূমিকা। জনসমাজেব বিভিন্ন অংশ শ্রেণী ও স্তবের মানুষেব কাছেই কমিউনিস্ট গণ-সংগঠনগুলি কম-বেশি পরিমাণে রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মসূচি নিযে ১৯৪২-৪৫ কালপর্বে পৌঁছাতে পেবেছিল। সর্বদাই যে সমান সাড়া পাওযা গিয়েছিল বা ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হযেছিল তা নয, বরঞ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীব মধ্যে কর্মবত গণ-সংগঠনগুলিব কর্মীদের (যেমন ছাত্র-মহিলা বা নাগবিক পরিষেবা) তীব্র জনবিক্ষোভ বা বিরুদ্ধতাব সম্মুখীন হতে হয। তুলনামূলকভাবে শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি পেশাভিত্তিক শ্রেণীসংগঠনগুলির অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত ছিল না, বরঞ্চ কোথাও কোথাও যথেষ্ট ইতিবাচকই ছিল। এছাড়া সব থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসময় পবিলক্ষিত হয সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী সংগঠনে। বুদ্ধিজীবীদেব উল্লেখযোগ্য অংশ এই সময কমিউনিস্টদেব সঙ্গে ছিল—এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাঙলায কমিউনিস্ট গণ-সংগঠনগুলি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধনীতি ও সংগ্রামে নিঃসন্দেহে সবথেকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ কবে।

শুধুমাত্র শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, বা ছাত্রদের মধ্যেই নয মহিলা, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য আবো কয়েকটি সরকারি বা বেসরকাবি গণসংগঠনেব মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি সে সময সাবা দেশে জনযুদ্ধেব নীতি ও তত্ত্ব অনুসাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সক্রিয রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ কবেছিল যাকে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বিচাবে 'ফ্যাসিবাদ-বিবোধী আন্দোলন' রূপে অভিহিত কবা যায। বিভিন্ন গণসংগঠনের মধ্য দিয়ে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি তাব তৎকালীন কর্মসূচি কার্যকব করেছিল। মহিলা সংগঠনের ক্ষেত্রে তার সমস্যা সাফল্য, সীমাবদ্ধতা এবং সমকালীন জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তার স্বরূপ ও সম্ভাবনা কী ছিল তা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা যেতে পারে।

১.

ভারতে Women's Indian Association (১৯১৭) এবং 'All India Woman's Conference (১৯২৭)' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতীয় স্তরে মহিলাদের সমস্যা ও সংকট মোচনের জন্য সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক মহলে স্বীকৃত হয়েছিল। স্বয়ং গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বের একাংশ এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহীও ছিলেন। কিন্তু AIWC কোনও বৃহত্তর নারী অন্দোলন গড়ে তুলতে যে পারেনি তার কারণ—এই সংগঠনের চরিত্র ছিল মূলত উচ্চবর্গীয় (Elitist), সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী- কৃষক এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের মধ্যে AIWC-র কর্মতৎপরতা ছিল খুবই কম। তৃপ্তি চৌধুরী তাঁর এক গবেষণা-নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে এর সঙ্গে প্রধানত কমিউনিস্টদের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠা বাঙলার 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি', দক্ষিণ ভারতের 'অন্ধ্র মহিলা সঙ্ঘম' বা 'কেরালা মহিলা সঙ্ঘম'-এর চরিত্রগত ফারাক ছিল।[১]

বাঙলা প্রদেশে প্রাথমিকভাবে ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রীকর্মীরাই নারীসমাজের মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করেন। ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে লক্ষ্ণৌ শহরে যে 'সারাভারত ছাত্রী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকশত ছাত্রীকর্মী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। সরোজিনী নাইডু ছিলেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি। লন্ডন থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে সদ্য প্রত্যাগতা বেণু রায় (চক্রবর্তী) ছাত্রীদের সামনে দেশ-বিদেশের উদাহরণ সহযোগে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেন এবং প্রদেশে প্রদেশে ছাত্রী-সংঘ গড়ে তুলতে তাদের উৎসাহিত করেন।[২]

ইতিমধ্যেই ১৯৩৯ সালে বাঙলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি ছাত্রী-সংঘ বা 'গার্লস স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন' (GSA) গড়ে উঠেছিল। ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নারী-কর্মীরা মিলিত হয়েছিলেন ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলবার কাজে। কমিউনিস্ট পার্টির কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি), শান্তি সরকার (বসু), কল্যাণী মুখার্জি (কুমারমঙ্গলম), চিনু ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ী (ব্যানার্জি), লেবর পার্টির উমা ঘোষ, গীতা ব্যানার্জি (মুখার্জি); কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির অনিমা ব্যানার্জি (চক্রবর্তী) এবং রায়বাদী পার্টির শোভা মজুমদার (গাঙ্গুলি)কে নিয়ে প্রথম গার্লস স্টুডেন্টস কমিটি গঠিত হয়। কনক দাশগুপ্ত হন এর প্রথম সম্পাদিকা। গার্লস স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার-আন্দোলন চালালেও জনযুদ্ধকালে কমিউনিস্ট ছাত্রী-নেতৃত্বের পরিচালনায় তাঁরা প্রদেশে-প্রদেশে, জেলায়-জেলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে শামিল হন।[৩]

এই সময়কালে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, কিছু কিছু মহিলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী ও বিপ্লবীবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত। আবার ছাত্র আন্দোলন থেকেও এসেছিলেন অনেকে। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে এইসব মহিলাকর্মীদের অনেকেই পার্টির গোপন কাজে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন, এমনকি পার্টিতেও যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টিও এই সময় মহিলাদের পার্টির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এবং তাঁদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে

তুলবার জন্য উদ্যোগ নেয। এইভাবে নারীসমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচাব করাব কাজ চলতে থাকে। পার্টির রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরগুলির মধ্য দিযেও মহিলাকর্মীদের প্রশিক্ষিত করাব কাজ শুরু হয়।[৪]

নাৎসি জার্মানি কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক সোভিযেত ইউনিযন আক্রান্ত হওয়ার পরেই সোভিযেত নারীদের বীরত্বেব কাহিনি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িযে পড়ে। সোভিযেত নাবীদের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগঠন গড়ে তুলবাব সংবাদ বাঙালি মহিলাদের অনুপ্রাণিত কবেছিল। হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের পবে ১৯৪১ সালেব ৭ সেপ্টেম্বর মস্কোতে মহিলাদের একটি ফ্যাসিবিবোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয। এই সম্মেলন থেকেই গঠিত হয় 'Soviet Women's Anti-Fascist Committee', এর মাধ্যমে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হওয়ার জন্য বিশ্বেব নারীসমাজের কাছে একটি ঐতিহাসিক আবেদন প্রচাব করা এবং বিশ্বের নারীসমাজকে ফ্যাসিস্ত-শক্তি গোষ্ঠীব বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয।[৫]

সোভিয়েত নারীদের বীবত্বপূর্ণ কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে চীনের নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনিও ভারতেব নাবীদের উদ্বুদ্ধ কবতে থাকে। মাদাম সান ইযাৎ সেনের একটি বিশেষ প্রবন্ধ—'চীনা মেযেদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' সেই সময় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হযেছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনযুদ্ধ'র মাধ্যমে।[৬]

২

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে ওঠে নারীদেব মধ্যে দেশবক্ষা ও আত্মবক্ষার আন্দোলন। বাঙলা ছিল এর পুবোভাগে। ফ্যাসিস্ত-বিবোধী প্রচাবের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে জাপবিরোধী মেলা প্রভৃতি সংগঠিত হতে থাকে। মহিলাবা দলে দলে এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন; ক্রমশই গড়ে ওঠে মহিলাদেব নিজস্ব সংগঠন আঞ্চলিক, জেলাভিত্তিক ও প্রদেশগতভাবে। ১৯৪২ সালে ১৩ এপ্রিল কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির-কর্মীদের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট-এর লাইব্রেরি হলে মহিলাদের একটি ফ্যাসিবিবোধী সভা ডাকা হয়। এই সভায় বামপন্থী দলগুলির মহিলাবা ছাড়াও বিভিন্ন দল ও মতের এবং নির্দলীয় প্রগতিশীল মহিলারাও যোগদান করেন। এই সভা একটি 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতি' (Calcutta Women's Self Defence League) গঠিত হয়। এই সাংগঠনিক সমিতি গঠন কবার জন্য সভা আহ্বান করেছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, সাকিনা বেগম, রেণু চক্রবর্তী, সুধা বায়, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমদ, বিযাট্রিস টেবান (YWCA)। অপর্ণা সেন (AIWC) ও ফুলরেণু দত্ত (গুহ) প্রমুখ। এই সভা থেকে সাংগঠনিক সমিতির আহ্বাযিকা নির্বাচিত হন এলা রীড।'[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা প্রযোজন যে, ১৯৪২-এ মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতির আহ্বায়িকা এবং পববর্তীকালে কযেক বছর পর্যন্ত প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিব সম্পাদিকা পদে অধিষ্ঠিত এলা রীড কোনো বিদেশিনি মহিলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন কলকাতাব প্রখ্যাত ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের কন্যা, প্রথম ভারতীয় ব্যাবিস্টার মনমোহন ঘোষেব নাতনি।

'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক এ্যালেক বীডেব সঙ্গে তাঁব বিয়ে হয। এ্যালেক বীড ও এলা রীড দু'জনেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিব ঘনিষ্ঠ দবদী। মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতিব দপ্তর প্রথমে কলকাতায তাঁদের বাড়িতে ২/১ লাউডন স্ট্রিটে এবং ১নং থিয়েটাব বোডে কিংস কোর্টে অবস্থিত ছিল। প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনেব (১৯৪৩) পর মধ্য কলকাতার ১৩, ওযেলিংটন স্কোযারে লীঁ মেমোরিযাল স্কুলের একটি ঘরে সমিতিব দপ্তর স্থানান্তরিত হয। রীড-দম্পতি পরবর্তীকালে অবশ্য লন্ডনে চলে গিযে সেখানকাব কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। সুলেখিকা এবং একজন প্রথম সাবির সাংবাদিক এলা বীড লন্ডনে ১৯৮২ সালে মাবা যান। মহিলা আত্মবক্ষা সমিতিব প্রথমপর্বে এলা বীডের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাহোক, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায 'মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতিব' সভাব যে-বিববণ প্রকাশিত হয তা নিম্নরূপ ·

"গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভাবসিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেবী হলে কলকাতাব নাবীদের এক ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন হয়। চীনা কনসাল জেনাবেলেব পত্নী মাদাম পাও সভায সভানেত্রীত্ব কবেন।

"শ্রীযুক্তা প্রণতি দে বলেন, চীন ও সোভিযেত দেশেব মেযেদেব মতো ভাবতেব মেযেদিগকেও দেশ ও গৃহবক্ষার জন্য পুরুষেব পাশে যোগ্য স্থান গ্রহণ কবিতে হইবে। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী বলেন যে, স্বাধীনতা কখনো অপরের দান হিসাবে আসে না। জাপান আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না। সভায শ্রীযুক্তা বেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমদ, স্টেলা ব্রাউন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয (১) দেশেব জনসাধারণেব মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইতে হইবে, (২) জনবক্ষাব জন্য মেযেদেব শক্তিশালী সংগঠন গড়িযা তুলিতে হইবে এবং প্রযোজন উপস্থিত হইলে মেযেদিগকে অফিস, কাবখানা, এমনকি বণক্ষেত্রেও পুরুষেব স্থান পূরণ কবিতে হইবে, (৩) মেযেদেব আত্মরক্ষাব কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে, (৪) জনসাধাবণের সহিত ভাবতেব সৈন্যদেব সদ্ভাব স্থাপন কবিতে হইবে।"[৮]

'মহিলা আত্মবক্ষা সাংগঠনিক সমিতিব' কার্যকবী কমিটি নাবীসমাজেব উদ্দেশ্যে একটি যুক্ত আবেদন প্রচার কবে প্রতিটি গ্রামে ও শহবে মহিলা আত্মবক্ষা সমিতি গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। এই আবেদনে ৮ দফা কর্মসূচি প্রচাব কবা হয—(১) প্রচাব আন্দোলন, (২) পঞ্চম বাহিনীব বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, (৩) সিভিল ডিফেন্সেব কাজগুলি সংগঠিত কবা, (৪) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য বাসস্থানেব ব্যবস্থা কবা, খাদ্য-বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ কবা, (৫) প্রযোজনবোধে সামবিক সুবিধার্থে অধিকৃত স্থানগুলি থেকে সাধাবণ বাসিন্দাদেব সবে যেতে সাহায্য কবা, তাদেব জন্য ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনেব দাবি আদায কবতে সাহায্য কবা, (৬) যুযুৎসু, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেযেদেব বাহিনী সংগঠিত করা। (৭) বিপদের সময নিজেদেব ও প্রতিবেশীদেব যাতে রক্ষা কবতে পাবে তাব জন্য এবং গেরিলাযুদ্ধেব সাহায্যের জন্য মহিলাদেব একটি আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন কবা, (৮) 'ফসল-বাড়াও' এবং 'উৎপাদন বাডাও' আন্দোলনে সহযোগিতা কবা।[৯]

এরপর থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে গ্রামে ও শহরে সর্বত্র স্থানীয়ভাবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে। সমিতি গড়ার এই কর্মসূচি নিয়ে মহিলাকর্মীরা ছড়িয়ে পড়েন কলকাতার বস্তি ও মধ্যবিত্ত অঞ্চলে, বিভিন্ন জেলার গ্রাম ও শহরের অঞ্চলে অঞ্চলে। এর ফলে স্থানীয় ভিত্তিতে অনেক ছোটো ছোটো কমিটি গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়কার প্রচার-আন্দোলনের যে বিবরণ কমিউনিস্ট নেত্রী বেণু চক্রবর্তী দিয়েছেন তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"...কমিউনিস্ট মেয়েরা প্রত্যেকটি বাড়ি ও দুয়োরে উপস্থিত হতে লাগল। দরজা খুলে মেয়েরা বেরিয়ে এলে আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে বর্তমান বিপদের অবস্থায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের দেশকে রক্ষা ও আমাদের সম্মান রক্ষা তো আমাদেরই করতে হবে। এতে আমাদের স্বনির্ভরতা চাই। তাই জাতীয় সরকার গঠনের জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদেরও সাহায্য করতে হবে। সেই সরকারই পারবে সমস্ত জাতিকে একত্রে সমবেত করতে এই জন্যই নেতাদের মুক্তি আমাদের পেতেই হবে।"[১০]

মহিলাদের মধ্যে এই আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে কলকাতা ছিল সব থেকে অগ্রণী। কলকাতায় জাপ বোমাবর্ষণে আগে থেকেই আত্মরক্ষার প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রবীণ মহিলা কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"...প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় বস্তি অঞ্চলে মহিলা ভলান্টিয়াররা জাপবিরোধী প্রচার-স্কোয়াড সংগঠিত করতে থাকে। কলকাতায় বিমান আক্রমণের প্রথম দিন থেকে অন্তত ১৫টি বস্তিতে মেয়েরা কাজ শুরু করে। তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল—(১) পাড়ায় পাড়ায় দিয়ে সেখানে কত লোক বাস করে, বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার মতো কতগুলি পাকা বাড়ি আছে, কতজন মেয়ে ও ছেলে ওয়ার্ডেন আছে, কত লোককে এ আর পি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, ঐ পাড়ার মানুষের কি কি অসুবিধা আছে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা, (২) পাড়ায় পাড়ায় এ আর পি ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া ব্যবস্থা করা, (৩) নিজেরা এ.আর পি প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা নেওয়া, (৪) ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠিত করা ও আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য সংগ্রহ করা।"[১১]

৩.

অবশ্য শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয়, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠন ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্‌সল জেলাগুলিতেও। বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পাবনা, হুগলি, খুলনা, যশোহর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে, দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার কর্মসূচির মাধ্যমে এবং খাদ্য আন্দোলন ও রিলিফের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। এইসব জেলায় যাঁরা সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন—মণিকুন্তলা সেন, সুরবালা সেন, বীণাপাণি দে, শান্তি সেন, স্নেহলতা দাস, শান্তিসুধা ঘোষ, ভানু দেবী, যুঁইফুল রায়, কল্পনা দত্ত, আশা দত্ত, প্রীতি হালদার। কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি), রেণু রায় (চক্রবর্তী), জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, কমল

চ্যাটার্জি (মুখার্জি) প্রমুখেবা ছিলেন নেতৃত্বে। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষিত মুসলিম পরিবাব থেকেও মহিলাবা এই আন্দোলনে শামিল হযেছিলেন। ১৯৪২-এব ১৩ এপ্রিল যখন কলকাতায় Calcutta Women's Self-Defence League গঠিত হয়েছিল তখন সাকিনা বেগম তাব অন্যতম সংগঠকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় খুলনা জেলার যে বিপোর্ট 'জনযুদ্ধ'র পাতায দেওযা যায় তা হল :

"খুলনা-সাতক্ষীরা মহকুমার বসুলপুবে নারীদের ভিতর যথেষ্ট চেতনা দেখা গিয়েছে। তাঁহাবা সংঘবদ্ধ হইতেছে। মুসলিম নারীদেবই উৎসাহ বেশি। এখানে একটি নারী আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। তছমিনা খাতুন এই সমিতির সম্পাদিকা।"[২]

বস্তুতই, পূর্ববাঙলাব জেলাগুলিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অধিকাংশ সভাতেই মুসলিম মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। যাহোক, ১৯৪২-এর জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালেব মধ্যে সমগ্র বাঙলা জুড়ে গড়ে উঠেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিব অসংখ্য শাখা।

'আত্মরক্ষা সমিতি' ও 'পিপলস রিলিফ কমিটি'-র যৌথ দাযিত্বে গড়ে ওঠা 'নাবী সেবা সংঘ' যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-বন্যা ও মহামারীর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিঃস্ব ও রিক্ত নারী ও শিশুদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, স্বয়ম্ভবতা ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করেছিল। সে-সময প্রধান দুটি সমস্যা ছিল ধর্ষিতা ও অত্যাচারিতা নাবী যাদেব অনেকেই সমাজে আশ্রয লাভে বঞ্চিত হচ্ছিলেন বা বাধ্য হচ্ছিলেন দু-মুঠো অন্নেব জন্য 'বাববণিতা'র পেশা নিতে। এবকম সমাজবিচ্ছিন্না-সর্বহারা নারীব সংখ্যা সে-সময বাঙলায ছিল কযেক লক্ষ। এছাড়া ছিল অনাথ বা পবিত্যাজ্য অবৈধ শিশুদের অন্ন-আশ্রয ও শিক্ষাপ্রদানের স্থাযী ব্যবস্থা কবা। যুদ্ধ ১৯৪২-৪৫-এ ব বাঙলায যে চূড়ান্ত সংকট নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিযে এসেছিল তার মোকাবিলায সে সময বলিষ্ঠ ভূমিকা PRC-এব সঙ্গে মিলিতভাবে গ্রহণ করেছিলেন কমিউনিস্ট 'নারী সেবা সংঘ' ও 'আত্মবক্ষা সমিতির' সংগঠক ও কর্মীরা। তৎকালীন লীগ সবকাবেব কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায ১০ লক্ষ নিঃস্ব নারী ও শিশুর বক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রায ১৩ কোটি টাকাব প্রকল্প সরকাবকে অনুমোদনের জন্য তারা ব্যাপক প্রচার আন্দোলন সংগঠিত কবেছিলেন।[৩]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিব কর্মযজ্ঞ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে জেলায় জেলায, এমনকি গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তেও। প্রথম যখন বঙ্গদেশে জাপানি বোমা পড়ে তখন সুবক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্নটি অতি তীব্রভাবেই অনুভূত হয। এই পর্বে নারী-আন্দোলনেব মূল কর্মসূচি ছিল চারটি—এক) দেশরক্ষা; দুই) জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয সরকার প্রতিষ্ঠা, তিন) দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হাত থেকে জনগণকে রক্ষা কবা, চাব) আর্ত ও নিঃস্বদেব পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে সাহায্য কবা।

প্রথম পর্যাযে, ১৯৪২-এব সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায়, মহিলাদের মধ্যে আত্মবক্ষা সপ্তাহ পালনেব জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয। এই আত্মবক্ষা সপ্তাহের প্রধান কর্মসূচি ছিল জাপ-বিরোধী প্রচার। প্রতিটি অঞ্চলে মহিলাদেব স্কোয়াড, বৈঠক-সভা, সাধারণ-সভা, চিত্র-প্রদর্শনী, প্রভাতফেরী, জননাট্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে জাপানি আক্রমণেব বিরুদ্ধে

দেশবক্ষার কাজে সর্বস্তবের মানুষের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানানো হয়। আত্মরক্ষা সপ্তাহের এই আন্দোলনেব মধ্যে দিয়ে কতকগুলি গঠনমূলক কাজও করা হয যেমন ১) মেযেদের মধ্যে এ.আর পি প্রাথমিক চিকিৎসা ও ছোবা-লাঠি খেলা শেখার ব্যবস্থা, ২) ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা; ৩) খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করা। এই প্রচার-আন্দোলনেব মধ্যে দিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য সংগ্রহের কাজও চলতে থাকে।[১৪]

দ্বিতীয় পর্যাযে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিব কাজ ছিল নভেম্ববব, ১৯৪২-এব প্রথম সপ্তাহটিকে কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিযে 'জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ' পালন কবা। এই ঐক্য সপ্তাহের রণধ্বনি ছিল কংগ্রেস নেতাদেব মুক্তি চাই, দমননীতি বন্ধ করো, কংগ্রেস-লীগ এক হও, জাতীয গর্ভনমেন্ট গঠন কবো, জাপানিদের কখে দেশ স্বাধীন কবো। এইসব স্লোগানের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে জনগণের সহি-সংগ্রহ, রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকাব ব্যাপক প্রচাব-বিক্রয়, বৈঠক-সভা ও জনসভা, সাহিত্য প্রচারেব মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা আব দেশরক্ষার জন্য জাতীয ঐক্যেব প্রয়োজনীয়তা প্রচাব কবাই ছিল এই ঐক্য-সপ্তাহেব বিশেষ উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই বাজনৈতিক প্রচাব-আন্দোলনে প্রথম থেকেই অংশগ্রহণ কবেছিল।

এই ঐক্য-সপ্তাহের আবো বৈশিষ্ট্য এই যে, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখ কংগ্রেস নেত্রীবাও অনেকে এই দাবিপত্রে স্বাক্ষর দেন ও কমিউনিস্ট মেযেদের সঙ্গে দেশবক্ষার সংগ্রামে যুক্ত হন (যদিও তখন 'ভাবত-ছাড়ো' আন্দোলন পুরোদমে চলছিল)। মুসলিম ও খ্রিস্টান মহিলাবাও এই দাবিপত্রে ব্যাপক সংখ্যায় স্বাক্ষর দেন। এইভাবে মহিলাদেব মধ্যে এক দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার বাস্তব ভিত্তি বচিত হতে থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ে মহিলা আত্মবক্ষা সমিতি ১৯৪২-এব ডিসেম্ববব থেকে শুরু কবে গোটা ১৯৪৩ সালে জুড়ে বাঙলায ব্যাপকভিত্তিক খাদ্য-আন্দোলন গড়ে তোলে। ভযাবহ মন্বন্তব ও খাদ্য-সংকটেব মোকাবিলায়, খাদ্য সরববাহ ও বন্টনের কাজ পরিচালনায মেযেদেব এই ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয। শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ বা খাদ্যসংকট মোকাবিলাতেই নয, জাপবিমান আক্রমণ প্রতিবোধেও 'ফ্রেন্ডস এ্যাম্বুলেন্স ইউনিট'-এর সঙ্গে একত্রে এরা কার্যকবী ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল। সাইবেন বাজা মাত্রই বস্তিতে গিযে নারী-শিশুদের নিবাপদ আশ্রয়ে সরে যেতেও এঁবা সাহায্য কবতে থাকে। বস্তি অঞ্চলেব মানুষদের অসুবিধাগুলি দূব কবা এবং বিমান হানাব পর আহতদেব শুশ্রূষাব জন্য রিলিফ সেন্টাবে কাজ করার জন্যও নারী-ভলান্টিযাবদেব বিশেষ দাযিত্ব ছিল। এই সময কন্ট্রোলের দোকানেব সামনে লম্বা লাইন পডলে দোকানিবা লাইনে দাঁড়ানো দরিদ্র মানুষগুলোব সঙ্গে অত্যন্ত খাবাপ ব্যবহাব, এমনকি নিগ্রহ পর্যন্ত করত। এসব ক্ষেত্রে মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকাবা গিযে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন এবং মহিলা ক্রেতাবা যাতে বিধিসম্মত পণ্যসামগ্রী পান সে বিষযে ব্যবস্থা গ্রহণ কবতেন। বস্তি অঞ্চল থেকে শ্রমজীবী মেয়েবাও এসে কাজে যোগ দেন। ৩/৪ মাস আগেও যারা পর্দানশীন ছিলেন, তাঁরাও স্বেচ্ছাসেবিকা হযে এগিযে আসেন। মধ্যবিত্ত মহিলাবাও অনেকে তাঁদের ঘবেব কাজ ফেলে সকাল থেকেই এই কাজে লেগে যেতেন।[১৫]

এই সময়কালে কমিউনিস্ট মহিলা ফ্রন্টেব উদ্যোগে সংঘটিত একটি স্মবণীয ঘটনা হল বিধানসভা ভবন অভিমুখে মহিলাদেব বিশাল 'ভুখামিছিল' (১৭ মার্চ, ১৯৪৩)পবিচালনা। কলকাতাব বস্তিঅঞ্চল সহ উত্তব ও দক্ষিণ শহবতলিব প্রায ৫,০০০ মহিলা শোভাযাত্রা সহকারে খাদ্যের দাবিতে এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ওইদিন বিধানসভা অভিমুখে যাত্রা করেন। ছেঁড়া ন্যাকড়াব ফালি পরা হাড্ডিসাব শত সহস্র মাযেব দল তাঁদেব হাড় জিবজিবে মুর্মূষু শিশু কোলে নিযে কলকাতাবাসীব চেতনায সেদিন যেন কশাঘাত হেনেছিল, ওই বিশ্বল কঙ্কালসার মহিলা-মিছিলেব সুশৃঙ্খল ও দৃপ্ত দাবিব কাছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ছিলেন একেবাবেই অসহায। একশো বস্তা চাল এই মিছিলকাবীদেব হাতে তাঁদেব সেদিনই তুলে দিতে হযেছিল প্রযোজনেব তুলনায যদিও তা ছিল অপর্যাপ্ত।

বেণু চক্রবর্তী লিখেছেন, 'এটাই হলো মহিলাদেব প্রথম সংগ্রামী মোর্চা—যা নাড়িযে দিযে গেল গোটা শহবকে, পিঠ সোজা কবে বসতে হলো সবকাবকে। নাবী-আন্দোলনে এক নতুন পর্যায এলো। সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজেব আন্দোলন থেকে কলকাতাব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পৌঁছাল শ্রমিক—গৃহিণীদেব স্তবে এবং সংগ্রামের বাণী পৌঁছে দিল গ্রামের দবিদ্র মানুষেব কাছে।''[১৬] কলকাতাব অনুসবণে কমিউনিস্ট মহিলাদেব এই ধবনের ভুখামিছিল ছড়িযে পড়ে বাকুড়া, পাবনা, ফবিদপুব ববিশাল, বংপুব, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুব প্রভৃতি জেলাতেও। পাশাপাশি চলে ফ্যাসিস্ত-বিবোধী প্রচাব।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলাব নাবীসমাজেব এই ব্যাপক ভিত্তিক গণআন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তুলবার পশ্চাতে ছিল ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টিব সুপবিকল্পিত নেতৃত্ব। কেবলমাত্র বাঙলাতেই নয, কেবল, অন্ধ্র, আসাম, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশগুলিতেও নাবী-আন্দোলন এই সমযকালে সংগঠিত রূপে আত্মপ্রকাশ কবেছিল। কিন্তু বাঙলাই ছিল এব অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র। ১৯৪২-এব ২৩ জুলাই পার্টিব উপব থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওযার পবেই মহিলা ফ্রন্টকে সংগঠিত করাব বিশেষ পবিকল্পনা কমিউনিস্ট পার্টি করে। ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায এই ফ্রন্টকে সংগঠিত কবাব বিশেষ পবিকল্পনা কমিউনিস্ট পার্টি কবেছিল। ইতিমধ্যেই কলকাতা ও বিভিন্ন জেলাব পার্টি সদস্য মহিলাকর্মীবা কমিউনিস্ট পার্টিব জেলা কমিটিগুলিব নেতৃত্বে কাজও শুরু করে দিযেছিলেন। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওযাব পবে মহিলা ফ্রন্টের কাজ পবিচালনাব জন্য প্রাদেশিক ও জেলা কমিটিব সদস্যদের নির্দিষ্ট দাযিত্ব দেওয়া হয। মহিলাদেব মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষাব ক্লাস সংগঠিত কবে কর্মী তৈবি কবা হতে থাকে। প্রাদেশিক স্তবে ও জেলাস্তবে মহিলা ফ্রন্টেব নেতৃত্বকে গড়ে তুলবাব জন্য পার্টি-সদস্যদেব পার্টি সেল ও ফ্র্যাকশন গঠন কবা হয়। প্রাদেশিক কমিটির তবফ থেকে সাবা প্রদেশের নাবী-আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পবিচালনা কবার জন্য পাঁচজন মহিলা সদস্যকে নিযে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন ও পবে প্রাদেশিক স্পেশাল সেল গঠন কবা হয। এঁদেব মধ্যে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন, বেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জি, যুঁইফুল বায ও কনক মুখার্জি। কমিউনিস্ট পার্টিব তৎকালীন প্রাদেশিক দপ্তবই (২৪৯, বহুবাজাব স্ট্রিট, কলকাতা) ছিল প্রথমে মহিলা আত্মবক্ষা সমিতিব অফিস। ১৯৪৩-এব মার্চে সমিতিব বুলেটিনেব দ্বিতীয় সংখ্যায দেখা যায প্রথম ৬ মাসে মহিলা

আত্মরক্ষা সমিতির সদসংখ্যা হয়েছে ৫৯৫৭ জন (এর মধ্যে ১৫১ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য) এবং বিভিন্ন জেলায় ৮৯ টি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে উঠেছে। ১৯৪৩-এর ১৫ আগস্টে এর সদস্যসংখ্যা ২৫,৪৭৯তে পৌঁছায়। শুধু মধ্যবিত্ত নয় কৃষক নারীদের মধ্যেও সমিতির সদস্য ও সক্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৭]

অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ও পরিচালনায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' পরিচালিত হতে থাকলেও তো কোনো সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও কখনো আবদ্ধ থাকেনি। দেশরক্ষামূলক প্রচার-আন্দোলন কাজ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এবং দুস্থ মানুষকে বিলিফ দেওয়া, তাদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠিতভাবে দলমত নির্বিশেষে অন্যান্য মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবেই কাজ করেছে। যেমন, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (AIWC), কংগ্রেস মহিলা সংঘ, মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি, মুসলিম নারী আত্মরক্ষা সমিতি, হিন্দু মহাসভা মহিলা সমিতি, খ্রিস্টান মহিলা সমিতি প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এরকম মোট আঠারোটি নারী সংস্থা নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'নারী সেবা সংঘ' যার সভাপতি হন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও সম্পাদক ছিলেন সম্পাদকছিলেন সীতা চৌধুরী।[১৮] এদের মধ্যে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' ভূমিকাই ছিল মুখ্য, একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

অবশ্য আরেক ধরনের আন্দোলনে ১৯৪৩-৪৪ সালে নিখিবঙ্গ মহিলা সমিতি AIWC-র সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু বিবাহ বিধির সংস্কারের জন্য রাও-কমিটির যে সুপারিশ ছিল তার বানচাল করার জন্য প্রধানত হিন্দু-মহাসভাপন্থীরা যে প্রচেষ্টা নেয়—সেই মৌলবাদী অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ১৯৪৪-এর অক্টোবরে কলকাতায় কমিউনিস্ট মহিলাদের ভূমিকা ছিল (সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।[১৯]

যাহোক, কলকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর ২৮ এবং ২৯ এপ্রিল। প্রায় ৫০০ মহিলা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁরা প্রধানত বস্তি এলাকার এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলা। ২৮ এপ্রিল (১৯৪৩) প্রকাশ্য অধিবেশন আর্য-সমাজ হলে। প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী মোহিনী দেবী এই সভায় সভানেত্রীত্ব করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে সমিতির কাজের প্রশংসা করেন এবং এই সংকটের দিনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সংগঠন-সম্পাদিকা এলা রীড মূল প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করেন। কমলা চ্যাটার্জি, মণিকুন্তলা সেন ও রেণু চক্রবর্ত্তী প্রস্তাবের উপর তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেন। শ্রমিকশ্রেণীর এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের এই সভায় যোগদান ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।[২০]

কলকাতা সম্মেলনের কিছুদিন পরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩-এর ৭-৮ মে, কলকাতার ওভারটুন হলে। বাঙলার নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে এটি অবশ্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। বহু মহিলা 'মহাত্মা গান্ধীর ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই', 'ফ্যাসিস্ত হামলাবাজ মুর্দাবাদ', 'সকলের জন্য খাদ্য চাই' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে দলে দলে হেঁটে সভায় আসেন। সম্মেলনে প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হন সুদূর চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, উত্তর-বঙ্গের রংপুর থেকে কলকাতা এবং নিকটবর্তী জেলাগুলো থেকে আসা মহিলা-কর্মীরা। অবিভক্ত

বাঙলাব ২১টি জেলার প্রতিনিধিদেব সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেব ভিত্তিতে গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মবক্ষা সমিতি' এবং এবই মধ্য দিযে নাবী-আন্দোলন বাস্তবরূপ পবিগ্রহ কবে।

১৯৪০-এব দশকে প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্য নারীদেব দ্বারা সংগঠিত (যদিও পরিচালনাভাব সম্পূর্ণত কমিউনিস্টদের হাতে ছিল না) 'মহিলা আত্মবক্ষা সমিতি'র নামে পরিচালিত নারী আন্দোলন প্রচাবমূলক ও গঠনমূলক পদ্ধতিতে যেভাবে কাজ করছিল তাব বিশেষ একটি 'বোল মডেল' বা বৈশিষ্ট ছিল। বিংশতাব্দীব প্রথম দশকে মূলত ব্রাহ্মনাবীদেব (যেমন সবলা দেবী) দ্বারা পরিচালিত 'ভাবত স্ত্রী মহা-মণ্ডল' বা 'অল ইন্ডিয়া উওমেন কনফাবেন্স' (AIWC)-ব সঙ্গে এমনকি ১৯২১ সালে দেশবন্ধু জাযা বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে পবিচালিত নারী আন্দোলনেব সঙ্গে এব লক্ষণীয তফাত ছিল।[২১] এমনকি যে গান্ধীজী ভাবতীয় মহিলাদেব জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ স্থান দিযেছিলেন বলা হয—তাঁব পদ্ধতিব থেকেও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কর্মকাণ্ডের ফাবাক ছিল অনেক। বিশিষ্ট এক গবেষক সঠিকভাবেই ব্যাখ্যা কবেছেন—

"It is however argued that Gandhi made women struggle for the Congress but did little to make the congress speak for them By popularising the myth of ideal, Indian women-hood as symbolized by Sita (the obedient follower of her husband), he also prevented the growth of radical and independent ideas among his women followers Women's movement in the Gandhi era hesitated to challenge the legacy of male patriarchy "[২২]

জনযুদ্ধেব যুগেব কমিউনিস্ট-নাবী আন্দোলন এই অবস্থাব সম্পূর্ণ রূপান্তব ঘটিযে স্বয়ম্ভবতা ও নাবীব প্রকৃত মুক্তির সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের সংযোগ ঘটাতে পেরেছিল। পাশাপাশি জাতীয আন্দোলনেব সঙ্গে তাব নিবিড় বন্ধন ছিল অটুট। অবশ্য তা কবতে গিয়ে 'মহিলা আত্মবক্ষা সমিতি' কোনো সংকীর্ণতাব পথে চলেনি। বেণু চক্রবর্তীব বক্তব্য তাই যথার্থ বলেই মনে হয :

"কমিউনিস্ট মেযেবা চেষ্টা কবেছে তাদেব সংগঠনগুলিব দবজা সকলেব জন্য খোলা রাখতে—কংগ্রেস মুসলিম লীগ, লেখিকা, শিল্পী—সর্বস্তর, সর্বমত ও পথেব সকলেই স্বাগত। জীবনকে সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত কবে এমন সব জীবন্ত সমস্যা তাবা হাতে নিযেছে—তাই সব মত-পথেব মেযেরা এগিয়ে এসেছে কম্যুনিস্ট পবিচালিত সংগঠনগুলিব দিকে। যেখানে বেশিবভাগ কর্মী কম্যুনিস্ট মেয়েবা, সেখানেও অকম্যুনিস্টদেব মত নেওযা হযেছে এবং তাদেব মতকে যথাযোগ্য মূল্য দেওযা হযেছে। এভাবেই গণসংগঠনগুলি শুধু আযতনেই বাডেনি—তারা দলীযতা, সংকীর্ণতা ও অগতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি পবিহাব কবে হযেছে উদাব ও প্রশস্ত, তাই সববকম মেযেরাই তাদেব আন্দোলনে যোগ দিযেছে।"[২৩]

স্বাধীনোত্তব পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক নাবী আন্দোলনেব ভিত্তি স্থাপন এভাবেই ঘটেছিল।

তথ্য ও সূত্র-নির্দেশিকা

১ এই বিষয়ে বিস্তাবিত জানাব জন্য দ্রষ্টব্য Geraldine Forbs, *The Indian Women'S Movement,A Struggle for Women's Rights or National Liberation'*, See also Tripti

Chaudhuri, 'Women in Radical Movements in Bengal in the 1940s, The story of the Mahila Atmaraksha Samiti', in Mandrakantra Bose (Ed), *Faces of Feminine in Ancient, Medieval and Modern India*, Oxford, Newyork 2000

২ মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, নবপত্র, কলকাতা

৩ কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা', একসাথে, কার্তিক, ১৩৯৪, পৃ ১০।

৪ তদেব, শ্রাবণ, ১৩৯৪, পৃ ৯, এছাড়া লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২০০২

৫ Chakraborty, Renu, *Communists in the Indian Women's Movement*, PPH, Delhi, 1980

৬ জনযুদ্ধ, ২ ডিসেম্বর, ১৯৪২

৭ কনক মুখোপাধ্যায়, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা; *একসাথে*, শ্রাবণ, ১৩৯৪, পৃ ১৩।

৮ *জনযুদ্ধ*, ১২ আগস্ট, ১৯৪২

৯ Tripti Chaudhuri, 'Women in Radical Movements in Bengal in the 1940s, The story of the Mahila Atmaraksha Samiti', in Mandrakantra Bose edited Monograph

১০ বেণু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা : ১৯৪০-৫০*, বঙ্গানুবাদ, ১৯৮০, পৃ ১৫-২৯

১১ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্ব-উক্ত, পৃ ১৫-১৬

১২ জনযুদ্ধ, ১২ আগস্ট, ১৯৪২

১৩ Tripti Chaudhuri, op cit

১৪ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্ব-উক্ত, পৃ ১৫-১৬

১৫ বেণু চক্রবর্তী ও কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্ব-উক্ত।

১৬ বেণু চক্রবর্তী, পূর্ব-উক্ত ও *People's War*, 4 April, 1943

১৭ সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, ২য় খণ্ড, পৃ ১০৩-০৭ এবং প্রাদেশিক পার্টি চিঠি নং ১৯/৪৩, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৩

১৮ সরোজ মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ ১৪৪

১৯ বেণু চক্রবর্তী, পূর্ব-উক্ত, পৃ ১৫৫

২০ মণিকুন্তলা সেন, ও বেণু চক্রবর্তী, পূর্ব-উক্ত, পৃ ৩৩।

২১ Man Mohan Kaur, *Role of Women in the Freedom Movement*, Delhi, 1968 and J M Everett, *Women and Social Change in India*, New Delhi, 1979

২২ Maria Mies, *Indian Women and Patriarchy*, New Delhi, 124-129

২৩ বেণু চক্রবর্তী, পূর্ব-উক্ত, পৃ ১৮৬-৮৭

কথাসাহিত্যের তিনদশক : নানামাত্রিক অন্বেষণ

শুভঙ্কর ঘোষ

গত শতাব্দীর শেষ তিনদশকেব (১৯৭০-২০০০) কথাসাহিত্য আলোচনায দেশকালেব কথা অনিবার্যত উল্লেখ করতেই হয়। শেষ তিনদশক কেন, যে-কোনো দশকেব কথাসাহিত্যের আলোচনায দেশকাল প্রসঙ্গ নিতান্তই জরুবি। অবশ্য একথা স্বীকার কবে নিতে হবে, দশক মেপে বা ভাগ কবে সাহিত্য-বিচাব যথাযথ কিনা এ নিযে বির্তক আছে। আমবাও মানি যে-কোনো দশকেব শুরু থেকে বাতারাতি নতুন নতুন সাহিত্যলক্ষণ ধবা পড়বে, নতুন নতুন সাহিত্যপ্রবণতা ফুটে উঠবে তা মোটেই সম্ভব নয। তাছাড়া, পঞ্চাশেব দশকের লেখককুলেব অনেকেই ষাট-সত্তর-আশি নব্বই পেবিযে ২০০৫-এ লিখে চলেছেন, তাদেব সম্পর্কে মূল্যাযন কী হবে, কী ভাবে হবে? প্রত্যেক দশকেই নতুন নতুন লেখকেব আবির্ভাব ঘটে থাকে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁদেব লেখালিখিতে ব্যতিক্রমী উপাদানসমূহ বা সমযেব চিহ্ন ধাবণ কবতে দেখব, এমনটা সত্য নয। কিন্তু ক্যালেন্ডাব-চিহ্নিত পর্ববিভাজনেব ওপব জোব না দিযেও দাবি কবা যায়, পৃথিবীর সব দেশেব সাহিত্যে এবং আমাদের বাংলা দেশেও, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব-স্যাপাব দেখা গেছে। এটা তো ঘটনা, আত্মপ্রকাশেব কালে এক বা একাধিক লেখকেব লেখাব চরিত্র-লক্ষণ অন্য সাহিত্যেব মতন বাংলা সাহিত্যেও নাড়া দিযে গেছে, পরবর্তীকালে সেই ধারা পবিপুষ্ট হয়েছে তরুণতব লেখকদের লিখনশিল্পে। ধবা যাক, আমরা যে সত্তর দশক থেকে নব্বই দশকেব কথাসাহিত্য পর্যালোচনা কবতে চাইছি, এক্ষেত্রেও, পূর্বাপব বিবেচনায, দেশকালেব পবিবর্তনেব নিরিখে, এমন কিছু বিষয আমবা পেতে পাবি, যাকে মান্য কবতেই হয। গত শতাব্দীর শেষ তিনদশকেব কথাসাহিত্যে—গল্প উপন্যাসে—বঙ্কিমচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথ-শবৎচন্দ্র-তাবাশঙ্কব-বিভূতিভূষণ-মানিক এবং আরো অনেক কৃতী লেখকেব ঐতিহ্যেব উত্তবাধিকাব বর্তাযনি তা তো নয। তবু স্বাধীনতা উত্তবকালে পঞ্চাশ বা যাটেব দশকে অধিপত্য কাযেম কবেছিলেন যাঁবা, সত্তব দশক থেকে তাঁদের কণ্ঠস্বব উত্তবপ্রজন্মেব লেখালিখিতে শোনা গেল না। এখানে বলে রাখা ভালো জনপ্রিয ধাবার সহজমাত্রিক গল্পউপন্যাস নিযে আমাদেব মাথাব্যথা নেই, এই ধাবার অনুবাগী পাঠক-সমালোচক থাকবেই, থাকাটাও অন্যায নয, বরং স্বাভাবিক, আমবা এদেব নিযে এখানে আলোচনা কবব না, আমাদেব লক্ষ্য, সেইসব তরুণ কথাকাব, আত্মপ্রকাশেব কালে ও পববর্তী পর্যাযে অর্থাৎ তিনদশকে নানামাত্রিক আখ্যান বা জীবনভাষ্য রচনা করেছেন, ছোটোগল্পে নব নব দিগন্তেব উন্মোচন করেছেন।

দেশকালযোগে গড়ে ওঠা সাহিত্যেব গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি। আমাদেব দেশে, বিশেষত স্বাধীনতা উত্তবকালে বাজনীতি-অর্থনীতি-সামাজিক অবস্থা, গ্রাম

ও নগব সমাজ নিয়ে প্রভূত গবেষণা হয়ছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০-এব মধ্যে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি, বৃহদাযতন শিল্পব্যাপাব, চীনভারত সীমান্তসংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টিব দুভাগ হওয়া, ১৯৫৯ ও ১৯৬৬-এব খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও পতন, কনিউনিস্ট পার্টিব পুনবায বিভাজন ও নকশালবাড়িব অভ্যুত্থান, ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধ (১৯৫৪-১৯৭৫)—জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনাতরঙ্গে উথালপাথাল বাংলা। এই সমযকালে যে-কোনো কথাকাবেব শিল্পচৈতন্য ও সমাজচৈতন্যেব যথার্থ সাঙ্গীকবণ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু লক্ষণীয, মধ্যশ্রেণীর অসহায়তা, ব্যক্তির অনন্বয, চবিত্রপাত্রের বিচ্ছিন্নতা ও শিকড়হীনতা, সর্বোপরি স্বপ্নভঙ্গ ছাড়া অন্য কিছুই পূর্ববর্তী দুটি দশকের কথাসাহিত্যে পাওয়া গেল না। সত্যপ্রিয ঘোষ, দেবেশ রায, অসীম বায, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায, কার্তিক লাহিড়ী প্রমুখেব ব্যতিক্রম লেখা বাদ দিলে অধিকাংশ হযে উঠলেন অস্তিত্বেব বিপন্নতা ও ব্যক্তি সংকটেব বিষযে মগ্ন। মহাশ্বেতা দেবী অবশ্য ক্রমান্বযে কোন অভিমুখে যাত্রা করছেন, তা স্পষ্ট হযে উঠছিল, সত্তবদশকে যাব বিস্তাব ঘটবে। পঞ্চাশ-ষাটেব সাহিত্য লক্ষণগুলির প্রযোজন নেই বলি না, কিন্তু সেক্ষেত্রেও অনেকেব লেখায বিশ্বাসের জগৎ নেই। যৌনতাও সাহিত্যে কত শিল্পগুণান্বিত হতে পারে, তাব নমুনা কথাসাহিত্যে কম নয। কিন্তু এই সমযে যৌনতাসর্বস্ব সাহিত্যেব আতিশয্য পীড়াদাযক হযে উঠল, সমবেশ বসুরা শিল্পক্ষমতা ভিন্নপ্রসঙ্গে নিযোজিত রাখলেন।

ষাটেব শেষ থেকে মধ্য সত্তব দশক অবধি বোমাবাকুদেব গন্ধে আতুব বাংলাদেশ; একদিকে ব্যক্তিহত্যাব বাজনীতি, গ্রাম থেকে শহব ঘেরাও-এর শ্লোগান, বক্তপাত, অপবদিকে গণতান্ত্রিকতাব বুলি নিযে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, রক্তস্নাত বাংলা, জরুরি অবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক হবণপালা, মানুষেব মুক্তিব স্বপ্ন ও জীবনেব নিবাপত্তার অভাব। সব মিলিযে বড় জটিল সময। তবু ছোটোগল্পেব ক্ষেত্রে আমবা দেখব, একটা নতুন ধাবা, বিমল কব ষাটেব দশকে ছোটোগল্পেব নবনিবীক্ষায নেতৃত্বে দিয়েছিলেন কিন্তু বেশিদূর তা অগ্রসব হযনি। শাস্ত্রবিবোধী আন্দোলন বা হাংরি জেনাবেশন আন্দোলন সামান্য ঝাঁকুনি দিলেও দর্শনেব দুর্বলতায তাও ব্যর্থ হযেছে। সত্তব দশকে যাঁদেব আত্মপ্রকাশ ঘটল, তাঁরা বাজনীতি-বিচ্ছিন্ন নন, বাজনীতিব ভেতবে থেকে ও বাজনীতিব উত্তাপ নিযে বাইবে থেকে অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁবা গল্প-উপন্যাস লেখায ব্রতী হলেন। উপন্যাসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব ফসল স্বর্ণ মিত্রব 'গ্রামে চলো' বা শংকব বসুব 'কমুনিস'—বাজনৈতিক বীক্ষাব শিল্পদলিল। প্রবীণতা সত্ত্বেও মহাশ্বেতা দেবীব আত্ম-আবিষ্কাব, মধ্যশ্রেণীব জীবনকে ভাঙা ও নিজেকে মেলে ধবাব সাহস লক্ষ কবা গেল 'হাজাব চুবাশীব মা'-য, আখ্যানেব বিষযসীমানা ও শিল্পসীমানা ভেঙে মহাশ্বেতা লিখলেন 'অবণ্যেব অধিকাব' 'চেট্টি মুণ্ডা এবং তার তীব' 'কবি বন্দ্যঘাটী গাঞিব জীবন ও মৃত্যু'। সাধন চট্টোপাধ্যায যাটের দশকে 'বন্যা' গল্প লিখে আত্মপ্রকাশ কবলেও তাঁব প্রকৃত যাত্রা শুরু হল 'অগ্নিদগ্ধ' উপন্যাস থেকে, সত্তর দশকেই তিনি ক্রমশ পরিচিত হযে উঠলেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের

ব্যাপক প্রভাবে ছোটোগল্পেব বিষয হযে উঠল গ্রামজীবন। বিভূতিভূষণ-তাবাশঙ্কব-মানিকের গ্রাম নয। দেশীয ও আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে সচেতন ছোটোগল্পেব বিষয নির্বাচনেব ক্ষেত্রে একঝাঁক লেখক শ্রেণীবাস্তবকে স্বীকাব করে নিযে, বহির্বাস্তবেব সঙ্গে অন্তর্বাস্তবেব সমীকবণে ছোটোগল্পে নতুন মাত্রা যোজনা কবলেন। সকলেই যে সমান সফলতা পেলেন তা নয। সাধন চট্টোপাধ্যায-ভগীবথ মিশ্র-অভিজিৎ সেন-কিন্নর রায-অমব মিত্র-স্বপ্নময চক্রবর্তী-শচীন দাশ-শৈবাল মিত্র এবং আবো অনেক কথাকাব লিটল ম্যাগাজিনকে আশ্রয কবে ছোটোগল্পের বহুমাত্রিকতাকে আবিষ্কাব কবতে চাইলেন। অপবদিকে শিল্পেব বিপণনেব জগতে নকশালপন্থী আন্দোলন বা গ্রামজীবনেব ঘাতপ্রতিঘাতময শ্রেণীদ্বন্দ্বকে পণ্য কবে যৌনতাব বসে চুবিযে একদল বাণিজ্যদাস কথাকাব গল্প-উপন্যাস লেখক ব্যস্ত বইলেন, কিন্তু তখনকাব তরুণেবা সে-পথে হাঁটেননি। বীক্ষাগত কাবণেই তাঁবা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হযেছেন। নযেব দশক পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে, তাঁবা নিজেদেব ভাঙবাব, সময ও সমাজকে বুঝবাব, ঐতিহ্যেব হাত ধবেও বর্তমানকে নতুন মাত্রা দেবাব ও ভবিষ্যতেব স্বপ্নকে স্পর্শ কববাব ও রূপ দেবাব কাজে ক্লান্তিহীন।

সাধন চট্টোপাধ্যায পোলিটিক্যালস সোসাইটি ও সিভিল সোসাইটিব দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন। ভিযেতনাম বিজযেব কালে, বাষ্ট্রীয সন্ত্রাসেব কালে যে সাধন দুটি বিপবীতমুখী অভিজ্ঞতাব অধিকাবী তিনি নযেব দশকে বিশ্বাযনকালে ক্রমে অন্যবকম চেতনায সমৃদ্ধ, যা তাঁব সাহিত্যজীবনে ধাবাবাহিকতায ঋদ্ধ। কোথাও দাঁড়িযে থেকে পাকাপাকি হিসেবনিকেশ কবতে চান না তিনি। কিন্নব জানেন, যে লেখা বহুমাত্রিক নয, সে লেখা খঞ্জ হতে বাধ্য। অতএব সে-ভাবেই তাঁব সাহিত্যচর্চা। অভিজিৎ সেন জীবনকে দেখতে চান যেমন আছে, কেমন থাকবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-ভাবনা নিযে; ভগীবথ বা অভিজিৎ পিছডেবর্গেব যাপিত জীবনেব সংগ্রামশীলতা সংকট ও সমস্যা নিযে ভাবতে চান। অমব মিত্রেব শূন্য থেকে গল্পেব দিকে যাত্রা, কিন্তু তিনি জীবনকে বুঝতে চান অক্ষবে অক্ষবে, আসলে তাঁব ভাবনা শূন্য নয, ববং 'এ জীবন ক্রমপূর্ণতাব দিকে যাত্রা।' প্রত্যক্ষ বাজনীতিক কর্মী হযেও শৈবাল মিত্র ব্যক্তিজীবনেব অভিজ্ঞতা ও বাজনীতি, বাষ্ট্রীয পীড়নকে সম্পদ কবে গল্পভাবনায স্থিত হতে চান। ঝড়েশ্বব চট্টোপাধ্যায়েব একটা দেশ আছে, ভূগোল আছে, ভূগোলে বসবাসকাবী মানুযেব প্রতি মমতা থাকে। তাঁবও প্রতিবাদ মানুযেব পাশে থেকেই মানুযেব কথা বলেই। একনিঃশ্বাসে আমাদেব মনে পড়ে যাবে অসীম বাযেব 'অনি', শৈবাল মিত্রব 'সংগ্রামপুব যাত্রা', সাধন চট্টোপাধ্যাযেব 'বক্তিম বসন্ত', স্বপ্নময চক্রবর্তীব 'আবওযালেব হাত'—সমযেব হেবফেবে অসংখ্য গল্পকার ও গল্পেব কথা এভাবেই বলা যায। আমাদেব বলাব কথা, নকশালপন্থী আন্দোলন গোটা সমাজকেই শিল্পসাহিত্যে প্রবল নাড়া দিযে গেছে। এই আন্দোলনেব সমকালে ও পবে প্রচুব লেখাও হযেছে। অজস্র গল্পসংকলনও প্রকাশিত হযেছে। ১৯৯৫- এ কেন তখনকাব গল্পেব সংকলন প্রকাশিত হয তা বোঝা যায় 'প্রতিবাদেব গল্প নকশালবাড়ি'ব 'পূর্বাভাষ'-এ পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যাযেব বক্তব্যে—'আমাদেব মনে হযেছে বর্তমানেব অবসন্ন অন্ধকাবে ঐ স্বপ্নেব প্রতিবাদকে স্মবণ

করা প্রয়োজন। অদ্ভুত যে আঁধার আমাদের ঘিরেছে, আমাদের চৈতন্যে যে মড়ক, তাকে প্রতিহত করতে হলে সময়ের যন্ত্রণায় শুদ্ধ প্রতিবাদকে সামনে আনা একান্ত জরুরী। শিল্প অভিজ্ঞতার হাত ধরলেও, আসলে চৈতন্য থেকেই রূপ নেয়। এ চৈতন্য অস্তিত্বের চৈতন্য, আর এই অস্তিত্ব মানুষের জীবন-প্রক্রিয়া।'

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিন্তাচৈতন্যে পরিবর্তন এল। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা কায়েম হল। আশি ও নয়ের দশকে জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। অপারেশন বর্গা, কমজিউমারিজম, সিনথেটিক কালচার, বাজার অর্থনীতি, মুক্ত অর্থনীতি, সোভিয়েত ও ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের উল্লাস, নতুন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বায়নের থাবা, এক ভুবনগ্রামের শ্লোগানের ফাঁকে আমাদের আত্ম-পরিচয়ের সংকট, গ্রামীণ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতি কাঠামোয় দুর্নীতি ও শ্রেণীধারণার প্রচলিত রূপ বদলে যাওয়া, ভূস্বামীদের বৃহৎ সংগঠনে অনুপ্রবেশ, ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপের সংকটপন্ন হওয়া—এইসব নিয়ে আশি ও নব্বই দশকের কথাকারদের সৃজনক্ষেত্রে পদচারণা করা। আট ও নয়ের দশকে যাঁরা পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামকুমার মুখোপাধ্যায়, আফসার আহমেদ, আবুল বাশার, জয়া মিত্র, সৈকত রক্ষিত, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, স্বপন সেন, রবিশংকর বল, মুর্শিদ এ এম, অনিশ্চয় চক্রবর্তী, সোহারাব হোসেন, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শুভঙ্কর গুহ, সঞ্জীবন চট্টোপাধ্যায়, সুকান্তি দত্ত, অসীম ত্রিবেদী, শরদিন্দু সাহা, নীহারুল ইসলাম, শ্যামল ভট্টাচার্য, শাহাদাদ ফিরদৌস, সুদর্শন সেনশর্মা প্রমুখ। এরকম আরো অনেকের নাম করা যায়।

কিন্তু লক্ষণীয়, সত্তর দশকে একমাত্রিক বা স্থূল বাস্তবের প্রত্যক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়ে গল্প লিখেছিলেন, তাঁরা ক্রমশ গল্পেই নয় উপন্যাসেও বর্ণময়তা, বহুস্বরিকতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় পক্ষ-বিপক্ষ-মাটির অ্যান্টেনা-জলতিমির ট্রিলজি উপন্যাসে তিনটি আখ্যানকে সময়ের ক্যানভাসে অসামান্যতায় এঁকেছেন। আর্সেনিক আক্রান্ত লোক বাংলার আখ্যান কালীদমন মিথের পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নপ্রাণিত বহুজাতিক সংস্থার গ্রামপর্যায়ের থাবাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাস সংঘশক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশপ্রেমী ব্যক্তির লড়াই, 'গহিন গাঙ'-এ সুন্দরবন জীবনের দ্বন্দ্বময় জীবনযাত্রা, আঞ্চলিকতার ফ্রেম ভেঙে শ্রমজীবী নিম্নবর্গের প্রতিনিধি শ্রীপদ'র শাশ্বত লড়াই এবং চারশোর কাছাকাছি ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে, পুনরুক্তির দোষে দুষ্ট না হয়ে, শিল্প সাধনাকে তিনি ঋদ্ধ করে চলেছেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী স্মার্ট গদ্যগঠনে, সমাজব্যবস্থাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে একটি সমাজসত্যকে উন্মোচিত করার ব্রত নিয়েছেন। তাঁর ছোটোগল্প উপন্যাস এমনই,—'ভূমিসূত্র' চতুষ্পাঠী' 'অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু' 'জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা' জীবনকে ও সময়কে ভিন্নভাবে দেখার উদাহরণ। বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে একদিকে দক্ষিণবঙ্গের নিম্নভূমির বাদা অঞ্চলের জীবনযাত্রা অপরদিকে সমগ্র জীবনের সময়চিহ্নিত টানাপোড়েন তাঁর গল্পে শচীন দাশকে স্বকীয়তায় বিশিষ্ট করেছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায ও শচীন দাশ—দুজনেই অনেকখানি সমকালীন হওযা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ঘবানা গড়ে তুলেছেন। শচীনের গল্প-উপন্যাস, যেমন 'আণ্ডবেব দিন' 'দুই জীবনেব গল্প' 'নির্বাচিত গল্প', 'মধ্যবাতেব কাব্য' বা 'পঞ্চাশটি গল্প'—তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য ভাবনার কথাকার হিসেবে স্বীকৃতি দিযেছে। 'আড়কাঠি'ব ভগীবথ মিশ্র, 'মেঘপাতাল' ধর্মসংকট, 'প্রকৃতিপাঠ'-এব কিন্নব, 'রহুচণ্ডালেব হাড়' 'অন্ধকারেব নদী'ব অভিজিৎ. 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ', 'দানপত্র', 'সমাবেশ'-এব অমব 'নদী মাটি অবণ্য'-এব তপন বন্দ্যোপাধ্যায প্রমুখেবা এভাবেই বিষযবৈচিত্র্য ও সমযেব চিহ্ন-বাহিত জীবনভাষ্যে স্থিত রয়েছেন।

এইসব লেখকের সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যিকৃতি সামনে বেখেই পববর্তী লেখকদের সাহিত্যসাধনা, কিন্তু তাঁরাও প্রত্যেকেই সমযসচেতন। স্বপন সেন 'প্রত্নভূমিতে কুচকাওযাজ' গল্পসংকলনেব মধ্য দিযে বোঝাতে চেযেছিলেন তিনি সময়সচেতন, সমাজসচেতন লেখক। বিশেষত তাঁব 'কাশীপুব ববানগব গণহত্যায' নিহত শহিদদেব প্রতি উৎসর্গীকৃত 'মুখোশযোদ্ধা' উপন্যাসে সৃজনশক্তিব যথার্থ পবিচয দিযেছেন। আশিব দশকে থেকে উঠে এলেও নযেব দশকেব বাস্তবতাব তাপ নিতে নিতে তাঁব উপন্যাসেব বিষয হযেছে সত্তরদশকের সমাজবাস্তবতা। নিজেকে 'কনফ্রন্ট' করাব মধ্য দিযেই ওই প্রতিবাদী লেখকের সৃজনসাধনা। আপাত অর্থে মুখোশযোদ্ধা আত্মহত্যা বিষযক সন্দর্ভ। এটি রাজনৈতিক ও প্রেমেব উপন্যাস। ১৯৭১-এ যে গণহত্যা প্রত্যক্ষত সভ্যতাকে লজ্জা দিযেই ঘটে গিযেছিল আর ১৯৯০-এ অনির্বাণরা খুন হয আত্মহত্যাব কাঠামোয, মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাসেব মধ্য দিযে। এই উপন্যাসসন্দর্ভে জানা যায, 'আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত ক্রিযা নয়, এব খাঁজে খাঁজে থাকে বাষ্ট্র পবিবাব-দল-অন্যমানুষ, সমাজ। আসলে আত্মহত্যা একটি মুখোশেব হত্যা'। মার্কসবাদে বিশ্বাসী হযেও সুকান্তি দত্ত শিল্পবোধকে প্রাধান্য দিযে লিখেছেন 'দহনবেলাব পাণ্ডুলিপি' গল্পগ্রন্থে। 'যুধানকথা' ইটভাটা উচ্ছেদেব দাবিতে পবিবেশ সচেতন যুধানেব স্বার্থন্বেষীদের দ্বারা আক্রান্ত হওযাব আখ্যান। এই নভেলেটেব মধ্য দিযে দেশকালবাহিত চৈতন্যেব আলোঅন্ধকাব আর্থসামাজিক ছোবলগুলি মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টিব জটজটিলতাগুলি উপস্থাপনা সুকান্তিব কঠিন শিল্পচর্চা। এ আখ্যানেই পাওযা গেল, বিশ্বাযন শাসিত পবিবেশ দূষণে রুগ্ন সমাজ থেকে যেন আদিম সাম্যবাদী প্রকৃতিলগ্ন সমাজে, যেখান থেকে নতুনভাবে ফিবে আসা যেন যুধানেব অঙ্গীকাব। জাদুবাস্তবতা প্রযোগ ও মিথের পুনর্নির্মাণও সুকান্তিব লক্ষ্য। আশিব দশকে উঠে আসা শুভঙ্কব গুহ বা অনিন্দ্য ভট্টাচার্যেব প্রতিষ্ঠা নযেব দশকে। 'জগন্নাথবাবুব নিরুদ্দেশযাত্রা'-তেই শুভঙ্কব জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে অনুপুঙ্খ উন্মোচনেব ক্ষমতা দেখিযেছেন। অনিন্দ্য'র 'ক্রমপাঠ' সময়, সমাজ, দেশ ও জীবনেব ক্রমাগত পাঠ। ৬ বছব ধবে ক্রমান্বযে সংশোধন, পবিবর্ধন ও পবিবর্জন কবে আখ্যানকে, আখ্যানেব প্রকবণকে গড়েছেন। সমযেব দীর্ঘতম হাতাব মধ্যে আখ্যানকে ধবে বাখতে তিনি উপন্যাসের ছক ভেঙেছেন বাবেবারে। গোবিন্দপুব-ভেলুযা-মংলাপোতা, ভগবানপুব-ঘাটাল-কলকাতা—অনাথবন্ধুর এই বিশ্বে—যাবতীয দেখতে দেখতে স্মৃতিতাড়িত সমযেব বিশাল অঞ্চলের মধ্যে থেকে ছেঁকে উঠে আসে রাজনৈতিক ঐতিহাসিক সামাজিক ধর্মীয

জীবনধাবা স্থান পায সোনাগাছি—যৌনতা ও মনস্তত্ত্বেব সাঙ্গীকবণ ঘটে অনাথ মনোরমা এপিসোডে, তিলোত্তমা কলকাতাব জীবনধারায। সময়ের অপেক্ষায 'কর্মকরম' উপন্যাসে থেকে 'ক্রমপাঠ' সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। 'খড়েব মানুষ' এবং 'দশক ও দুই' গল্পসংকলনে ছোটোগল্পেব দিনকাল ধবতে চেযেছেন অনিন্দ্য। আফসার আহমেদ কিংবা অনিল ঘড়াই গ্রামবাংলাকে চেনাতে চান স্বতন্ত্র কথাগ্রন্থনায, 'হন্যমান' আত্মকথায' জয়া মিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষজীবনকে শিল্পগুণান্বিত কবেন, সম্পূর্ণত স্বতন্ত্র সৈকত বক্ষিত 'আকবিক', 'হাড়িক', 'মাড়াইকল', 'জন্মভূমি বধ্যভূমি'-তে আঞ্চলিকতাব সীমানাডিঙানো জীবনবোধকে বিস্তারিত কবেন। সুদর্শন সেনশর্মাব 'ভালোবাসার ডালপালা', 'চিত্রকবেব ডান হাত', 'সুদর্শন সেনশর্মাব ছোটগল্প' এই সমযেব ভিন্নস্বাদ ও ভিন্নবোধেব সাহিত্যকৃতি। শবদিন্দু সাহাব 'মেঘজীবন', 'গুণাহর পটভূমি' গল্পসংকলন এবং 'অজ্ঞাতবাস', 'উজানিমঙ্গল' নযের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয আখ্যান। উজানিমঙ্গল সমাজবাস্তবতা ও শিল্পবাস্তবতাব সমীকরণে পবিবেশের গুরুত্বকে জীবন ও সংস্কৃতিব গুকত্বে অন্বিত কবা হযেছে। সাতটি বিন্যস্ত এ আখ্যানেব শকুনি অমঙ্গলেব প্রতীক নয়, ববং তাব লডাই সামাজিক শত্রুগুলিব বিরুদ্ধে, আক্কাস আলিব সহযোদ্ধা শকুনির লড়াই ভোম্বলদের ষোলো বিঘা আব ওলাইচন্ডীব দখল নেবাব বিরুদ্ধে। শবদিন্দু বিশ্বাস কবেন, যে শিল্পের ভূমি অববোহ চূর্ণ বিচূর্ণ হযে তাঁকে আলাদা কবতে চাইছে তাকে তুলে ধবা ছাডা তাঁব নিস্তার নেই। ফলে তিনি দুবহ শিল্পব্রতে কৃচ্ছ্রসাধনে সংকল্পবান।

শ্যামল ভট্টাচার্যেব 'বুখাবি' মাইনাস উনিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিযাসের জগতে যোদ্ধা সমাজের বযান অলোক মিত্রেব দৃষ্টিতে উপস্থাপিত। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব বিশ্বস্ততায ওই উপন্যাস হযে উঠেছে বিষযগত নিবিখে ব্যতিক্রমী। মুর্শিদ এ এম-এব 'ছন্নভূমি' সময়কে ধাবণ করেছে, বিশেষত 'সুখসাযর' পল্লীব বিবর্তনে জমি ব্যবসাযী প্রোমোটাবদেব নজব ও ভূমিকা যখন ধরা পড়ে। ববিশংকব বলেব 'স্বপ্নযুগ' একদল একলা মানুষেব আখ্যান। সত্তর দশকেব বসন্তেব বজ্রনির্ঘোষে যাবা যুক্ত ছিল, তাবা প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভাঙতে পাবেননি, নযেব দশকে এসে, সত্তব দশকে বুকেব ভেতবে পুযেও কোথাও যেন তাবা নিজেবাই বদলে গেছে। সমসময ও ইতিহাস নিযে প্রশ্নার্ত চরিত্রগুলি যন্ত্রণাকাতর, স্বপন সেনের মুখোশযোদ্ধাব অনির্বাণেব মতনই 'স্বপ্নযুগ'-এব অনিরুদ্ধ আত্মহত্যা কবে।

নব্বই দশকেবই কথাকার শাহযাদ ফিরদৌস ও সোহাবাব হোসেন অত্যন্ত শক্তিশালী কথাকার। শাহযাদের ব্যাস, আলতামাস, প্লেগ, মহাভার, পালট মুদ্রা—এই দশকেই লেখা। সবই নভেলেট। একে অতি উৎপাদনও বলা যায। কিন্তু প্রত্যেকটি উপন্যাস তাঁব স্বকীযতা, মিথেব নবনির্মাণ, মনুষ্যধর্মেব উচ্চাবণে বিশিষ্ট। 'আলতামাস'-এ ১৯৯২-এর কলকাতার দাঙ্গা বিষয হয়েছে। অদ্ভুত কথনভঙ্গিমা। প্রকবণশৈলী অভিনব। যেমন উপন্যাসেব সূত্রপাতে বলা হয়েছে 'দাঙ্গাদীর্ণ এবং দাঙ্গাবাজ হন্তাবক আব হননীয, লুব্ধজীবন আব অসহায মৃত্যু উভয়েব জন্যে এই হল সর্বশেষ প্রস্তুতির কাল'। সমালোচক বলবেন, এ

উপন্যাসে টাইম স্পেসেব ক্রনোটপে অতিনাটক আছে। কিন্তু এই যে দাঙ্গাব প্রেক্ষিতে দীপক ও আলতামাস পবস্পবকে হত্যা কবছে, কিন্তু আসলে দীপক ও আলতামাস একই মানুষ। বস্তুত সাত অধ্যাযেব শেষে গাজীব আহ্বান যেন এক অসম্ভব কঠিন ব্যাপ্ত এক শপথ—'তাহলে আলতু, আমাব আলতামাস তোমাব সাক্ষাতে অথবা অসাক্ষাতে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসাবে কাছে অথবা দূবে, শত্রু অথবা মিত্র যে কেউ উৎপীড়িত হোক তুমি তাব ভাই, তুমিই তাব বক্ষক।' দীপক ও আলতামাসেব মাঝখানে মেবী। এ বিষযে আমবা একমত হতে পাবি, অন্তত আখ্যানপাঠ শেষে, পবাবাস্তব-অধিবাস্তব অবলম্বন কবেও নব্বই দশকের বাস্তবে শিল্পবাস্তবেব চমকাব ব্যবহাব ঘটেছে।

সোহাবাব হোসেন ১৯৯৬-এ যখন 'একটি রূপকথাব বিববণ বা কেযামতের দববেশ হবাব কাহিনী' লেখেন তখনই লেখক হিসেবে তাঁব অনন্যতাব, তাঁব মৌলিকতাব ইঙ্গিত পাওযা গেছে। তাঁকে তাবাশঙ্কব ঘবাণাব ভাবলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই দূব অতীতেব ঘবাণাটি নযেব দশকের ঘবাণা হযে অভিনবত্ব সন্ধানী হযে উঠেছে। বাস্তবতাবাদী উপন্যাসেব সংগঠন ভেঙে দিলেও এই আখ্যান রূপকথা নয় অতীব জীবনকেন্দ্রিক ও সমাজভিত্তিক। কিন্নবেব মন্তব্যও মনে পড়বে, 'ইসলামী মৌলবাদ, মবিফতি ধাবা আব সবাব ওপব নুববুডি ও তাব কাব্যিক ফ্যানটাসি, এই উপন্যাসকে অন্যমাত্রা দিযেছে।' লাতিন আমেবিকাব জাদুবাস্তবেব পবিচর্যা বাংলা আখ্যান এখন নিয়মিত চলছে। কিন্তু সোহাবাবেব জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ভিন্ন একাব। আফসাব আহমেদকে এক সাক্ষাৎকাবে তিনি জানিযেছেন—'আমাব গল্প উপন্যাসে দেশীয রূপকথা-উপকথা-ইতিহাস-বৃত্তান্তধর্মী কাহিনী, কথকতাব রূপ, অলৌকিক অবাস্তবকে ব্যবহাব প্রবণতা বাবে বাবে এসেছে। দেশীয ধাঁধা প্রবচনকে আধুনিক জীবনেব নিবিখে ব্যব্যহাব করতে খুব ভালো লাগে। এ ব্যাপাবে বাংলাভাষায লেখকদের লেখাই আমাদেব তাবৎ রূপকথাব ভাণ্ডাব আমাব কাছে ঐতিহ্যেব মতো এসেছে। বিদেশী প্রভাব যদি থাকে সব পবোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয।'

গত শতাব্দীব শেষ তিনদশকে বাংলা উপন্যাস বাস্তববাদেব সীমা লঙ্ঘন ও অতিক্রমেব প্রচেষ্টাই প্রবীণ নবীন মধ্যবযসী নানা মাপেব লেখকেব তৎপবতা লক্ষণীয। শুধু নযেব দশকেই উঠে আসা লেখেকবা নন। কিন্তু পাঠকেব প্রশ্ন জেগেছিল যে আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক ডাযালগ, বাস্তব অতিক্রমেব সূচকচিহ্নিত পবিবেশনির্মাণ উপন্যাসে লক্ষ কবা যাচ্ছে। জাদুবাস্তবতার জগৎকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে, তাব ভেতবমহলেব সন্ধান চলেছে, ফ্যানটাসি মিথেব যথেচ্ছ ব্যবহাব চলছে—এক্ষেত্রেও এসবেবও সীমা কতদূব? যদি অন্তহীন হয, প্রশ্ন নেই। তবু সম্ভবনা থাকে পুনবাবৃত্তিব। তখন তো ক্লান্তিকর মনে হতেই পাবে। শিল্পব্যাপাব নিযে প্রশ্ন উঠতেই পাবে। এ আশঙ্কা মিথ্যা হোক, আমবা সকলেই চাইব। এই বযনরীতি উপন্যাসশৈলীব জটিলতা পাঠকের সঙ্গে সংযোগ কতদূব সক্ষম তাও প্রশ্নচিহ্নিত হলে প্রতিবাদেব কিছু নেই, ভাববাব আছে। এ ক্রাইসিস না থাকলে এ প্রশ্ন অর্থহীন হবে, তখন ভাববাব কারণ থাকবে না।

২০০৫-এ এইসব কথাকাব এখনো এই ধবনেব পরীক্ষানিবীক্ষায নিযোজিত। না, প্রত্যশিত ক্রাইসিসের ঘনীভূত রূপ দেখা যাচ্ছে না। শূন্য দশকে পৌঁছে যাঁবা এখনো আত্মআবিষ্কারে, শিল্প ব্যাপাবে, বাস্তবেব স্বরূপবৈচিত্র্যসন্ধানে সমাজ ও সময়কে গুরুত্ব দিযে লিখে চলেছেন তাঁদেব লিখন প্রক্রিযায, জীবনব্যাপাবে, সত্যসন্ধিৎসায নিত্যনতুন বিশিষ্টতা টেব পাওযা যাচ্ছে। এটা কম কথা নয। গত তিবিশ বছবে যাঁবা নিষ্ঠাব সঙ্গে লিখেছেন, এখনো ২০০৫-এও লিখছেন, সত্তবদশকের 'লেখকবাই নয, আশি নব্বই তথা শূন্য দশকেব লেখকদেব মনে বেখেই বলা যায, যা অন্যত্র অন্যসূত্রে, বর্তমান নিবন্ধকাব জানিয়েছিলেন, এঁদের একপাশে সবিযে বাখার, উপেক্ষা কবাব, গুরুত্ব না দেবাব অসুখে আক্রান্তদের জন্য আমাদেব উদ্বেগ নেই, করুণা আছে। আজকেব সময দাবি কবছে, এঁদেব বচিত সাহিত্য দাবি কবছে, নতুন শতকে এঁদেব নিযে আলোচনা হোক, মূল্যাযন হোক, ভালোমন্দ নির্ধারণ হোক, নির্ভযে বিতর্ক হোক। মিডিযা শাসিত সময়ে এঁদেব মাথা উঁচু কবে চলা নিযে গল্প বচনা নয, এঁদেব ছোটোগল্প উপন্যাস নিযে সমালোচনা হোক, দেখা যাবে, এঁদেব কাছ থেকে আমাদেব পাঠক হিসেবে প্রাপ্তিযোগ নিতান্ত সামান্য নয়। পুবনো সাহিত্যধাবণা ও ক্লান্তিকব সমালোচনাব বৃত্তে যাঁবা আবদ্ধ, তাঁবা আপাতত বিশ্রাম নিন। সাপ্তাহিক পাক্ষিকে যাঁদেব দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাঁবা চোখেব ঠুলিটি আপাতত ছুঁড়ে ফেলুন, দেখবেন পবে ঠুলিব প্রযোজন হচ্ছে না।

'রক্তকরবী' : পঞ্চাশ বছর

সন্ধ্যা দে

"আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমাব 'নন্দিনী'র পালা-অভিনয। প্রায কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হযেছে। ভয হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিযে দেবেন। তাবা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি কববার চেষ্টা কববে। এক ভবসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পাববে না।

আপনাবা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতব থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিযে বেব করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ কবলেই তার সার্থকতা চলে যায। তাকে বের করে তাব কার্যপ্রণালী তদাবক করতে গেলে কাজ বন্ধ হযে যাবে। দশ মুণ্ড-বিশ হাত-ওযালা বাবণের স্বর্ণলঙ্কায সামান্য একটা বন্য বানর লেজে কবে আগুন লাগায, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদেব এই সভায উপস্থিত কবতেন, তা হলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদেব চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলবব উঠত। সন্দেহ কবতেন, কোনো একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ কবা হচ্ছে। অথচ শতশত বছব ধবে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও বামাযণের প্রকাশ্য যে রস আছে তাই ভোগ কবে এলেন—গোপনে যে অর্থ আছে তাব ঝুঁটি ধবে টানাটানি করলেন না।

আমাব পালায একটি বাজা আছে। আধুনিক যুগে তাব একটাব বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদি কবির মতো ভবসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষেব হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমাব পালাব বাজা—সে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ কবেন, গ্রাস কবেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ...বাল্মীকিব রামাযণকে ভক্ত পাঠকেবা সত্যমূলক ব'লে স্বীকার কবেন। আমাব পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকেব উপবে প্রমাণেব ভাব দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে এটি সত্য।

...কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয সভ্যতাব মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রাযই আলাপ কবে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হবণেব কাজে মানুষকে টেনে নিযে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় কবে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত বাক্ষসেবই মতো।

.. নাবীব ভিতব দিযে বিচিত্র বসময প্রাণেব প্রবর্তনা যদি পুরুষেব উদ্যমেব মধ্যে সঞ্চারিত হবাব বাধা পায তা হলেই তাব সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রেব আঘাতে কেবলই পীড়া দেয, পীড়িত হয।

এই ভাবটা আমাব বক্তকববী নাটকেব মধ্যে প্রকাশ পেযেছে। যক্ষপুরে পুরুষেব প্রবল শক্তি মাটিব তলা থেকে সোনাব সম্পদ ছিন্ন কবে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহেব লুব্ধ চেষ্টাব

তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

এই কথাগুলি স্বয়ং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের 'নাট্যপরিচয়' ও 'পরিশিষ্ট' অংশে তুলে ধরেছেন।

১৯৫৪-র ১০মে বেলগুয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট-এ (বর্তমান · নেতাজী মঞ্চ) বহুরূপী - কৃত ও শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'রক্তকরবী'র প্রথম অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা মঞ্চে রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হল। বর্তমান নিবন্ধকার পৃথিবীতে আসার আগেই বহুরূপী সংস্থা 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেছে। আর যখন এই অধম পুরোপুরিভাবে ঘর-বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় থিয়েটার করতে চলে এল—তখন আর বহুরূপীর 'রক্তকরবী' অভিনীত হত না। বড়ই পরিতাপের যে, এমন একটি প্রযোজনা দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে হ'ল চিরদিন—চিরকাল।

না দেখলেও নাটক বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়ার সুবাদে এই প্রযোজনাটি সম্পর্কে কিছু কথা জানা বা শোনার ভাণ্ডারকে নিয়েই দু-এক কথা লিখতে বসেছি।

নান্দীকার গোষ্ঠীর মহড়াকক্ষে অনেকের মধ্যে সেদিন এককোণে আমিও বসে। নানা অভিনয়ের কথার ছলে উঠে এল 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গ। বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "'রক্তকরবী' দেখার পর ঠিক করে ফেললাম সারা জীবন নাটকটাই করব।"

সেদিন সে-কথার অর্থ বুঝিনি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে থিয়েটারের মধ্যে থাকতে থাকতে আজ বারেবারেই মনে হয় কতটা নাড়া দিয়েছিল তাঁর অন্তরকে—এই রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী' বহুরূপী-র 'রক্তকরবী'—যা এমন কথা বলায়।

রবীন্দ্রনাথের নাটককে ইউরোপীয় অথবা সংস্কৃত কোনো নাট্য ব্যাকরণের লক্ষণ দিয়েই মেলানো যায় না। কিন্তু সাধারণ থেকে প্রতীক, মাটি থেকে আকাশ, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম—যে প্রসারতা আমাদের দেশজ শিল্পচিন্তার ভেতরে আছে, তারই সেরা উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। এ নাটকে জনতা ও একক মানুষ আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যে চলমানতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বসায়ন ঘটেছে, সেই পরস্পর-বিরোধী শক্তির সংঘাতে ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে নাটকটির প্রাণকন্যা-নন্দিনী। এখানে নির্দেশক শম্ভু মিত্র যা করতে চেয়েছেন তা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দ্রানুগ প্রেরণায় নতুন সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের প্রচ্ছদে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত আলো আঁধারি যক্ষপুরীর যে বিমূর্ত আভাস দেখা যায়, শিল্পী খালেদ চৌধুরী সেই রহস্যময়তাকে অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে মঞ্চে তুলে ধরেন।

এই 'বক্তকবরী' প্রসঙ্গে ১৯৯৪-এর ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৮ অক্টোবর শ্রীখালেদ চৌধুরীর কাছে গিয়েছিলাম মঞ্চের কাজ সম্পর্কে কিছু জানতে। এই প্রতিবেদক-কে তিনি যে কথা জানান তার কিছু অংশ তুলে ধরছি,

". আমি দু-একটা নাটক দেখেছি যেমন সবাই দেখে কিন্তু বিশেষভাবে আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী হইনি। ১৯৫৩-৫৪-তে শম্ভু মিত্রই আমাকে এ কাজে আগ্রহী করে তুললেন। তিনি আমাকে বহুরূপী-র 'রক্তকরবী' নাটকে কাজ করার জন্য ডাকলেন কিন্তু তারও আগে আই পি টি এ-তে থাকাকালীন ১৯৪৯-এ জর্জদা (দেবব্রত বিশ্বাস) একবার 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'-র তত্ত্বাবধানে 'রক্তকরবী' করেছিলেন। আমি ও সূর্য রায় দুজনে মিলে সেট্ করেছিলাম। আমার তখন সেট্ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। আমাকে বলা হ'ল, 'করে দাও' আর আমিও করে দিলাম। একটা বিরাট মাকড়সার জালের মত, জাল ভাড়া পেয়েছিলাম সেটা নিয়ে এসে পেছনে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিছু মার্কিনের কাপড় ছিল, সেগুলো টাঙ্গিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে কিছুটা উঠিয়ে দিতে সে'টা হয়ে গেল দরজা আর সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকল। মাঝে মাঝে তার আড়াল থেকে রাজা কথা বলত। রাজা আর বেরোতো না। এটাকে ঠিক অভিজ্ঞতা বলে না। মনে হ'ল এই নাটকের খুব মঞ্চ সম্ভাবনা আছে। .মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে চিন্মোহন সেহানবীশের স্ত্রী উমা সেহানবীশ ও কাটু রোসের স্ত্রী পুষ্পময়ী বসুও ছিলেন। ঐ নাটকে দেবব্রত বিশ্বাস নিজে বিশুর চরিত্রে অভিনয় করেন, শম্ভু মিত্র রাজা, তৃপ্তি মিত্র চন্দ্রার ভূমিকায়, নন্দিনীর ভূমিকায় কণিকা মজুমদার, সর্দারের ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোঁসাই ছিলেন সজল রায়চৌধুরী। দেবব্রত বিশ্বাস নির্দেশনা দিয়েছিলেন, শম্ভু মিত্রে'রও সাহায্য নিয়েছিলেন।

... ব্যাপারটা কেমন হ'ল কি হ'ল তা নিয়ে আমার কোনো পরে মাথাব্যাথা ছিল না। কিন্তু 'রক্তকরবী' আবার নতুন করে শম্ভু মিত্র যখন করলেন, তার আগে ডেকে নাটকটা পড়তে বললেন, আমি পড়লাম। শম্ভু মিত্র বললেন, 'এটা কিছু করা যায়'? বললাম 'কেন করা যাবে না'। কাজ শুরু হল। প্রথম দিকে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। স্টেজের কোনটা ডানদিক, কোনটা বাঁদিক, কাকে উইংস বলে, কাকে ফ্রন্ট স্টেজ বলে, কাকে ব্যাক স্টেজ বলে—এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই আমার ছিল না। 'রক্তকরবী'র একটা মডেল করা হল। ইনভিটেশন কার্ড কেটে কুটে একটা স্পেস্ ডিভিশন করা হল। ঠিক হল এখানে রাজার ঘর থাকবে, ওখানে সর্দার চত্বর থাকবে। এ ভাবে করার পর একটা ছবি আঁকলাম এবং ডিজাইনটাকে বদলাতে বদলাতে একেবারে লেটেস্ট ডিজাইনটা ঠিক হল। এ ব্যাপারটা আমি একা করতে পারতাম না যদি সিতাংশু মুখার্জী না থাকত। প্রথম শো-এর পরে আমার মনে হল সোজা দরজাটা খুলে না গিয়ে যদি উপর থেকে হাঁ করা মত হয় অর্থাৎ অর্ধেক ওপরের দিকে থাকবে, অর্ধেক নিচের দিকে থাকবে, আর ভেতরে দেখা যাবে রঞ্জন মরে পড়ে আছে। প্রথম ছবিটা করেছিলাম গগন ঠাকুরের 'রক্তকরবী'-র প্রচ্ছদ থেকে প্রায় অনুকরণ করে। দ্বিতীয়বার সেটা করিনি। 'রক্তকরবী'-র ডায়লগ-এর মধ্যে যা আছে ঐটাকে ঠিক ধারায় পেইন্টিং করলাম। দুটো একেবারেই আলাদা।"

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিকতা প্রথমেই জোরালো আবেদন সৃষ্টি করে মঞ্চ-সজ্জার

পাশাপাশি প্রযোগ শিল্পী তাপস সেনেব আলোক-সঞ্চাবে। বাস্তব ও কল্পনাব মাঝখানে যে অতিদৃশ্য বিভাজন রেখাটি থাকে, নাটকটিব পবিচালক উপস্থাপনাব গুণে সেই সীমাবদ্ধতা ভেঙে চুবমাব কবে দেন। ফলে, এ নাটকে তাত্ত্বিকেবা কেউ কেউ সমাজ বাস্তবতাব অভিজ্ঞান বলে চিহ্নিত কবেছেন, কেউ বা এব মধ্যে চূড়ান্ত পরাবাস্তব সম্ভাবনা খুঁজেছেন। নাটকটিব প্রযোগেব ক্ষেত্রে বহুরূপী-ব কৃতিত্ব এই যে 'বক্তকববী' প্রযোজনা একই সঙ্গে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শকদেব চৈতন্যকে আলোড়িত কবেছে।

নাটকেব মুক্তিকপা-চরিত্র নন্দিনী-ব যে বিকাশ ববীন্দ্রনাথ 'চাবিদিকেব পীডনেব ভিতব দিযে' ফুটিযে তুলতে চেযেছেন, তৃপ্তি মিত্রেব অভিনয সেই চবিতার্থতা ছুঁযে দেয।

বর্তমান প্রতিবেদকেব সুযোগ ঘটেছিল তৃপ্তি মিত্রেব এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকাব গ্রহণেব। 'নন্দিনী' তৃপ্তি মিত্র তখন খুবই অসুস্থ, তবুও তাবই ফাঁকে ফাঁকে ১৯৮৬-ব ১১ মার্চ, ১৯ জুন, ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৭-ব ৫ জানুযাবি, ২৬ জুলাই—এই এতদিন ধবে বহু কথা হয। আমি বলতে পাবি এটাই তাঁব দীর্ঘ শেষ সাক্ষাৎকাব। সেই 'নন্দিনী' তৃপ্তি মিত্রেব কথায,

" 'বক্তকববী' যেদিন আমি শেষ দিন কবি সেদিনও আমাব মনে হযেছিল, আবও কিছু কবা যেত। আমি যেন ভাল কবে কবতে পাবিনি, এটাই মনে হযেছিল। শুনলে হযত লোকে বলবে এটা আবাব বেশি বেশি। কিন্তু এটা আমি সত্যি কথাই বলছি। আমি বলছি তোমাকে, কবতে গিয়ে যে একটা আবেগ আমি অনুভব কবেছিলাম, এবং প্রথম সেদিন নাটকটা পডি তখন আমাব কববাব কথা ছিল না। কিন্তু পরে যখন কবতে হয তখন দেখেছি যে আমি বোধহয ঠিক পাবলাম না, আমাবটা বোধহয ঠিক হলো না। কী কবলে ঠিক হয, কেমনভাবে কবলে ঠিক হয—সেটা সব সময়ই আমাব মনে হতো। অনেকে বলেওছে যে নন্দিনীকে পাওযা যায়নি, ঠিক হযনি—এবকম। শেষ যেদিন 'বক্তকববী' হলো সেদিন আমি জানি না যে, আজকেই শেষ অভিনয। পবে জানলাম উনি (শম্ভুবাবু) আব এটা কববেন না।"

কত বডো মাপেব অভিনেত্রী তিনি, যাঁব এত বিনয দেখলে শ্রদ্ধায মাথা আপনিই অবনত হয। এমনভাবে কথা কজনা বলতে পাবে? জানা নেই, তবে 'বক্তকববী'-ব 'নন্দিনী' সে কথা বলে, বলে তৃপ্তি মিত্র।

আব স্বযং নিদেশক শ্রীশম্ভু মিত্র বলেন, "পঞ্চাশের দশকে যখন আমবা বক্তকববী তৈবি করা শুরু কবি তখনও কিন্তু আমরা যথেষ্ট কবে বুঝিনি এ নাটক। একবকম কবে নিশ্চয বুঝেছিলুম, তাই আব উপস্থাপনায দর্শকবা অত খুশি হযেছিলেন। কিন্তু আবও যে কিছু বুঝতে বাকি ছিল সেটা বুঝেছিলুম আবও কিছুকাল পবে।"

বিশু, কিশোব, অধ্যাপক, গোসাঁই ও সর্দাবেব ভূমিকায শোভেন মজুমদাব, পবেশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, কুমাব বায ও অমব-গাঙ্গুলীব অভিনয রাবীন্দ্রিক ভাবনাকে মূর্ত কবে তোলে। বলাবাহুল্য, গোটা ববীন্দ্র সাহিত্যে সবচেযে জটিল 'বাজা' চবিত্রটিকে শম্ভু মিত্র এমন এক পর্যাযে পৌঁছে দেন যা একই সঙ্গে মেধা ও আবেগেব সেবা সমন্বয বলে পবিগণিত হতে পাবে।

বিশিষ্ট প্রবন্ধকাব ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদাব এই প্রযোজনাকে সাধুবাদ জানিযে বলেছেন,

"শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রেব অসামান্য কৃতিত্ব তাঁর দুঃসাহসেব ফলেই আযত্ত হয়েছে। তিনি সমস্ত 'বক্তকরবী'কে জীবন্তকালের জীবন্ত সমস্যা রূপেই উপস্থিত কবেছেন, নাটকেব দিক থেকে যতটুকু রহস্য-স্তিমিত আবেষ্টন বয়েছে তাকে তিনি আভাসিত কবেছেন মঞ্চ ও দৃশ্য পবিকল্পনায ও পবিবেশ রচনায. (নতুন সাহিত্য, পঞ্চম বর্ষ শ্রাবণ, ১৩৬১)।"

প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীহিবণকুমার সান্যাল 'বক্তকববী' নাটকের প্রযোজনার বিরুদ্ধবাদীদেব তীব্র বিদ্রূপ কবে লেখেন,

"বহুরূপীর যদি কোন অপবাধ ঘটে থাকে তা এই যে বক্তকববীর মধ্যে বাস্তবের যে মর্মস্পর্শী ছবি ফুটে উঠেছে তাকে মর্মস্পর্শী ভাবেই আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলা (পরিচয়, ২৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬১)।"

বাংলা মঞ্চেব আব এক প্রধান ব্যক্তিত্ব নাট্যকাব, নির্দেশক ও অভিনেতা শ্রীউৎপল দত্ত তো সবাসরি লিখলেন,

"আসলে শম্ভুবাবুব সূক্ষ্ম রসবোধ এবং প্রযোগ-কৌশলেব অভিনবত্ব এমন এক নাটক সৃষ্টি করেছে যা বাংলা বঙ্গমঞ্চেব প্রকৃত ঐতিহ্যকে ধবে তাকে বেশ কযেক ধাপ এগিযে নিযেছে। বিগত পঁচিশ বছরে বাংলা দেশে কোনো নাটক এ কবতে পেবেছে বলে জানা নেই (পাদপ্রদীপ, আশ্বিন, ১৩৬৩)।"

সেকালের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রই 'রক্তকরবী' প্রযোজনার প্রভূত প্রশংসা করে। কলকাতা তো বটেই মুম্বাই, দিল্লি, লখ্‌নৌ থেকে শুরু করে তদানীন্তন পূর্ববাংলার ঢাকা থেকে প্রকাশিত সমস্ত বিশিষ্ট পত্রপত্রিকা নাটকটির পবিচালনা, অভিনয, মঞ্চসজ্জা ও আলোক ক্ষেপণেব অভিনবত্বকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাতে কার্পণ্য করেনি।

এককথায বলা যায, বহুরূপী-প্রযোজিত 'বক্তকববী' সমস্ত প্রথাবদ্ধতা ও গতানুগতিকতাকে ভেঙে দিযে রবীন্দ্র-নাট্য নিযে সৃজনশীল নিবীক্ষাব অমিত সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয।

'রক্তকববী' অভিনযেব সংক্ষিপ্ত খতিয়ান

১ ১৯৪৯—মহিলা আত্মবক্ষা সমিতি-ব তত্ত্বাবধানে 'বক্তকববী'-ব অভিনয শ্রীবঙ্গম মঞ্চে, পববর্তী সময়ে যাব নাম—বিশ্বরূপা। নাটকটিব নির্দেশক—দেবব্রত বিশ্বাস।

২ ১৯৫৪-ব ১০মে বহুরূপী প্রযোজিত বক্তকববী-ব অভিনয বেলওযে ম্যানসন ইনিস্টিটিউট মঞ্চে। বর্তমান নেতাজী মঞ্চ। নির্দেশক—শম্ভু মিত্র।

৩ ১৯৭৪-এব ১০ আগস্ট প্রান্তিক/বহবমপুব প্রযোজিত বক্তকববী-ব অভিনয় বিমল হল/বহরমপুব। নির্দেশক—অঞ্জন বিশ্বাস।

৪ ১৯৮৪-ব ১ জানুযাবি আবদ্ধ নাট্য বিদ্যালয প্রযোজিত বক্তকববী-ব অভিনয থিযেটাব সেন্টাব মঞ্চ। নির্দেশক—তৃপ্তি মিত্র।

৫ পথসেনা (অঙ্গন মঞ্চ)—প্রথম অভিনয ১৩ অক্টোবব ১৯৯৬, নির্দেশনা—পথসেনা।

৬ নটধা—প্রথম অভিনয ৩১ জুলাই ২০০৪ হাওডা শবৎ সদন, নির্দেশনা—শিব মুখোপাধ্যায।

৭ ব্লাইন্ড অপেবা—প্রথম অভিনয ২০০৫, নির্দেশনা—শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায।

আকাশটা যদি ছিঁড়ে যায়

বাম বসু

সমস্ত আকাশ নিঃস্ব, তাবাহীন, ভিক্ষুক
সেই আকাশটা যদি ছিঁড়ে পড়ে
আমি আর কোথাও থাকব না।

কোথায় যাবো?
তা তো জানা নেই, জিজ্ঞাসাও কবি নি
আমাকে কেউ বলেও দেয নি।

আমাব ঘরে যে তাবাগুলো প্রাণভবে খেলা করছিল
এখন ভোবেব গন্ধ পেযে বেশ মনমরা তারা
নিজেব ঘরেব দিকে যাই-যাই করছে।

কিন্তু কোথায তাদেব ঘর?
সে ছাই তো তাবাই জানে না।

সত্যি, কেউ কি কখনো জানতে পাবে
তাব ঘব কোথায়?

আদপে আমাদেব ঘবেব কোনো বালাই নেই
হৃদযটা চেপে ধবে আমবা কেবল হাঁটছি
মাঠেব পর মাঠ, বিলেব পব বিল
হাঁটছি অন্ধকাবে অথবা মবা আলোব আর্তনাদে
আব ভাবছি, আকাশটা যদি ছিঁড়ে পড়ে
আমবা কেউ আব থাকব না।

কোথায যাবো আমরা?

তা-ও অজানা

ভেবে কী লাভ? তাব চেয়ে হাঁট
আকাশটা যদি ছিঁড়ে পড়ে জোনাকিব মতো তারা হযে যা।

ফেরা

মৃগাঙ্ক বায়

বাডন্ত ছাযাব মাথায মাথায কাক
ডেকে ডেকে ওড়ে, কুকুবেব নখব বাজে
ধূমল গলিতে, পাতাল
স্রোতস্বনিত প্রভূত পাতালে পিছলে পড়ে যায সূর্য।
তাবপব অন্ধকাব হয়, হাওযা এসে
পথে ঘাটে শুকনো পাতা নাড়ে,
আলো জ্বলে বহুদূব বহুতল বাড়িব চূড়ায
চোখ মেলে চায গাঢ অন্ধকাব।
ঘবে ফেবে মানুষেব আঘাতেব মুখ
ফেবে কোলাহল। অহংকাব। বাসনাব জ্বব।
মানুষ ফেবে না।

পঁচাত্তরে পা

যুগান্তর চক্রবর্তী

১
আমাব চেযে বছব দুযেক বড
আমাব যখন প্রথম পবিচয
তখন আমি চোদ্দ কি পনবো
সবটা বোঝাব বযস সেদিন নয

আমি তখন ধূসব মফস্বলে
কলকাতায লেখা পাঠাই ডাকে
মন্দ নাকি লিখি না, লোকে বলে
এদিক-ওদিক ছাপাও হতে থাকে

শেযমেশ তো কলকাতায এলাম
চিনছি তাঁদের যাঁদেব লেখা পড়ি
পবিচযেব পাতায চেনা নাম
আমি তখন এম এ-ব ক্লাশ কবি

সুভাষদা-কে চেনাব উত্তেজনা
সহজে সে তো ভোলাব ব্যাপাব নয
একসঙ্গে হাঁটছি কযেকজনা
হাঁটাব সঙ্গে কথার বিনিময

কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা
সঙ্গে চলে সুভাষদা-ব কথা
কোনোদিন কি শেষ হবে এই চলা
কথাব সঙ্গে ছডানো নীববতা

আবও সে কত সুহৃৎ, আপনজন
স্বনামধন্য নন সকলে তাব
আছেন কবি লেখক বিদ্বজন
পবিচযেব যৌথ পবিবাব

পবিচযেব শুরুব ইতিকথা
সেসব যেন ঘটেছে গতকাল
সুধীন্দ্রনাথ—কবি, প্রতিষ্ঠাতা
পাশেই ছিলেন হিবণ সান্যাল

এবং ছিলেন নীবেন্দ্রনাথ বায
এলেন ক্রমে শ্যামলকৃষ্ণ, আব
'আড্ডা' নিযে লেখাব নিলেন দায—
বাড়ছে ক্রমে ইতিহাসেব ভার

ইতিহাসেব কথাই উঠলো যদি
সভ্যতাব পতনে-উত্থানে
যে-ইতিহাস খুঁজছে নিববধি
দ্বন্দ্বময বেঁচে-থাকাব মানে

সূচনা থেকে কযেক দশক ধবে
পবিচযেব প্রতিটি সংখ্যায
সে-ইতিহাস মুদ্রিত অক্ষবে
প্রত্নলিপিব মতন পডা যায

এ-দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওযাও দায
বাংলা সাময়িকেব ইতিহাসে
জীবনবোধের সংকটে-সংজ্ঞায
পরিচয তো ইতিহাসের পাশে

২
আমাব লেখা ছাপলো পবিচয
যতই আমাব শুকব দেবি হোক
শেষ করতে ততটা দেবি নয
তখনও আমি পবিচয়েব লোক

ছিলেন যখন গোপাল হালদাব
সবাব তিনি নিছক গোপালদা
যেদিন দিলেন গদ্যলেখাব ভার
সেদিন আমার মাটিতে নেই পা

তিন দশকেব অধিক নীববতাব
পরেও যখন হঠাৎ শুক লেখা
গত পুজোয একটি গুচ্ছ তাব
পবিচযেব পাতায় দিল দেখা

আমাব কালেব সম্পাদক য়াবা
দীপেন তরুণ দেবেশ অমিতাভ
প্রবহমান ইতিহাসের ধাবা—
কেউ কাবো চে' কম যায কি ভাবো

মনে পডছে, কত কি পড়ে মনে
ভুলে যাবাব কথাও সেসব নয়
আমবা আছি ব্যস্ত জনে-জনে
পঁচাত্তবে পা দিল পবিচয়

এই শতক কি পবিচযেব হবে?
শতবর্ষ হবে উদ্‌যাপিত?

আমরা কি আব থাকবো সে-উৎসবে!
পঁচাত্তবেই আমরা উচ্ছ্বসিত

পবিচযেব পঁচাত্তরে পা
আমারও আর ভয করছে না, না

পদ্মাবতী

তরুণ সান্যাল

কী মুশকিল এসে পড়েছেন
এখন কী করে লজ্জা ঢাকি
ওদিকে লুঙ্গিতে যত শক্ত গিঁটই দিই
মনে পড়ছে অন্তর্বাস নেই
তার উপব বহিবঙ্গে উর্ধাঙ্গে কিচ্ছুটি নেই
ববিবাব তো সব ধুযে দিয়েছি

কোথায বসাই ওঁকে একটিই তো চারপাই
সামনে তার দোমড়ানো মোচডানো মোড়া
ওতেই বসে শক্ত বই খাতায় কাগজ বেখে
তক্তাপোষ-টেবিলে পদ্য লেখা

বলছিলেন চমৎকাব চমৎকাব
জানলার ওপারে কুলি লাইনেব পানাপুকুবে বেগনি ফুল
চমৎকাব
দবজাব কাঠভাঙা পাল্লা ভাঙতে ভাঙতে নদী-ভাঙনে
টিকে থাকা ভিটেটি
চমৎকাব
আমি দেখছি কপালে বেহুঁস চুল উড়ে পড়েছে
বেতাল সিলিং পাখা কর্কশ আওযাজে ঘুবছে
ওকেই বুঝি অলক না কেশদাম বলে
বা চূর্ণি উড়াল হলে হাল্কা উঠছে পডছে দু-সুনামি

স্যাঁতা দেওযালে ঠেস দিযে বসে বললেন
কবিমশাই এমন চুপচাপ এমনি ভয়
চা বলবেন না নাকি

কি বলবো চায়ের দাগে চটচটে সস্তাব কাপে
নিচে রাস্তাব ঠেক থেকে
হাফপ্যান্ট খোকাটি দেয়
যা দিনে দু-তিন বার
তাবও হিসেব বাকি

তা তিনি বসলেন চা খেলেন
এ বই ও বই ওলটালেন
পদ্যটদ্যও শুনলেন
বললেন কালিদাসও ক্ষৌমধুতি উত্তবীযে
কবিতা পড়তেন বাজসভায়
কবিকে কি তৈজস মানায
তৈজস তো এর তাব বানানো
সেই বানানোব বিশ্বে কবি নাকি স্বস্তি পায?
সে তো স্বতঃস্ফূর্ত ভোর বাত্রি ও নক্ষত্র
হঠাৎ ঢেউ ছলাৎ নদী

আমিও তো কালিদাস ডালে বসে সে ডালই কাটছিলাম

উনি তখনো বলছিলেন
সেই তো ঠিক ভারতীয়
শোনেন নি বনবাসী জয়দেবের কথা
পদ্মাবতী নিজে যাকে দোকা করেছিলেন

ভযে না উল্লাসে রক্ত নেচে উঠলো

উনি বলে গেলেন আসবো ফের
আমি সেই দুটি পা ঘেবা উদাব পল্লব দেখি
কবে ওখানে মাথা রাখবো আমাব

আমার এমন ঘর
এমন বসত
তবু এসেছিলেন পা পড়েছে মেঝেয
দেখছিলাম উড়াল লাল চূর্ণি বাঙা শালোযাব
আজও তাঁরই অপেক্ষায আছি।

স্মরণবিরহ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যেন 'এক্ষুনি আসছি' বলে দূরে চলে গেছে।
শুনে নিজস্ব টবের ফুলগুলি নিঃশ্বাস ফেলেছে,
মানুষ গাছেব খুব কাছে তখনো তো তেমন যায় না
যাতে সে বুঝতে পাবে বৃক্ষেরও দুঃখ সুখ আছে।
ওই নারী সমস্ত সবুজ টেব পেতো, সাধারণ মানুষ যা পায না,
তাই দীর্ঘ তিরিশ বছব আমাকে ও টবেব ফুলগুলি একই সঙ্গে লালন করছে,
একমাত্র গাছই তাকে যথাযথ বোঝে,
তাঁর অসহ অসুখ হলে
ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে যেতো, ভাল থাকলে
অলিন্দ উঠতো ভরে ফুল্ল ফুলে ফুলে।
মানুষের আগে গাছ আনন্দ বিষাদ টেব পায
ক্ষুদ্র পিপীলিকা বিশাল ঝড়েব আগমনী আগে বুঝে যায।
এ-সব তো জানিই আমরা, তবু ওই সজীব সংকেতগুলি
লক্ষ্য করে দেখি না তেমন। তোমাব দুচোখ
প্রকৃতি-মানুষ যোগাযোগ শুষে নিয়েছে কেবলিই,
—যেমন আমার স্থাবব দুঃখ, পরাজয়, অন্যায ক্রোধ ও চিৎকাব—সবই
নিজের শবীবে তুলে নিয়ে নীল হযেছিলে—আকাশও
অনেক উদ্‌বৃত্ত নীল পাঠিযেছে তোমাকে।
আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর বুঝিনি কিছুই
যখন বুঝলাম! তখন অনেক দেবি হযে গেছে
টবের ফুলগুলিও ফুল-দেখানো বন্ধ কবেছে,
আমি শুধু অসহায বসে দেখেছি তোমার ক্রমশ চলে যাওয়া।
এই যাওয়া আষাঢ়ের সানু মেঘও দেখেছে!

আজ চাবিদিকে এত হাওয়া
তবু পাবছি না বিশ্বাস নিঃশ্বাসে নিতে,
আমার হলো না আব তোমাব প্রকৃত কাছে যাওযা।

২

যে যাবেই তাকে আর হাত তুলে থামাতে চেয়ো না।
কি যন্ত্রণায় যে কেটেছে তাব কষ্টেব শেষ-কটা বছব।
তবু সে হেসেছে, যাতে ওই যন্ত্রণায আমরা না কাঁদি,
শুধু হাত তুলে বাধা দিযেছিল নিজ হাতে লাগানো সব সন্তান গাছ, এমন জর্জব
কষ্ট দেখে শেষ দিকে টবে ফুলও ফুটতো না,
যে কোকিল বৈতালিক, বসন্ত জানিযে যেতো—সে পাখিকে বলি
দেখছো না জানলাব পাশেব বিছানা আজ ধু ধু সাদা, খালি!

আমি তাকে থামাতে চেযেছিলাম, শুধু প্রতিবাদী হযে
হাত তুলে নয, আমাব সমস্ত বকেযা নিশ্বাস দিযে
সত্যিই থামানো যেতো যদি!
আমি নিজেকে টুকবো কবে চাবদিকে ছড়িযে
বলতাম যাও দেখি কোথায কেমন যেতে পাবো?
যেতে হলে আমাকে মাড়িযে যেতে হবে,
তবুও তো পরমাযু বাঁচলো না!
যখনি দবকাব ছিল এক ফোঁটা আলো, তখনি কিভাবে
নেমে এলো ঘনান্ধকাব, সত্যি যদি স্মরণবিবহ লিখে
তোমাকে থামাতে পাবতাম!

৩

চলে যাওযাব আগে ব্যক্তিগত করে গিযেছো আমাকে
সময আমার মুখে মুখোশের মতো ছিল বহুদিন
এতোদিন দর্পণে যে মুখ দেখে ভেবেছি বিকেলে—দিন
তাহলে ভালই কাটলো আজকে!
সার্থকতা মাখা সব আহ্লাদগুলি ফর্সা হযে মুখে লেগে
বললো তা হলে ভোব থেকে
যা যা চেযেছিলে সবই পেযে গেলে।
তখনি হঠাৎ মুখেব পাশে—একি।
আরো এক মৃত্যু-মুখ জেগে উঠতে দেখি
সেই মুখই কি স্মবণবিরহ। যেন তুমি ঘন হলে
শুধু আমাকে শোনানো স্ববে বলে উঠলে

স্বচ্ছলতাগুলি সব চঞ্চল মুখোশ
ওগুলি কিছুই নয়, শুধু অপেক্ষারত এক ফুঁঃ সঠিক সময় এলে
এরা ঝরে যাবে, হবে মুখোশের করুণ আপশোষ!
এই বলে আমাকে ছিঁড়লে তুমি, দুর্বল তুলোব মতো ওডালে বাতাসে
যা যা উড়ে যা দূরে যা বলতে বলতে তুমি
আমাকে নির্বাস কবে জাগালে দ্বিতীয়-জন্ম নিবিড় গভীব ভালবেসে!
তাবপর আয়না ছেড়ে পুনর্বার ছায়ায় পালালে নিরুদ্দেশে!

৪

যখনি লিখতে চেযেছি প্রেমেব কবিতা, তুমি থামিয়ে দিয়েছো! খুব কাছে
এসে বলেছো 'শুধুই নাবীব বর্ণনা নিযে কি প্রেম হয?
বৈষ্ণব পদাবলীতেও হযেছে। সেখানে তো
নক্ষত্র-তক্ষণময ঘনান্ধকাব ছিল, তমাল বৃক্ষটি ছিল!
প্রেমের কবিতা শুধু মাংসেব খঞ্জনা নয়
যোনি স্তনে দেশ ছেযে গেছে।
আমিও কি ওই সবে আছি? তুমি তো আমাকে যতটুকু পাওযা যায আমূল পেয়েছো
ওই পাওযায় যে উঁচু নিচু মানচিত্র চিনেছো
তাকে শৈল উচ্চতায় নিযেও বলেছো আকাশ ও বরফেব পবিণয় চাই!
সমুদ্রেব ফেনিল মুদ্রাকে বলেছো এসো বিবাহ জাগাই।
আজ কেন বাববার শব্দ ফেলে উঠে আসছো অসুখের কাছে,
আমাব সময় আব নেই, আমাব যাবাব শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে
যে শব্দ কাঁদাতে পাবতো, সে এখন নিজেই কাঁদছে,
আমি তো জানিই তুমি কবিতাব বহুগুণ বেশি মহান নীরবে
ভালবাসতে আমাকে!
আজ এই জীবনখেলার শেষে কেন তাকে লিখেই জানাবে!'

গোলা ফাটার মুহূর্তে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কোমরবন্ধ থেকে যে একবাব বেরিয়ে গিয়েছে
রক্ত না দেখে তার ফেরা বাবণ।
আজ আর করুণা নেই, মমতার আলোড়ন নেই,
'মা হিংসি' শব্দদুটির বুকেব ওপব দাঁড়িয়ে
সে তুলে ধবেছে তর্জনির মত ছুঁচলো তববাবি,
বক্ত না দেখে যার ফেরা বাবণ।

বহুকাল
তুষের আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে
গোলা ফাটাব ঠিক আগের মুহূর্তে
এসে দাঁড়িযেছে সে।
আর একটু পরেই গল গল উগবে দেবে
বিষ, ঘৃণা, হনন,
বামিযানের বুদ্ধমূর্তি টুকরো টুকরো হযে
ছড়িয়ে আছে তার চাবপাশে,
সূর্যভস্ম, হিরোশিমা, মাইলাই,
বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া
ইরাকেব হাজাব হাজার নবজাতকেব অন্তিম আর্তনাদ
সবকিছু মিলেমিশে একাকার-শরীবে
সে আজ তুলে ধরেছে তর্জনির মত তরবারি
বক্ত না দেখে যার ফেরা বারণ।

বিস্মৃতির আড়ালে

শ্যামসুন্দর দে

চৈত্র অবসানে
বসন্ত দিনেব শেষে
কখন শেষ হলো
ফুল-ফোটা বেলা

কে আব হিসেব বাখে!
রিক্ততার কাল
এত দ্রুত নিযে আসে পরোয়ানা
সমাপ্তিব গান গেযে!
ঝরাপাতা উড়ে যায়
ঝড়ের প্রবল বেগে
গ্রীষ্মেব প্রচণ্ড দাব-দাহে।
ঝরা দিন সরে যায়
ভেসে যায় নিরুদ্দেশে
যেমন হাবায ঝরাপাতা।
হাবায কি সব কিছু
কালেব আঁধারে
কিছু তারা জেগে থাকে
বিরাট আকাশ জুড়ে
দূবান্তে আলোক বিকিরণে
স্বপ্ন জেগে থাকে চোখে
স্মৃতির অঞ্জনে
কখনো কোনদিন মননের ছবিতে
কখনো জলেব রেখা চোখেব পাতায
কখনো বা দমকা বাতাসে
নাড়া দেয মনের বন্ধ দুয়ার।
তখন কি খুলে যায ঘরেব জানালা
আসে কি বিবাগী বাতাসে বাতাসে
স্মৃতির সঞ্চয়।
মনে কি পড়ে এখনো
বৈভব আব নিরাপত্তা আড়ালে
বকুল ঝবা কলেজ স্ট্রিটের সরণি
ধুলোয় ধুলোয় স্বপ্ন মাখা
দিন বদলের কাব্য .
বক্তে রক্তে আলোড়ন!
ঝরাপাতা ঝরে যায়
বসন্ত শেষের গান ঢেকে দেয
গ্রীষ্মেব উন্মাদ ঝড়ে
তারপরে সিক্ত করে নিসর্গকে

বর্ষণের ধারাজল
মেঘে মেঘে বিদ্যুতেব ঝলকানি
গভীব নিনাদ
তখনো জানলা বন্ধ
আসুক না ঝড়েব ইশারা
শীকবেব স্নানে
চৈত্র শেষেব ঝবা পাতায
স্বপ্নের বাসনা কৃষ্ণচূড়া ফুলে ফুলে
আকাশকে কাছে ডাকে
লালে লাল ফুলে ফুলে।

কথনীয়

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

জলের উপবে কথা বলি

অঙ্গিরাব অঙ্গচ্যুত জ্যোতি
আগুনকে ঠেলে দেয় বনে
সেই দীপ্তি অগ্নি হন্তাবক
ব্যস্ত থাকে ক্ষুধা ও খননে,

নবান্ন ধ্বংসেব ইতিহাসে
ন্যায্য দামে পুড়ে যায ঘাস
কেটে ফেলে বাঁ হাতের শিরা
প্রেমিকাকে পরাই তিযাস,

স্থলপদ্ম শুকোবার আগে
জ্বরে ভুগে মবে যায় চাঁদ
জ্বরেব ভিতবে কেঁদে ওঠে
স্মৃতিভ্রট ঝিঁঝির প্রবাদ,

গোধূলির চোখ খুবলে নিযে
জ্বাল দিযে সূর্যাস্তের সোনা
চন্দ্রমাংস টেবিলে সাজিয়ে

কানারাত ডেকে আনবো না,
জলের উপরে কথা বলি

প্রলযেব সঙ্গে কথা বলি.

১২. ৮ ২০০৫

সরল বাক্য

শিবশম্ভু পাল

ক্ষমা কবে দিযো, সূর্যোদযেব আগে
'যেহেতু' লিখতে শেখেনি 'তবুও' অব্যয
ক্ষমা করে দিযো যদি তাব ভোব সেই
ফিবে আসে রাতে, রাত থেকে বাতে—
ভোব থেকে ভোবে নয়।
তাহলে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে
অরূপে-স্বরূপে বাত্রিই ঘুবে বেরিযেছে স্বচ্ছন্দে।

রাতেব বচনা সবল বাক্যে লেখা
একটাই তাব সমাপিকা ক্রিযা, অর্থ স্বযংপূর্ণ .
'ঘুমিযে পড়ল'—বাস্তা হারিযে ঘুমিয়ে পড়ল, কিংবা
'পাযেব তলার মাটিব ভাঁড়টি চূর্ণ।'
মাঝে মাঝে বাত মুখ পালটায
তেঁতুলতলাব মাঠে
গোপনে সূর্য কখন গেল যে পাটে!

জ্বলে ওঠে আলো বেশ জমকালো
মঞ্চের লাল-নীলে
চমকে-চমকে কেঁপে যায মবীচিকা
হেলেদুলে গায় মিস জোজো, লতা-কিশোর দু-নম্বরি
ক্ষমা কবে দিযো ভুল পারিজাতে যদি খোঁজে মল্লিকা।
পুনশ্চহীন প্রাযোবেশন তাব,
সূর্যোদযের প্রাক্‌কালে নেই 'তবুও'-ব ব্যবহার।

সাফল্যের পরিমাপ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সাফল্যের পরিমাপ করা আজ দারুণ কঠিন মনে হয়।
ব্যাঙ্কে ও লকারে অর্থ, সোনাদানা
কে কত সঞ্চয
করেছে, জানার ইচ্ছে উবে গেছে আমাদের,
জেনে লাভ নেই।
ওই সুরক্ষিত দুর্গে হানা দেব
এই অভিসন্ধি থেকে দূরে
অনেকেই আজ।

উপমা উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ, রূপকের সূক্ষ্ম কারুকাজ
ছেড়েছে কবিতা। চাই আত্মার সহজ উন্মোচন।

মানুষের বাঁচা আজ সম্পূর্ণ সঠিক অর্থে যুদ্ধ এক
জীবন মবণ।
দেশ ও মাটির গন্ধ মুছে কিছু প্রযুক্তির দক্ষ কারিগর
হতে যুবকেবা ভিন্ দেশে দিচ্ছে পাড়ি
অর্থই ঈশ্বর—জেনে।
কি যে তাবপব!

রাতের নগরী ফুঁড়ে উঠে আসে অন্য এক অচেনা নগর;
পরিচিত গলিপথ, রাজপথে হ্যালোজেন আলোও পারে না
জমে ওঠা অন্ধকার ঈষৎ তরল করে দিতে।
ওৎ পেতে আছে, থাবা তুলে আছে কারা
ভেঙে নৈঃশব্দ্য, কোথায়
দুপদাপ ছুটে যায়। সাফল্যের চিহ্ন প'ড়ে থাকে
ছিন্নমস্তা নারী, কাত্রায়
বিধ্বস্ত পুরুষ, বয
আতঙ্কেব হাওযা চরাচরে।

বইমেলা, ফুটবল, আর ক্রিকেটের জ্বরে

কোলকাতা কাঁপছে; ঘুরে কবিতামেলায় গানমেলায়
মনে হয,—মনে হতে থাকে
জীবন জড়িয়ে আছে শিল্পসুন্দবের
অভিপ্রেত সুন্দর পৃথিবী।

এসব মুহূর্তে আমি হয়ে উঠি শুধু স্বপ্নজীবী।
স্বপ্নভুক্ মানুষের দুঃখ তো ঘোচে না কোনোদিন!
পায়ের তলাব বৃষ্টিধোয়া ঘাস, মাযের মতন
ক্ষতচিহ্নে ভরা পায়ে আঙুল বুলিযে
নিরাময় এনে দিতে চায়।

ছিটেফোঁটা মেঘ নেই, আকাশের নক্ষত্রসভায়
চাঁদ, দিব্যজগতের আভা
ছড়িয়ে বসেছে। জ্যোৎস্না
মুঠো মুঠো, ঘাসে ও পাতায
সুস্থির শান্তির প্রতিশ্রুতি
দিযেছে। প্রকৃতি নির্বিকার।

পাশেব গলিতে কাব আর্তকণ্ঠে সুতীব্র চিৎকাব?
মসজিদে মানববোমা! হত বা নিহত
প্রার্থনায় নিরত মানুষ! ঈশ্বরের
পৃথিবীর বিভাজনরেখা
কে কবে নির্ণয?

সাফল্যের পবিমাপ করা আজ
দারুণ কঠিন মনে হয়।

কোনো যুদ্ধের পর

রত্নেশ্বর হাজরা

জলে ভেসে গেছে বহু শব—কৈশোর শৈশব
অনেকের
যৌবনেব মুগ্ধ স্ববলিপি—
এবং এসব দেখেছিল রহস্যের মতো ডালপালা
বৃদ্ধ ছাতিমের
আব দেখেছিল বুড়ো মেঘ
ওপাবেব নিচু কুঁড়েঘর
প্রাচীন বটেব ডালে ভীত ত্রস্ত কিছু হবিযাল—

জলে ভেসে গেছে বহু শব—অনেক উৎসব
অনেকের জয আর
অনেকের দীর্ঘ পবাজয়
অনেক চিতার কাঠ আংবা আর বহু অস্থি
নাভিকুণ্ড—ছাই
ভেসে গেছে অনেক গৌরব
অসময়ে অনেক পরমাই
এবং এসব জানে যারা জয়ী হযেছিল—তারা
অথচ তাদের চোখেমুখে—অবয়বে—বিষণ্ণ দৃষ্টিতে
এখন অনেক বিপন্নতা—

জলে ভেসে বহু শব
অনেকের
হৃদয়েব—মননের বিপুল বৈভব—

আমি ও আপনি

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

মাথার ওপর কাক-চিল-শকুন
মাটিতে সাপ ও শেয়াল .
মানচিত্রের ঠিক মধ্যিখানে
আমি ও আপনি;

আপনার চাষের জমি আর আমার
জীবনদায়ী অক্সিজেনের গুল্মলতা
জলা বুজিয়ে হাইরাইজের দম্ভ মাথা
আপনার আমার নিরাপত্তার জন্য
জনসংখ্যার সমগুণ পুলিশ ও ব্যাফ্,

ডানে-বাঁয়ে, ঊর্ধ্বে-নিচে কাঁটাতার
শরীরের অনেকাংশ কাঁটাতারে বিদ্ধ
আপনার আমার মধ্যে যারা
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতো
তাঁদের অনেকেই চারদেয়ালের অন্তর্গত
এমন কী যেন সিমেন্ট বালির কংক্রিট·

মোষ এখন ঘরের ভিতর .
মাতাল-পুলিশ আমার বিছানায় .
আপনার আমার আশ্রয় খাটের তলায়

এখনও হিসেবের খাতায় চোখ না দিলে
আমাদের শেষ আশ্রয় মাটির তলায়।

অলৌকিক ভারতবর্ষ

বেণু দত্তরায়

কারখানাবাড়ির শেড্-এর তলায বসে থাকতে-থাকতে
আমি ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ বলে
চেঁচিযে উঠি
মস্ত চোঙে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে
কারখানা ছাড়িযে নীলাকাশ বৌদ্র-মেঘ-কুযাশা
আরো অবাক কাবখানা
অনেকটা দূবে অনেক উপবে
ধোঁয়াও কি খোঁজে ভারতবর্ষ ভাবতবর্ষ
বেওয়ারিশ কুকুবটাও কি

বসে থাকতে-থাকতে মনে পড়ল
পেভ্মেন্টেব সিমেন্ট-বাঁধানো জমির পাশটিতে
এক চিল্তে পার্কেব ঘাসে
একমুঠো ফুল
সোনালি-হলুদ
সে-ও নাকি ভালোবাসে ভাবতবর্ষ ভাবতবর্ষ

বাস থেকে কেউ কমাল নাড়ল
উত্তবমুখে চলে যাচ্ছে বাস চামুর্চিবাজাবে
আবও উত্তরে অলৌকিক প্যাগোডাব পথ
দু'একটা বনঝাউ
সে-ও কি খোঁজে

তাদের প্রত্যেকেবই মুখ প্রত্যেক
মুখেই
এ-রকম অলৌকিক ভারতবর্ষ ভাবতবর্ষ খেলা কবে

শিল্প-রূপারোপে বাঁধে

সিদ্ধেশ্বর সেন

‘ আব আপনি যেভাবে আঁকবেন সেভাবে তো আব
কেউ নয়’—বিষ্ণু দে’ব ছবি আঁকাব প্রসঙ্গে যামিনী বায

মন জানে, দৈনন্দিনে নিত্যেবই
চাওযা-কে—

দেশজে বিশ্বপটেরও গৌবব
চেযে থাকে—
কবিতায়-ছবিতে—‘অনিষ্টে’-রই যুগে
সে-নন্দনেব প্রসাদে

সেখানে রয়েছে চেনা ঘরে সাবেকি হৃদয়ে
প্রকৃতিব-পৃথিবীর
আবাব যা মানবিকেই বৈভব

চৈতন্যেব দায শিল্পে, ব্যক্তি ও সমাজে
সমুদ্রমন্থনেব পুরাণে যেন—
বা ক্যালকাটা গ্রুপে একালে, আধুনিকে
বিষামৃতে দ্বন্দ্ব-রূপাবোপে, বাঁধে

তখন রাবীন্দ্রিক ‘সাঁওতালী ছেলে’ বা
‘কৃষ্ণকলি-কালো হরিণ’ চোখেব মাযাতেই ডুবে নয়—

হযতো রিখিয়াষ ত্রিকূট পাহাড়েরও ছাযায
লাল মাটি-কাঁকড়েব উচ্চাবচে উঠে-নেমে
অতনুবতির সাঁওতালি ছেলেমেযে
ফুল ও মাদলে সেজে যায়।

* কবি বিষ্ণু দে’ব ‘শিল্পকর্ম-শিল্পসংগ্রহ-শিল্পভাবনা’-য বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ আযোজিত প্রদর্শনীতে গেযে।

সামান্য

অরবিন্দ গুহ

কিছু কথা এখনও গোপনে আছে নিঃশব্দে গোপনে
বার্তাময; কিছু কথা গোপনে থাকাই সমীচীন,
মুখে বলা না হলেও কেউ-কেউ যা শোনার শোনে,
বৈশাখ শোনায় কিছু, কিছু বার্তা শোনায আশ্বিন।

আমাব বিধ্বস্ত টেলিফোনে
ভিতবে কেবলই ঘণ্টি দ্রুত লযে বেজে যেতে থাকে,
বাইরে কোনো সাড়াশাব্দ নেই।
আমি কূটসাক্ষী নই, আদালতে বটতলায আমি
কখনও থাকি না,
নাম একটা আছে কিন্তু হযে আছি সন্তপ্ত অনামী—
আমাকে একদিকে টানে ভালোবাসা, অন্যদিকে ঘৃণা।

এখন আমাব প্রতিমার
নিশ্বাস পড়ে না কেন? কার
চতুর সঙ্কেতে আজ চরাচবে অবলুপ্ত ঘাস।
কিছু শব্দ আচ্ছাদিত করে আছে সমস্ত আকাশ—
অরূপ অস্পষ্ট মূর্তিহীন,
বৈশাখ শোনায় কিছু, কিছু বার্তা শোনায আশ্বিন।

জ্যৈষ্ঠের দুপুবে কত পবিশ্রান্ত জল
সরু খালে বযে যায; আবেকটু বাঁদিকে গেলে পেত
অশথেব ছাযা—এই অশত্থই ছাযাব বিধাতা,
অশথেব ডালপালায বাশি-বাশি কচি বাঙাপাতা।

যেটুকু সামান্য কথা বাকি, কিছু না বলেই আমি
সব কথা বলে যেতে চাই।

সুখ দুঃখের রাত

কার্তিক লাহিড়ী

হাতে বাড়তি সময় আছে কি তোমাব? সুজয বলতে না বলতেই অংশু জিজ্ঞেস করে

সুজয় হেসে বলল, জিজ্ঞেস কবাব কী দবকাব? মালটি বের কবে ফেলো

হাঁ মানে তোমাব—

আমতা আমতা করছো কেন? দাও শীঘ্রি, তুমি গল্প লিখেছো, আর আমি পড়ব না, সে কি হয়? তোমাব প্রথম পাঠক বলে কথা

অংশু টেবিলেব ড্রযাব থেকে লেখাটা বেব কবে, আব হাতে পৌঁছতে না পৌঁছতে পড়া শুরু কবে দেয় সুজয

আজ মেঘনার জন্মদিন ছিল

ছিল না, এখনো আছে, ঘড়িব কাঁটা এখনও বাত বারোটা পেরোয নি, সূর্যোদয হতে ঢেব দেরি, তাই দিশি বিদিশি দু-মতেই এখনো তবে ১ জুলাই ২০০৫, এবং ১৬ আষাঢ ১৪১২-ই বটে, তবে জন্মদিনের

তোড়জোড় চলছিল বেশ কিছুদিন ধবেই, শুরু যাব বোধহয় পয়লা আষাঢ় ষোলোই জুন থেকে, সেদিন থেকে শুরু কেন মেঘনার বাবা মোহন মজুমদাব বলতে পাববেন না, মেঘনার মা মায়া হয়তো বলতে পাববেন, তা-ও পুবো জোর দিযে নয, বলবেন ইতস্তত করে—আষাঢ় মাস রথযাত্রাব মাস, তাই সব শুভকাজ আবম্ভ কবতে হয ওই মাসে, সেজন্য...

তবে এসব চিন্তা বা কথা মায়ার মাথায বা মনে ছিল কিনা, তা ঠিকঠাক বলতে পারবেন না তিনি, তবে পাকচক্রে ওই দিন চলে যান শপিং করতে, অন্য কেনাকাটি কবতে কবতে একটা ফ্রিল দেয়া হালকা আকাশি বঙেব ফ্রক পছন্দ হযে যায, মাযা ওই বকম হালকা রং-ই পছন্দ কবেন, বিশেষ ওই রং, তাই ঝট্ কবে কিনে ফেলেন ওই ফ্রক, আব বাড়ি ফেবাব সময়

হঠাৎ-ই মনে পড়ে, আবে আবে মেঘনার জন্মদিন তো আর ক-দিন বাদে, মনে পড়তেই খুশিতে উছলে ওঠেন, হ্যাঁ এটা-ই হবে মেঘনাব বার্থ-ডে গিফ্ট, তবে আগে ভাগে বলবেন না কিছুতেই মেঘনাকে, অথচ

মেঘনা ঘ্যানব ঘ্যানব করেই চলে, ওমা, বলো না, কী-দেবে আমার জন্মদিনে, শুধু ক্যাডবেবি ঠেকালে চলবে না, তোমবা বলেছিলে একটা সাবপ্রাইজ্ দেবে, সেটা কী মা, কী সাবপ্রাইজ?

বাবা-কে জিজ্ঞেস কবো, বলে মাযা এড়িয়ে যান নিজেব উপহাবেব কথা

কিন্তু মোহন জন্মদিনেব আগেই এনে ফেলেন একটা বক্স-ক্যামেবা, পেযে মেঘনা দারুণ খুশি, হাতে পেযে কী করবে ভেবে পায না, তাকায বাবাব দিকে, আব মোহন তাকে দেখিযে দেয ছবি তোলাব কাযদা, ভিউ-ফাইন্ডাবে এক চোখ বেখে সার্টাব টেপা, তাবপব বোল কবে পরেব নম্ববটা এলে বলেন, তুই তোল্

আব মেঘনা ফট কবে মোহনেব দিকে ক্যামেবা তাক্ করে সাটাব টেপে, কী মজা! কী মজা!

এইভাবে শুরু হযে যায মেঘনাব সাত বছবেব জন্মদিনেব তোড়জোড় বেশ কদমে, তাব মানে এই নয যে মেঘনাব জন্মদিনে এক এলাহি কাণ্ড হবে—শ'যে শ'যে লোক নিমন্ত্রিত হবে বা কোনো পাঁচতাবা হোটেলেব কন্‌ফাবেন্স রুম বা বল্‌-রুম বুক করে অতিথি আপ্যাযন চলবে মুখবোচক খানা ও পানীয সমেত, আসলে

মেঘনাব জন্মদিন ঘিবে খুব একটা কিছু হচ্ছে না, দারুণ-গিফট্ ওই ক্যামেবা পাওযাব পব মেঘনা কিন্তু আহ্লাদে আটখানা হযে যে-কোনো বিষয বা দিকে তাক্ কবে সাটাব টিপছে না, এমনকি বাবা-মা-ব ফটোও সে তুলবে জন্মদিনে কযেকটা, তাই ঠিক কবে বেখেছে মনে মনে, এমনকি ক্লাশেব বা পাড়াব একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেবও আসতে বলেনি জন্মোৎসবে

জন্মদিনে সে দাদু দিদাকে কাছে পেতে চেযেছে শুধু, ঠাম্‌মা-কে-ও চেযেছিল, কিন্তু ঠাম্‌মা এখন থাকেন পাটনায জ্যেঠুব কাছে, তা-ও তিনি আসতে পাবতেন, তাঁব কপাল-ই খাবাপ, বাথরুমে পড়ে গিযে ঠাম্‌মা পাযে ভীষণ চোট পেযেছেন, ডাক্তাব তাঁকে শুযে থাকতে বলেছেন তিন সপ্তাহ অন্তত, পাযেব প্লাস্টাব কাটা হযে যাবাব পবও তাঁব নড়াচড়া চলবে না অন্তত আবও সপ্তাহ দুযেক, অতএব

ঠাম্‌মা আসতে পাবছেন না তাব জন্মদিনে, এতে মোহনবাবু মুষড়ে পড়েছেন খুব, কিন্তু যা হবাব তাব উপব কাব হাত আছে? তাই দুর্ভাগ্যেব উপব ববাত দিযে তিনি দুঃখ-কে গিলে ফেলেন চুপচাপ

মেঘনাবও কষ্ট হয, ঠাম্‌মা-কে বেশি দিন পায নি কখনো, যতটুকু যত দিন পেয়েছে তাঁকে, খুশিই ছিল সে, কাবণ বাবা-মা পড়্ পড়্ কবলে ঠাম্‌মা বলে উঠতেন, সাবাক্ষণ অত ট্যাক্‌ট্যাক্ কবিস না পড়্ পড়্ বলে, ওতে মোটে ভালো হয না, ওব যখন পডাব ইচ্ছে হবে তখন পড়বে? আব পড়েই বা কী ছাই হয, সেই তো হাঁড়ি ঠেলা, অতএব

মেঘনা পুতুল খেলাব সময পায খুব, আব বেশি পডতে হয না ব'লে ঠাম্‌মাব চলে যাওযাব কথা হলে মুখ ভাব কবে, কিন্তু এবাব—

মেঘনাব দীর্ঘশ্বাস পড়ে, মাযাও দুঃখিত হন, কাবণ

তাঁব বাবা-মা আসবেন, অথচ মেঘনাব ঠাকুমা আসতে পাববেন না, এতে অনুষ্ঠানটা পুরো হচ্ছে না মোটে, পুবো হত যদি মোহনেব মা দাদা-বা আসতে পাবতেন, কাবণ

এবার তাঁবা এটিকে শুধু পাবিবারিক অনুষ্ঠান কবতে চেযেছেন

মেঘনাব দাদু দিদিমা ঠাম্‌মা জেঠু বড়মা, কিন্তু শেষেব তিনজন আসতে পাবছে না যেহেতু তাব ঠাম্‌মা এখন শয্যাশাযী পাটনায, তবু দাদু দিদিমা এসেছেন, আব অবাক কাণ্ড

তার বন্ধুদেব কেউ কেউ চলে এসেছে বিনা নেমন্তন্নে, তাবা জানত মেঘনাব জন্মদিন আজ, যেমন মেঘনা জানে কেযা রিয়া আতা সীমা এবং অন্য বন্ধুদেব জন্মদিন, পাড়ায় থাকে বলে তাবা চলে এসেছিল গ্রিটিং-কার্ড দেবাব জন্য ডাকাডাকিব কোনো তোয়াক্কা না করে, এতে

মাযা ও মোহন দুজনে উছলে ওঠেন খুশিতে, তেমনই খুশি হযেছেন দাদু-দিদা মেঘনার, তাঁবা ভাবতেও পারেন না—এমন ঘটনা ঘটতে পাবে এখন এই সময় কলকাতায? অথচ তখন ভুলে যান তাঁদের বৈদ্যপাডাতে এখনও পাডা-পড়ুশিদেব মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য আছে, একের বিপদে অন্যে এগিযে আসে তো বটেই, এমনকি খবব বাখে সকলেব, পাড়া-ফিলিং যাকে বলে

যাই হোক, না বললেও বেশ কযেকজন কচি-কাচা মেঘনাব খেলাব সঙ্গী সব এসে পড়ে, তাই তড়িঘডি মোহন কেক কিনে আনেন এবং সাতটি মোমবাতি, আব যথাবীতি কেকের উপব মোমবাতি জ্বালিযে তাবপর ফুঁ দিযে নিভিযে কেক কাটে মেঘনা, সকলে হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ মেঘনা গেযে উঠলে মেঘনা প্রথমে দাদু-দিদিমা তাবপর বাবা-মাকে দিযে নিজেব সঙ্গীদের মুখে একে একে পুবে দিতে থাকে কেক, আব

ওরা হেলে দুলে তালি মেবে মেবে গাইতে থাকে—হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ মেঘনা, এবং নানা ইংবেজি গান, তাব কথা বোঝা দায—কান পাতলে শোনা যাবে কলিং ফুলিং মেবেলিং ইত্যাদি, কে বুঝল না-বুঝল তাতে কী এসে যায ওদেব, গান চলাব ফাঁকে মেঘনাব মা কাগজের বেকাবে মিষ্টিমুখ থেকে আনা তালশাঁস সঙ্গে মঙ্গিনিজেব পনীর ফিস্ কচৌরি দিযে যান, আব ইশারা কবেন খাওযাব জন্য, ততক্ষণে গান থামে এবং ওবা খাওযায মন দেয

মেঘনাব দাদু দিদা বাবা মোহন মজুমদার সকলে ভাবি খুশি বোধ কবতে থাকেন, ভাগ্যিস ওবা এসেছিল নইলে..

বেশি আপসোস হত মাযা-ব, যাইহোক এখন সকলে খুশি, আর মনে মনে প্রার্থনা করে—সকলের জন্মদিন যেন এমন আনন্দের হয

ততক্ষণে মেঘনা তুলে ফেলেছে একগাদা ছবি তাব বক্স-ক্যামেবায়—বিভিন্ন ভঙ্গিতে বন্ধুদেব, মা-বাবাব, দাদু-দিদিমার, লাস্ট যেটা বেঁচেছিল তাতে সে তুলে ফেলল

বাবা মা দাদু-দিদাব ছবি একসঙ্গে, শেযে মোহন প্রায আর্তনাদ করে ওঠেন, এ্য হে, মেঘাব ছবি তো তোলা হল না একটাও, তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে দোকানে যাবাব জন্য ব্যস্ত হন, মাযা হা-হা কবে বাধা দিতে চায, কিন্তু কে শোনে কাব কথা

আবে, এই যাব আর আসব, গাডিতে যেতে কতক্ষণ লাগবে? ওই সুন্দব ফ্রকে ওব একটা ছবি থাকবে না আজকেব দিনে, তা কি হয?

কিন্তু এখন কি দোকান্ খোলা পাবে? আট-টা বেজে গেছে.

হাতিবাগানে না পাই, কলেজ স্ট্রিট চলে যাব

থাক্ না, কাল বরং তুলো

সে হয না, আজকে না তুললে, মোহন মেঘনার দিকে তাকায, কী বল্ মেঘা, আজকের দিন হচ্ছে..

মেঘনা লাফিযে ওঠে, ইযেস্.., বলেই সে কেমন মুযড়ে আমতা আমতা কবতে থাকে, থাক্ বাবা, এখন নাই বা গেলে, দাদু-দিদাকে তো পৌঁছতে যেতে হবে...অত ধকল..

তাতে কী? কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত যেতে আসতে বড় জোর..

তখন দাদু এগিযে এলেন, হয়তো যেতে মানা করতে কিন্তু তার আগেই মোহন বেরিয়ে পড়ে..

সাবধানে যেও কিন্তু, বেশি স্পিড দিও না বাবা

মাযাও যেন কী বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর বুকের দোলন কেমন বেড়ে গেল, তিনি মোহনকে সাবধানে গাড়ি চালাবার কথা বলতে গিযেও বলতে পারলেন না, ততক্ষণে

মেঘনা-র সঙ্গীরা চলে গেছে, ঘর খাঁ খাঁ করছে খুব

গাডি-তে স্টার্ট দিতেই মনে হল কে যেন শিশিবের শব্দেব মতন চুপে এসে বসে পড়েছে পিছনেব সিটে, মোহন পুবো শরীর ঘুরিযে দেখতে বিফল হচ্ছে, ততক্ষণে শবীরের বোম সব ফুলে ফুলে উঠেছে। সে সিকিব সিকি-ও ঘাড ঘুবিযে আড়চোখে দেখতে পায না, কে কে—এমন শব্দও স্ফুট হয না, কেবল ঘড় ঘড় কবে ওঠে গলা, খাকাবি দিযে গলা পরিষ্কাব কবতেও পাবে না।

হিন্দি সিনেমা টিভি সিবিযালে কখনো কদাচ এ বকম অশবীবীর আবির্ভাব হয, সে প্রতিহিংসা চবিতার্থ কবে নানাভাবে, অর্থাৎ যখন সে সজীব শরীবী ছিল, তখন তাব উপর যে সব অত্যাচাব হয়, সেই অশরীবী বলে বলে তাব শোধ নিতে থাকে ধারাবাহিক ভাবে, কিন্তু

সে কি তেমন অত্যাচাব করে কারো উপর? এক সময জীবিত ছিল কিন্তু এখন সশবীরে বর্তমান নেই তেমন কাউকে? তন্নতন্ন তল্লাশি চালিযেও তেমন কাউকে খুঁজে পায না, তবে স্কুলে পডাব সময কিছু দুষ্টুমি করে থাকতে পাবে কাবো সঙ্গে, কিন্তু তেমন অত্যাচাব তো কবে নি কখনো সে? তাহলে?

অবাক কাণ্ড ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু কবেছে, তখন

কানে বেজে উঠছে মেঘনাব চেতাবনি, বেশি স্পিড দিও না বাবা

তাদেব গাডিতে মিউজিক সিস্টেম নেই, কিন্তু মেঘনাব ওই কথাগুলো বাজনাব তালে তালে বেজে চলে, এবং মোহন

ওই তালে তালে এক্সিলেটাবে চাপ দিতে থাকে, চাপ বাডে, সঙ্গে সঙ্গে গতিও বেড়ে চলে, মোহন টের পাচ্ছে না তা, তাব ঘাড়ের উপব ঠান্ডা বা গবম কোনো নিঃশ্বাসই এসে পডছে না, কিংবা কোনো ভাব-ওজনহীন হাত কিংবা কথা, অথচ

মোহন টেব পাচ্ছে—একজন কেউ নিশ্চয বসে আছে পিছনেব সিটে খুব শান্তভাবে, এবং তাব দৃষ্টি বিদ্ধ হচ্ছে মোহনেব ঘাড়ে এবং চুল, তবু তার চোখ নেই প্রস্তবেধ উচ্চতা, শুধু

আছে অস্তিত্ব, মোহন নার্ভাস হতে হতেও এখন বেশ নির্ভয়ী হয়ে উঠছে, আপনি কে? কিন্তু সহস্র সাহস জোগাড় করেও তার জিজ্ঞাসা বাঙ্ময় হয় না, নার্ভাস হতে থাকে শুধু, আর অচেতনেই এক্সিলেটারে চাপ পড়ে আরও

গাড়ি ছুটছে বেগে, স্টিয়ারিং বাগে রাখতে পারছে না তেমন, কেবলই মনে হচ্ছে পেছনে যে বসে আছে তার মুখ সূক্ষ্ম হাসিতে টল টল করছে

সেখানে অন্ধকার, মোহন পিছন ফিরে দেখলেই কি সেই অন্ধকারের মধ্যে উপবিষ্টর ফটফটে সাদা দাঁতের পঙ্‌ক্তি দেখতে পেত?

এক্সিলেটারে চাপ বাড়ছে, মোহন ভাবছে তাকে এমন চাপের মধ্যে রেখে সে কেন আরাম পাচ্ছে এত—আরাম

এবং সুখ, আরাম পেলেই সুখ বাড়ে, নাকি এসবই তার ভ্রম? এরকম ঘটে থাকে সিনেমা ও সিরিয়ালে, সেগুলো দেখার ফলেই এমন মনে হচ্ছে, কিন্তু এখন তো সত্যিই ঘটতে চলেছে কিছু, স্পিড তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, গাড়ি সামলাতে পারছে না কিছুতেই

সি আর এভিনিউ—বৌবাজার ক্রশিং পেরিয়ে গাড়ি আরও স্পিডে ছুটছে, মোহন গাড়ির ব্যালেন্স ধরে রাখতে পারছে না, স্টিয়ারিং, এ-পাশ ও-পাশ করছে, গাড়ি কাঁপছে থরথরিয়ে, নিজের সিটেই বসে থাকতে পারছে না আর যেন

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌সের সামনে রাস্তা যেখানে কাস্তের মতো বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের মাথায় এসে স্টিয়ারিং থেকে হাত ছিটকে গেলে গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারছে রেলিঙে পোস্টে, রাস্তা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে

গাড়ি উল্টে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে তখন..

আর চাকা শূন্যে ঘুরে চলে অবিরল .

গল্প পড়া শেষ করে সুজয় তাকায় অংশুর দিকে, শুভদিনে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিলে?

অংশু ম্লান হাসে, শুভদিন?

নয়? মেয়ের জন্মদিন আর সেই দিনই তুমি, বাক্য শেষ না করে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, মোহন বাঁচবে তো?

অংশুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তারপর তাকায় উপরে তর্জনী তুলে

মানে?

সব উপরওয়ালা জানে, তাঁর ইচ্ছে, সিনেমা সিরিয়ালে ডাক্তার-রা যেমন পেশেন্টের আত্মীয়স্বজনকে বলে থাকে, অংশু তেমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে, তাতে

সুজয় অবাক হয়, কী বলতে চাইছো তুমি?

অংশু হাসে, আমার বলার না-বলার কী আছে, ওটা আমার হাত বেরিয়ে গেছে, তারপর স্নেহার্দ্র স্বরে বলে, তুমি কী ভাবছিলে, তাই বলো

সিম্পল, ভাবছিলাম, মৃত্যু ওঁত পেতে বসেছিল পিছনের সিটে

অংশু তীক্ষ্ণভাবে তাকায় সুজয়ের দিকে, তবে সেটাই ঠিক

সুজয় কী জবাব দেবে ভেবে পায না, সে চুপচাপ দাঁড়িযে থাকে, তাবপর বলে, ওকে না মাবলেই কি চলত না?

অংশু আবাব দেখে সুজয-কে, চলত

তাহলে? সুজয় উদ্দীপ্ত হচ্ছে অংশুর কথা শুনে

তাতে কি তোমবা খুশি হতে?

মানে?

অংশু হাসে, আবে বাবা মোহন ফিল্ম কিনে ফিবে এলে—তোমরা কী ভাবতে? সিনেমাব দর্শক যা দেখলে খুশি হয, তেমন মিলনান্তক ইতি টানলে তোমবাই তো বলতে তখন—এ মা, একেবাবে জোলো

সুজয বিজ্ঞের মতো মাথা নাডায়, তা বটে, তবু—

বললাম না ওটা আমাব হাত থেকে বেরিযে যায লেখাব টানে, তুমি তো জানো সব কিছু নিজেব হাতে থাকে না, নিজের ইচ্ছায হয না, যদি হত তেমন—তবে? অংশু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সুজযেব দিকে

তাই তো—

যেমন আমি বলতে পাবব না পিছনের সিটে এসে কেউ বসেছিল কিনা, নাকি ওটা মোহনের মন-গডা কিছু? বাক্য শেষ না কবে বলে, ভাবো তুমি, ওটা তোমাদেব কাজ

তারপব চুপ কবে যায একদম, আব

সুজয ভাবতে ভাবতে চিন্তার একবাশ আঁকিবুকি—চোখে মুখে বিহ্বল হযে যেতে থাকে কেবলই তবু...

কথোপকথন ৪

সাধন চট্টোপাধ্যায়

ঘরের বাতাসে টের পাওয়া যায়নি। উঠোনে পা দিতেই কেশব অনুমান করলেন জল-ঝড়ের তাণ্ডব। সঙ্গে বন্ধু প্রবুদ্ধ, প্রবুদ্ধ বায়। মল্লযুদ্ধের পর শ্রান্তির আখড়ার মতো চারপাশ। অন্ধকার ঘুটঘুট। কাদা। ব্যাঙের ডাক। বিকেলে গাঁয়ে ঢোকার মুখের কালবৈশাখীটি এতটা যে স্থায়ী ও দাপুটে থেকে যাবে, খেয়ালই ছিল না। গৃহকর্তা আক্কাস। বললে, ডাঁড়ান, টর্চ না-হলি যাওয়া যাবে না। লম্বা পাঁচ-ব্যাটারির টর্চটা সঙ্গে, পেছনে নিজের বাগানের শর্টকাট সেরে পঞ্চায়েতের রাস্তায় উঠল। সরু এবং ইট-সুরকিতে ছ্যাঁচা। কয়েক বছরেই বেহাল এখন। কাদা, ফ্যানা, গর্ত, ছিন্নডালপাতা, কলাগাছ এবং ঝুকতি বাঁশের ডগা সরিয়ে সরিয়ে, আক্কাস সামনে। পেছন পেছন টর্চের এরিয়ায় দুই বাবু, সকালের বাজারের দুই ঘনিষ্ঠ ক্রেতাও বটে আক্কাসের। এ-সব দূর দূর গাঁ থেকেই রোজ ঊষায় বাজার-সমিতির তত্ত্বাবধানে ভাগ-ভাগ ঠাঁইতে শাক-আনাজের মেলা বসে যায়। ভাঙতে ভাঙতে বেলা দুটো।

সাপ-টাপ নেই তো? পা দাপিয়ে হাঁটুন, পাইলে যাবে। কেশব বুঝলেন কেন আক্কাস পলিথিনের জুতোয় মাটি গুঁতিয়ে হাঁটছে। প্রবুদ্ধ বল্লেন, এগিয়ে না দিলে আজ আহিরা থেকে বেরুতেই পারতাম না। আক্কাস অন্ধকারে হাসল। বল্লেম কত করে, বাতটা গরিবের বাড়ি থেকি গেলে পাত্তেন। পাগোল। আর একদিন থাকব। ভেতরে ভেতরে দুজন প্রৌঢ় খুবই সন্ত্রস্ত। দু-চার বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে খুব লো-ভোল্টেজের বিদ্যুৎ আছে বটে, চরাচর অন্ধকারে লেপাপোছা। কেশব ভদ্রতা দেখালেন, আর এগোতে হবে না আক্কাস। নিজেরাই পারব এবার! নিছকই মানবিকতায় বলা। ক্ষেতের মাটির দাগ এখনও বেচারার ধোয়া পাখলা হয়নি।

উঁচু খালপাড় ধরে রাস্তাটা বিপজ্জনক খানা-খন্দ-কাদাজলে কোথায় কীভাবে ওৎ পেতেছে—বহু-অভ্যাস না থাকলে অসম্ভব। অন্ধকারে দু-চারটে ক্রিং ক্রিং। ওরা এ-ভাবেই অভ্যস্ত। কেশব চলতে চলতে হামিদের ব্যাপারটা ভেবে বোমস্থিত। আক্কাসের ছেলে। সে ছয় কিলোমিটার দূরবর্তী ওঁচা একটা স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পড়ে, আর্টস নিয়ে।

আর কদ্দূর যাবে? জবাবে আক্কাস ফোঁশ করে, চল্লেন তো। বাজারের মোড় পর্যন্ত যাই।

এখনও হাফ কিলোমিটার। ছোট্ট গঞ্জের মতো এবং নতুন কটে অটো মিলতে পারে। আহিরা, মালতিপুর, কাপাসিয়া গ্রামগুলোর এসপ্ল্যানেড হল গিয়ে বাজারের মোড়। চা, তেলেভাজা, মনোহারি, ওষুধ ডাক্তার, মিষ্টির দোকান, সাইকেলসারানো দোকান, দু-চারটে মটোর সাইকেলের ঠেক, মোবাইল বা ও ধরনের কিছু আড়তদারের লাভ-লোকসান নিয়ে রাত দশটা অবধি জাগিয়ে রাখে।

বিকেল ঝরা ছাঁটের বৃষ্টি মাথায় যখন উঠোনে হাজির হয়েছিলেন দুজন, আক্কাস বাড়ি

ছিল না। অথচ দিনক্ষণ বলে-কয়ে আসা। অহংযে গা লাগলেও হামিদ ডেকে ঘরে তোলাব ইঙ্গিতে কিছুটা স্বস্তি পায়। রোদ মাথায় বেগুন-ট্যাড়শ নিযে বসে থাকলে, তার সম্পর্কে ভাবা যায না ছাদ ঢালাই করে সাজিযে গুছিয়ে বাখতে পাবে ঘর-বাবান্দা। দুটো নড়বড়ে চেয়ার, চৌকি এবং টুলেব ওপব একটা রঙিন টিভি বেখেছে। ঘুবে ঢুকতে ঢুকতে কেশব দেখেছিলেন খোলা রান্নাঘবের মধ্যে লম্বা ঘোমটায অদৃশ্যমান মুখের গৃহিণী—আক্কাসেব বিবি। পাযেব পাতা ক্যাটক্যাটে সাদা। কাচের চুড়িতে গোল গোল হাত।

বিকেলেব মুখেই আকাশটা হঠাৎ গুরু গুরু। আক্কাস ক্ষেতে। শেষ-চৈত্রে লম্বা লাল শাক ফলিযেছে। খালের পানিব সেচ। তুলছিল। পাল্লা দুই পাইকাবকে দিযে বাকিটা নিজেই বেচবে। আজ তাই নাকেমুখে গুঁজেই বাজাব ফেবত মাঠে। বিড়ি, পান-সুপুরিব বিলাসিতায় সামান্য বিশ্রাম শেযে যখন মাঠেব পথে হাঁটা দিয়েছিল, বোদ্দুব মাথাব চুল পুড়িযে দিচ্ছে। তাই, নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার ফাঁকে, গুড়গুড়ুম কালো দানবেব ছডানো চেহারাটি আচমকা খুশি কবে। মুখ তুলে দেখে নেয় একবাব। এবং আশঙ্কাব হিসেব বিদ্যুতের মতো খেলেছিল মস্তিষ্কে, কাল বাজাবে কাঁচা আমেব দর পড়ে যাবে। এখনও দু-বস্তা টিপেনো আছে তাব বান্নাঘবে।

তখন কেশব-প্রবুদ্ধবা ছিলেন মাঝপথে। যেখানে খালের পথটা ভাগ হযে গ্রামগুলোব দিকে চলে গেছে। বাতাস উঠল, ধুলো ছডালো এবং ধীরে সূর্যের তেজ ঢেকে দিযে মেঘ ঠান্ডা বাতাস এনেছিল। কেশব লক্ষ কবলেন, মেঘের একটি অংশে রোদেব ফলা ঢুকে ভযংকব মাধুর্যেব একটি জলজ হলদে বর্ণ তৈবি কবেছে। বাকি জীবনটুকু স্মৃতিতে মুদ্রিত থাকবে। ওবা হাঁটছে। আশঙ্কা ছিল, কিছু ভেঙে উড়ে এসে মাথায় না পড়ে। কোনো আশ্রযে গিযে কি উঠবে? একটু বিস্ক নিলেই বা কী ক্ষতি! এমন ফাঁকা ফাঁকা এলাকায ঝড়ের অভিজ্ঞতা বিবল। ডান পাশেই বরাবব মস্ত খালটা, যেন ছোটোখাটো নদী। উঁচু পাড় ধবে হাঁটা। দু-পাশে গ্রাম। ক্বচিৎ যোগাযোগের ভাঙা বাঁশেব সাঁকো। কয়েক পুরুষেব হিন্দু-মুসলমান। সবাই আজলফি মুসলমান এবং হিঁদুদেব মধ্যে বেশি অংশটাই পোদ, মাহিষ্য এবং নমঃশূদ্র। গত পঞ্চাযেত নির্বাচনেব চিহ্ন দেযাল-লিখন একটা ঋতু টপকেই ম্যাডম্যাড়ে। বোঝা যায, অঞ্চলে খুবই উত্তেজনা, টান টান কৌতূহল। নানা স্কিম, সালিশী, দেশেব ভালোমন্দ থেকে শুরু করে আমেরিকা—লাদেনেব বিষযেও।

কালবোশেখির শুরুব মধ্যেই আধ কিলোমিটার দুজন চলে এসেছিল। বাতাস, ধুলো, গর্জন ও ডালপাতাব ফোঁশফোঁশানি। তাবপর টিপটপ। ভেবেছিল মেঘটা ক্রমে বাঁধনছিন্ন, বাতাসেব ঠ্যালায উডে যাবে। কেবল ঠান্ডা পবিবেশ থাকবে। কিন্তু এবাব আশ্রযেব দবকার। খানিকটা ভেজার আনন্দব পব মনে হল। তাবপর, মাটিব গন্ধ মেখে বেশ চববব ফোঁটায় নামতেই ভবা বসতি অঞ্চলের এক গেবস্তব টালিব চালাব কানাচে দাঁড়িযেছিল। অন্ধকাব উঁচু মাটির দাওযা। কুঁজোমতো, কাঁচাপাকা ছুঁচলো দাডিব এক বেঁটে বুড়ো গোরুব জাবনাব কলাগাছ কুচোচ্ছিল। একাগ্র কর্তব্যে। হঠাৎ, পানিতে ভেজবেন কেনো, দাওযায় উঠি ডাঁডান। কেশব ও প্রবুদ্ধ নিশ্চিন্ত হলেন। টালিব ফাঁক-ফোকব দিযে টপ্‌টপ্ জল, কিন্তু ওরা বুঝে-বেছে নিশ্চিন্ত হলেন। তখন প্রবল বৃষ্টিব ধাবা। শোঁ শোঁ শব্দ। এবং সামনে একটা খোলা

বাগানে আম কুড়োবাব ধাক্কাধাক্কি, হাসি, কাদায় পিছলে পডা। বুড়ো ধাড়ি ছেলেপুলেদেব মধ্যে বউ-ঝিরাও আছে। হঠাৎ দূরে নিরাশ্রয় একটা গোরু ডাকল। শাবকের চিন্তায় এখানে মাযেব কান খাড়া। কুঁজো বুড়ো কুচনো হাতদুটো থামিযে হাঁক, ই-দ্দু-স! গাইটা ভেজে নাকি? বলতে না বলতেই, খুঁটি নিযে উগলানো দডি নিযে, গোরুটা হাজিব। দু-দুবাব কচি স্বরে হাম্বা এবং অভ্যস্তভাবে দাওযায উঠে দাঁড়াল। লেজের ঝাপটায ভেজা শরীব ঝাড়ছে। ঘ্যাস্ ঘ্যাস দ্রুতলযে কুচনো, রাগে গড গড। ইদ্দুস—ওই আমকুড়োনো ধেডে নাতিটাব প্রতি। লালি গাইটা তখন একটা সম্পর্ক হযে আরামসে দাঁড়িযে থাকে।

আক্কাস বলে, আব কাদাগণ্ড নেই...পর থেকে খাঁটি রাস্তা। দুজন পাকুব গাছটায বুঝল, বিকেলে এখানেই ঝড়েব মধ্যে বৃষ্টিব ফোঁটা নেমেছিল। কেশবেব গলায় আক্কাসেব বাডির সিমুই-এর ঢেকুর। চা থেকে সব কিছুই গোলা মিষ্টি। হামিদই বান্নাঘর থেকে একে একে প্লেটগুলো নামিয়ে বাখছিল। এমনকি, বড কাঁসাব গ্লাসে পানিও। গায়ে নীল গেঞ্জি এবং ছাই রংয়েব প্যান্ট।

প্রাইভেট পড়ো? হামিদা হাসি হাসি ঘাড় কাত কবে। কোথায? পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং ইতিহাস একজন ম্যাডামেব কাছে। স্কুলেরই। কখন? স্কুলের পব। তারপর বাড়ি আসি। খেলাধুলো করো না? হামিদ মাথাব ভাষায না বলে। এবং জানায, পাড়াতেও সে আব মেশে না। কাব সঙ্গে আড্ডা দেবে? একটা ক্লাব। নতুন গড়েছে বটে। দিন-রাত ক্যাবাম এবং বিডি। আরও রাতে ভিডিও। সবগুলো পাডা মিলিযে মাত্র দুজন উচ্চ মাধ্যমিকে। তাবা হামিদেব স্কুলে পড়ে না এবং আর্টসও নয। বাণিজ্য। হামিদ উত্তব দিল, কবিতা পড়তে ভালোই লাগে।

প্রবুদ্ধ চমকালেন। বাংলাব শিক্ষক ছিলেন কিনা। কবিতা? কাব কবিতা ভালো লাগে? আক্কাসও ঘরের মধ্যে। সিমুইযেব প্লেট দেখিযে দুজনকে বলে, খান। খান! আবও দেবে। এবং ছেলের সঙ্গে ভদ্রজনদেব আলাপ-প্রসঙ্গ বেশ গর্বেব সঙ্গে গিলতে থাকে। পুত্রেব শিক্ষা-গৌরবে বলে, এই শোনেন! আমি বলিছি, বাবা, তোমার ঝ্যাথো মাস্টার লাগে, আমি ট্যাকা জোগাবো। হামিদ মিষ্টি হাসে। শখ বলতে তার পাকানো হ্যান্ডেলের আধুনিক একটা সাইকেল। এই দ্যাখেন। এবার ডাঁটার খন্দটা আগে-আগে হযেছে .দবও পাচ্ছি. বলিছি ওকে, সাইকেল কিনে দোবো। কেশব বলে, সাইকেল? ও-সাইকেলে কী হবে? টোটো।

দ্যাখেন। মিথ্যে বলব না, চাবপাশে তেমন ছেলে-ছোকডা নাই, পাড়ায় মিশতে দেই না। ছেলে চাযও না। বলিচি, যত তক পড়বি, আমি পযসা নিযে আচি!

কার কবিতা ভালোবাসো? ববীন্দ্রনাথ, নজরুল?

হ্যাঁ। দুজনের কবিতাই!. জীবনানন্দ।

জীবনানন্দ? কী কবিতা পডেছ তাঁব?

লাজুক হাসি। হামিদেব অস্ফুট গলা, এক-আধটা। পডার বইতে যা আছে। নাম মনে নাই! কেশব উৎসাহে, বেশ বেশ। বই পড়োনি? বেশ, আমি তোমায কিনে পাঠাবো...বুঝলে আক্কাস?

তেমন গুকত্ব না বুঝে সে মামুলি মাথা হেলায। উৎসাহে বলতে চায, ছেলেব পডাশুনোব জন্যই পাকাঘবটা সাজিযেছে গত সনে আমবাগানটা জমাব পুরো টাকা! ও পাশেব ঘরটায কেবল ছাদ, জানালা-প্ল্যাস্টাব বসেনি। ভিন দিশিবা খালে মাটি কাটতে এলে, কাউকে-কাউকে থাকতে দেয। পযসা নেয না। কী বা খাটুনিব পযসা জোটে ওদেব!

ছোটোবেলা ভালো হা-ডু-ডু খেলত আক্কাস। দশ গাঁযে খেপ খাটতেও যেত। এখন গাঁযেব কোনো কাজিযাতেই জডায না। চায। ভোট। এবং ক্বচিৎ কখনো মসজিদ কমিটিব মাইকে কোনো মবশুমেব খবব বললে, গোরস্থানে দু'কোদাল মাটি ফেলাব শ্রদ্ধা।

বলল, এই শোনেন, গেল সনে সূয্যমুখীতে লস্।..বীজ থেকে গাছই বেকল না। কেশব বলে, বীজ কোত্থেকে কেনো?

সে অনেক কতা! নইলে বাবাব সাইকিল গত সনেই কিনতে পাত্তাম!

তিনজন হাঁটছে। আলাপের প্রসঙ্গ হঠাৎ ফুবিযে গেল। নির্জন খালেব দু-পাশেই গাঁ-গ্রাম। সাঁকো। হঠাৎ ওপাব থেকে বাতাস উছলে গাঁ-ড়াঁ-ও ধ্বনি। পশুব ডাক। আক্কাস অন্ধকাবে হাসে, ওই শোনেন, বনমালীব জার্সি গোরু! কোন গ্রাম? সিংহেব বেড।

বনমালী আক্কাসেব পাশেই বসে। কুমডো ডাঁটা, পটোল, থোড়—আলুব সিজনে লাল আলু।

জার্সি গোরু একধবনেব বিদেশি জাত। অস্ট্রেলিযাব। যেমন ডাচ্ দেশের হলস্টেন। মার্কিন মুল্লুকেব মুগেবনদস।

কেশব বলে, বিদেশি গোরুর তো অনেক দাম? ওবা নিজেব দেশে গোরু পোযে না? তাতে কী। সমিতি হযেছে এখন। চাইলেই বিনি পযসায ঢুকিযে দিযে যাবে। তাবপব?

বোজেব দুধটা ত্যানাবা নিযে যাবে।..সুদ-আসলে দেনা মিটলে তখন পুবো মালিকানা বনমালীব।

খাওযানো? দুধেব হিসেব?

আক্কাস সহজ ভঙ্গিতে, হিসেব তেনাদেব হাতে, খাওয়ানো বনমালীব। আমাদেব বহু গাঁযেই তো ঢুকে গেছে, জানেন না?

প্রবুদ্ধ বল্ল, এদেব দিশি ষাঁডে চলবে?

এত সামান্য সত্যটি অজানা থাকায, আক্কাস বলে, তাই চলে নাকি। .দেখেন, 'গরম হলে বীজ কিনতে হবে আলাদা .সমিতি অবিশ্যি বলা-কওয়াব ব্যবস্থা বাখে!

তিনজনেব ধুপধাপ পাযেব শব্দ। এ-শব্দে বিপদ পালায়। কী শান্ত অন্ধকাব! কেশবেব মনে হল, ভাগ্যিস ঝড়-জলে আটকা পড়েছিলাম! একঘেয়ে কোলাহলে টেবই পেতাম না, নীরবে গ্রাম-গাঁযেব গোযালে এখন বিদেশি দুধেল গাইদেব আশ্রয়। মালিকানাব অপেক্ষায।

তাবপব তিনজন এসপ্ল্যানেডে হাজিব। ঝড়জলেব তাণ্ডবে কখ-ন অটোবা উঠে গেছে!

পলাতক আলো-ছায়া

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

বকিং চেযারে বসে আবীবলাল আকাশ দেখছিলেন। আকাশে তখনও আলো আছে। তখনও দিন আছে। বিকেল-বিকেল দিন।

এখানে আকাশ খুব বড। সে আকাশে খেলা কবে শাদা মেঘ, শবৎ, শীত বা বসন্ত হলে। পাল পাল শাদা মেঘ ভেসে যায দূবে দূবে, হয়ত অজানা আকাশে। ভেসে আসে অন্য মেঘ, অজানা আকাশ থেকেই হয়ত বা। কে জানে হযত সেই একই মেঘ, একই শাদা, একই হাসিখুশি। চেহাবাই শুধু যা আলাদা। মেঘেদেব চেহাবা তো সদাই আলাদা। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তারা ভাঙে তাদের চেহাবা, অতি দ্রুত, যেন কোনও তাড়া আছে। যেন কেউ তাড়া কবছে, চেহাবাটা বদলে না গেলে, বদলে না ফেললে ধবা পডে যাবে অনিবার্য, ধবা পড়তে কে-ই বা চায? মেঘও চায না। আকাশেব অনেকটা জুড়ে কখনও হাতি তাই উট হযে যায। ডানামেলা প্রজাপতি অনাযাসে হযে যায প্রাসাদ বা জাহাজ। আদুবে কুকুব কাবও ভবে থাকে সমস্ত আকাশ।

তখন আকাশ খুব নীল। নীলেব অনন্ত পটে খেলা করে কত জনপ্রাণী। খেলা কবে, ভেঙে যায়, তাবপব হাবিযেই যায একেবাবে। অথবা হযত কেউ হাবায় না কোনওদিনই। একেবাবে হারায় না। ফিবে আসে। ফিবে ফিবে আসে। পুরোনোই ফিবে আসে, নতুন চেহাবা নিযে। সে-ই আসে ফিবে, শুধু চেনা যায না তাকে আব। যেন চিনে ফেললেই ধরা পড়ে যাবে। বাঁধা পড়ে যাবে, প্রেমে বা ঘৃণায়, ক্রোধে বা উদাসীনতায, অথবা শুধুই বিযাদে। যেন মানুষেরই ছায়া, তাব ভবিতব্য নিযে এবং নিযতি।

এখানে পট শুধু নীল। কোনও ছায়া নেই তাতে। শুধু উজ্জ্বলতা। আনন্দও। গগনেব বুক জুড়ে, কোণে কোণে শুধু হাসি, আব শুধু গান। এবং বিযাদ, পাহাড়ের মতো।

এই নীল, এই শাদা, এই সাজা, এই দেখা, হাসি আর গান, সবই কি সত্য? নাকি শুধু সেজে থাকা? সাজানো গোছানো? বানানোই সব? দুই চোখ যা-ই দেখে তাই সত্য নাকি?

অথবা শুধুই মনে হওযা? মনেব বদল হলেই বদলে যাবে সব। তাই যায়। হৃদয নিজেকে যদি মেলে দেয, এই নীল আকাশেব মতো, তবেই তো দেখা যায় সব নযন ভুলানো যত ছবি। তা না হলে, হৃদয মেলে না দিলে বৃথা সব আযোজন। এই নীল, এই সাদা, এই ওড়াউড়ি সব।

হাসি, গান, কান্নাও। অভিমানও। মানও তাই। যেমন হাতি বা উট কিংবা ইচ্ছাজাহাজ। সবই তো মনেব। কখনও বা হৃদযের। মন যদি খোলা থাকে, হৃদয ভবা থাকে নীলে, সব থাকে। থাকলে থাকে, না থাকলে নেই। উধাও সব।

আবাব আসবে তাবা। হয়ত অন্য কিছু হযে, ভিন্ন সাজে। কিন্তু আসবেই ফিবে ফিবে। সেই হাসি, সেই গান, সেই ব্যথা, সেই অভিমান, ক্রোধ আব বিষাদেব প্রতিজ্ঞাবা সব। ধৈর্য থাকে যদি, চিনে নেওযাব ইচ্ছা যদি থাকে, প্রবল, সাহস থাকে চেনা মেঘে কাছে ডেকে নিতে, বসে থাকো, বসে বসে দেখো, সব কেমন বদলে বদলে যায়। বদলে গিযে পুরোনোরা ফিরে আসে নূতন হয়ে। পিতামহ পিতা হযে আসে। পুত্র ফিবে আসে পিতৃসাজে। কন্যাও আসে ফিবে, যেন বহুকাল পবে, আরও পুরাতন কোনও ঋণ শোধ দিতে। সে শোধেব যন্ত্রণায আকাশ, বাতাস, জল, মাটি সবই এত নীল হযে যায়, মহাদেবও লজ্জা পেযে ফিবে যান পবাজয়-ভযে, তাঁর নীলকণ্ঠ নিযে। মেঘেরা উধাও। নীল নেই আকাশে আকাশে। শুধু ছাযা, শুধু ছাই ছাই। হাসি নেই। গান নেই। আনন্দও নেই। আছে, গান আছে। শুধু গান আছে। অন্য গান। সে গান অন্য কথা বলে। সে আকাশও কথা বলে, অন্য কথা। পূর্ব-পুরুষেব কথা। তাঁদেব প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধ আব জয়-পরাজযেব কথা। উত্তরপুরুষেব কথা। যুদ্ধবত, সততই যুদ্ধরত উত্তবপুরুষ। শুধু প্রতিজ্ঞাবিহীন। দিশাহীন। যুদ্ধের কোনও স্তরে নির্মম স্মরণ থেকেও হাবিযেই গিযেছে প্রতিজ্ঞা। সব দিশা। মনেও কি পড়ে না কখনও, কী ছিল সে প্রতিজ্ঞার অন্তরে অন্তবে? কেমন ছিল সে অন্তব? কত শক্তিধব? কত স্বপ্নধব? স্বপ্নেব ভেতবে কত রং? মনে পড়ুক, না-পড়ুক স্মবণে থাক বা না-থাক, পরিণতি অনিবার্য এক। পবাজয। আকাশজোড়া জনপ্রাণীর খেলা, বদলে যাওয়া অরূপ চেহারা, অত নীল, অত গাল আর হাসি। সব ঢাকা পড়ে যাবে অন্ধকাবে। সব। গাঢ অন্ধকাবে। অনিবার্য।

তখন বিকেল-বিকেল দিনেব শেষে সন্ধ্যা নামবে নামবে করছে। আকাশের কোথাও তখনও লাল আছে। নীল গেছে চলে। লালও হারিয়ে যাচ্ছে কালোতে, দ্রুত। যেন পালাচ্ছে, ধবা পডাব ভযে।

আবীবলাল আব দোলেন না বকিং চেয়ারে। দ্রুত বদলে যাওযা আকাশেব দিকে চেযে বসে থাকেন। আব ভাবেন।

একটা ভাবনাই শুধু ঢেকে বাখে সব চিন্তা জুড়ে থাকে মন? তবে কি অন্ধকারই সব? সব শক্তিধব?

অন্ধকাবই শেষ সত্য? সব বঙেব শেষে শেষ বং?

প্রতিদিনেব মতো, যেন অভ্যাসবশত তিনি দেওযাল জোড়া জানলা থেকে, আকাশ থেকে চোখ ফিবিয়ে জানলার ওপবে দেওয়ালে তাকান। ছবিটা ভালো বোঝা যায় না। বাবা-মা'ব ছবি। সন্ধ্যা নামছে। আলো অন্ধকাব। আলো জ্বালতে হবে।

আবীবলাল ওঠেন না। অন্ধকার ঘন হচ্ছে, তবু উঠতে ইচ্ছে কবে না তাঁব। কাউকে ডাকতেও ইচ্ছে করে না।

কাকেই বা ডাকবেন? দুর্গা গিযেছে তার প্রাত্যহিক বৈকালিক আড্ডায। স্নেহলতার ফেরাব সময হয নি এখনও।

স্নেহলতা! নামটা তাঁব মনে বাব দুযেক উচ্চাবিত হতেই আবীরলাল মুখ নামিযে হাতেব কাগজটার দিকে তাকান। লম্বা একটা খামের ভেতব বযেছে কাগজটা। আজ দুপুবেই দিযে

গেছে ক্লিনিক থেকে। এখন সন্ধ্যা নামছে। এখনও তাঁর হাত থেকে খামটা নামে নি। দামি খাম, মোটা কাগজের ওপরে নামী ক্লিনিকের নাম লেখা।

নীরবেই বসে থাকেন তিনি। তাঁকে ঘিরে গাঢ় হতে থাকে অন্ধকার। আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কালো। বিপুল আকৃতি সে কালোর। এত উঁচুতে, তাঁদের জানলার ওপারের কালোতে, ঝলমলে রাস্তার আলো এসে পৌঁছয় না। ঝকমকে দোকানপাটের আলোও আসে না। এমনকি ফ্লাইওভারে ওঠবার সময় গাড়িগুলো যখন প্রায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে হেডলাইটের আলো ফেলে আকাশের গায়ে, তখনও কোনও আলো এসে ছোঁয় না এ কালোকে। শুধু দূরে, কালো আকাশের তলার দিকে, দশ তলা, বারো তলা, পনেরো তলা বাড়ির ওপরতলায় যে আলো জ্বলে, সেই আলো ছুঁতে চায়, ছুঁতে চেষ্টা করে, এই কালোকে। আবীরলালের মনে হয়, হাতিকে ধরার চেষ্টা পিঁপড়ে দিয়ে। ধরতে যারা তারা যেন পাতার তলায় হাফ লাইনের নীচে, পড়ে থাকে ফুটনোট হয়ে। আলোর ফুটনোট! নিজে ভাবেন কথাটা, মজাও পান নিজে নিজে। অল্প হাসেনও অন্ধকারে।

আজ এই প্রথম হাসলেন আবীরলাল। হাসার কোন কারণও ছিল না আজ। অকারণ হাসার দিন, হো হো করে ছাদ ফাটানো হাসি, যা দিয়ে তাঁকে চিনত বন্ধু বান্ধবীরা, করেই ফুরিয়ে গেছে। শেষ কবে হেসেছিলাম ওমনি করে? এ বাড়িতে? কোন বন্ধুবান্ধবের. নাকি কফি হাউসে?

ধুর। নিজের মনকে, স্মরণের ক্ষমতাকে যেন দুষো দেন আবীরলাল। কফি হাউস? সেখানে করে গেছি শেষ? এ যুগে? আগের যুগে? আগের জন্মে? তা-ও মনে পড়ে না। তবে একথাও ঠিক, কফি হাউসেও পরিচিত ছিল, বলা যায় বিখ্যাতই ছিল, তাঁর হাসি। সে যুগে। তাঁদের যুগে। সকলেরই তো একটা যুগ থাকে। সেই যুগেই ছাদ ফাটার কথাটা উঠেছিল। বার তিনেক তাঁর নিজের হাসি হেসেছিলেন আবীর। তারপরেই পাশের টেবিল থেকে কেউ আওয়াজ দিয়েছিল, আরে ছাদ ফেটে যাবে যে!

সে হাসি একবার পুরস্কারও পেয়েছিল, অন্তত একবার। মূল্যবান পুরস্কার। দেওয়াল ভর্তি, খাটভর্তি, টেবিলভর্তি, মেঝেভর্তি বইয়ের মাঝখানে বেতের চেয়ারে বসে একটা বই নাড়াচাড়া করছিলেন কবি। তাঁদের প্রিয় কবি। মানুষও চমৎকার। একটাই দোষ শুধু। কথা বলেন কম, কৃপণের মতো। তাঁর ওপাশে ওমনি চেয়ারে বসে বৌদি, তাঁর স্ত্রী। কথাবার্তা হচ্ছিল নানারকম। ভারি, হালকা, কাজের, অকাজের। মাঝে মাঝে হেসে উঠছিলেন আবীর। সে হাসিতে মৃদু হেসে যোগ দিচ্ছিলেন সবাই, স্নেহলতাও। বৌদির তখন হাসার অবস্থা নেই। নানারকম ব্যাথা বেদনায় ভুগছিলেন। তবু হাসছিলেন তিনি। যেন না হেসে পারছিলেন না আবীরের এ-গল্পে ও-গল্পে। কবি হঠাৎ কলম খুলে হাতের বইটার মলাট উলটে কীসব লিখলেন। তারপর কলম বন্ধ করে বইটা এগিয়ে দিলেন আবীরের দিকে।

আবীর বইটা নিয়ে, দু-হাত দিয়ে ধরে, যেন বইটা খুব ভারি, বসে থাকেন। যেন বুঝতে পারেন না কী করবেন। জাপানিরা উপহারের প্যাকেট উপহারদাতার সামনে খোলে না, মরে গেলেও। এ ব্যাপারে তাদের সামাজিক রীতি খুব কড়া। সেই কথা মনে করে, নাকি মুগ্ধ

বিস্ময়ের ভাবে, কে জানে, আবীর বইটির মলাট ওলটাতে পারেন না। স্নেহলতা তাঁর হাত থেকে বইটি টেনে নেন। কবির নিজের বই, একেবারে টাটকা বেরোনো। মলাট উলটে পড়েন তিনি। কবির দিকে তাকিয়ে স্নেহলতা হাসেন। বাঙালি মেয়েরা শুধু হাসি দিয়ে কত কথা বলতে পারে। এক হাসিতে কত রকম কথা। কবি তো সবই বোঝেন। তিনি কেমন লাজুক হাসেন। বইটি ফিরিয়ে নিয়ে আবীর পড়েন। এর পরে না পড়ে আর পারা যায়? কবি লিখে দিয়েছেন, প্রাণ খুলে যারা হাসতে পারেন, সেই আবীর ও স্নেহলতাকে।

ছাদ ফাটানো হাসির জন্যে জীবনভর পাওয়া সব তিরস্কার মুহূর্তে পুরস্কার হয়ে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যায়।

বইটা এখন কোথায়? পড়ার ঘরে? সে ঘর তো গুদাম এখন। ঝাড়পোঁছ ফাঁকাটাকা করা হয় কেউ এলে। এসে ক-দিন থাকবে বলে। তবে কোথায়? শোওয়ার ঘরে, দেওয়াল-তাকে? নাকি এই ঘরেই কোনও বুক কেসে বা তাকে? হয়ত চলে গেছে অন্য কোনও বাড়িতে, অন্য কারো বইয়ের তাকে? বইদের স্বভাবই খারাপ, একবার বেরোতে পেলে আর তারা ফিরতে চায় না ঘরে, কিছুতেই। মনে করতে পারেন না আবীরলাল। হয়ত স্নেহলতা জানে, হয়ত জানে না। হয়ত তাঁর হাসির মতো হাসির পুরস্কারও হারিয়ে গেছে কবেই। ঢাকা পড়ে গেছে ধুলোয়। আবার অন্ধকারে।

জানলার ওপারে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একভাবে বসে থাকেন আবীরলাল। জানলাটা খুব বড়। ওদিকটা দক্ষিণ। দক্ষিণে এইরকম একটা বড়, দেওয়ালজোড়া জানলাই চেয়েছিলেন স্নেহলতা। তাঁরা এই কো-অপারেটিভের মেম্বার হওয়ার সময়ই চেয়ে রেখেছিলেন স্নেহলতা।

আবীরলাল তাঁকে তার চেয়ে বেশি দিয়েছিলেন। দক্ষিণের দেওয়ালটাই প্রায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কাঠ আর কাচের ভাঁজ করা দরজা বসানো হয়েছিল সেখানে। তার ওপারে বারান্দা, গ্রিলে ঘেরা।

এই জানলা নিয়ে, এই বারান্দা নিয়ে, এত বড় আকাশ আর এত বাতাস নিয়ে এখন কী করবে স্নেহলতা? কী করব আমি?

তাঁর হাতদুটো কালের ওপর। লম্বা খামটা দু'হাতে ধরা। দুপুরে আসার পর থেকে একভাবে ধরা। রাত নটায় যাওয়ার কথা ড গাঙ্গুলির কাছে। যাওয়া যাবে। যেতে তো হবেই। কিন্তু কী হবে? কী করবেন ড গাঙ্গুলি? কী করার আছে তাঁর? কারই বা কী করার আছে!

কার্সিনোমা! কঠিন একটা শব্দ দিয়ে সাদাসিধে, আটপৌরে কিন্তু ভয়ংকর একটা কথাকে আড়াল করার কী কঠিন চেষ্টা!

বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আবীরলালের আবার মনে হয়, তবে কি অন্ধকারই শেষ কথা? সব রং শেষ হয়ে গেলে একমাত্র রং?

আবীরলালের মন ভার হয়ে যায়। সে ভার দ্রুত বাড়তে থাকে, বাইরের অন্ধকারের মতো।

স্নেহলতা কেন আসছে না এখনও? এখনও কি তার সময় হয়নি? সে এলে তাকে

পাশের চেয়ারে বসাব। নিজে হাতে গেলাস ভরে জল এনে দেব। তারপর তার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে খাবার টেবিলে রেখে ফিরে আসব নিজের চেয়ারে। কিছুক্ষণ কাটবে চুপচাপ। তারপর বলব, প্রায় ফিসফিস করে, এমন অন্ধকারে যেমন বলা যায়, একটা গান শোনাবে, স্নেহ? কতদিন তোমার গান শুনি নি!

স্নেহ আলতো করে হাসবে। বলবে,

কী ব্যাপার? আজ হঠাৎ কী হল তোমার?

একটা হাত বাড়িয়ে দেবে আমার দিকে। হাতটা ধরব এক হাতে। বলব,

গাও না। খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্নেহ বলবে,

কী গাইব?

তারপর গান হবে। লুকিয়ে আস আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে থাকবে স্নেহ। জানলার বাইরে অন্ধকার পার হয়ে আলোর জগতে পৌঁছে যাবে তার গান।

কিন্তু মৃত্যু কেন? আবীরলাল যেন বিদ্রোহ করেন। যে লুকিয়ে আসে, আঁধারে আসে, অন্ধকারের আড়াল নিয়ে আসে, অথবা সবকিছু আঁধারে আবৃত করে আসে, সে কেন হবে আমার বন্ধু? কেমন করে হবে? সে সত্য হতে পারে। কঠিন সত্য। এমন কঠিন যে তাকে এড়ানো যায় না। তাকে হারানো যায় না। তাকে ভুলে থাকা যায় না। ভুলে থাকলেও, সে-ভোলার মধ্যেও থেকে যায় সে। সে অনিবার্য। সর্বকালে, সমস্ত ঋতুতে, প্রতিটি প্রহরে, প্রত্যেকটি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে সে সত্য, কারণ সে অনিবার্য। শুধু সত্য নয়, শেষ সত্য। আকাশময় এই কালোর মতো, এই অন্ধকারের মতো। কিন্তু সে বন্ধু হবে কেন? কেমন করে হবে? আবীরলালের বুকটা ফেটে ফেটে যায় গানের কলিতে কলিতে, সুরের মোচড়ে মোচড়ে।

কী আশ্চর্য আবীরলাল, তোমার এত কষ্ট কেন? এত ভয় কেন মৃত্যুকে? মৃত্যু কি অপরিচিত তোমার? অচেনা? সে কি বারবার আসে নি তোমার জীবনে? বারবার চলে যায় নি তোমাকে প্রায় ছুঁয়ে দিয়ে। মৃত্যু কি দেখো নি তুমি?

কথাগুলো বারবার নিজেকে বলেন আবীরলাল। অনেকবার বলেন। তারপর একসময় আবার যেন বিদ্রোহ করতে চান। দেখেছি, অনেকবার দেখেছি। দূর থেকে দেখেছি। কাছ থেকে দেখেছি। খুব কাছ থেকে। অনেকবার। কিন্তু আর নয়। আর দেখতে চাই না।

শেষ কথাটা তিনি খুব জোরে, প্রায় চিৎকার করে বলতে চান, যাতে এই অন্ধকার ভেদ করে। এই আকাশ চিরে, অন্য আকাশে, আলোর আকাশে পৌঁছতে পারে তাঁর কথা। তাঁর প্রতিবাদ। তাঁর বিদ্রোহ। মৃত্যু যেন জেনে যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের কথা।

তখনই আলো জ্বলে ওঠে। মুহূর্তে সব অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে এমনভাবে আলো আসে, এমন হঠাৎ আসে, আবীরলালের চোখে লাগে। খুব লাগে। তাঁর দুই চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। তার আগেই তিনি যেন প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন,

কে?

আমি।

তুমি? তুমি এলে কী কবে?

কেন? রোজ যেমন কবে আসি তেমনি করে।

ও!

সব অন্ধকাব কবে বসে আছ কেন?

একটা চেয়ার টেনে তাঁর পাশে বসতে বসতে স্নেহলতা জিজ্ঞেস কবেন।

এমনি। মানে..ওঠা হয নি আর কি।

চা খেযেছ?

চা? না।

দুর্গা করে দেয নি?

না...ও তো সিরিয়ালটা শেষ হতেই বোজ যেমন যায।

স্নেহলতা উঠে পডেন। লোকটা চা খেতে ভালোবাসে। বিকেল থেকে একবাবও .

বসো না, এই তো এলে। একটু রেস্ট নাও. তাবপর না হয তাডাব কী?

এক্ষুনি আসছি, দেবি হবে না। রেস্ট নেওযাব কী আছে? কী এমন পরিশ্রম কবেছি যে..

তা তো বটেই! কী এমন পবিশ্রম। সেই এগাবোটায বেবিযেছিলে, এই এলে। তাব মধ্যে দেড় দেড় তিনঘণ্টা ট্রেনে। একে কি আব পবিশ্রম বলে!

স্নেহলতা হাসেন। আবীবলাল যে বোঝেন, তাঁব কষ্টটুকু অনুভব কবেন, এটা তাব খুব ভালো লাগে। বলেন, কলেজে পডানো আবাব পবিশ্রম। কতজন আবো কত..তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুনি চা নিযে আসছি। . ঠিক তিন মিনিট, ঘড়ি ধরে।

বেশ, আমি কিন্তু ঘডি দেখতে আরম্ভ করলাম।

আবীরলাল হাসেন। এটা প্রায় অহংকাব স্নেহলতাব। ঘডি দেখো, তিন মিনিটে চা! ঘড়িতে মিলিযে নাও, সাত মিনিটে কটি হয়ে যাবে।

কোনও ফোনটোন এসেছিল?

না, বলার মতো কিছু নয়।

রান্নাঘর থেকে কাপ ডিশ চামচেব টুং টাং আওয়াজ ভেসে আসে। তাব মধ্যেই স্নেহলতা জানতে চান,

লোকজন কেউ আসে নি? আমাব খোঁজে বা তোমার কাছে?

আবীবলাল উত্তব দেন না, যেন শুনতে পান নি। হাতের খামটাব দিকে তাকিযে চুপ কবে বসে থাকেন। শুটকো মতন চেহাবার সেই লোকটিব আসাকে কি আসা বলা যায়! নাকি ততটা শুটকো নয লোকটা! দেখতেও ততটা খারাপ নয। আসলে নয। সে চলে যাওযাব পব, খামটা খোলার পর থেকে মনে হচ্ছে, লোকটা কেমন যেন শুটকো মতন. যেন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। লোকটা এল, একটা কাগজে সই কবালো, খামটা দিল, পাঁচ টাকার নোটটা নিতে নিতে বলল, না, না এর কী দবকার ছিল? আমি তো আমাব ডিউটি কবছি। তাব আসা, ঠিক কাব খোঁজে, কাব কাছে আসা বলা যায?

ডিউটি! লম্বা খামে ভ'রে রিপোর্ট দিযে যাওয়া। ডিউটি। কার্সিনোমা। ডিউটি।

স্নেহলতা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ান। দু-হাতে ধরা একটা ট্রে। ট্রেতে দুটি ডিশের ওপব দুটি কাপ। একেবাবে শাদা। আর একটি ডিশে গুটিকয় বিস্কুট। তিনি জানেন আবীরলাল শুধু-চা খেতে পারেন না।

কই, ঘড়িতে মেলালে না তো!

আবীরলাল দেখেন, সাড়ে চার মিনিট। বলেন,

একেবারে অন্য দ্য ডট, ঠিক তিন মিনিট।

আবীরলাল তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। এখনও কী সুন্দব দেখতে স্নেহলতা! লম্বা। ছিপছিপে। বড বড় চোখ। কোমর পর্যন্ত চুল। চোখেব তলায় কি একটু কালি পড়েছে? মুখে কি বয়সের. নাকি কার্সিনোমার...

হাতেব ট্রেটা কাচের নীচু, গোলটেবিলে নামিযে বাখতে রাখতে স্নেহলতা বলেন,

ড. দত্তব ক্লিনিক থেকে কোনও খবর...

আবীবলাল চোখ সবিয়ে নেন। আবার জানলাব ওপারে কালো আকাশেব দিকে তাকান। তাকিয়েই থাকেন। তাঁর দুই হাতেব মধ্যে লম্বা খামটা ছটফট করে।

ট্রেনের সময়

সুব্রত সেনগুপ্ত

স্টেশনে গিয়ে শুনলাম, ট্রেন চলে গেছে।

তিনটের সময় অরেকটা ট্রেন আছে, আমি এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারি অথবা পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

একটা টিকিট কেটে বেঞ্চির ওপর বসে থাকব, অথবা, স্টলগুলোর কাছে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। একটা সিগারেট খেতে পারি। খার অথবা খার না। পরের ট্রেন আসার জন্য অপেক্ষা করব। করতে পারি আবার এখনই ফিরে যেতে পারি।

আমার বাড়িতে আমার ঘরের দরজা খুলে ঢুকব। ফিরে যার। তিনটে বাজতে এখনও অনেক দেরি। আমার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে? আজ সকালে দম দেয়া হয়নি। তিনটের ট্রেনে গেলে হয়তো, যে কাজে যাওয়ার কথা সে-কাজ হবে না। কী জানি? আমায় শুধু যেতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এই সময়। এই ট্রেন। কেন যেতে হবে, আমাকে বলা হয়নি। এখন না-গেলে কী হবে, পরে পরের ট্রেনে গেলে হবে কি না, আদৌ যদি না যাই, কী ক্ষতি হবে, আমি জানি না। আমি শুধু যার অথবা যার না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে এসেছি। ঘরের জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরের ভেতরটা এখন অন্ধকার। দরজায় একটা তালা ঝুলছে। চাবিটা— চাবি আমার কাছে ছিল। আছে তো? হ্যাঁ আমার পকেটে আছে।

আমার ঘর। এখন আমি ঘরে ফিরে যেতে পারি ভাবতে নিজেকে আশ্চর্য দায়মুক্ত, ভারশূন্য মনে হল।

আবার ট্রেনে চেপে কোথাও যার ভাবতে চলন্ত প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্মের অসংখ্যে মানুষের মুখ। ক্রমশ পিছিয়ে পড়া ধানক্ষেতের পর ধানক্ষেত চোখের সামনে ভেসে উঠল। উঠতে লাগল। বিশাল আকাশের তলা দিয়ে কোথাও যার। কারও-কারও সঙ্গে দেখা হবে। আমি এখন ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

তাহলে আমি এখন একটা সিগারেট ধরাব। হাঁটতে-হাঁটতে কিছুটা পথ হাঁটব। বেশি দূরে নয় কাছে কোথাও যার। যাতে হাঁটতে-হাঁটতে আবার সময়মতো ফিরে আসতে পারি। অবশ্য ইচ্ছে করলে মানে যেতে ইচ্ছে না-করলে না ফিরতেও পারি।

পকেটে একটাই সিগারেট ছিল, ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলাম। ঠোঁট খুব শুকনো লাগছিল। দেয়াশলাই নেই। কিনব কিনা ভাবতে-ভাবতে দোকানে টাঙানো জ্বলন্ত দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

আমি এখন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। ব্রিজটা কাঁপছে। নিচে নদীর ত্বক কাঁপছে। এক পাশে নৌকো। এক পাশে স্টিমার। দূরে নদীর ওপারে সারি সারি বাড়ি। আকাশময় বাড়ি। ওপারে কলকাতা। আকাশময় কলকাতা।

পোডা তেলের গন্ধ। ট্রাক-বাস-মানুষের শব্দ।

নদীর ওপর নৌকো। নদীব ওপব স্টিমাব। কোথাও তেল ভাসছে। বিশাল ব্রিজের ওপাবে কলকাতা। ব্রিজেব বুক কাঁপছে।

আধপোড়া শুকনো সিগাবেটটা মুখ থেকে ফেলে দিলাম। জলের ওপব খসে পড়ল সিগারেটটা। তখনই একটা ট্রাম গুমগুম শব্দে ব্রিজটা কাঁপিযে দিল।... ...

স্টিমারের ধোঁয়ায চোখ জ্বালা কবে। আমি ব্রিজটা পার হযে গেলাম।

হাফপ্যান্টপরা পুলিস হাত দেখাতে গাড়িগুলো ছুটতে লাগল। আমিও যাব। আমি যাব। কিছু দূব যাব। বেশি দূবে নয। যাতে ইচ্ছা হলে ফিরতে পাবি। সমযমতো ফিরতে পাবি। ইচ্ছে হলে না-ফিরতেও পারি।

পথের ধাবে ধাবে সাব সাব ল্যাম্পপোস্ট দাঁড়িযে আছে। আকাশে একটাও চিল নেই। ফেরিওলার ডাক শোনা যাচ্ছে না। একবাব ভাবলাম ফিবে যাব, ফিবে যাই। 'গরম চা' লেখা সাইনবোর্ড দেখে একটা দোকানে ঢুকলাম। এখন বেশি ভিড় নেই। অনেকগুলো চেযার খালি পড়ে আছে। এখন, যদি এখন হঠাৎ কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হযে যায...এখানে দেখা হযে যায . । দেখা হতেই পাবে। যেমন সুবিমল। সুবিমলেব হাতেব কবজি বেশ চওড়া। এবকম কতদিন তো কতজনেব সঙ্গে হঠাৎ দেখা হযে যায। আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। সুবিমল পথে-ঘাটে এমন হা-হা কবে হাসে যে সবাই ওব দিকে তাকাবে। সুবিমলেব সঙ্গে দেখা হলে আমি এখন স্টেশনে না ফিবতেও পাবি। ফিবতে পাবব না। আমি হযতো একটু ইতস্তত কবব। মৃদুস্ববে 'কাজ আছে' বলে আপত্তি কবব। কিন্তু ও কিছুতে শুনবে না। কিছু গ্রাহ্য কবব না। . কিন্তু সুবিমল কোথাও নেই। চাবদিকে চেনা কাউকে দেখলাম না। আবাব হাঁটতে লাগলাম। লাইনের ওপর দিযে ট্রামগুলো দৌডাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর দেখি, আমি একটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িযে আছি। কেন আছি? আমি কি কোথাও যাব? আমার পাশে দাঁড়িযে আছে এক প্রৌঢ। তার পবনে লাল সার্ট, পাযে কেডস, কাঁধে ঝোলানো কিটস ব্যাগ। হাতে টিনের বাক্স।—বাসেব অপেক্ষায দাঁড়িয়ে আছে। তাব সঙ্গে নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা এক মহিলা। কোলে শুধু ছোটো জামাপবা একটি ছেলে। তাব পাশে গগলস চোখে মোটা একটা মেযে। তাব পাশেব মেযেটিব চোখে গগলস নেই। টাইপরা এক ভদ্রলোক। তাব পাশেব ভদ্রলোকেব গলায টাই নেই। এবা প্রত্যেকেই কোথাও না কোথাও যাবে। সেজন্য এবা বাসেব অপেক্ষায দাঁড়িযে আছে। একজন বলে উঠল, বাস আসতে এত দেবি কবছে কেন? উত্তবে আবেকজন কী বলল। একসঙ্গে একই কাবণে অপেক্ষা কবছে বলে সবাই বোধহয নিজেদেব মধ্যে একটা সম্পর্ক অনুভব করছে। টাইপবা লোকটি কী যেন বলতে-বলতে আমাব দিকে তাকিযে একটা ভঙ্গি করল—যাব মানে, তাই না?

আমি তাকে বলতে পারলাম না, আমি আপনাদেব দলে নেই। আমি বাসেব জন্য অপেক্ষা কবছি না।

হঠাৎ দেখা গেল, একটা বাস দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে। এদিকেই। কেউ বলল, আসছে, ওই আসছে...বাস এলে সবাই তাড়াহুড়ো কবে উঠবাব চেষ্টা কবতে লাগল। তাবপর পথটা পেছনে ফেলে বেখে সমস্ত বাসটা, বাসেব যত যাত্রী হু হু করে চলে গেল। আমি একা, বাসস্ট্যান্ডে আমি একা দাঁড়িয়ে থাকলাম।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূবে চলে এসেছি। পথের ও-পাশে বিবাট তাঁবু ফেলা হয়েছে। তাঁবুব মাথায পত পত করে পতাকা উড়ছে। আমি কোনওদিন সার্কাস দেখিনি। কেন দেখিনি, কী জানি। মুখে সাদা রং মেখে একটা লোক নেচে ভিড় জমাচ্ছিল। ঢোকার দরজায ছেঁড়া পর্দা ফেলা। ভেতর থেকে ব্যান্ড বাজানোর শব্দ আসছিল। সার্কাসে বোধহয় বাঘ আছে। রয্যাল বেঙ্গল টাইগার। আমি কযেকবাব বাঘের ছবি দেখেছি। বাঘেব গায়ে হলদের ওপর উজ্জ্বল ডোবাকাটা দাগ। দু'একজন লোক নাকি খালি হাতে বাঘ মারতে পারে! কিন্তু কেউ শুধু লাঠি, ছুবি দিযে বা খালি হাতে বাঘকে হাবিয়ে দিযেছে শুনলে আমার খুব খারাপ লাগে।

—কত কবে টিকিট?

সার্কাসের কাউন্টাবে অনেকে লাইন দিযে টিকিট কিনছে। তখন আমি স্টেশন থেকে শুধু হাতে ফিবে এসেছি। টিকিটি কাটিনি।

কখন ফিবে যাওযার ইচ্ছায, ফিরে না-যাওয়াব ইচ্ছায, কোনও কিছুব ইচ্ছে ছাড়া ফিরতে লাগলাম। চায়েব দোকানে সুবিমল বা অন্য কারও সঙ্গে দেখা হতে পাবত। একটা টিকিট কেটে সার্কাস দেখতে পারতাম। অথবা অন্য কোথাও না-গিযে বাড়ি ফিবতে পারতাম। অথবা অন্য কোথাও, অন্য কিছু....

আমাব পাশ দিয়ে একটা ট্রাক ছুটে গেল। কোথাও যাচ্ছে।

বাসগুলো ছুটছে। কোথাও যাচ্ছে।

ট্রামগুলি, মানুষবা কোথাও যাচ্ছে। সবার, সব কিছুব গন্তব্য আছে।

আমি স্টেশনেব দিকে হাঁটছি। স্টেশন আর কত দূব? অনেকক্ষণ হেঁটেছি, পা'দুটো ভাবী ভারী লাগছিল। আমি আব কোনও দিকে তাকাতে চাই না। কোনও কিছু শুনতে চাই না। নিজের সঙ্গে কথা বলতেও ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল।

স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছাতে বিবাট ঘড়িটা চোখে পড়ল। অজস্র মানুষ, মানুষের লট- বহরে তাড়াতাড়ি এগিযে যাওযাব উপায ছিল না। ভিড়ে ভিড়ে ধাক্কায ধাক্কায ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম।

কোলাপসিবল্ গেটেব কাছে পৌঁছতে, না পৌঁছতে দেখতে পেলাম, আমার ট্রেন চলে যাচ্ছে। চোখেব সামনে ট্রেনেব এক-একটা কামবা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িযে থাকলাম। চামড়ায ঢাকা বুকেব মধ্যে নিঃশ্বাসেব সঙ্গে মনে হল, হযতো শেষ ট্রেন চলে গেল। আবাব কখন ভিড়ে ভিড়ে ধাক্কায় ধাক্কায় ভিড়েব সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভিড়ের মধ্যে ভাসতে দেখলাম।

আজকের দিনটা

আশিস ঘোষ

হাত তুলে ডাকল মনোজ। কয়েকটা টেবিল পেরিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝুল বারান্দার দু'দিকেই চেয়ার-টেবিল। সব টেবিলেই চারটে চেয়ার। মুখোমুখি। মনোজ কোণের দিকে ছিল। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখাল।—এত দেরি কেন?

বলতে পারতাম ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাম-বাসের ভিড়। ট্যাকসি পাইনি। আরও অনেক কারণ দেখানো যেত। কিছু না বলে, চুপ করে রইলাম। মনোজ আবার বলল,—বললি না, দেরি হল কেন?

চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দেয় মনোজ। কাপটা রেখে সিগারেট ধরায়। টেবিলে চায়ের পট, কাপ, দুধ চিনি সবই আছে। ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, কাপে চা ঢেলে নিলাম। নিচের রাস্তায় লরির জটলা। হর্নের শব্দ। মনোজ ওদিকে চেয়েই সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। মাঝে মাঝে কাপে চুমুক দিচ্ছে। কেমন যেন অন্যমনস্ক। বুঝতে পারছি না, হঠাৎ ও আমাকে এরকম একটা চিঠি দিল কেন। —আজ এই সময়ে, এখানে থাকবে। অবশ্যই যেন আসি। হয়তো আর দেখা হবে না। হয়তো—

ওর মুখ দেখে এখন বোঝার চেষ্টা করছি। চিঠিটা পকেটেই আছে। জানতে চাইব কি, এরকম চিঠি কেন লিখেছে? এখানেই বা আসতে বলেছে কেন? ও আমার অনেক দিনের বন্ধু। এক সময় আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছি। এক সঙ্গে লেখালেখি, পত্রিকা বের করেছি। তখন কত স্বপ্ন ছিল। অস্থিরতা ছিল। এখন অবিশ্যি, রোজ দেখা হয় না। আমাদের প্রত্যেকেরই দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। ও থাকে শহরের উত্তরে। আমি থাকি অনেক দক্ষিণে। কখনো দেখা হয় কিংবা অন্য কারুর কাছে খবর পাই। ইদানীং নাকি কারুর সঙ্গেই আর দেখা-টেখা করে না। বাড়ি থেকেও খুব একটা বেরোয় না। কিন্তু আজ হঠাৎ এখানে কেন? আমাকেই বা চিঠি দিয়ে ডেকেছে কেন? কিছুই তো বলছে না। রাস্তার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে। কতক্ষণ এভাবে থাকা যায়? আরও কিছুটা অপেক্ষা করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম—কীরে, বল কিছু?

মনোজ নিচের রাস্তার দিকেই চেয়ে রইল। মনে হল না, আমার কথা শুনেছে। এই হোটেলের দোতলাটা শুধু রেঁস্তোরা-বার। জুক বক্সে সেতার বাজছে। বোধহয় 'টোরি'।

—কী ভাবছিস অত?

ও এবার সোজাসুজি তাকাল আমার দিকে। একটু যেন অন্যমনস্ক। আবার রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল,—এমনিই চেয়ে আছি—

রাস্তাটা বেশ চওড়া। দু'দিকের ফুটপাথ দিয়ে অসংখ্য মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। সবার মুখ নিচের দিকে। ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে একটা লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। অন্ধ বোধহয়। ভিক্ষা

চাইছে। সামনে দিযে হেঁটে যাওযা মানুষগুলো একবাবও ফিরে তাকাচ্ছে না। একটু আগেও বিকেলেব রোদ ছিল। এখন অন্ধকাব হযে আসছে। এই সময়ে এমনিতেই কেমন মন খাবাপ হযে যায। এখন তো আরও খাবাপ লাগছে। আমবা মুখোমুখি বসে। কোনও কথা হচ্ছে না। আমি এখানে আসাব পর থেকে ও অন্তত পাঁচটা সিগারেট শেষ কবল। মনোজ একটু বেশি ধূমপান করে জানি, কিন্তু তাই বলে এত! কী বলব ভাবছি, মনোজ হাতের ইশাবায বেযারাকে ডাকল।—নিবি কিছু?

—দবকাব নেই। তুই নে—

আসলে ভেতবে ভেতবে খুব চটে যাচ্ছি। এখানে এসে ওব দিকে চেয়ে বসে থাকার জন্যেই কি আমাকে ডেকেছিল? এত কাযদা কবে তবে চিঠি দেযা কেন? একটু বিবক্ত হযেই বললাম—এখানে বসে বসে ধোঁযা গিলছিস কেন? চল বাইবে যাই—

শাদা উর্দিপবা বেযাবা এসে দাঁড়াল। আমাব দিকে হাত দেখাল মনোজ—বল না কিছু—

—বললাম তো আমাব দবকাব নেই—

মনোজ ড্রিংকস দিতে বলল। সঙ্গে সোডা। সোজা হযে বসলাম। করছে কী লোকটা? চা আবাব ড্রিংকস। পাগল নাকি?

আলতোভাবে টেবিলে টোকা দিযে মনোজ বলল,—তোদের সঙ্গে আব হযতো দেখা হবে না—

—উল্টোপাল্টা বকছিস কেন? চল, বাইবে যাই—

—কযেকটা কথা বলাব আছে—আমাব দিকে চেযে কী যেন ভাবছে মনোজ। জুক্ বকসে এখন সেতাব বন্ধ হযে গান হচ্ছে।—ব্যথার কথা যায ডুবে, যায় গো—

বেযাবা দুটো 'পেগ' দিযে গেল। সঙ্গে সোডা। ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে গ্লাস উল্টে দিযে সোডাব বোতল নিচেব বাস্তায ছুঁড়ে দেই।

মনোজকে দেখলাম। ও মাথা নিচু করে বসে। রাস্তায কযেকজন চিৎকার করে ঝগডা কবছে। হর্ন দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি চলে গেল। ও-পাশের গলি দিয়ে একটা স্কুটার এসে হোটেলের সামনে দাঁড়াতেই উঠে দাঁডিযে বললাম—চল এবার ওঠা যাক।

আমাকে হাত নেড়ে বসতে বলে, টেবিলে দেযা একটা গ্লাস তুলে নেয় মনোজ,—খুব তাড়া আছে?

—কেন?

—বোস না একটু—

অগত্যা আবাব বসতেই হল। বললাম—বসেই তো আছি। তুই তো কিছুই বলছিস না।—

—কী বলব তোকে? বললাম তো, আর হযতো দেখা হবে না—

—ওসব নাটক ছাড। কেন আমাকে চিঠি লিখলি—এখানেই বা এসেছিস কেন—কিছুই তো বললি না—

মনোজ কী যেন বলতে গিযেও বলে না। প্যান্টের পকেট থেকে শাদা একটা খাম বের

কবে এগিয়ে দেয়। খামটা খুলতেই শাদা একটা কাগজ। কিন্তু একি! এ তো ডাক্তারি রিপোর্ট! তাড়াতাড়ি রিপোর্টটা পড়লাম। লিভারের 'ম্যালিগনান্ট গ্রোথ'! মনোজের দিকে চাইলাম। ও আমার দিকেই চেয়ে। চোখাচোখি হতেই ম্লান হেসে বলল,—কাল নার্সিং হোমে ভর্তি হচ্ছি। অপারেশন হবে—তারপর কদ্দূর কী হবে জানি না—

নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। এরকম অবস্থায় কেউ যে এখানে এসে উল্টোপাল্টা গিলতে পারে—একটার পর একটা সিগারেট—ভাবাই যায় না! ওর কি কোনও কষ্ট হয় না? ও কি আজকেই নিজেকে শেষ করতে চায়? কী বলব বুঝতে পারছি না। অস্বস্তি হচ্ছে। নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

একটা মিছিল যাচ্ছে। সবাই কালো পোশাক পরা। অনেকের হাতেই পোস্টার। কী যে লেখা আছে, এখান থেকে পড়া যাচ্ছে না। মৌন মিছিল। নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে। মিছিলের পেছনেই একটা কালো প্রিজন্ ভ্যান। ওরা ট্রাম রাস্তার দিকে যাচ্ছে। মনোজ বলল,—জানিস, রাতের পর রাত ঘুমুতে পারি না। রোগের কষ্ট, নানা চিন্তা ভাবনা—কী হবে বল তো? আমার বউ মেয়ে—এরাই বা দাঁড়াবে কোথায়? কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মনোজ। এদিক-ওদিক চেয়ে আবার বসে পড়ে। কেমন যেন অস্থির। কী করব বুঝতে না পেরে, ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

মনোজ বাইরের দিকে চেয়ে। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িটা এখন অন্ধকার। ওদিকের পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক এদিকেই চেয়ে আছে। এ্যাসট্রেটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে বললাম,—কবে থেকে এসব হয়েছে? কিছুই তো জানি না—মনোজ একভাবেই বসে রইল। ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম—এত ভাবছিস কেন? অসুখ-বিসুখ আছে, তার চিকিৎসাও তো আছে—

মনোজ আমার দিকে তাকাল। চোখদুটো ভীষণ লাল। কপালে-গালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ। ওকে কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে। যেন অনেক দূরের কেউ। আমার দিকে চেয়ে মনোজ বলতে লাগল,—দ্যাখ, গত দু'এক বছরে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চলে গেল। কেন বল তো?

জুক বক্সে এখন মাউথ-অর্গানের ক্যাসেট। দ্রুত লয়। আশপাশের টেবিলগুলো ভর্তি। উর্দি পরা দু'জন বেয়ারা ছুটোছুটি করছে। ওদিককার ঘরে গ্লাস ভাঙার শব্দ হতেই, একজন বেয়ারা ছুটে গেল। গ্লাসে বেশ কয়েকটা বিল জমা পড়েছিল। হিসেব করে দেখলাম, টাকার পরিমাণ নেহাত কম নয়। তার মানে, আমি এখানে আসার অনেক আগে থেকেই ও এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এসব উল্টোপাল্টা খেয়ে যাচ্ছে। বিলগুলো গুছিয়ে ওর দিকে চাইতেই, ও কয়েকটা পঞ্চাশ টাকার নোট গ্লাসে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।—চল, এবার যাওয়া যাক—

উঠে দাঁড়ালাম। মনোজ আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। পেছনে আমি। রাস্তায় নেমে

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোকজন গাড়ি—এসবের দিকে তাকিয়ে। এক সময় হাঁটতে শুরু করল। পা টলছে। রাস্তায় ভিড় এখন অনেকটা কম। গাড়ির জটলাও নেই। ফুটপাথ ধরে আমরা পাশাপাশি বসে হাঁটছি। চারপাশে শব্দ মানুষ আলো—কিন্তু আমরা যেন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। খানিকটা এগুতেই ডানদিকে অন্ধকার ময়দান। বাঁদিকে জাদুঘরের বিশাল নির্জন বাড়ি। ভেতরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঙ্কাল ঝুলছে। ওখানে কাচের শো-কেসে বহু বছরের পুরোনো 'মমি' আছে। জাদুঘরের সামনে দিয়ে হাঁটলে, কেমন যেন গা শিরশির করে। এখন মনোজের পাশাপাশি হাঁটছি। ময়দানের দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। বাঁদিকের বিশাল বাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই, সেই শিরশিরানি ভাবটা পেয়ে বসল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি আসতেই, মনোজ হঠাৎ একটা ট্যাকসি দাঁড় করাল।

—চলে যাচ্ছিস? মনোজ উত্তর দিল না। ট্যাকসির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। একটু এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—কোথায় যাচ্ছিস? মনোজ মুখ বাড়িয়ে বলল,—তোর অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। কিছু মনে করিসনি তো?

কী জবাব দেই? চুপ করে রইলাম। ট্যাক্সি স্টার্ট নিতেই ও বলল—আজকের দিনটা মনে রাখিস—ট্যাক্সি এবার গড়াতে শুরু করল। কালো পিচের রাস্তায় গড়াতে গড়াতে আর পাঁচটা গাড়ির ভিড়ে মিশে যেতেই, ট্রাফিকের লাল আলো সবুজ হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে রইলাম। একা। ময়দানের দিকটায় এখন আরও গাঢ় অন্ধকার। বেশ কয়েক বছর আগে এই অন্ধকার ময়দানে হাঁটতে হাঁটতে মনোজ বলেছিল,—জানিস, অন্ধকারের একটা নিজস্ব শব্দ আছে। ও কি সেই শব্দের সন্ধানে গেল?

ভেতরের রাস্তা দিয়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে কয়েকজন এগিয়ে আসছে। জনা দশেকের একটা দল। কুষ্ঠ রুগি। হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ। দু'জন ড্রাম বাজাচ্ছে। বাকিরা থালা হাতে পয়সা চাইছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে একজন সামনে এসে থালা হাতে দাঁড়াতেই, একটু পাশে সরে গেলাম। কাছেই একজন দাঁড়িয়ে। আমার দিকে চেয়ে আছে। মুখ ফ্যাকাশে। এমন শাদা চেহারা কোনওদিন দেখিনি। পোশাকটাও শাদা। লম্বা সাদা চুল কানের দু'পাশ দিয়ে প্রায় পিঠ পর্যন্ত নেমে গেছে। লোকটার চোখ দুটো দেখে চমকে উঠলাম। ঠিক যেন একটু আগের মনোজ চেয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে চাইলাম। ছুটন্ত গাড়ির মিছিল। কালো পিচের রাস্তায় চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। পেট্রোল আর ডিজেলের গন্ধ। কাছেই ল্যাম্পপোস্ট একটা। পোস্টের ছায়া ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। আমার দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। এদিকেই—

এসো সুসংবাদ, এসো

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আমার এন্.জি.ও.আমাকে কিছুদিন হল বন্দগাঁও-তে পাঠিয়েছে। ওখানে বছবখানেক ছিলাম। বন্দগাঁও হল ঝাড়খণ্ডে, পশ্চিম সিংভূম জেলায। চাইবাসা থেকে রাঁচী যাবাব পথে হিবনি পেরিযে বন্দগাঁও। বন্দগাঁও একটা ব্লক। বিডিও অফিস আছে। একটা থানা আছে, একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে। ওই প্রাইমারি হেলথ্ সেন্টারের সঙ্গেই আমরা কাজ করি। আমাদের একটা প্যাথোলজিকাল ইউনিট আছে, কিছু পবীক্ষা করে দিই, স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য কিছু কাজ কবি। আমাদেব এন জি ও ভারত জুড়ে কাজ কবে। ভারতের বাইবেও।

বন্দগাঁও অঞ্চলে মুণ্ডাদের সংখ্যাই বেশি। মুণ্ডা ছাড়া অল্প কিছু হো আছে, বীরহোড় আছে। পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চল। কতরকমের গাছ নাম জানি না। জঙ্গলেব একটা নেশা ধরানো গন্ধ আছে, নেশা ধবানো ছাযা আছে, আর নেশা ধবানো রাস্তা। এর আগে আদিবাসী অঞ্চলে আমি কাজ করিনি। যখন সিংভূমে যেতে বলল, আমি রাজি হয়ে গেলাম।

আমাদের একটা জিপ আছে। চাইবাসাতে মালপত্র নিয়ে নেমেছিলাম। আমাকে নিতে এসেছিল জিপগাড়িটা। ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যান্ট কল্যাণ মুণ্ডা এসেছিল আমাকে নিতে।

প্রথম দিনেব অভিজ্ঞতাটা আমাব বেশ মনে আছে। চাইবাসা থেকে জিপ চলল। বোবো নদী পার হল। শক্তি চট্টোপাধ্যাযেব কবিতায বোরো নদীর কথা আছে জানি। এই শীর্ণ, কৃশ্ন নদীটায কোনো কবিতা লেখা ছিল না। গদ্যময় বদ্ধজলে কয়েকটা মানুষ এবং শুয়োর স্নান করছিল।

করাইকেলা পার হবাব পব টেবো ঘাঁটিতে ঢুকল আমাদেব গাড়ি। পাহাড় কেটে রাস্তা। জুলাই মাস। আকাশে দু-চার ছিলকা মেঘে মোহ বযেছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। পাহাড়ের গাযে হাল্কা মেঘের প্রলেপ, কিন্তু গাছের পাতাদের গাযে তৃষ্ণা লেগে আছে।

একটা মিছিল দেখলাম, ৩০/৩৫ জনেব শোভাযাত্রা। কল্যাণ মুণ্ডা বলল, দেখুন স্যার, দাঃ পরব। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা। এ বছব এখনো বৃষ্টি হযনি তো। দেখলাম মেযেবা সব ছেলেদের পোশাক পরেছে। ফুলপ্যান্ট, শার্ট, লুঙ্গি। কাকর প্যান্ট খুব ঢলঢলে। হয়তো ওদের দাদাব, দড়ি দিয়ে আটকে রেখেছে। কেউ টুপি পরেছে, কালোচশমাও কেউ। ওদের সবাব হাতেই একটা করে গাছের ডাল। শালগাছের পাতা চিনতে পারছি, অন্য গাছেব পাতা চিনতে পারছি না। ওরা একটা গান করছে।

কল্যাণ বলল, ওরা গান গাইতে গাইতে হিরনি ঝর্না পর্যন্ত যাবে। ওই ঝর্নায় স্নান করবে, ওই গাছের ডালগুলো জলে ভাসাবে। তারপর আবার গান করতে করতে অন্য পথে গ্রামে ফিরবে। একটা কম বয়সেব মেযে, পরনে ছেঁড়া জিনস্, গেঞ্জি, মাথায় টুপি, কাপড়ে বাঁধা সন্তান ঝুলিযে বেখেছে পিঠে। গানের মানে জিজ্ঞাসা করলাম হিন্দিতে। ওরা ঠিক বুঝল না।

কল্যাণ বুঝিয়ে দিল গানের কথা। হে জলের দেবতা, জল দাও, কী কবে ক্ষেতি-বাড়ি হবে, কী কবে দুটো ভাত দেব পেটে। একেবাবেই সেই আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে, মুণ্ডাবী ভাষায়।

দুই

আমাদেব অফিস বাডিটা দোতলা। উপবেব একটা ঘরে আমি থাকি। বিবাট আকাশ, আকাশের চাবদিকে পাহাড়ের পাড। হাওযায় বড় বড গাছ মাথা দোলায। বর্ষাও নামে। আকাশ জুড়ে মেঘ আব বিদ্যুতেব লেখা। বর্ষাভেজা গাছেদেব গা থেকে একটা গন্ধ বেব হয। এইসব প্রকৃতির কথা আমি ভালো বর্ণনা কবতে পাবি না। কাঠখোট্টা মানুষ। আমি মানুষেব বিষ্টা ঘেঁটে জিয়াডিয়ার জীবাণু দেখি, কৃমিব লার্ভা দেখি, পেচ্ছাপেব ইউরিক এ্যাসিড মাপি, সুগার মাপি। এই ব্যাপক বনবৃত্তান্ত কী করে বোঝাই? বন কথাটা লেখার পব বনবাজি লিখতে ইচ্ছে করছে। আর মহিমা শব্দটাও বেশ ভালো। কীভাবে ইজি কবি? যে বাস্তাটা বাঁচীব দিকে গেছে, ওই রাস্তায ট্রাক কলকাতা বা টাটা থেকে ট্রাক ভর্তি ডিটাবজেন্ট, কসমেটিকস্, গাবমেন্টস, ইলেকট্রনিক্স, এইসব কত কিছু যায, বন্দগাঁও সেই দ্রুত ধাবমান শকটগুলির হাওযা পায শুধু, কালো ধোঁয়া পায। ওইসব লেল্যান্ড, মাহিন্দ্রা, টাটা, টযোটাবা ভীমগর্জনে ছোটে যখন, এদিকেব মানুষেরা জঙ্গলের ধাবে, পাহাড়ের গাযে সরে যায। বাতে বুনো ফুল। বুনো ফল পিচ বাস্তায পড়ে গেলে সকালের ট্রাকের স্বাভাবিক টাযাব ওগুলো তো পিযে দেবেই, আমবা ভেবে কবব কী।

বন্দগাঁও-তে কযেকটা দোকান আছে। চা, সিঙ্গাবা, পকোডা, গজা আব ধোস্কা পাওয়া যায। ধোস্কা হল চাল-ডাল আটার গোলা তেলের মধ্যে ভাজা। গরম গরম বেশ লাগে। একটা হোটেলও আছে। ট্রাক ড্রাইভারবা খায। রুটি, তডকা, আন্ডা, মাঝে মধ্যে চিকেন। মাছ কখনোই পাওয়া যায না। আমি অবশ্য বান্না কবেই খাই। বন্দগাঁও-এ সপ্তাহে দু-দিন হাট হসে। শনি আর মঙ্গল। হাটে তবিতবকাবি খুব শস্তা। ভাগা কবে বিক্রি করে অনেকেই। দাড়িপাল্লা কেনাব পযসাটাও খবচ কবতে পাবে না অনেকে। একটা সাদা ধুতি আর গলায পৈতে পরা মানুষ কাঁঠালের বিচি বিক্রি কবছিল। দু-টাকা ভাগা। দু-টাকায অনেকটা। যদিও কাঁঠালদানা খেতে ভালোবাসি, কিন্তু একা লোক এত কী হবে? শুকিযে যাবে, কিংবা ফাংগাস পড়ে যাবে। আমি দু-টাকাই দিলাম, কিন্তু ভাগাব অর্ধেক নিলাম। ও বলল এক টাকাব বিক্রি নেই, পুরো ভাগাটাই নিতে হবে। আমি বোঝালাম আমি দু-টাকাই দিচ্ছি, কিন্তু নেব অর্ধেকটা। ও বাজি হল না, জোব কবে ব্যাগে ঢুকিযে দিল। ও ভাঙা হিন্দিতে বোঝানোব চেষ্টা কবল বেইমানি করতে পাববে না।

ওব গলায পৈতে দেখে আমি ব্রাহ্মণ ভেবেছিলাম। এবং এই আদিবাসী এলাকায, এই জঙ্গলে কাঁঠালদানা বেচা এই দবিদ্র সবল ব্রাহ্মণেব অস্তিত্বে আশ্চর্য হযে গিযেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম ,আপ ব্রাহ্মণ হ্যায?

ও ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকিযেছিল আমার দিকে। যেন ব্রাহ্মণ শব্দটাই শোনেনি। আমি ওব পৈতেটাব দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্রামহন? ব্রামহন?

ও বলল নেহি জী। হাম বীবসাইযত।

তিন

বীর সাইযতরা হল বীবসা মুণ্ডাব... কী বলব..অনুগামী? টর্চ বেযারাব? ফলোযাব? ঠিক বোঝাতে পাবছি না। ওরা বীরসা মুণ্ডাকে মানেন। ভগবান বলে মানেন। বলেন—বীবসা ভগোয়ান।

বীবসাইয়ত কথাটা প্রথম শুনলাম আমি এখানে। তবে বীবসা মুণ্ডাব নাম জানি। মহাশ্বেতা দেবীব অরণ্যের অধিকার নামে একটা বইযেব কথা শুনেছি, পড়িনি। এখানে দু-এক জনের গলায় বীরসা-গান শুনেছি। "উলিহাতুরে জনম নেলা বীরসা ভাগোয়ান।" তাব বীরত্বগাথা নিয়ে গান এখনো এ অঞ্চলেব মানুষ গায। আসলে এই অঞ্চলটাই বীরসাব কর্মক্ষেত্র। এই বন্দগাঁও-কে কেন্দ্র করে পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটাব জাযগা জুড়ে বীরসার কাজেব জাযগা ছিল। মানুষেব মুখের গানে শুনেছি বীবসা উলিহাতুতে জন্মেছিলেন, চালকাদে বড় হযেছিলেন, ডোম্বাক বুরুতে লড়াই কবেছিলেন, আব ভগবান হযেছিলেন বন্দগাঁও-এ। বীবসা ভগবানের সৈন্য সামন্তবাই হল বীরসাইয়ত।

এই জাযগাটা কোলহান ক্ষেত্র। মানে কোলদেব এলাকা। এখানে গ্রামকে নিযন্ত্রণ কবে মাঝি, এবং কযেকটা গ্রামের নিয়ন্ত্রক মানকি। এই মাঝি-মানকি প্রথা অনেক দিনেব। জঙ্গল কেটে যারা বসত কবেছে, ওদের বলে খুঁটকাটি। গ্রামেব অনেকটা জমিই ছিল যৌথ মালিকানায। ব্রিটিশবা এই ব্যবস্থা ভেঙে দিল। ব্যক্তিগত খাজনাব নিযম কবল, মিডলম্যান এল, নানা ধবনের কর্মচাবী এল। বিভিন্ন আড়কাঠিগুলো চা বাগান, সুন্দববন, এসব এলাকায কুলি জোগাড় কবে বাইবে পাচার কবতে লাগল, এই সময বিরসাব জন্ম হয, ১৮৭৪/৭৫ সালে। বন্দগাঁও-এব বি ডি ও একটা বই দিযেছিল, কুমার সুবেশ সিং-এব দি ডাস্ট স্টর্ম অ্যান্ড দি হ্যাংগিং মিস্ট। ওই বইটা বীরসার জীবন নিযে লেখা।

পডলামও, আব জিপ থাকার সুবিধার জন্য কিছু জাযগা দেখলামও। উলিহাতু গেলাম। উলি মানে আম। হাতু মানে বসতি। এখন কোনো আমবাগানের চিহ্ন নেই। এটা ছিল ওদের পৈত্রিক বাড়ি। একটা মন্দিবমতো কবা আছে ওখানে, বাইরে মন্দিরের উদ্বোধক এক মন্ত্রীব নাম বড় বড় করে লেখা, ভিতরে বীরসাব মূর্তি। একজন পাহান বোজ পুজো করে।

বিবসার বাবা সুগনা মুণ্ডা এই গ্রাম ছেড়ে চলে যান চালকাদ। সুগনাব মা গর্ভবতী ছিল। চালকাদেব কাছে মানবা গ্রামে বীবসাব জন্ম হয। বীবসার মা জন্মনাড়ি সমেত বীবসাকে নিযে চালকাদে আসে। নাড়ি কাটা হয। বীবসাব জন্মনাড়ি যেখানে মাটিতে পোতা হযেছিল, সেখানে একটা পাথব রাখা আছে।

জানি না কোনটা ঠিক। লোকগানে বলছে উলিহাতুতে জন্মেছেন বীরসা, সুবেশ সিংও তাই লিখছেন, কিন্তু আমবা তো দেখলাম সেই উদ্ধত পাথবটিকে, যে জন্মনাড়িব স্থান নির্দেশ করছে। বীরসার জ্যাঠামশাই খ্রিস্টান হযেছিলেন। বীরসাব বাবাও খ্রিস্টান হলেন। ওর বাবা ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন, চালকাদে স্কুল ছিল না, মামাবাড়ি আয়ুবহাতুতে চলে এলেন বিবসা, কাছাকাছি একটা স্কুল ছিল। ওখানে প্রথমে পড়াশুনো কবেন বিবসা।

ওই স্কুলে টালিব চাল ধারণ কবার জন্য শালকাঠের আড্ডা আছে। দশ বছরের বীবসা

নাকি ওই ভারী কাঠ উপবে তুলেছিলেন। আব আযুবহাতুব মামাঘবে সমরাই মুণ্ডা, পাকু আর ডিবরা মুণ্ডা থাকে। আমি যখন যাই, ওরা রুগডা পরিষ্কার কবছিল। কগড়া হল জঙ্গলের একধরনের ছত্রাক। খায়। ওদের ভিটেতে শুযোর চবছে। খুব উদাসভাবেই বলেছিল আমরা পাণ্ডু মুণ্ডার নাতি। আব পাণ্ডু মুণ্ডা ছিল বীরসার মামা।

এবপর বীরসা চাইবাসার জার্মান মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেন। কোনো এক মিশনারি বলেছিলেন আদিবাসীরা অসৎ। সেই মিশনারিকে আক্রমণ করেছিলেন বীরসা। যেন সেই ওটেন সাহেব এবং নেতাজী। ফলে এ স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন বিরসা। এরপর উলিহাতুতে কিছুদিন থাকেন, তারপর চলে আসেন বন্দগাঁও-তে। ১৮৯১ সালে।

বন্দগাঁও-এর রাজাব মুন্সি ছিলেন আনন্দ পাঁড়ে। আনন্দ পাঁড়ে বীবসার একটা কাজ জোগাড় কবে দেন তাঁব সেবেস্তায। আনন্দ পাঁড়ের সঙ্গে থেকে বীবসা বামাযণ মহাভারত, পুবাণ, বৈষ্ণব শাস্ত্র এসব পডেন, বোঝাব চেষ্টা কবেন। বীরসা তখন ব্রাহ্মণদের মতো পৈতে নিলেন, তুলসী পুজো করতে থাকলেন। ধর্মগুরু হযে পড়লেন ক্রমশ। কিছুটা ক্রিশ্চিয়ানিটি, কিছুটা শরণা ধর্ম, মানে অদিবাসী ধর্ম, কিছুটা হিন্দুধর্ম মিলেমিশে বীরসা ধর্ম তৈরি হল। এব মধ্যে প্রতিবেশীদের সদ্ভাব রাখা একটা বড় কথা। সেবাধর্ম, সংঘবদ্ধ প্রার্থনা, আর শুদ্ধ জীবনযাপন। বিবসা মদ খেতে নিষেধ করলেন। পরিশ্রমী হতে বললেন। বীরসা ধর্ম যারা মানতে লাগল, তাবাই বীরাসাইযত। আর বীবসাইয়তবা বীরসাকে খ্যাত কবল 'ধরতী আবা' বলে। মানে বিশ্বপিতা।

এর পরের অধ্যায় বীরসাকে কেন্দ্র কবে নানা অলৌকিক গল্প আছে। কাউকে স্পর্শ করে রোগ ভালো কবে দিযেছেন, কখনো এমন ভবিষ্যৎবাণী কবেছেন যে ফলে গেছে এবকম অনেক কথা। বীরসা ভগোয়ান যা বলবেন তাই হবে। এমন বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেল ১৮৯৫ সালেব মুণ্ডাদের মধ্যে।

মুণ্ডা সর্দারদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। বীবসা বললেন আংবেজ তাড়াও, দিকু তাড়াও, আমবাই জিতব, মুণ্ডাবাজ কাযেম হবে। বীরসা ভগোয়ান বলেছেন সুতরাং মুণ্ডারাজ আসবেই—এই বিশ্বাসে লড়াই শুরু হয়ে গেল। বীরসা ঘোষণা করেছিলেন আমিই বাজা।

এরপরের ঘটনা সবাই জানেন। বীবসা গ্রেপ্তাব হন। দু-বছর পর ছাড়া পান। ১৮৯৯ সালে ডোম্ববীবুরুতে ইংবেজ ফৌজ-এর সঙ্গে লড়াই হয়। প্রচুর মুণ্ডা মারা যান। ১৯০০ সালে বীরসা ধরা পডেন বোগত নামের একটি গ্রামে। তার একজন বিবাহিতা স্ত্রী এবং অন্য একজন সঙ্গিনীসহ। বলেছিলেন ফিবে আসব আবার এখানেই।

চার

সবকারি হাসপাতালের তথ্য থেকে জানতে পেরেছিলাম রোগত গ্রামের কোনো বাচ্চাকে পোলিওর টিকা খাওযানো যায়নি। গ্রাম থেকে বাধা এসেছে। রোগত ছাড়াও আরও ৩/৪টি গ্রামের নাম পেযেছিলাম, যেখানে পোলিও টিকাকবণ সফল হযনি। একদিন ঠিক কবলাম বোগত যাব। কল্যাণও আছ। বন্দগাঁও থেকে ১৫ কিলোমিটার দূবে রোগত। জঙ্গলেব ভিতর

দিযে কাঁচা রাস্তা। ওই রাস্তা বেয়ে মাথায় করে কাঠ নিয়ে যায় জঙ্গলের মানুষ। বন্দগাঁও-এব হোটেলে বিক্রি করবে। একটা লোক খুব বেশি হলে কুড়ি কেজি কাঠ বইতে পাবে। ২০ কেজি কাঠের দাম পনেরো থেকে কুড়ি টাকা। এজন্য হযতো ২০/২৫ কিলোমিটার হাঁটতে হয।

রোগত পৌছুলাম। ছেঁড়াখোড়া গ্রাম। ভেঙে যাওযা বাড়িঘর। মানুষজনের পরনে সাদা কাপড়। মেয়েবাও সাদা কাপড় পরেছে। কল্যাণ বলল বীরসাইয়তদেব গ্রাম।

কল্যাণ গাঁ মুণ্ডার খোঁজ করে নিয়ে এল। গলায় পৈতে, হাঁটুর উপর সাদা কাপড় বয়স মনে হয় পঞ্চাশের উপর। মুখটা চেনা মনে হল। সেই কাঁঠালদানা বেচা লোকটা না? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বন্দগাঁও হাটে কাঠালদানা বিক্রি করতে গিয়েছিলে? চিনতে পারছ? লোকটা যেন চিনতে পাবল। একটু হাসল। বলল জোহার জোহার।

আমাদেব জিপগাড়ি গাঁ পর্যন্ত যেতে পারেনি। একটু দূরেই ছিল। কয়েকটা বাচ্চা ওদিকে ভিড় করেছে। একটা সাহসী ছেলে একবার হর্ন টিপেই অপবাধ কবেছে ভেবে ছুটে পালাল।

আমরা একটা বাড়ির উঠানে। উঠানেব এক কোণে একটা বেদীতে তুলসী গাছ। একটা মরা গাছেব ভেঙে পডা ডালেব উপবেই বসেছি। গাঁ মুণ্ডা বোধহয় জিজ্ঞাসা কবল আমাদের আগমনের হেতু কী?

কল্যাণ ওদের সঙ্গে মুণ্ডাবি ভাষাতেই কথা বলছে। কল্যাণ সম্ভবত পোলিও নিযে কথা তোলেনি। ও কী বলেছিল আমি ঠিক জানি না। কল্যাণ মাঝে মাঝে হিন্দিতে আমাকে ওদের কথাবার্তাব অংশ বলে দিচ্ছিল। আমিও কিছু প্রশ্ন করছিলাম কল্যাণকে, কল্যাণ দোভাষীব কাজ কবছিল। ওখানে ঘন্টা দেড়েক কাটিযে যা বুঝলাম, তা এলোমেলোভাবে এরকম।

এরা সব বীরসাইয়ত। ধরতী আবার প্রজা। ধরতী আবা যা আদেশ করেছেন সেটাই পালন করার চেষ্টা করে তাবা। তাইতো তুলসী গাছ। সব ঘরে ঘরে তুলসী গাছ আছে। এই তো সাদা কাপড়। মাথায পাগড়ি এখন নেই অবশ্য, কিন্তু রবিবার মাথায পাগড়ি পবতে হয।

রবিবার কেন? কেননা রবিবারই তো পবিত্র দিন। ওই দিন কাজ করতে নেই। বিশ্রাম। এই দিন ভগবানও বিশ্রাম কবেন। এই দিন সারা সপ্তাহের পাপের জন্য অনুতাপ করতে হয়। ওই যে বড় শালগাছটা, ওই শালগাছের তলায দাঁড়াই আমবা। অনুতাপ করি। তারপর ধরতী আবাব পূজা করি।

না, ফুল বেলপাতায নয, ধ্যানে। বীবসা ভগোযানেব ধ্যান করি। ওকে মনে মনে ডাকি। বলি হে ভগবান এসো, আমাদেব বাজা হও। আমাদেব মুণ্ডাবাজ কায়েম হোক। বীবসা আবা আসবেন। শিগগিবিই আসবেন।

না, বীবসা আবাব কোনো ফটো নেই আমাদেব কাছে। একটা ফটো ছিল চেট্টি মুণ্ডাব কাছে। উইপোকা লেগে নষ্ট হযে গেছে। কোথায় ছবি পাওযা যায আমবা জানি না।

আমবা বিলাস করি না। বঙিন পোশাক পবি না। বিলাস করব, যেদিন ধরতী আবা ফিবে আসবেন। বান্দোযানের রাজাব উপর আমাদের খুব রাগ। ওই রাজবাডিব দিকে পাথব ছুঁড়ি আমরা, কারণ বান্দোয়ানেব রাজাই আমাদের ধরতী আবাকে ইংবেজেব হাতে ধরিযে দিয়েছিলেন।

ধবতী আবা ধবা পড়েছিলেন ওই পাহাড়ে। ধরা পড়ার পব আমাদের আদেশ দিযেছিলেন দশ আদেশ

কাজ কবো।

সৎপথে চলো।

মদ খেযো না

চুট্টা তামাক বিড়ি খেযো না

প্রতিবেশীব সঙ্গে ভাব বাখো।

ব্যাভিচাব কোবো না

একসঙ্গে প্রার্থনা কবো

পাপ স্বীকাব করো

তুলসী গাছ পূজা কবো

আমাব বীবসাইযত। সেই আদেশ পালন কবি। বীবসাইযতরা সবাই স্বর্গে যাবে। ধবতী আবা সব বীবসাইযতদের স্বর্গে নিযে যাবে। সিঙ্গ বোঙাই বিবসা। পাপীদেবও ক্ষমা কবেছেন বীরসা। আমাদেব প্রার্থনাব মন্ত্র হল—হে ধবতী আবা, তুমি সব জানো, আমাদেব পথ দেখাও। কী কবে নিজেদের বাজা পাব, সেই পথ দেখাও। তোমাব আদেশের অপেক্ষায় আছি। সেগুন গাছ শাল গাছ বুড়ো হযে গেল, এখনো তোমাব দেখা পেলাম না। হে আবা, তুমি আবার এসো। তোমাকেই বাজা মানি।

আমাদেব এখানকাব এম এল এ এম পি? জানি না। ভোট? ওটা একটা হয, উধাবে।

তিন বকম শযতান আছে। লুসি, ফির্সি আব কুর্শি। লুসি আব কির্সি শযতানেব নাম। আব কুর্শি মানে? হে হে হে।

প্রথম হাসল এতক্ষণে গাঁ মুণ্ডা।

গাঁ মুণ্ডার নাম ডোকাই টোপ্পো।

ওব মাঝে মাঝে কম হয। মানে ভব।

ভবেব সময ও বীবসাব সঙ্গে কথা বলে। গাঁ মুণ্ডা ডুকাই টোপ্পো সামান্য জমিতে চাষ করে। যা ধান হয তা দু-মাসেব খোরাক। জঙ্গলেব আমলকি বিক্রি করে হাটে, আমেব সময আম। কাঁঠাল বযে নিযে যাওযা কষ্ট। পাঁচটা কাঁঠাল বযে নিলে পঁচিশ টাকা হয বটে, তাব চেযে ভালো বুদ্ধি কাঁঠালেব কোযা খুলে, কাঁঠাল নিজেবা খেযে দানাগুলো বিক্রি কবা। কাঠও বযে নিযে যায মাঝে মাঝে। বর্ষায রুগড়াও নিয়ে যায়। এই গ্রামেব সবাই জঙ্গলেব উপবই বেঁচে আছে।

জনযুদ্ধ এম সি সি? উবা খুব ভালো লোক। এসেছিল বটে। ওদেব বলে দিযেছে তোমাদেব দরকার নেই। আমাদেব বীবসা আছে।

কেবোসিন কিনতে যেতে হয চাকি ১৮ কিলোমিটাব। বান্দোযান ১৫ কিলোমিটাবে। টেবো ২০ কিলোমিটাব। হাটগুলো ওখানেই। জঙ্গলেব জিনিসপত্র নিযে ওখানেই যায়।

হাটের কোনো জিনিস খাই না আমরা। চিড়া গুড় খাই। কুয়ো বা চাপাকল থেকে জল

তুলে খাই। জিলিপি-গজা-সিঙ্গাবা এসবও খাই না আমবা। আমাদেব ঘরের ছোটো বাচ্চাবাও খায না। ছোটোবেলা থেকেই সে-রকম শিঙা দি। ওদের তো গলায সুতো পরিয়ে দি। ওরা বোঝে ওবা পবিত্র। কেন অজাত কুজাতেব হাতেব রান্না খাবে বাজাবে? আর পোলিওব টিকা খাওযানো কেন?—এই প্রশ্নেব সোজা উত্তব—কোন না কোন জাতেব মানুষ ওই টিকাব জল খাওয়াচ্ছে কে জানে? শিশুবেলায কেন ওদের অপবিত্র কবে দেব?

এবাব আমি চমকে যাই।

আমি সমাজতাত্ত্বিক নই, নৃতাত্ত্বিক নই, অতি সাধাবণ জন। তবু কীবকম যেন মনে হয় ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র জলে মাটিতে হাওযায মিশে আছে।

বীবসা ধর্মের মধ্যে ক্রিশ্চিযানিটির প্রভাব আছে অনেকটাই। বীবসাব পরিবাব তো খ্রিস্টধর্মই নিযেছিলেন। কিছুটা বৈষ্ণব প্রভাবও ছিল। কিন্তু আজ সব ছাপিয়ে বড হযে গেল ব্রাহ্মণ্য। অথচ এদের চাবপাশে কোনো ব্রাহ্মণ নেই।

বীবসাইতরা অন্যান্য মুণ্ডাদেব থেকে নিজেদেব আলাদা মনে করতে থাকল। নিজেদেব অন্যান্য মুণ্ডাদেব তুলনায শ্রেষ্ঠ ভাবল। আব শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন হিসেবে গলায পৈতে ধাবণ।

বীবসাব দশ আদেশে তুলসীর কথা ছিল। হযতো ওযধিগুণেব জন্য এই গাছ বক্ষা কবতে বলেছিলেন তিনি।

পৈতে পবাব কথা বলেননি কখনো। বীরসাইযতদেব মধ্যে ক্ষাত্রধর্মেব কোনো চিহ্ন আর নেই। আছে কগ্ন ব্রাহ্মণ্য।

জিজ্ঞাসা কবেছিলাম—টিকা যে নিলে না, যদি অসুখ হয, পোলিও হয, কী করবে?

—বীরসা বক্ষা কববেন।

বলি, বীবসাই যদি তোমাদের সব দেখাভাল কবেন তো কষ্টে আছ কেন?

—কষ্ট কোথায? দিব্যি আছি। এখন শুধু আদেশেব অপেক্ষায আছি। বীরসাব আদেশ হলে আমবাই বাজা হব।

—আর উলগুলান?

—বীবসা ভগোযান আসবেন। তাবপব হবে।

গাঁ মুণ্ডা ডোকাই টোপ্পো আমাকে হাতছানি দিযে ডাকল। একটু দূরে নিযে গেল। মাটিতে শোযানো কালো পাথব। ওগুলো সসানদিবি। মৃত মানুষকে কবব দেযাব পব ওখানে স্মৃতি-পাথর বেখে দেযা হয।

সসানদিবির উপব বসল। ওব মতন কবে বলল, শোনো বলি, সুসংবাদ আছে, সুসংবাদ। আমাদের বীরসা আবা আসছে। এই গাঁযে। আমাব কম হয। আমাকে জানিযেছেন তিনি। সসানদিরিতে বসে মিথ্যে কথা বলা যায না। আমি এই সসানদিবিতে বসে বলছি তিনি আমাকে সুসংবাদ দিযেছেন। এ বছব তার সব লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি। এ বছব প্রচুর আম হযেছে। প্রথম বর্ষায শিল পডেছে। জঙ্গলে ময়ূর হযেছে অনেক। পেখম তুলে নেচেছে। আর গুবমা নদীব জল এ বর্ষায এখনো লাল হযনি।

ধবতী আবা যখন জেহেল-এ ছিলেন, যখন তাব নাড়ি দুর্বল হযে আসছিল, তখন তার

মিতান ডংগি মুণ্ডাকে বলেছিলেন একশো পাঁচ বছর পবই আমি আসব। এটাই একশো পাঁচ বছর। একশো পাঁচ বছর চলছে।

এইবারে আসল কথাটা বলি। এখনো কাউকেই বলিনি। আগামী রবিবারেই ঘোষণা কবব আমি। শোনো **আমাদের ভগবান আসছেন আমাব স্ত্রীর গর্ভে।**

হ্যাঁ। তাই। সসানদিরিতে বসে মিথ্যে বলা যায় না।

আমার স্ত্রীর গর্ভ হয়েছে। ওই দেখো আমার স্ত্রী, গলায় তুলসীব মালা, হাতে লকড়ি, বুঝতে পারছ কিছু? আমাব সঙ্গে আমাব স্ত্রীর মিলন হয না গত দু-বছব। আমাব স্ত্রীর 'স্ত্রী ধবম' শেষ হয়ে গেছে।

লোকে ভাবছে আমার এখনো মর্দানী আছে। আমাব স্ত্রী বুঝি এখনও ভিতবে ভিতরে ডাঁটো। যেমন নদীব তলায় জল থাকে, কিন্তু শুখা মনে হয। ওদের ভুল ভেঙে যাবে যখন সত্যি কথাটা ঘোষণা কবব। মেরী মাতার গর্ভে যিশু ভগোযান এসেছিলেন কীভাবে?

জঙ্গলেব দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারি গাছেব পাতায পাতায় সুসমাচাব লেখা।

পাঁচ

ডোকাই টোপ্পোর সঙ্গে এব পবও দেখা হযেছে হাটে। আমাদের সেন্টাবেও নিয়ে এসেছিলাম একদিন। বোঝাতে। টীকা নেয়া কেন দবকাব বলিযেছিলাম অন্য লোকদের দিযে। ও শুধু শুনেছিল।

একদিন ওর স্ত্রীকে নিযে হাজিব ডোকাই টোপ্পো। ওব স্ত্রীর তলপেট বেশ ভারী , বেশ উঁচু। আট-ন মাসের গর্ভ হলে যেমন হয। জানালো বক্তস্রাব হচ্ছে মাঝে মাঝেই। প্রথম দিকে ডাক্তাব হাসপাতাল কবেনি। ভগোযানকে গর্ভে ধারণ করলে একটু কষ্ট তো পেতেই হবে। কিন্তু গত কয়েকদিন একটু বাড়াবাড়ি হযেছে। তাই কষ্ট করে এসেছে। একবাব ডাক্তাব দেখিযে নেয়া ভালো।

সেদিন হাসপাতালে ডাক্তাব ছিল। দেখল। সন্দেহ করল ওভারিযান টিউমাব।

আমার চেষ্টাতেই রাঁচী থেকে অপারেশেন করানো হল।

বায়োপসির জন্য পলিথিন প্যাকেটে চলে গেল একটা রক্ত মাখানো স্বপ্ন। আকাশে চিল। আমি বললাম হুস্। ডোকাই টোপ্পো হাসপাতালেব সিঁড়িতে বসে কাঁদছে। ব্যর্থ উলগুলানেব মুণ্ডা সৈনিক কাঁদছে।

তাবপব মাস দুযেক পব, এই তো সেদিন, এক শারদ প্রাতে ওব সঙ্গে দেখা। হাটে। ও কিডকি ফল বিক্রি করছে। আমায দেখেই উঠে দাঁড়াল। আমাকে আস্তে আস্তে বলল স্যাব, সুসংবাদ। আমাব ছেলের বউ গর্ভবতী হয়েছে। ক'দিন আগে জানলাম। বীবসার এই বছরই জনম নেবার কথা ছিল। আমাদেব গ্রামেই। তা হলে আমাব ছেলেব বউ-এব পেটেই...।

গোয়েবলসের স্ত্রী

বারিদবরণ চক্রবর্তী

মানালি-কুলু-সিমলা ফেরতা কালকা মেলটা ধরেই টুণ্ডুলা জংশনে নেমে আগ্রা যাওযাব কথা। দিল্লি যাওয়া-আসার পথে স্টেশনটা। ভাসন্ত দৃষ্টি নামিযে সেভাবে দেখতে না চাইলেও এখন স্টেশনটা নিযে জপ কবতে করতে নানান কল্পছবি আঁকবাব চেষ্টা করে যেতেই হয়। কেননা দিল্লি থেকেই টেব পেযেছে হোক-না থ্রি-টাযাব কামরা কোনো বিধিনিষেধ কেউ মানতে চাইছে না। বাঁধভাঙা জনস্রোত সমানে আছড়ে পড়ছে স্টেশনগুলিতে। পোঁটলাপুটলি বাচ্চাকাচ্চা সমেত জনমণ্ডলীর প্রবাহ গোটা ট্রেনটাকেই যেন লাইন থেকে উপড়ে ফেলতে চাইছে। সামনেই ইদ্। খুশিব ইদ্ পালনে আত্মীয-পবিজনদের মধ্যে গিযে জাযগা নিতে বা আশপাশেব বড়োসড়ো বাজার-মহল্লা থেকে এটা-ওটা সওদা কবতে।

আলিগড় থেকেই নিজের ব্যাগস্যুটকেস এটা-ওটা নিযে তৈরি হচ্ছিল। আর উপছনো বিরক্তিব ওগরানি নিযে টিপ্পনি কেটে চলেছিল বেলদপ্তবের তত্ত্বাবধানেব ওপর, ক্রমশ যা নেমে দাঁড়াচ্ছিল ট্রেসপাসারদেব উদ্দেশে—স্বাভাবিক বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞানে প্রথমটায সংযত থাকলেও শেষাব্দি পাবছিল না। উদগাবটা রাখছিল দিল্লি স্টেশন থেকে ওঠা কযেকটা বাঙালি ছেলে-ছোকরাদের কাছে। যাদেব বাড়িঘর নদিযা-হুগলি-বর্ধমানের প্রত্যন্ত কিছু অঞ্চলে। তারাও ফিবছে। কোনো একটা কাজ নিয়ে নাকি দিল্লি গিয়েছিল। তখনও ভিড়টা সেভাবে মালুম না হওযাতেই বোঝেনি, পবে বুঝেছিল তাবাও ওই অনধিকারী প্রবেশকদেবই দলে, খুশিব পরবে আত্মীযস্বজনদেব সঙ্গে মিলতেই তাবাও ঘবে ফেবার তাডনা নিযে চলছে। কিন্তু কী করা যাবে! পরিস্থিতি বিবেচনায আব সবব না হলেই হল। তারা বাঙালি বাংলা ভাষায কথা বলে। রমেনও বাঙালি বাংলা ভাষায কথা বলে। এইরকমের একটা মৌন ঐকমত্যেব সমঝোতায নীরব তো হওয়া যায়। অধিকন্তু নিজে হাত পা গুটিয়ে তার বাক্কে তাদেব দু-একজনকে জায়গাও ছেড়ে দেয। হোক না ঘণ্টাখানেকের পথ এখনো বাকি। তাকে নামতে তো হবে। আলিগড জংশনেব পরের স্টেশনেব নাম হাতবাস স্টেশন। তাবপব টুণ্ডুলা জংশন। হৃদ্যভাবেব উষ্ণতা ছড়িযে সে তাব কাছেব ছেলেটাকেই বলে, 'আপনাদের আমাকে একটু সাহায্য কবতে হবে কিন্তু।'

'কী ভাবে?'

'কোনোরকমে নিজেব ফোলিও আব একটা ব্যাগ নিযে নেমে পডব। দেখছেন তো আমাদের লটবহবেব ঘটাটা। ঝকমাবি হয়ে গেছে। সঙ্গে স্ত্রী আছে ঠিকই, কিন্তু সে নিজে নামতে পারলেই যথেষ্ট। আপনাদেবই আমার এই মালপত্তবগুলো টেনে হিঁচড়ে যেভাবেই হোক-না কেন নামিয়ে দিতে হবে প্ল্যাটফর্মে।'

'নিশ্চয়।'

ব্রণে-খোঁদালানো মুখের ছেলেটা জিবেব ডগা থেকে সম্মতিটা ঝাড়তে দেরি কবে না। হাতরাস স্টেশন পেবিয়ে যায। ভয আব বিবক্তিটা বমেনের ক্রমশ টইটুম্বুব হযে উঠতে থাকে। নামা যে কিছুতেই সম্ভব হবে না। মধ্যেব ছোটোখাটো স্টেশনগুলো না ছুঁলেও গতি থামিযে যে এক-আধ সেকেন্ড হাঁটি হাঁটি পা-এব ভঙ্গিতে এগোচ্ছে, তাবই সদ্ব্যবহাব কবতে যেভাবে মানুষজন আছড়ে আছড়ে পড়ছে। স্টেশনে স্টেশনে দাঁড়িযে থাকা মানুষগুলো চোখমুখের চেহাবায় ছেঁড়াখোঁড়া ঠিকই, লক্ষ্যে যে ভাবী একবোখা। পথ দিযে উট চলছে—ধুলিধূসরিত বিশাল তাদেব আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে।

ওপর-টাযাবে শুয়ে থাকা স্ত্রী মোহিনীকে বলে, 'ওঠো'।

'সমযেব হিসেবে এখনও তো আধঘণ্টা দেবি।'

চাপা গলায বললেও নিজেব খিঁচড়ে ওঠা কর্কশ গলাটাকে কখতে পাবে না রমেন, 'এখন আর বাথরুমটাথরুমে যাওযাব চেষ্টা কোবো না, সময হবে না।' স্ত্রীব জবাযু অপারেশন হওযার পব থেকে ঘন ঘন এই প্রস্রাব যাওযাব অভ্যাসটা বযে গেছে। প্রতিকূল অবস্থায যা আবো বেগবতী হযে ওঠে।

যুদ্ধে চলা লেফট্যানেন্টেব মতোই বমেন এগোয। ভেবে নেয় অনুগত সৈনিকেব মতন সে-ও চলবে।

কিন্তু কোন দিকে চলবে? কী কবে চলবে! এ যে একেবাবে দুষ্প্রবেশ্য-নিষ্ক্রমণ-বহিত এক পর্বত-গুহাব আশ্রয় নিযেছে। আদিম অন্ধকাবেব কালো গুহা ছাড়া আব কী! চোখ কচলায। তাকে যে চলতেই হবে। নিজেকে ছেঁচড়ে নিযে অষ্টাবক্রের মতো কবেই হাতড়ে হাতড়ে চলে। স্ত্রীব নাম ধবে ডাকে।

কে একজন উর্দুমিশ্রিত হিন্দিতে বলে ওঠে, স্টেশনটা আসতে দিন না, স্টেশন আসার অপেক্ষায না থেকে খ্যাপা ভৈঁসেব মতন কোথায চললেন!

একহাতে পোর্ট-ফোলিও, অন্যহাতে একটা ডাকব্যাকেব ব্যাগ আটকে দুটো হাত জোডা হযে যাওযায বমেনেব নিজস্ব কোনো বাশ থাকে না। তাকে ঠেসে ধবে পকেট হাতডানো হচ্ছে, তাব প্যান্টের জিপার খুলে আবও ভেতবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে, পকেটে টাকাব বান্ডিল। বমেনকে একেবাবে নগ্ন কবে কোর্ট-মার্শালেব মতো দাঁড় না-কবিয়ে সে-টাকাকে কি বাব কবে নিযে আসতে পাববে! সে দাঁতে দাঁতে ঘষে নড়াচডা কবে তাদের নিশানা সবিযে দিতে চায।

একজন হিন্দিতে বলে ওঠে, 'এভাবে নড়ছেন কেন? দেখছেন না রুগ্ন কুচোবাচ্চা নিযে কীভাবে দাঁড়িযে আছি।' নিতান্তই নিবীহ এক গবিব মুসলমান, চাপাচাপিব বিচ্ছিরি পবিস্থিতি থেকে রুগ্নশিশুটাকে কিছুতেই সামলে বাখতে পাবছে না, শিশুটা সর্দিব দবানিব সঙ্গে ঘং ঘং শব্দে আওয়াজ নিযে কেঁদেই চলেছে। না বোঝাব কিছু নেই, কাছে পিঠে কোনো ডাক্তার বা হাকিমেব উদ্দেশ্যে চলেছে। তবুও ঝাঁঝিযে উঠে নিজেব অসহায়ত্বে এবং ঝাঁঝিযে ওঠার যৌক্তিকতাকে প্রমাণ কবতে ঝবঝবে ইংবেজিতে বলে যায। যাব মোদ্দাকথা—অসুবিধে কষ্ট তো হবেই। দেশেব আইনকানুনকে কাঁচকলা দেখিযে যাব যে ভাবে ইচ্ছে চললে, কোনোকিছু

পরোযা না কবে চললে, দুর্বলেরা, অসহাযেরা, ভদ্রলোকেরা দুর্বিপাকের মধ্যে তো পড়বেই। দেখছেন না আমাব বিডম্বনাটা।

ইংবেজি কপচানিব কোনো সুফলই ফলে না। কিন্তু তাকে থেমে গেলে তো চলবে না—নিজেকে বাঁচাতে এংগর তাব নড়বড়ে হিন্দিতেই, বিযোদ্‌গাবে মেতে ওঠে, 'রেল পর ঘুমনাফিরনা সে এক কোড অফ কনডাক্ট হায় না—মতলব জায়জ। আপলোঁগো সবভি ট্রেসপাসারস হ্যায।'

'জাযজ' কথাটা লক্ষ্যভেদ করতে পাবে। ঝলসানো চোখগুলোব সঙ্গে নিবু নিবু চোখেবও কযেকটা ফুলকি ওডে। একজন বলে ওঠে 'জাযজ। হ্যাঁ হ্যাঁ। রেলওযে কোডসে চল্‌না হোগা। আপলোঁগো সব ট্রেসপাসারস হ্যায—কোইকা টিকিস নেহি হ্যায।'

একজন মজা কবাব মতো কবে বমেনেব দিকে এগিযে এসে বলতে থাকে, 'আপকা পাস টিকিট হ্যায না, হাম টিকিট কালেক্টব হ্যায। দেখাও আপকা টিকিট।' শুধু একজন নয আবও কযেকটা হাত ওভাবেই ওপব নীচ থেকে ডানবাম থেকে এগিযে আসে। ক্রমান্বযে ত্রস্ত হযে উঠলেও দমে গেলে চলবে না। 'কাঁহে তুম লোঁগো সোব মাচাযে মুঝকো পর হামলা কবতা হ্যায। কোই তকদাব কা বাত নেহি, সমঝো।'

'তব হাম লোঁগো আপকো সাথ তকদারি কবতা হ্যায।'

'আউব কুছ। আপ লোঁগো—'

এবাব রমেন প্রায নগ্ন হয়ে যায তাদেব তল্লাশিব ঠেলায এবং তাতেই মুখ পিছলে বেবিযে আসে, 'শা-আ-লা যত সব এক্কাগাড়িব সহিস, খেত খামাবেব চাষি মজুর রিক্সাওয়ালা অশিক্ষিত ভাগাডের খোবড়াওযালা জীব। শালাদেব টিকিট কাটাব মুবোদ নেই, তবু বোয়াবি। বোযাবি নিয়েই দেশটা ভাগ কবে নিযেছে—আবাব'

'এসব কী কথা বলে জ্বলন্ত তাওযাব ওপব তেল ঢালছো?' কোথা থেকে কীভাবে বিডালিব মতোই নরম তালুব নখাবাঘাত নিযে ঝাঁপিযে পড়ে তার মুখেব কথা চেপে দেয় মোহিনী। কিন্তু আব আগেই যেটুকু উত্তেজনা ছড়াবাব ছড়িযে গেছে। কে যে বলে ওঠে 'কমবক্ত চুতিযাকো মুহ তোড় দো আগাড়ি।'

পিঠোপিঠি আবো একটা কণ্ঠস্বর হিসহিসিযে ওঠে।

'শিশ কা সামান কো মাফি হাবামি হিন্দু কো বাহারনে নিকাল দে না। দঙ্গইবালা কো দফন কা কাম সূচনা হো যায।'

আর কোনো কথা না বাডিযে দুদ্দাডিযে পিছিযে যায় মোহিনী বাকি মালপত্তবগুলো টেনে হিঁচডে আনতে। না মোহিনী আটান্ন তো নযই, আটত্রিশ নয—আটাশেবই যুবতী হযে ওঠে। কাব যেন ভর্ৎসনা কানে বেজে ওঠে, 'আপ কিঁউ প্রবলেম ক্রিযেট করতা। সুস্থিব সে ঠাবিযে, হো না হো দঁবে পাঁও সে চলিযে।' সুস্থিরভাবে দাঁডিযে থাকতেই তো চায। সেই অবস্থা থাকছে কোথায? আবাব যে স্টেশন এসে পডল। মনে হচ্ছে গাডি ইযার্ডে ঢুকে পডল।

'—মোহিনী-মোহিনী. '

'ইযার্ডমে গাড়ি ঘুসা ওহি বাত ঠিক হ্যায়। লেকিন আপ জানতা ইয়ার্ড কিতনা মৈল

লম্বি হ্যায। নাইন মৈল—সমঝাতে আপ কিলোমিটার নহি মৈল—'

তবু নামে। ভোঁ-কাটা লাট খাওযা ঘুড়ির থেকেও বিপন্ন অবস্থায পা স্টেশনেব মাটি ছোঁয। দূরে দেখতে পায শানেব মাটিতে পোঁতা কাঠেব ঢাল দেওয়া বডো চেযাবটা, তবু পা টানতে পাবে না শবীরটাকে। ছত্রখান হযে পড়ে থাকা প্ল্যাটফর্মেব মালপত্তবের পাশেই ভঙ্গ জানু দুর্যোধনের মতো বসে বড়োবডো শ্বাস টানে। মোহিনী প্রথমটায় বাধা দিয়ে বলতে চায় 'এখানে এভাবে বসে পড়লে কেন' কিন্তু সেকথা তাব জিভেই থেকে যায। পরিবর্তে বলে ওঠে 'ইনহেলাবটা কোথায়? দুটো পাফ নাও না।'

ভাঙা ডানাব মতোই ল্যাকপ্যাকে হাতদুটো দিযে এ-পকেট সে-পকেট হাতডায। 'দাঁডাও দাঁডাও।' বলতে বলতে নিজেব ভ্যানিটি ব্যাগের খাপ থেকে মোহিনী সেই বড়িটা বমেনের জিভেব তলায দিযে বলে ওঠে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে। কী মনে হচ্ছে বলো তো।'

বমেন মোহিনীব উদ্বিগ্নতা বাডাতে না চাওযাব জন্যেই তৈলাক্ত মুখটাব ওপব হালকা হাসিব পালিশটা নিযে বলে, 'ওই একটু আব কী! যে-অত্যাচারটা সহ্য কবে নামতে হল। একটু জিবিযে নিলেই।'

ট্রেন চলে গেল। কিন্তু একী। একী। তার ঘামটা তেল হযে যাচ্ছে কেন? চোখটাই বা এভাবে বুজে যেতে চাইছে কেন? আব সেই চোখবোজা অন্ধকারে অদ্ভুত এক আলোব ছটায কাছে ক্রমশ এসে দাঁড়াচ্ছে কেন শ্বেত আর বক্তচন্দনেব তিলক আঁটা দু-চারটে লোক। এরা সব কাবা? আমাব তবে কি মৃত্যু আসন্ন। আব লোকশ্রুতিতে জেনেছি এমনই সব মুহূর্ত গতিরুদ্ধ বক্তের ধাবা থেকে ধীবে ধীবে এসে নামে পূর্বপুরুষেবা। এবা কি তারাই সব! পিতামহ-প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহ-সমভিব্যাহাবে নিযে যাবে বলেই—কিন্তু এসব সে ভাবছে কেন—সে তো যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী।

চোখ খুলতেই বুঝতে পাবে মবেনি, বেঁচে আছে। যদিও যে অর্থে চোখ খোলা বলে তা নয, একটা আঠা আঠা ভাব শুধু চোখেব পাতাতে যে জড়িযে থাকে তাই নয, শিবা স্নাযুব মধ্যে দিয়ে কীসের যেন একটা আবেশ চক্ষুরুন্মীলনে বাধাব সৃষ্টি করে চলে, অথচ মাথাব ভেতবে দৃষ্টিটা ফুটে থাকে। বুঝতে পাবে টিমে পাতলা আলোয স্নিগ্ধ হযে থাকা ঘবটায খুব পবিচ্ছন্ন একটা বিছানায শুযে আছে অবশ্যই হসপিটালেব বেডে। তাহলে সে কি আগ্রাতেই উঠেছে? যদিও না ওঠাব কিছু নেই। প্ল্যান-প্রোগ্রাম ছকা প্রিন্ট আউটের ডুপ্লিকেটটা মোহিনীব কাছে বাখা ছিল। সঙ্গে হোটেল-টোটেলেব হোযের অ্যাবাউট-সহ অ্যাডভান্স ভাউচাবেব ক্লিপিংস, তাতে মোহিনীব কিছু অসুবিধা হবাব কথা নয়।

বমেনেব উসখুসে ভাবটাকে শান্ত কবতেই কুসুম-রাঙা নার্স মেযেটি এগিযে আসে। মিষ্টি হিন্দিতে বলে ওঠে,

'আপনাব মিসেসকে খুঁজছেন তো। উনি ঠিকই আছেন। ঠিক সমযেই আসবেন। আপনি টেনশন কববেন না।'

মেযেটি যেভাবে তাব সঙ্গে কথা বলে, কাঁধে হাত বুলিযে দেয় তাতে বুঝতে পাবে সে আই সি ইউ-তে নেই। কেবিনেব বেডেই আছে।

তবু বলে, 'আমি কোথায়?'

'আগ্রার মিলিটারি হসপিটালে।'

'আ-আ-মি।'

'ভয়-ভাবনার আর কিছু নেই।'

না ভয়-ভাবনাব আব কী থাকবে? বমেন তো বুঝতে পেবে যায়, মাইল্ড গোছেব একটা স্ট্রোকই তাব হযে গেছে, যার প্রস্তুতি তাব মনে মনেই ছিল। হ্যাঁ মাইল্ড বলব, তা না হলে তার বোধগম্যতায় সংশ্লিষ্ট আগেপরেব সব কথা এভাবে মনে পড়ে যাবে কেন? মাইল্ড যে তার আরও বড়ো প্রমাণ পেযে যায নার্সটি যখন তার কপালে হাত বাখে। স্পর্শটা সে উপভোগ কবে। সন্দেহই থাকে না তাব দাঁড়াতে বেশিদিন লাগবে না। তা না লাগুক আপাতত তাকে যে মরার মতন পড়ে থাকতে হবে, যার অন্যথা হতে পাবে না, শোনা কথাগুলো আবাব নতুন করে শুনল কিছুটা পবে মোহিনী যখন এল তার মুখ থেকে। মোহিনী এসেছিল সঙ্গে ওই পিতামহ-প্রপিতামহ বলে যাদেব ভেবেছিল তাদেব কযেকজনকে নিযে। হিন্দি-বালা-ইংরেজি জড়িয়ে তাদেব মধ্যে যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছিল তা থেকে বোঝে সেই আদ্যিকালেব মেডিকেল বুকনি—ভারি হোক আর হাল্কা হোক একটা স্ট্রোক হওযা মানে আবো দু-একটা স্ট্রোকের সম্ভাবনা থেকে যাওযা। সমুদ্রে ঢেউযেব মতন এই ধাক্কাগুলো, একটা ঢেউ আছাড় দিয়ে পড়া মানেই পেছন পেছন আরো কযেকটা ঢেউ আসা। তাই শাস্ত্রমতে বাহাত্তব ঘণ্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণে বেখে দিতেই হয। সে ইনটেনসিভ কেযাব ইউনিটেই হোক বা কেবিন বেডেই হোক।

ক্রমশ বুঝতে পারে পিতামহসদৃশ বলে যাদেব ভেবেছিল তারা কাবা! সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না। এই মুহূর্তে এবাই না ভাবতের সর্বত্র সর্তক নজরদাবি নিযে চলছে। বিশেষত যে সব জাযগাগুলো নিয়ে তাবা চিন্তিত হযে আছে, ভাবছে ধর্মাধর্মেব ভিত্তিতে জাযগাগুলো বিদ্বেষবিষে সংক্রামিত হযে উঠতে পাবে, অসহিষ্ণুতাব ঠুসঠাস প্রলযকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পাবে। সুতবাং সাধুদের পবিত্রাণে দুষ্কৃতিদের বিনাশের কৃত্যাকৃত্য নিয়ে পাহারাদারি কবে যেতে হবে বইকি। গোধরাব পুনরাবৃত্তি হয়ে যেতে কতক্ষণই বা লাগবে। জানি এসব বখওয়াস শুনতে মোহিনীব ভালো লাগবে না। কিন্তু সে যে ওই চক্রব্যূহের মধ্যেই পড়ে গেছে না! তাদেব বদান্যতায় আমাকে ফিরে পেযেছে। তাঁদেরই তেজি উপচিকীর্ষায একটা মিলিটারি হসপিটালে পর্যন্ত তার মতন এক অখ্যাত পৌবজনের চিকিৎসা হচ্ছে। বুঝতে পাবে কামবাঙা-চোখের গাউনি নিযে মোহিনী আমাব পাশেব টুলটায় বসবাব জন্যে যে ব্যস্ত হযে উঠেছে তা শুধু ওই নঘন আবেগে আশ্লেষ নিযেই নয আমাকে চাঁচাছোলা ভাষায দুযবাব জন্যেও—আমি নির্বোধ মনবধানতায তাকে ওই চক্রব্যূহেব মধ্যে ঠেলে দিযেছি না!

কড়াক্রান্তিতে এখন তারা উশুল নেবে বলেই না চাইবে মোহিনীব সাহচর্য, রক্ষা করে যেতে চাইবে যোগাযোগ। হ্যাঁ এখন রমেন তাদের মনোভাবটা বুঝতে পারে, —ম্যাডাম, এখন আপনার হ্যাজব্যান্ডকে বোগী হিসাবেই দেখুন, কোনোরকমে বাজে দাম্পত্যালাপ কববার চেষ্টা করবেন না, আর কী করেই বা করবেন। উনি আছেন তো ওষুধেব ঘোবেই। এখন

দেখছি আই সি ইউ-এর মধ্যেই ওনাকে বাখলে ভালো কবতুম। চলুন-চলুন তো—

হ্যাঁ হ্যাঁ মোহিনী তার কাছ থেকে এখন চলেই যাকঁ। তাব বা কাড়বার কোনো অবস্থা নেই বটে কিন্তু সে কোনো ঘোরেব মধ্যে নেই। বমেন ভয়ংকবভাবে জেগে আছে মগজে-মননে। ওই জেগে থাকাই তাব ধবন না! গত কযেক বছর সে ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি অ্যালপোজামের মাত্রা বাড়িযেও না। স্নাযুগুলো কিছুতেই শিথিল হয় না, মগজও থাকে কমপ্যাক্ট। এক্ষেত্রে এখানেও তো ব্যতিক্রম ঘটতে পাবে না। আব সে কথাটা মোহিনী ভালো করে বুঝতে পাবে বলেই ছলছলে চোখে ফিসফিসিযে তাকে আশ্বস্ত করতে চায।

'শোনো আমি কিন্তু তোমাব ওই বুকিং কবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকাব হোটেলেই আছি।' তার জলকাটা চোখের চাউনিতে কোনো বিশেষ নিষেধাত্মক কথা কি ফুটে উঠেছিল তা না হলে মোহিনী পুনরায বলে যাবে কেন,

'এঁবা সবাই মিলে অনেক অনুবোধ কবেছিল ওদেরই ব্যবস্থায় থাকতে। ফোর্ট এলাকাতেই ওদের অফিস প্রতিষ্ঠান।'

বলতে বলতেই ঝবঝবিযে কেঁদে ফেলে মোহিনী। বুঝতে পাবে যে-কথাগুলো বলতে চেযেও পারল না—কী আতান্তবে অবস্থাব মধ্যে তুমি আমায ফেললে বলো তো, তোমাব এই শরীরী ঘটনাটাকে নিযে ওবা নানাবকমভাবে ফোকাস কবতে চাইছে, মিডিয়াব কত লোকই না ওদেব সঙ্গে তো বটেই আমাব সঙ্গেও ঘুবছে। আমাকে যত আদব আপ্যাযনে বাখতে চাইছে ততই আমি সিঁটিযে যাচ্ছি—কী জানি কোন পিছলে পা দিযে ফেলি। আমাকে দিযে কোন উদ্দেশ্যসাধন কবে নেয।

হ্যাঁ ঠিক। রমেন বুঝতে পাবে মোহিনী এখন কত অসহায। এখন ওরা মোহিনীকে নজববন্দিই কবে বাখতে চায। মোহিনী চাইলে এখন ওবা ফোর্ট এলাকার ওবেবয় গ্রুপের ওই 'অমর বিলাস' হোটেলেও ব্যবস্থা কবে দিতে পাবে।

পিতামহদেব একজনেব গলায যেন বিশুদ্ধ বাংলা বুলিই শোনে বমেন। ব্যবস্থাব কি কোনো কমতি দেখছেন? আপনার জন্য মেডিকেল বোর্ড বসানো হযেছে ক্যান্টমেন্টেব এই হাসপাতালে। যে-কোনো পবিস্থিতিব মোকাবিলা কবতে সববকমের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আপনি নির্ভয হোন ম্যাডাম। চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলে দেখবেন বাহাত্তর ঘণ্টাও কেটে যাবে। চলুন-চলুন তো, নিজেকে একটু রিল্যাক্স করুন। আপনাব কোনো কথা শুনব না। আজ আপনাকে তাজ দেখাতে নিযে যাবই। জানেন আজকেব দিনটা কী? ইদ। আজকের তাজের জেল্লাই আলাদা।'

মোহিনী রমেনের অর্ধ-নিমীলিত জলকাটা চোখেব দিকে তাকায। সে তার জড়ানো জিভের গোঁ গোঁ স্বরেব মধ্যে দিযে জানিযে দেয, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি যাবে।'

সে কী বোঝে জানে না। কিন্তু বমেনেব নিমীলিত সেই-শরীরীসত্তার দিকে চেযে থাকে নির্নিমেষ চোখে অনেকক্ষণ মোহিনী। কেননা সে তো জানে রমেন তাকে আগ্রায় তাজ দেখাতে কতটা উন্মুখ হযে উঠেছিল।

দেখুক-দেখুক-প্রাণভবে দেখুক।

যাক্ তাহলে দেখাটা শেষমেশ হল।

তাজ দেখাতেই না এবারেব এই ট্যুবটা ছকেছিল। 'তাজ' নিয়ে রমেনের ভেতবে একটা অপরাধবোধ থেকে গিযেছিল—কার্যকারণে তার তো তাজ দেখা অনেকবারই হল, মোহিনীর একবারও হবে না। তাই ইচ্ছে হযেছিল অন্তত একবার তার পাশে থেকে মোহিনী তাজটা দেখুক। ষাট বছব বয়স হল। যে-কোনো দিন খসে যেতে পাবে, আর সে না খসলেও ভবিষ্যৎ যে তাজের জন্যে কোন ভূমিকা নিযে অপেক্ষা করে আছে কে জানে? পবিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ভয়ভাবনা তো আছেই তো তাব উপবে যুক্ত হয়েছে আবাব একটা বিশ্বযুদ্ধের ধর্মযুদ্ধের ভয়। ধুমোদ্গাব তো হয়েই চলছে না।

আমি পাশে না থাকলেও মোহিনী তাজ তো দেখল। আঃ।

যখন যাচ্ছে—অবশ্যই দেখবে।

পিতামহ সদৃশ্য ওইসব ধর্মাত্মা পূজ্যপাদেরা নিশ্চয মোহিনীব সে-বাঞ্ছা পূবণ করবে। বৃথাই ভয় পাচ্ছে তাকে নিযে অন্য কিছু কববে না—আটান্ন-উনষাটেব মহিলাকে নিযে বতিসুখসায়বে অবগাহনেব ইচ্ছা কাবো কি হয। বিশেষ কবে টেনেহিঁচড়ে ভুলিযেভালিয়ে। যদিও সম্মোহন ও সম্মোহন-জাল নির্মাণেব অশেষ ক্ষমতা আছে জানে। তবু। তেমন হলে তাকে নিযে হসপিটালেব বেডে পৌঁছে দিত না।

দেখুক-দেখুক৷ চোখেব তৃষ্ণা বুকেব পিপাসা মিটিযে দেখুক৷ আজই না ইদ! গতবাবই—গতবাব না তার আগেব বাব সেবাবও—হ্যাঁ সেবারই গোধবা কাণ্ডেব জেবে গুজরাতেব বাজ্য জুড়ে ব্যাপক দাঙ্গাব সেই বছবই ইদের দিনেব সকালে তাজ দেখতে গিযেছিল—কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে, দুপুরেব নামাজটা পড়বে সংলগ্ন ওই পশ্চিমদিকের মসজিদে। উঁচু মার্বেলের চত্বরে দাঁড়িযে সাদা পাথবেব ওপব ফুল লতাপাতার বংবাহাবি সৌন্দর্যই দেখছিল—নীল-কালো-মেরুন-হাল্কা হলুদ। আচম্বিতেই চমকে উঠেছিল পশ্চিমের সবুজ লনটায চোখ পড়তেই। দেখছিল একটা বৃহৎ প্রজাপতি। যার ডানায নানান বঙেব ছিট। সে যেন ক্রমান্বয়ে ডানা মেলছে আবার বন্ধ কবছে। হ্যাঁ নামাজ পড়াব বিশেষ ভঙ্গির জন্যই সেটা মনে হচ্ছিল। আর তাব ওপরে ছিল শীতের দুপুর-পোশাকে কত বংই না ঝলমলাচ্ছিল। যে রং বৈচিত্র্যের কাছে হার মানছিল শুভ্রসমুজ্জ্বল তাজের বাহাবি শতনরী বিভা-বৈচিত্র্যও। বিবৃত হযে চলেছিল শরীরী মুদ্রায় অবিভাজ্য মানুষী ঐশ্বর্য। যে বঙেব সমাহার ঘটাতে পারেননি সম্রাট শাজাহান মিনারে স্তম্ভে প্রকোষ্ঠে গাত্রে গাত্রে ইউরেশিয়া টুঁড়ে আনা দুর্মূল্য সব পাথবের সমাহৃতিতে, অমর শিল্পীবৃন্দের সুষমিত শিল্পসম্ভাবের নির্মিতিতেও। নিশ্চয মোহিনীর চোখেব পলক পডছে না। হ্যাঁ সেইবকম ঘটনারই ঘটবার তো কথা। সেই যে বাউল গানের ভাষাতে রমেন বলতে পাবে যে—আমাব পথিক গুরু অথিক গুরু গুরু অগণন। যাকে মনুষ্যত্ব বলে। আনন্দবাদ বলে তার অনেকটাই না মোহিনীর সঙ্গগুণে পাওয়া।

কিন্তু এ দৃশ্য দেখে সে কি আনন্দে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে উঠতে পারবে? সে তো বুঝতে পেবে গেছে না তাব আশে পাশে কারা আছে। পিতামহ প্রপিতামহ বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভূজদের যে মহামণ্ডল তার চারিদিকে বেষ্টনী রচনা করেছে তারা কী চায়। বুঝতে পেরে

গেছে বলে কোনোরকমের অন্যথাই সে কবতে পারবে না। একেই কি বলে চক্রব্যূহ! না না চক্রব্যূহ বলা বোধহয ঠিক হচ্ছে না। একরকমেব মনস্তাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতায পড়ে গেছে। সে ওদেব কথায ব্যবহারে আচবণে এক প্রতিবর্ত-বিশ্বাসের ক্রম ধরে চলেছে। ক্রমশ বিশ্বাসই কবে ফেলেছে আমাব যে-মৃত্যু হতে চলেছিল। সেই-মৃত্যুর হাত মুচড়ে আমার জীবনকে ফিরিয়ে দিযেছে তাদেবই মহানুভবতা। জীবনটা নিযে শুধু থাকতে পেবেছি এঁদেবই সতর্ক পাহাবায—উপচিকীর্ষু শুশ্রূষায। হ্যাঁ পবিস্থিতিতে প্রচাবে অবিশ্বাস্য অনেক কিছুই হতে পাবে। ইতিহাস নির্মিত হয। মানসিক পবিমণ্ডল তৈবি হয। তা না হলে গোয়েবলসেব স্ত্রী কখনও ছ-সন্তানকে বিষ খাইযে হত্যা কবতে পাবত হিটলাবেব পতন আসন্ন বলে, না না গল্প বলে উড়িয়ে দিতে পারি না সে-সব কথা। পরিস্থিতি ও প্রচারের চাতুবিতে মনের অনেক ভাঙা গড়াই হযে যেতে পারে। আসল ঘটনা, ভাববলয় তৈবি কবতে কবতে মানুষকে তার মধ্যে নিমজ্জিত কবা—তখন প্রচাব যা বলবে মানুষ তা দেখবে। মোহিনী ক্রমশ সেই ভাবনার পথে শনৈঃ শনৈঃ এগোতেই পাবে। যাব ফলে বমেন যে চোখে ওদের নামাজ পড়া দেখেছিল দৃষ্টিব সেই স্বচ্ছতা সে পাযনি—নরখাদকেব দৃষ্টি সেভাবে না জ্বললেও। নরখাদক কথাটা কিন্তু এমনি উঠছে না। সেদিন যখন বমেন নামাজের ওই দৃশ্য দেখেছিল, ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়েই আবো একজন দেখছিল। দেখতে দেখতে তাব চোখে সেই অঙ্গারখণ্ড দেখেছিল কিনা! বলে উঠছিল 'এত মুসলমান। রাষ্ট্র হয়তো সে-ভাবে হিন্দু নয়। তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানদেব এত বাড়বাডন্ত। আগুনে তোপ দাগবাব এত কাবিকুরি এত মশাল-ল্যান্ডমাইন, ডিটোনেটব, গ্রেনেড, আব ডি এক্স, এ কে ফর্টি—তবু শালাদের এত দেখনদাবি। দরকার—অনেক বেস্টবেকাবি দরকার—দরকার গুজরাটেব নবেন্দ্র মোদিদেব। নাহলে হযতো উন্নযনেব সব শাঁসজল খেয়ে নেবে এই সংখ্যা!'

রমেন সবে গিযেছিল কথা না বাড়িযে। মোহিনী তো সরে যাবাব পথ পাবে না। আনন্দেব কোনো অভিব্যক্তি নিয়েই পাপডি মেলতে পারবে না। পরিবর্তে বিদ্বেষ-বিষের জারক রসে জাবিত হযে যাবে। নিজেব সীমিত অভিজ্ঞতাব পুঁজি নিযে নিরন্তর প্রচারের এই উদ্বেলিত প্রবাহেব ধাবা ধবে চলে যাবে চক্রব্যূহের সেই চক্রব্যূহের ভেতবে। প্রচাবে কী না হয শীতল পানীযেব অপর নামই না হযে ওঠে কোকাকোলা, কমপ্লিট ম্যান হওয়া যায় না। বেমন্ডের স্যুটিং শার্টিং না কিনলে—কমপ্ল্যান ভিন্ন শিশুব পুষ্টি থমকে থাকে।

হায প্রচাব! কীভাবেই না চক্রব্যূহ গড়ে তোলে। না ক্রমশ মোহিনী তার এ পরিণামেব জন্য তাকে আর দুষবেও না। কিন্তু বমেন যে নিজেকে দুষে চলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ চলবেই। সে দায়ী, অন্তত কিছুটা তো বটেই। না না তার মাথা ঠিক কাজ করছে। কোথাও কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে না। তাব-আমাদেব অজ্ঞাতে আমাদেব সংগুপ্ত সাধ বাসনা থেকে এইরকমেব চক্রব্যূহ রচনা কবে যাই। স্বাধীনতাব পব থেকে হযনি হযনি করেও উন্নযন যা কিছু হযেছে বাঘ সিংহদেব দাঁত নখ থেকে খসে পড়া সেইসব ভুক্তাবশেষকে ভোগ দখলে রাখার জন্য আমবা কী ভাবেই না কৌশলী হযে উঠেছি—আবামপ্রদতাব্ সন্ধানে সচেষ্ট হযে উঠেছি। যে কাবণে আশপাশের দিকে তাকিযেছি—তাকিয়ে চলেছি শত্রুনিকাশেব জিঘাংসা নিযে। নিজেব ভাইকে

সন্তানকে প্রতিবেশীকে কখনও মেরেছি হিন্দু বলে কখনও মুসলমান বলে কখনও খ্রিস্টান কখনও আদিবাসী সাঁওতাল কোল ভীল মুণ্ডা মুচি মেথর বলে! বণ্টনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে না-গিয়ে আরামপ্রদাতার সন্ধানে থাকতে হলে যা করতে হয় আর কী! সে-ও এক্ষেত্রে তারই সূত্রপাত করে ফেলল না! ডলফিন ট্রাভেলস্‌কে বলেছিল গোটা ভ্রমণের নির্ঘণ্টটাকে এমনভাবে সাজাতে যাতে কোনো দুর্ভোগেব মধ্যে পড়তে না হয। গোটা ব্যবস্থাটা তারা সেইভাবেই কবেছিল সর্বত্রই টু টাযার এ সি রিজার্ভেশন মধ্যে দিয়ে। সত্যি, যে-মসৃণতায় আমজনতাব হট্টগোল বাঁধাবার কোনো জাযগাই ছিল না। শুধু কালকা-টুণ্ডুলা এই কয়েকঘণ্টাব এই একটা ফাঁকই থেকে গিয়েছিল। যার যৌক্তিকতায় বলা হযেছিল, 'কী করা যাবে, ভরা মবসুমে আর যে কিছু পাওয়া গেল না। একবকম কবে চালিযে দেবেন এই কযেক ঘণ্টার ভোগান্তিটা। তাও সেভাবে দেখলে খুব একটা অসহনীয হযে ওঠাব কথা নয়। কালকা থেকে গাড়ি ছাড়বে বাত এগারোটা পঁযতাল্লিশে, টুণ্ডুলা গিযে পৌঁছবে সকাল সাড়ে দশটায। বাতটায সেভাবে উপদ্রব কিছু হবে না—সকালেষ ওই কযেক ঘণ্টাই যা একটু ভুগতে হবে'।

ব্যস এখানেই ঘটে গেল বিপদ। আমজনতাকে সর্বতোভাবে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে তার মধ্যেই শুরু হযে গেল মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। তার ভ্রমণেব আবামপ্রদতাকে একটুকু কাটছাঁট কবতে পরাঙ্‌মুখ হযে উঠল। ছোটাতে লাগল খিস্তি। প্রকাশ করতে লাগল বিরক্তি। হ্যাঁ, এ সব কিছুবই সুদূরপ্রসারী ফল ফলে ফলে ওইসব গল্পগাছায—যাতে একজন মা বাক্ষুসে গ্রাসের অতলে তলিযে গিয়ে নিজেব সন্তানদেব হত্যা কবতেও কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু এসব কী ভাবছে রমেন। কেন ভাবছে গোয়েলবলসের স্ত্রীকে নিয়ে? সে ভাবলে ভাবতে পারে তার স্ত্রীকে নিযেই।

ওই ওই তো মোহিনী।

ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রমেনের পক্ষে যতটা স্থিতধী হয়ে ওঠা সম্ভব কেবিন-বেডে শুযে শুযে ততটাই হযে ওঠে।

কিন্তু এত রাত্রে মোহিনী কেবিনে আসবে কেন? রমেন প্রায-নিমীলিত চোখে দেখে তাকে ঘিবে আছে সরু-সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম অতিমিহি অগুনতি সব টিউব বা নল। যেগুলো আবাব ঢুকে আছে থাকে থাকে সাজানো হবেক বকমেব বাক্সে। বাক্সগুলোব গা জুড়ে লাল-নীল-বেগুনি পুঁতির মতো আলো জ্বলছে। আলোর রেখা কত বকমেরই না জ্যামিতি এঁকে চলেছে।

বমেন বুঝতে পারে ওইসব বস্তুগুলোব সামঞ্জস্যময় সমন্বযেই তার জীবন নির্ভর কবছে। কেউ গ্রন্থি থেকে ছুটে গেলেই ব্যাস্।

রমেনের কাঁদতে ঘৃণা হয। চিঁ চিঁ কবে স্ত্রীব নাম ধবে ডাকতে আরও ঘৃণা হয়। যা ইচ্ছে—যে ভাবে ইচ্ছে

ও তো আব মোহিনী নয়, ও গোযেলবলসেব স্ত্রী।

সুধাসিন্ধুর মূর্তি

ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

১

আট ইঞ্চি উচ্চতায় চার ফুট বাই চার ফুট প্রথম চাতাল। তার উপর একই ঘনত্বে তিন ফুট বাই তিন ফুট চাতালটায় দু-আড়াই ফুটের স্তম্ভমূল। সবই তো টাইলস লাগিয়ে ভীষণ শুভ্র! লম্বাটে মুখ পরিশ্রমী চেহারায় পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটি সম্মুখে তাকিয়ে। তার চশমা ভেদ করে মণিজোড়া শশীকান্তর দু'চোখে গাঁথে।

শশী তার নাটা চেহারায় কালো ত্বকে কেঁপে ওঠে। ত্রিশ-একত্রিশের সুধীর গায়ের কাছে। শশী বলে, বাবু—তাহলে আমার কাজ কোনটি?

—কী, সুধীর গড়াই আর একবার উচ্চারণটা ধরতে চায়।

—আজ্ঞা, আমার কাজ কোথায়?

সুধীর গড়াই নতুন কাজের লোকটাকে পুনরায় চোখ বোলায়। স্তম্ভের উপর শ্বেতপাথরে আবক্ষ মানুষটির চোখের চেয়ে সুধীরের জ্যান্ত চোখে তীক্ষ্ণতা। একটু সময় সরতেই বলে, তোমার কাজ এইখানে—এখানটায়

সুধীর গড়াই একবার দু-বার—পাঁচবার আঙুল নেড়ে নেড়ে নির্দেশ দেয়।

সাদা ফিনফিনে কাপড়ের পাড়ে সরু কালো রেখায় পঞ্চাশ একান্ন বয়সি মা। এক পা দু-পা করে স্মৃতিস্তম্ভের কাছে আসে। কাজের নতুন ছোকরাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। পরে বলে, তুমি পান খাও মনে হচ্ছে? এ তো নেশা—

—আজ্ঞে না। কেউ খাবাইলে তবে খাই, নিজেকে বাঁচাতে ছুট করে বাক্য সাজায়।

মায়ের চোখে সন্দেহ। শশীর দাঁতের দিকে তাকাবার আগেই শশী নিজের ঠোঁট বুজিয়ে আত্মরক্ষা করে। শত কথায় সহজে বা কাড়ে না পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের শশী। ওটুকু বাদ দিলে তো কাজে নিয়োগ করা যায়, এমন বিবেচনা থেকে মা ছেলের দিকে তাকায়।

সুধীর গড়াই শশীর উদ্দেশে বলে, তুমি—আমার মায়ের কথামতো চলবে—ঠিক আছে?

শশীকান্ত মাথা নোয়ায়। তখন তার বাম হাতে বাজারি পলিব্যাগে গামছা লুঙ্গি চুনের ডিবে সুপুরি বাখার প্লাসটিক কৌটো শুদ্ধু নড়ে ওঠে। একার মায়ের দিকে এগোয়। মায়ের উদ্দেশে মাথা নত করে। কত ঘন কালো চুলের ঝাড় যে সে মাথায়!

শ্বেতপাথরে আবক্ষ মূর্তিটার কাছে দাঁড়ায় মা। নিচের চাতালটার চৌ-কোণ থেকে চারখানা সরু পিলারের উপর সুন্দর ছোট্ট ছাদে ছাউনি। রোদ-জল সরাসরি লাগে না। মানুষটার মাথায় সোজাসুজি উপর দিকে লোহার আংটা। সেখানে ঝোলানো বাল্বটা দিনের বেলা নেভানো।

একেবারে চাতালের কাছে ঘাসে পায়ের চটি খোলে মা। পরে কপালে হাত ছোঁয়ায়।

শশীও সঙ্গে সঙ্গে নিজেব কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণতি জানায শ্বেতপাথবে আবক্ষ মূর্তিটায। মূর্তির নিচে স্তম্ভমূলে শ্বেতপাথবে খোদাই,

ঁসুধাসিন্ধু গড়াই
জন্ম—১৮ই পৌষ ১৩৪৬ সাল
মৃত্যু—১৬ই আশ্বিন ১৪১০ সাল

যেহেতু বাংলা বর্ণে শশীকান্ত তার সামান্য বর্ণপরিচয় থেকে খোদিত নাম সাল তারিখ বোঝাব চেষ্টা কবে। পাশে সুধীরেব মায়েব মাথায চুল সিঁথি কপাল গা বুক কাপডেব বং সমঝে একটু ব্যথাদীর্ণ। পাথবে আবদ্ধ মানুষটাকে দেখায শশী, মা—এই বাবু মানুষ .

—হুঁ. আমাব

শশী হাতেব ব্যাগ পাশে ফেলেই আবার হাঁটু গেড়ে তিন ফুটে ধাপটায় কপাল ঠুকে প্রণাম করে। তারপবেই তো সুধাসিন্ধুবাবুব স্ত্রীর ফরসা দু-পাযে কপাল রেখে গড় জানায়, আপনি কত বড় মানুষেব পবিবার গো মা—তা না হলে এমন মূর্তি কেউ গড়ে? হলদিযা চৈতন্যপুবে দ্যাখছি—স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের মূর্তি তে-মাথানি বাস্তায বসানো..

শশীকান্তর এমন বিনয ও সমপর্ণে ঁসুধাসিন্ধুব স্ত্রী কমলা গড়াই তৃপ্ত। গাযে গতবে এখনও বেশ সচল, ও শশী—ও খোকা—ওঠো বাপু—

শশী কপাল থেকে ঝামডানো চুল সবিযে দাঁড়ায।

কমলাদেবী আবক্ষ মূর্তি থেকে শশীব দিকে নজব ফেলে, আমাব মানুষটার চেষ্টায এত বড় নার্সাবি বাগান—কত রকম আমেব কলম জামকল শবেদা—কত ফুল ফল পাতাবাহার খোর্মা টিসাইকাস—। এসব এ অঞ্চলে প্রথম পথপ্রদর্শক আমাব উনিরে খোকা—এ সংসার তাব বক্তে গড়া...

খোল চুন বোন ডাস্টেব বস্তা মাথায ক'জন লেবার পরপর যায়। ইট বিছানো বাগান পথ দিযে সোজা পাকা গো-ডাউন ঘর। গো-ডাউনের পাশ কামবায় ক'জন লেবাব থাকে। তাবপব তো ছাদ বাড়ি পাকা ছাউনি। তলায় মাটি খোল আব হাড়েব গুঁড়ো ভাগা দেওয়া।

ভিতর বাগানে বড় পুকুব থেকে দেড় ইঞ্চি ডেলিভাবি পাইপে জল টানছে টুলু মোটবটা। সে জল তো সরু পাইপ বেয়ে পিতলের নলমুখ থেকে সহস্র কণায উইপিং দেওদাব চাবাগুলো ভিজছে। চারাগুলোব গা গড়িযে জল। জল তো মাটির ভিতবে সেঁধোয। ভুটভুট শব্দ দু-একখানা বক ডানা মেলে পাশের গাছে বসে।

সদরে দু-পাল্লা লোহার গেট'য়ে দুটো পিলাবেব পব অর্ধগোলাকার গ্রিলেব ফ্রেম। ফ্রেমে স্টিলেব পাটি দিযে লেখা "GARAI NURSERY"।

বাগানে ইট বিছানো পথে শাঁখাচুড়ির শব্দ। বড় ঘড় এরিকা রাবিশ প্ল্যান্ট জবা গাছেব ঝাড় গাছগুলোব পাতালতা ভেদ কবে সে-শব্দ কমলাব কানে আসে। খানিক পরেই তো মেয়ে তিনজন চোখের সামনে। তাদেব হাতে ঝোলানো টিফিন কৌটো। ভোরবেলায আনা পানতা টিফিন খেযে কৌটো এখন খালি। ফাঁকা কৌটো ঝনঝনিয়ে দোলে।

কমলা সেদিকে তাকাতেই মাসুদা বলে, ও জ্যেঠি এখুনও চান খাওযা সারোনি?

—না। এবার সারব

—বেলা হল যে? আমরা ঘরে খেতে যাচ্ছি—আবার তিনটেয় জযেন দোবো

—আমাব এই নতুন লোক কাজে এল। তাকে সব বোঝাচ্ছি

মাসুদা সঙ্গীদের দিকে একবার নজর বুলিযে গলায় জোর আনে, নতুন লোক? পবে তিনজন খিলখিল হাসে।

শশী খানিক কুণ্ঠায় আবক্ষ সুধাসিন্ধুব দিকে সবে যায।

—তোরা যাচ্ছিস—যা তো, বেশ কড়া গলায় ধমক দেয় কমলা।

তখনই তো আকাশে এক পাঁজা মেঘ সরে রোদ। সূর্যটা খানিক বাঁক নিয়ে পশ্চিমেব পথে। ছোটো বড় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সে আকাশ। পাশে তাকিযে হঠাৎ বলে কমলাদেবী, ও শশী—তেল সাবানে চান করে নাও ওই বড় পুকুরে—

২

মাঘেব শেষ। সূর্য ডুবতেই আম-জামকলের জোড়কলম চাবা গোড়ায ঘাস মাটিতে আঁধার। এবিকা পাম বটল পাম অর্কেবিযা কুকি গাছ ভর্তি চাবশো সাত ম্যাটাডবটা সগর্জনে স্টার্ট নেয়। চাকা গড়াতেই আকাশ ডুবিয়ে অন্ধকাব নামে।

গড়াই নার্সারিব লেবাববা বড় পুকুরের পাকা ঘাটে নেমে হাতমুখ ধোয। সারা বিকেলেব ধুলো বালি শুকনো পাতার গুঁড়ো সদ্য শীত থিতোনো জলে সাফ কবে। পাকা সানে ঘষে ঘষে ফাটা গোডালির মযলা তোলে।

মেযে লেবাবরা সন্ধে সন্ধে গাছগাছালির কাজ ছেড়ে হাত মুখ ধুযে এখন অফিসঘরের সামনে। মাসুদা কমা ব্যাগের মধ্যে আনা সবযের তেলেব এক পল্লা নেয। সেই তেলে আঙুলেব চামড়া কবজি কনুই অব্দি মেখে চকচকে হয। মাথায চিকনি বুলিযে গোছগাছ।

সুধীরবাবু হাজিরা খাতাটা নিযে হাঁকে, এই নিমাই আছিস?

—আছি বড়বাবু

—বেশ, নামেব পাশে টিক দেয। খাতা থেকে মুখ তোলে বাবু, হরেন?

—হুঁ আছি

—বিপিন?

পাশেব লোক বলে, ওব জাড়তুতো ভাই হাসপাতালে। দেখতে গেছে—। ওব হাফ হাজরে—

সুধীরেব উদ্যম সেঁতিয়ে যায়। পাশে ছোকবা ম্যানেজারের হাতে ধবিযে বলে, বাকি ক'জনেব নিযে নাও—

শশীকান্ত শুকনো গামছা দিয়ে সুধাসিন্ধুর মাথা গাল মুখ ধীরে ধীরে মোছে। পরে জামার কলাব বুক পকেট আস্তে আস্তে ঝেড়ে দেয়। সারাদিন রোদ বাতাসে কত ধুলো।

তলাব চাতালে উড়ুক্কু পাতা-নাতা সরিয়ে বেশ ঝকঝকে। গামছাটা নিযে শশীকান্ত কমলা

দেবীর ঘরমুখো। কমলাদেবীর বড় ছেলেব বাতিল বারমুডা আব কলাব ছেঁড়া সাদা গেঞ্জি শশীর কালো চেহারায বেশ মানিয়েছে। ক'দিন পরে সাফসুফো হযে তেলজলে চেকনাই। শুধু হাজার সেলাই আর তাপ্পিতে হাওয়াই চটিটায় গড়াই বাড়ির বড়ছেলের নজর পড়েনি। সে হাওয়াই চটিতে মস্ত পাকা উঠোনে পা ফেলতেই ফটাস ফটাস শব্দ। উঠোনেব ওপাবে তিন মিলিমিটাব রডে বড়বড় বরফি কেটে জাল ঘেবা। অফিসঘর চত্বরের সঙ্গে বাস্তুঘর প্রাঙ্গণের এটুকু প্রাথমিক আড়াল। কিংবা বিভাজন।

মাসুদা সেই লোহাব জালে কপাল ঠেকিয়ে বলে, ও রুমা

—কী?

—ওই সুধা জ্যেঠুব নতুন লোক

মানুষটাকে যেতে দেখে রুমা বলে, বেশ নাদুস নুদুস তো..

তখনই ম্যানেজাব হাঁক দেয়, মাসুদা—

ছোকবা লেবার ক'জন তড়পে ওঠে, এই মাসু—সাড়া দিবি তো

—হুঁ এই তো।

—রুমা?

—আছি তো। ম্যানেজাবের চোখে কী হযেছে? বাবুদের এত বড় বড় আলো জ্বলতিছে তবু দেখা পায়নি?

ছোকরা ম্যানেজার বলে, হাজবে না পড়লে তোমাদের ক্ষতি। মজুবি পাবেনি—

রুমা চাপা স্বরে মুখ বাঁকায়, হুঁ—মজুরি নিতে বস্তা লাগবে। আজ অব্দি বেট বাড়ালে নি.

পুরুষ লেবাররা বলে, কাল—আমরা সকলে আসব?

—অবশ্যই। ওদিকে সব খিরনিগুলো তুলে নতুন প্লটে বসাতে হবে

মেযেদের মধ্যে মাসুদা বলে, আমবা?

—তোরা না এলে, গাছগুলোয জল সার দেবে কে?

ধীরে ধীবে অফিসঘরেব সামনে উঠোন ফাঁকা। হঠাৎ ভোল্টেজ বাড়তেই বাল্বটায় আলোব জোব। উঠোন গড়িযে সে আলো গোলাপ ঝোপেব গায়ে।

একতলায় দালানের কাছে দাঁড়িয়ে শশী বলে, মা—এউবার?

দোতলা থেকে দুই ছেলের বউবা মুখ বাডায। বড় বউ বলে, শশী কি হিন্দুস্থানী—বিহারি?

ছোটোবউ জানায়, উঁহু। যা গায়ের রং—নিঘ্‌ঘাত সাঁওতাল..

দুই বউ দো-তলার টানা বাবান্দা থেকে মুখ নামায়। বুক ঝুঁকিয়ে নিচে তাকায। মা কমলাদেবী দু-হাতে সাদা কাপড়ে জপেব থলি আর জপেব মালা এগিযে দেয, এটা ধবো—

—হুঁ

এবাব স্টিলেব ছোটো ঘটিতে তুলসি পাতা আব জল। সেটা বাড়িয়ে দেয়, নাও

—বেশ লিছি

কমলা সামান্য রুখে শশীব কথায কান পাতে। পবে মুখ উঁচিযে ইঙ্গিত দেয, এগিয়ে চলো—

সন্ধে নামতেই বাইরে হাওয়ায় শীত। সুতরাং ভেতব ঘরে কাচেব আলমারিটা খোলে কমলাদেবী। দামি কাশ্মিবী শালটার পাড়ে কত লতাপাতাব কারুকার্য। সেটা বুকের কাছে নিযে ভাবে কমলা, . মাত্র ক'বছর আগেই তো কেনা। একটু শীত পড়লেই গাযে দিত এটা। কী প্রিয ছিল যে মানুষটার কাছে..

পাযে পাযে তো শ্বেতপাথবে আবক্ষ মূর্তির সামনে দাঁডায কমলাদেবী। পিছনে শশী। দোতলাব বাবান্দা থেকে বউ দু-জন তাড়াতাড়ি ঠাকুবঘরে যায়। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায। ধূপ দেয। পিতলের ঝাঁঝ বাজায। ঝন্‌ঝন্ আওযাজে বাগানেব অন্ধকাব কাঁপে। ছোটোবউ শাঁখে ফু দেয। তখন বাদ্যি ঘর বাবান্দা উঠোন বাস্তু নার্সাবি বাগান—পুকুবঘাট বেযে কত অমঙ্গলকে যে দূবে দূবে হটিযে দেয।

মাথাব উপব বাল্বটা জ্বলে। কমলাদেবী শালটাব পাট খুলে সুধাসিন্ধু গডাইযের গা-পিঠ বেড় দিযে বুকের কাছ থেকে কাঁধে চাপায।

শশী দু-চোখে শাল জডানোব যত্নটা দেখে।

কমলা দেবী হাত বাড়ায তুলসী জলেব ঘটিব দিকে। শশী এগিযে দিলে কমলাদেবী তুলসী পাতায় জলটুকু ছিটিযে ঘটি আবক্ষেব সম্মুখেই ব্যাকে। পবে জপের থলি আব জপেব মালা মানুষটার বুকেব কাছে বসিযে দেয। পাটভাঙা চাদব জল তুলসী জপমালায় মানুষটি হঠাৎ প্রাণ পায। সন্ধ্যাকালে সুধাসিন্ধু বিড বিড় কবে,.. হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হবে

দু-কান ভবে যায কমলাদেবীব। কমলা গায়ে আঁচল জডিযে সুধাসিন্ধুকে গড জানায। নিজেও উচ্চারণ করে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে.

শশীও খানিক চুপ থেকে ঠোঁট নাড়ায, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হবে হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিজেব দাঁতে বাযু পেষণে হঠাৎ হাওযায় সাঁ সাঁ শব্দ শোনে শশীকান্ত। দূবে আবছা আলোয নার্সাবিব আম জাম কাঁঠাল বোগেনভোলিযা ভিক্টোরিয়া ফর্কেরিয়া পাতাবাহাব গাছগুলোব দিকে তাকিযে কী খোঁজে! আবাব নিজের দাঁতে চেপে কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চাবণ কানে ঠেকতে চমকে যায, .. এইখানে সৌদ্বীপের গায়ে ঢেউ ভাঙাব সাঁ সাঁ. ধু ধু নোনাজলে সাঁ সাঁ বাজনা

কমলা শশীব এমন মগ্ন উচ্চাবণে হঠাৎ খুসি। পবক্ষণে বিব্রত, ছোকবাটা থাকবে তো এই চাকরিতে. ! মানুষটার জন্যে ক' মাসে কতজন লোক এল, কত জন যে পালিযে গেল.. !

৩

বঙিন শাড়িতে ম্যাচিং ব্লাউজ পবে ঝুমবি। তার বাইশ তেইশ বচ্ছুবে শবীবে হাঁটা-চলায বড্ড কোলাহল। শ্যাম বর্ণ ত্বকে হাত বোঝাই কাচের চুড়ি। দু-কানে সিটি গোল্ডের পাশা।

দু-হাতে ট্রেটা ধরে পাযে পাযে ভেতব ঘব থেকে দবজা ঠেলে। ঘবটা ডিঙোতেই বাইরেব বড দালান। একদম কোণে বাববাবান্দায ছোট্ট কুঠরিটা তো এখন শশীর ঠাঁই!

কমলাদেবীব ঘবে ঢুকেই ঝুমবি বলে, মাসি তোমাব চা—

ট্রের দিকে তাকায়, মেসোর কাপ প্লেট দিয়েছে তোর বউদিরা?

—হুঁ, ট্রেটা রাখে ঝুমরি, পাতলা ফুলকাটা বড় কাপে লাল চা আর প্লেটে পাউরুটি সেঁকে ঘি চপচপিয়ে টোস্ট। বাকিগুলো সেঁকা রুটিতে সামান্য ঘি মুছে চিনি ছিটোনো।

—তিন কাপ আনলি যে।

—মেসোর লোক খাবে নি?

কমলা ছোকরাটার অমন গ্রাম্যতায় ঠিক ধাত বুঝতে পারে না, তাই একটু চুপ, আচ্ছা—চাপা দে। আমারটাও—

গায়ের চাদর গুছিয়ে নেয় কমলাদেবী। তার বাম হাতে ঘি চপচপে টোস্ট ডান হাতে গরম চায়ের কাপ প্লেট। কমলা চাপা স্বরে ডাকে, ঝুমরি—বারান্দার গ্রিলটা খুলে দে তো।

বাক্যের আওয়াজ সঙ্গে গ্রিলের ঝাঁকুনি মস্ত বারান্দা বেয়ে তো কোণের ছোট্ট কুঠুরিতে। যেহেতু চাকরি, শশী বিছানা থেকে উঠে সোজা পাকা উঠোনে দাঁড়ায়, মা—দিবেন গো আমার হাতে?

কমলা পাশে তাকিয়ে বরং সঙ্গে যাওয়ার মুদ্রা দেখায়। কমলার পদক্ষেপে খুব সতর্কতা। হাতে কাপভর্তি চা। ভাবে, একটু চলকালে যে কী রেগে যেত মানুষটা...

কোন আচ্ছন্নতায় থমকে দাঁড়ায় কমলা। কাপে কড়া লিকারে চা টলমল করে। একটু থিতোলে শশীকে বলে, এমন ভাবে—খুব সাবধানে নিয়ে যেতে পারবে তো?

—নিশ্চয়

চায়ের কাপ প্লেট আর টোস্ট ধীরে ধীরে সুধাসিন্ধুর বুকের সামনে রাখে কমলা। এতক্ষণে মানুষটা তো জপ করছিল। তাই নিম্নকণ্ঠে বলে, শশী—জল মালা তুলসী সরিয়ে নাও .

কাপ প্লেটগুলো গুছিয়ে একান্ন-বাহান্নর কমলাদেবী মাথা নোয়ায়, খেয়ে নাও

কত আবেশ যে সে কথায়! শশীও মাথা নুইয়ে কমলায় অনুগামী। হাতের দ্রব্যগুলি গিন্নিমার ঘরে রেখে নিজের কুঠরির দিকে এগোয় শশী। দালানের অনেকটা চলে যায়।

কমলাদেবী নিজের কাপটা হাতে নিয়ে বলে, শশী—তুমি চা খাও?

—আজ্ঞা? খাই—আমানকে দ্বীপে ব্যবস্থা ছিলি

—কী? কোথায়. ।

বিস্ময়ের ঝাপটায় শশী সঙ্গে সঙ্গে সরল বাক্যে উত্তরটা সাজায়, ওই আমাদের দেশ গাঁয়ে গো গিন্নিমা—

পাকা কুঠরিতে মেঝেয় পাতা বিছানা। মোটা পাতলিটা গায়ে জড়িয়ে চায়ে চুমুক দেয় শশী। ভাবে, ..কত ভালো কাপ প্লেট, দামি লিকার। তবুও দ্বীপে ফরেস্টের ডালপালা জ্বেলে তোরডানো সিলভার বাটিতে ফোটানো গরম জলে ডিমাগুড়ি বাজারের গুঁড়ো চায়ের স্বাদ কাঁই.

বার তিনেক ক্রিং .ক্রিং...ক্রিং.. বাজে। বাম হাতে মোবাইলটা নিয়ে ফাঁকা বাতাস পেতে দোতলার বারান্দায় সুধীর। সামনে পাশে আশি নব্বই বিঘে ভূমির উপর নার্সারি। গাছপালার মধ্যে পুকুর ঘাটে দু-একটা বাল্ব জ্বলে সারারাতি। গো-ডাউনের পাশ কামরায় ক'জন হাওড়া

জেলার লেবার রান্না বসিয়েছে। সে দিকে চোখ মাত্র।

সুধীববাবু এতক্ষণ তো মোবাইলে অন্যপক্ষেব কথা কানে নিচ্ছিল। থামতেই বলে, হাঁ—জী—হাঁ, এক ম্যাটাডর এরিকা বটল পাম খোর্মা সাপ্লাই হো গিয়া—আঁ.. আঁ নিউ অর্ডার?—ভেরি গুড—আঁ ফরেস্ট অর্ডার—হাঁ সব প্ল্যান্টস এভেলেভেল—। আঁ—ঠিক হ্যায ও কে—

দোতলায় মোবাইলে ফরেস্ট কথাটা উচ্চারিত হয। নিচের তলায় শশী চমকে ওঠে! তাদের ফরেস্ট এখান থেকে কত বাস রাস্তা. গাঙ পথ সমুদ্র পেরিযে যে কত দূব.. ।

ইলেকট্রিক ঘড়িতে ঢং ঢং দশখানা আওযাজ। শশী বিছানায থাকলেও চারদিকে তো আলো, শুলেও ঘুম আসছে না। ববং ঘড়িটাব আওযাজে উঠে বসে।

কমলাব ভেতর ঘবে ঠক ঠক আওযাজ। দবজা খুলতেই ঝুমরি স্টিলেব থালাটা এগিযে দেয়, মেসোব খাবার—

বিছানায় আধশোওযা কমলা উঠে বসে।, তোদেব খাবাব সাজিযেছিস?

—তুমি খাইযে এসো।' আমরা ততক্ষণ গুছোই

—শশীর খাবাব?

ঝুমবি ঝটপট কিছু বলে না। কমলা শশীকে নিয়ে খানিক দ্বিধায! নিজেব মধ্যে এপাট ওপাট খুলে দেখে। অন্দবমহলে খাওযা দাওযার কাছে এখনই শশীব অবাধ প্রবেশ। তাব উপব ভেতর মহলে বউমাদেব কাছে সড়গড় হলেই যে বউদের ফবমায়েসে কাজের লোক জেববাব। আগের জনেবা তো অভিযোগ কবেছে, গিন্নিমা—কাব কাজটা আগে-সাবব? আপনার, না বউদিদের?

.ভেতব-মহলে বাড়তি এক পবিচাবিকা তো আছে। তাই পুনবায একই সমস্যা থেকে পবিত্রাণের আশায ঝুমরির দিকে তাকায়। কমলার সে-দৃষ্টিতে পবামর্শ যাঞ্চনা। হাতেব থালায যে সুধাসিন্ধুব রাতের খাবাব। খুব ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস। ভাবে,.. মানুষটা থাকলে কি আমার এত ভাবতে হ'ত...

তখনই ঝুমবি বলে, মাসিমা—

—উঁ, থালায় একমুঠো ধবধবে সাদা ভাত। সুন্দর কবে সাজানো ছোটো কপোর বাটিগুলোয একটু মাছ, সবজি, একটা বাটিতে সামান্য দুধ, এক চিলতে সন্দেশ। ঝক ঝকে থালায় যাবতীয যে স্টিল আলমারির পাল্লায বড় আয়নাতে ফুটে ওঠে!

—আমি চাব বাটিব টিফিন কৌটোয ভাত তরকাবি দিয়ে যাবো তোমাব লোকের জন্যে?

কমলা সম্মতি জানায, তবে বউমাদের কানে বেশি তুলিসনি

যেহেতু টানা বাবান্দা পা পড়লেই তো হালকা কম্পন কানে। ফাঁকা কুঠবিতে একলা শশী। দবজা থেকে মুখ বাড়ায। খালি পাযে ছুটপাট কমলাদেবীব পিছনে। স্তম্ভমূলের কাছে দাঁড়ায কমলাদেবী। সামনে যে কাপেব চা জুড়িযে ঠান্ডা সব। পাউরুটিব টোস্ট পবিসবে ঘি জমে শীত দানা দানা।

শশী বলে, গিন্নিমা—এগুলান সবাই?

মাথা নেড়ে সহমত জানায় কমলা দেবী।

শশীব চোখে, কাপে চা টুকুব পবিমাণ একই আছে। টোস্ট'যের আয়তনও তো আগেব মতো ! তবু কেন যে .

সুধাসিন্ধুব সামনে ভাতেব থালাটা সাবধানে বসায কমলাদেবী। হঠাৎ মনে পড়ে, সুধীব তখন বছব সাতেকেব। মেযেটা কাঁদছে বিছানায। তাড়াতাড়ি বাখতে গিযে মাটিব মেঝেয কাঁসার থালায ঠং কবে শব্দ। বলেছিল মানুষটা, .না হয মেয়েটাকে সামলিযে আমাকে দাও। কত কষ্টেব অন্ন। সে টুকু রাখতে গোছাতে আরও কষ্ট.আবও যত্ন করবে. । কতজন যে শত চেষ্টায পেট ভবে অন্ন পায না.।

চারপাশে শীত। আশপাশেব গাছে পাতা বেযে হিম! কথাগুলো টুপ টুপ বাজে.!

রুপোব বাটি পর পর গুছিযে দুধেব বাটি পাশে রাখে কমলা। সামান্য ঘাড হেলিযে বিড়বিড় কবে, তোমাব হাতে গড়া সংসাব এবাব খেতে বসবে। তুমি খেযে নাও

কমলাব দু-ঠোঁট দাঁতের উচ্চাবণে স্পৃষ্ট বাতাসটুকু শীতেব বাগানে মিশে সবসবিযে সামান্য দোল। ত্রিশ বত্রিশ বচ্ছবেব কলমকাটা আম জামকল জলপাই লিচু গাছগুলো শীতেব জবুথবু পাতা নাড়িযে পাশে তাকায, তাদেব পুবাতন মালিক যে এখনও তাদেব সঙ্গে ঘাস মাটির বাগানে বসে খায..

ততক্ষণে যে বড় ডাইনিং টেবিলে খাবাব সাজিযেছে ঝুমবি। বউরা, সুধীব ছোটোজন সুদিন খাদ্যেব কাছে বসে। দোতলার বাবান্দায হাত রাখতে কবজি ভর্তি কাচেব চুড়ি ঝম ঝম বাজে। বেলিং থেকে নিচে মুখ বাড়ায ঝুমবি—।

টাইলস বাঁধানো জমিন ধাপটায কমলা দেবী, ও শশী

—আজ্ঞে

—দশ মিনিট এখানে বসো, ইঁদুব টিকটিকি যেন বাবুব খাবাবে মুখ না দেয

—মাত্র দশ মিনিট !

—আবাব কী? ওর মধ্যে মানুষটা খেযে নিযে কাজে লেগে যেত। তাব দু-হাতে কত কাজ। এত বড বাগান—এই বিল্ডিং এই সংসার তাব দু-হাতেব শক্তিতে

শশী অবাক চোখে জিজ্ঞাসু। সুধাসিন্ধুব মাথাব উপব থেকে আলো খানিক গড়িযে শশীব মুখে।

—মানুষ কি শুধু খাবে? কত কাজ থাকে বলো তো সমাধা করতে?

—তাই তো

খুশি হয কমলাদেবী, দশ...দশ মিনিট পবে—তুমি সব থালা বাটি তুলে আমাব ঘবে আনবে। ততক্ষণে উপব থেকে নামছি—

বড ডাইনিং টেবিলেব একধাবে মা কমলাদেবী। মাযেব আলাদা আযোজন হলেও বাতে এক সঙ্গে খেতে বসে। কমলাদেবী হাতেব ভাত মুখে তুলতেই তো শুনতে পায সেই কণ্ঠ, দিনেব শেষে ছেলে মেযে স্ত্রী নাতিপুতি কাণ্ড ডালপালা শাখা মেলে না খেতে বসলে গলাব মধ্যে ভাত যেতে চায় ? যতদিন আমি বেঁচে থাকব—এটা.যেন ছেঁটে দিও না কেউ.

টেবিলেব ওধাব থেকে হঠাৎ ছোটোবউ বলে, মা

কমলা মুখ তোলে, কী গো বউ মা?

—আপনার এবাবেব লোকটা বোধহয় ভালো..

কমলাব বুকেব ভেতরে হুড়মুড়িযে শিকড চাবায়। তখন সুধীর বলে, হবে না, এ তে গ্রামের মানুষ?

—এব আগেব লোকবাও তো গ্রামেব ছিল, বলে সুধীবের স্ত্রী।

—ছিল। কিন্তু এ হল আমাদের এখান থেকে একশো মাইল দূবে .সে গ্রাম! তাবপব আব ওদেশে গ্রাম নেই..শুধু জল। ধু ধু নোনাজল, বিবরণ দেয সুধীর।

সকলেব গালে মুখে নোনাজলেব ঝাপটা। কমলা অথৈ জলে, খানিক কূল পেতে কূলের ঝোপ ঝাপ আঁকড়াতে চায। থালাব খাদ্যটুকু হুটপাট শেষ কবতে উদ্যোগী।

৪

বড় গেট'যের গা ছুঁযে পাকা বাস্তাটা ডাইনে কলকাতামুখো। বাঁযে মফস্সলেব আবও ভেতবে। পথে অটো, ভ্যান ট্রেকাবের শব্দ জুডিযে গেছে। আকাশ আগলে তো শীত এ চরাচরে। গাছে গাছে পাতায পাতায় শীত। দূব নক্ষত্রেব ছিটোনো আলোর গা বেযে শীত এখন এই "গডাই নার্সাবিব" বাগানে।

দু-পাযে গামবুট এঁটে টুপি মাথায লোকটাব গাযে ফুল সোযেটাব। হাতে গেঁটে বাঁশেব লাঠি। ঘাড থেকে দড়ি বেঁধে ঝোলানো তিন ব্যাটাবি টর্চ। পাযেব চাপে বাগানে ইট বিছানো পথে ধুপ ধাপ শব্দ। সুধাসিন্ধুবাবুকে ডাইনে বেখে গেটযেব অফিসঘরে পাক খায। দালানের সামনে ঠিক কমলাদেবীব দবজা ববাবব দাঁড়িযে হাঁক মাবে বটু পাইক, মাসিমা কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

—নাবে বাবা—সব ঠিক আছে

—দবকার হলে ডাক দেবেন। ও ধাবে আছি

—হুঁ, ওদিকে তো বড্ড গাছ চুরি হয। ভালো কবে গার্ড দে

বটু পাইক বিছোনো ইটেব উপর দিযে ক্রমশ বাগানে গাছপালাব ভেতর।

কমলাদেবী দালানের গ্রিল খোলে। সুধাসিন্ধুব দিকে খানিক তাকিযে।

ঘরেব দবজা অনেকক্ষণ খোলা। নিজেব পবিষ্কাব বিছানায দুটো মাথাব বালিশ পাশাপাশি। বড আযনাব সামনে চিরুনি টেনে মাথাব চুল সামান্য গুছিযে নেয। হালকা পাউডাবেব মুখটা মুছে ঘবেব চেযাবে বসে কমলাদেবী। নাইলন মশাবি টাঙিযে বিছানা। সে-দিকে তাকাতেই তো কমলাদেবীব বুকেব ভেতব হাঁফ ধবে!

কমলাব মনে হল সিঁড়ি ধাপে হেঁটে ঘোলা গ্রিল দিয়ে চৌকাঠ পেকচ্ছে মানুষটা। ফাঁকা বিছানায ধুপ শব্দে সামান্য দোল। তখন তো কমলাদেবী ধীবে ধীবে উঠে গ্রিল আঁটে। দরজায হুক দেয। বড় আলো নিভিযে বেডল্যাম্প জ্বালে। মাথাব পাশে বালিশটায় হাত বুলোয কমলাদেবী। পবে সে বালিশে দু-গাল ঘষে কোন ছোঁযা যে পায। মিন মিন কান্না নাইলন

মশারি গলে জানালাব এপাবে।

শশী দেখে। দেখতে দেখতে ব্যথা পায। নিজেব পাশ কুঠবি বিছানায চুপচাপ বসে। দরজার পাল্লা গলে শীত। তখন বিছানাব চাদবটা জড়িযে উপবে ছাদেব গাযে চোখ। কী যে দেখে শশী!

বাত গভীর হয়। ঘবে ঘরে বাতি নেভে। বেল গো-ডাউন এফ সি আইযেব মস্ত মস্ত গো-ডাউন মাঠ ঘাট তেপান্তব পাহাড় কন্দব থেকে অন্ধকাব গডাতে গড়াতে মানুষের আনাচে কানাচে।

বটু পাইক ভেতব বাগানে নজর বাখে। ওদিকে চাষেব মাঠ ফাঁকা। লোহার ববফি কাটা টাওযাবের উপব হেভি ভোল্টেজ বৈদ্যুতিন তাব আকাশ চিবে কত দূব।

ফাঁকা বিছানায আজ বড্ড উশপাশে অস্থিব পঞ্চাশোত্তীর্ণ কমলা! ইলেকট্রনিক ঘডিটায ঢং. ঢং দু-খানা আওযাজ। সে আওযাজ বাগান বাগানে টবেব গোলাপ পাতাবাহাব ঝাড হাফসাইজ পলি ড্রামে খোর্মাগাছগুলোব পাতা হড়কে—আবও দূব ভূমিভাগ বেযে বাতাসে মিশে যায!

টুকুস কবে ছিটকিনি খোলে কমলা দেবী। গাযে লেডিজ শাল। নিঃশব্দে একদম সুধাসিন্ধুব কাছে। দু-বাহু দিযে মানুষটার বুক গা-জড়িযে নিকচ্চাবে দু-গালে গাল ঘষে। কী কঠিন ঠান্ডা! আকাশের ঢালে কোন নক্ষত্র যে কমলাকে আলগ্ন দেখে চোখ নামায: জমাট কালো মেঘেব খানিক আড়ালে সে-নক্ষত্র নতমুখ।

বিছানাব চাদরে শশী। সাবান কাচার গন্ধ শীতেব জমাট বাতাসে অনেকক্ষণ থমকে। ধীবে ধীবে পাশে তাকায কমলা দেবী, শশী

—হাঁ গো গিন্নিমা—। আপনি ঘবে চলুন

বারান্দা ডিঙিয়ে দরজাব কাছে আসতেই পঁযত্রিশ ছত্রিশেব শশী বলে, আপনি কত কষ্ট পান .

—তুমি বেঝো

—হুঁ। বাবুকে যে কত ভালোবাসতেন

শাল চাপানো দেহে ভারি গা-বুক কমলার। শশীব মুখোমুখি দাঁডাতেই পুরুষেব আবেশ, আমাকেও খুব ভালোবাসতো গো শশী .। গোটা সংসাব বাগানকেও .

—সেইটা ধবতে পারছি , শশীব কালো ফোলা গাল মুখ নড়ে ওঠে।

—পাবছো পাবো., বলতে বলতে শশীব দিকে তাকিযে কথা ফুবোলেও কমলাব বুকেব মধ্যে যে মানুষটাকে আচাবে, আচবণে বাঁচিযে বাখাব আকুলতা।

নিজেব দু-গালে পাথুবে ঠান্ডাব ছলক তখনও। পবক্ষণে বলে, শশী

—আজ্ঞা?

—তুমি থাকবে

—কোথায?

—আমার কাছে

বাইবে স্বল্প আলোয চৌ-দিকে নিঝুম। শীতের আঁধাব।

—আছি তো.

—ববাবব

—হুঁ। রাখলিই থাউকবো

শশীর দুই কালো ভারি ফোলা গালে কমলা হঠাৎ দু-আঙুল ছুঁযে আপনতা খোঁজে। তার গালে নিজের দু-গাল ঘষে পাথুরে ঠান্ডা মোছে। বিড় বিড় করে, শশী .

—আইজ্ঞা

তারপবে তো কমলা থমকে শশীব হাতটা ধবে। কেউ কিছু বলে না। ববং কমলা চকিতে গিন্নিমা হযে ভাবে,. মানুষটাকে বোজ বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যে বাঁচা-মানুষেব বড্ড দবকার...!

ফিরে যাচ্ছে লোকটা

বাসুদেব দেব

ফিবে যাচ্ছে লোকটা, ফুবিযে এল তাব পথ
পাহাড়তলিব ঢাল বেযে গড়িযে পডছে
বৃষ্টি, ভেড়াব গলায বাঁধা ঘণ্টাব শব্দ
গডিযে পড়ছে একবাশ অপমান
অসম্পূর্ণ হিশেবপত্র

এবাব আধ-অন্ধকাবে জ্বলে উঠবে
একটা বিধবা মোমবাতি
প্রতিকূল হাওযা, জানালা বন্ধ কবো
শব্দ না কবে
সব প্রত্যাশাব ওপব ঝবে পডছে
চোখেব জলেব মতো বিন্দু বিন্দু মোম
ফিবে যাচ্ছে লোকটা, কবুণ ক্ষতবিক্ষত
ববাবেব চটি

দিবাবসানেব বাঙা, ওকে আশ্রয দাও

দিন-কাল

অরুণাভ দাশগুপ্ত

এক
দেওযালে ঠেকেছে পিঠ, অন্ধকাবে ঢেকে যায মুখ
বিষজ্বালা বুকে নিযে ছেলে বেছে নেয বনবাস,
বারুদের গন্ধ আর হাড়-ভাঙা শব্দে কাঁপে শান্ত বনস্থলী
বুড়িমা দাওযায বসে হা-পিত্যেস কবে বাবোমাস।

দুই
অপুষ্টি না অনাহাব? পবিণামহীন তর্ক পণ্ডিতসমাজে,
অন্নপূর্ণা যোজনাব বার্তা-ভাতে প'ড়ে থাকে ছাই,
আত্মহননেব আগে পোষাতিব ভবা পেটে লাথি মাবে চাষা
বনমহোৎসব কাল, মন্ত্রীব সম্মানে গাঁযে
বিসমিল্লা বাজাবে সানাই।

চন্দ্রকলাভুক

নন্দদুলাল আচার্য

আকাশ আকাশ নয, যেন নীল পুষ্করিণী,
অর্জুন ও হবিতকি গাছেব মাথায।
আলোকের স্বৈবাচাবে চবাচবে মাযাবাস্তবতা।

অতর্কিতে পাহাড়চূড়াব থেকে
কে দিল মবণঝাঁপ,
'মুন?' নাকি মুনস্ট্রাক কেউ?

বাত্রিব স্তব্ধতা চিবে নিশিপক্ষী ডেকে ওঠে,
কাব মুখ? কাব মুখ? ওটা কাব মুখ?
দু হাত বাড়িযে তাকে বাঁচাতে কে ছুটে যাচ্ছে,
অগ্নিদেবতাব মতো চন্দ্রকলাভুক ?

এই আনন্দের দায়

শুভ বসু

বাসস্টপে দাঁড়ানো ওই যৌবনবতীব
নিতম্বেব দিকে চেযে সিডিঙ্গে লোকটিব দীর্ঘশ্বাসে
যে গভীব তৃষ্ণা-তাপ আছে, বুঝে যাই
মানুষেবা নিবন্তব স্পর্শে ও সম্ভোগে
কীভাবে মানুষতাব সার্থকতা পেতে চায,

পেতে চেয়ে পলাশের সংবাগের বেশে বেশে নিজেকে বাঙিয়ে
নিরন্তর চরিতার্থ হয়ে উঠতে চায়।

পাশের বাড়ির থেকে মধ্যরাতে উন্মাদক শীৎকারের শব্দ উঠে এলে
বুঝে যাই, কেন আনন্দের থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম
ঋষিকুল প্রাজ্ঞস্বরে বার বার জোর দিয়ে
আমাদের এ কথা বলতেন!

সেই আনন্দের দায় বয়ে যেতে হবে, তাই
মেঘের মদির মায়া আমাদের মাঝে মাঝে উদাসীন করে,
নরম জানলার পাশে বসে
সেইসব মুখগুলি, নরম সুগোল বুক স্পর্শের শিহরণ-স্মৃতি জেগে ওঠে।
গাছেদের মাথা নাড়ানাড়ির আনন্দে মজে গিয়ে
মনে হয় আমাদের সমস্ত জীবন যেন
শুধুমাত্র স্পর্শের তৃষ্ণায় আনন্দ হয়ে ওঠে।

সেই আনন্দের স্বাদ পাওয়াই জীবন
এই বর্ষার দিনে বার বার সেই কথা
প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে বেদনাগুলিকে কিছু সহনীয় করে দিয়ে যায়।

দুঃখের দিনলিপি

পার্থ রাহা

বুকের মধ্যে দুঃখ জমে পঁয়ষট্টি হাজার
কোনো কোনো দুঃখ লজ্জায় লাল
কেননা তারা জানে এর পরের দৃশ্যেই
তাদের সাদা হবার সময়
কেউবা ব্যথায় নীল, নীল নির্জনতা
অপমানে বেগুনি, অবহেলায় সবুজ
নিজেদের ভাবনায় মশগুল থাকতে থাকতে
কালো হয়ে যায়
পঁয়ষট্টি হাজার দুঃখ বিদেশি সেন্টের মতো হাওয়ায় হাওয়ায়

এই হাজাব পঁযষট্টি দুঃখ নাডাচাডা
নাড়াচাড়া কবতে কবতে
ঘুষি পাকিযে ছুটে আসছে যে লোকটা
তাকে ভুলে যাই
ডিমেব ওপব শান্ত হাঁসেব মতন
ঘৃণা কবতে ভুলে যাই
পঁযষট্টি হাজাব দুঃখ নিযে প্রতিদিন
দিনমান
খেলা কবতে কবতে
আসলে তেমন কোনো সাহস হযনি
আসলে তেমন কোনো অস্ত্র ধবিনি
আসলে দুঃখগুলো বাদামি বুলেট হযে কোনোদিন বকেট হযনি।

যা কিছু রঙিন

মৃণাল বসুচৌধুবী

অস্পষ্ট আলোয ওডে চিল
সোনালি কিবণ মেখে
দিগন্তবেখাব দিকে
উডে যায দলছুট্ মাছবাঙা পাখি
উডে আসে হিমেল বাতাস
তোমাব বাগান জুডে অসুখী ভ্রমব
ক্লান্ত ওডাউডি সেবে
চলে যায ঘুমেব ভেতবে

ডানাব বিরুদ্ধে যত প্রতিবাদ নিযে
উজ্জ্বল বাবান্দা জুড়ে
শিশুদেব সঙ্গে তুমি খেলায মেতেছো
'অবিচ্ছিন্ন ওডাউডি' শব্দ দুটি থেকে
যতটা উত্তাপ এসে
চন্দন কাঠেব প্রিয বোতাম পোডায

নিঃশব্দে পুড়িযে দেয
অনুপম স্মৃতি
তাব বেশি
যা কিছু বঙিন
তাকে আমি ছাইভস্ম সিঁদুব মাখিযে
এতদিন হিমঘবে লুকিযে বেখেছি
উদাসী জ্যোৎস্না এলে
এবাব ভাসিযে দেবো
উদাসীন জলেব আঁধাবে

কথা বলতে বলতে

নীরদ রায

ছবি হযে ওঠাব মতো নদীপাড়েব একটা আস্ত বিকেল
গল্পেব গাযে একটুখানি ঝুঁকে পড়া বকুল বকুল গন্ধ,
গতকাল বা পবশুব ভালোলাগাগুলিব ওপব অল্প অল্প জ্যোৎস্নাব আলো
কথা বলতে বলতে আজ তুমি এসব তুলে দিলে হিংসার হাতে,
বেশি নয সামান্যই ছিলো দুতিন হাতেব একটুখানি পুবনো
সমাজমুখী সংস্কৃতি ও তালগাছ সমান মানুষদেব প্রসঙ্গ—
ছিলো বাস্তায দাঁড়িযে একটা বৃষ্টিভেজা প্রেমও—
কথা বলতে বলতে আজ তুমি হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললে সেটুকুও?

আমি ইমরানা

মল্লিকা সেনগুপ্ত

আপনাদেব বলছি, আমি ইমবানা
ধর্মপ্রাণ মুসলিমেব ঘবেব বিবি
আমাব কিস্যা শোনাতে চাই আপনাদেব
ঘব কবছি বেশ কিছুদিন
পাঁচটি ছোটো বালবাচ্চা
এমন সময হঠাৎ এক অন্ধকাব দিনে

ঘবে এলেন শ্বশুবমশাই
যিনি আমাব ববেব বাবা
বাচ্চাদেব আপন দাদু
সংসারেব কর্তা যিনি
জাপটে ধবে শুইযে দিলেন
হাত পা বেঁধে, মুখে কাপড গুঁজে
খিমচে কামড়ে লোভে লালায
বক্তে আব বীর্যে আমায নষ্ট করলেন।

নষ্ট হলাম, তাবপব কী?
মাটিতে শুযে কাঁদব নাকি
বিচাব চাইব উলেমাদের কাছে
কেমন বাপ, কন্যাসম বউকে যিনি
শেযালজিভে চাটেন।
হাদিশ বলেন ধর্ষণেব শাস্তি হবে মৃত্যু
মাটিতে পুঁতে পাথব ছুঁড়ে মাবুন তবে ওকে
শ্বশুব নয, লোকটা শযতান।

দাব-উল-উলম ফতোযা দিলেন
শাস্তি হবে আমাব
পুরুষেব কাজ পুরুষ কবেছে, করুক
এখন থেকে আমাব ঘব ধর্ষকের খাটে
ববেব সঙ্গ এখন থেকে বাবণ।
আমদববাব বিচাব করুন
আমি কি এক মাংসটুকবো
শযতান এসে চেটেছে বলেই ববববাদ আমি
আমাব ঘর, আমাব খসম, সব ববববাদ?
এই কি আমাব শান্তিব দেশ ভাবতবর্ষ?
আমি ইমরানা, আপনাদেব জবাব চাই।

স্কিৎজোফ্রেনিয়া

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

'মতিচ্ছন্ন' যদি বলে বন্ধুবা,
আমি মুখ নিচু কবে বুড়ো আঙুলেব নখ খুঁটে যাব,
না কি খুব ফিচেল ধবনে মাজাকি মাবব।
সেদিন যে ফুল পাঠিযেছি,
ফ্রোবিস্ট ফোন কবে বলে দিল, ও বাড়িতে কেউ থাকে না—
আব, সঙ্গীতা? সে-ও বিট্রে কবল,
কফিহাউসেব মুখে তোমাকে চেনালাম, তো,
ফিবে এসে দিবি শোনাল, 'কই। কাউকে দেখিনি।'
ডাক্তাবও জানিযেছে যে, সত্যি নও,
কল্পনা আমাব।
এ-সব মুহূর্তে তুমি পাশ থেকে আশ্চর্যবকমভাবে সবে-সবে যাও,
তোমাকে ধুবন্ধব ভাবব, ভয হয।
বড বেদনাব মতো লাগে

আদিম পুরুষ

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

আব কতকাল গল্প শোনাবে তুমি, মিথ্যে স্বপ্ন দেখাবে?
আমি জানি যা কখনো ঘটবে না, সে-সব ছবিই
ঘুমেব অতলে তুলে আনো, দিশাহীন ডুবুবিব মতো সেইসব
লাল নীল মাছেব পিছনে ছুটে যাই। কোথায মিলিযে যায,
শুধু জল দীর্ঘশ্বাসে বুদ্‌বুদ্‌ ছুঁড়ে দেয। মিথ্যে আশ্বাসেব
সবুজ শ্যাওলা পিছল ও ভাসমান।

স্মৃতি স্বপ্ন শব্দ কিছু নেই, নিষ্ফল বেঁচে থাকা,
বাত্রি নিস্ব কবে ভোব আসে, মেঘেব আডালে
সব আলো মুছে যায। আবও অন্ধকাবে ছই-এব ভিতব
কবিতাব লণ্ঠন নিয়ে আদিম পুরুষ সপ্তর্ষিব ওপাবে চলে যায,
অপেক্ষা ক্ষযে যায শীর্ণ চাঁদেব কিনাবে। ফেবা নেই,

শুধু চলে যাওযা, একটাই লোহাব ফটক। একটি মাত্র
মোম, মাঝখানে পড়ে আছে পাশাপাশি সমাধি, কবব
একটি নক্ষত্র নিভে গেলে অবধাবিত আব এক শিশুব জন্ম—
আদিম পুরুষেব ছাযা ক্রমশ দীর্ঘ।

পাথর, তোমার বুকে

সুশান্ত বসু

পাথব, তোমাব বুকে পড়ে নিই স্তব্ধ কথকতা,
সজল স্মৃতিব যত নীববতা ঘুমানো পাথবে
কথা বলে, পৃথিবীব গর্ভ থেকে প্রচ্ছন্ন আগুন
হেসে ওঠে আমাদেব চতুবালি দেখে।
বাচাল বর্ণালী-ঘেবা আজীব পাট্টাব খোলা মাঠে
উদাসীন চেযে থাকে হাজাবো পাথব।

পাথব, তোমাব বুকে লেখা আছে আগুনেব ভাষা;
জলেব দীক্ষিত স্রোতে জেগে ওঠো ঘুমন্ত পাথব।

দ্রোহ

দীপেন বায়

জানু মুড়ে বসেছি ধুলোয, এত সহজেই তুলে দেবে।
মাযেব জঠব হযে ঘিবে আছে কাঁকাল পৃথিবী।
ফিবে আসছি, এখন সামনে মাঠ, শেষ দেখে
তবে যাবো—একটা জীবন মাত্র—জন্ম থেকে
সেদ্ধভাপে অবিকল ধানগন্ধী আকণ্ঠ প্রকৃতি
খিদেয খুঁচিযে মাত্র দশ হাত মৃত্যু থেকে দূবে
উলটে-পালটে টেনে এনে খুঁটি-নাটি জীবনেব
শিখিযেছে—মাটি ধবে সম্ভব যতদিন বাঁচি
দিযে থুযে পৃথিবীকে—উদবৃত্ত কিছু থাকে যদি
সমগ্রে তোমাকে দিই আকাঁড়া মেধায মোড়া দ্রোহ।

চুনু বাস্কের ছেলে

রাণা চট্টোপাধ্যায়

মানুষ কত বদলাবে?
আটপৌরে মানুষেরা আজ কেতাদুরস্ত হয়েছে।
সাঁঝপথ পেরিয়ে এসেছে উড়াল পোলের আলোয়।
ভাঙনের মুখোশ প'রে এখন আদিবাসীরাও হাঁটছে।
জলখেয়া পেরিয়ে শীততাপনিয়ন্ত্রিত মটোর যান
দৌড়চ্ছে কোন স্বর্গে?
সেই মানুষের সঙ্গে এই মানুষের গ্রুপথেরাপি,
এল-নিনোয় চেনা যাচ্ছে না বিভাজন রেখা।

মানুষ আর কত বদলাবে?
উচ্চাশা দু'দণ্ড আপন মুখচ্ছবিকে যে দেখবে
সংকোচে বাপ পিতেমোর ছবি দেখবে উপায় নেই।
মেধায় জাল বিস্তার করে আছে বিশ্বায়ন।
শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আর ধর্ষিতা কিশোরী
হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে।
বনজঙ্গল নেই যে হায়নারা মড়া নিয়ে টানাটানি করবে,
এখন মানুষই কখনও হায়না, কখনও বাঘ
দলমা ফেরত হাতি, কাজিরাঙার গণ্ডার।

মানুষ জ্বালা পরাভবকে অস্বীকার করতে চাইছে
গ্রামগুলোও টালমাটাল পায়ে হাঁটছে
সজনেখালিই হোক বা আমজুড়িয়াকুচুং গ্রাম
সব জায়গায়ই খড়ছাউনির নিচে
বৃষ্টির রিরিকল্লাই।
তবু, এরই মধ্যে ব্যাঙের ছাতা মাথায়
নিবন্ন কিশোর চুনু বাস্কের ছেলে
অলচিকি লিপি নিয়ে বসে।

মানুষ কি জাগছে সিধো কানোর দেশে?

মগ্ন-মেঘ

রেণুকা পাত্র

মগ্ন হযে আছে মেঘ
স্মাবকচিহ্ন পডে পথেব দুপাশে

ধানেব শিষেব মতো শব্দ ছডাতে ছডাতে
আবও কতকাল পাব হলে,
একবাব ফিবে পাব ঘুম ভাঙাব প্রথম
সে মুখ

সব বাঁক পাব হযে
একবাব বড় কাছে
দেখতে চেযেছি

একবাব
তুমি তাব হাহাকাব
বজ্রশব্দ শোনো

পা

প্রদীপচন্দ্র বসু

যখন কথাব দাম থাকে না আমার
আমি অপবাধবোধে ভুগি,
তোমাব চোখেব দিকে তাকাতে পাবি না
মুখ নিচু কবে দেখি দুটি পা,
শাডিব পাডেব প্রান্ত ছুঁযে থাকা
মাটি ছুঁযে থাকা তোমাব শবীব।

তোমাব দুই চোখ আমাব খুব প্রিয
তোমাব ঘন চুলে আমি দেখি শ্রাবণেব মেঘ
তোমাব ওষ্ঠ যেন পদ্মেব পাপডি

তোমার ভরাট বুক, নাভিমূল, সুমসৃণ পিঠ
—সব নিখুঁত ভাস্কর্য।

যখন কথার দাম থাকে না আমার
আমি অপরাধবোধে ভুগি,
চোখের দিকে না তাকিয়ে, শরীর পেরিয়ে
মুখ নিচু করে দেখি তোমার দুটি পা,
যা আমার বুকের মাটি ছুঁয়ে আছে।

যদি মাতৃভূমি ডাকে

রূপক চক্রবর্তী

বলো কেন? বলো কেন এত দাম হবে এ দেশে রক্ত পরীক্ষার? এত রক্তের দাগ তোমরা কোথায় রাখবে? কার কাছে গোপন করবে এ সব চিহ্নের? বলো কেন? বলো কেন সে রক্তের দাগ অনুসরণ করে পরান্নলোভী ক্ষুধার্তর মতো পিছু পিছু আসরে ডাক্তার, আসবে হাসপাতাল! বলো কেন রক্ত দিয়ে এসে একজন, বাতাসে জামা উড়িয়ে, প্রেসক্রিপশন উড়িয়ে বলবে না—আমি সুস্থ আমি সুস্থ আমি সুস্থ, আর আমি কোথাও কোনওখানে রক্ত দেব না। আজ আমার প্রতিটা ফোঁটা উজ্জ্বল পলাশ অথবা কৃষ্ণচূড়ার মতো ফুটে আছে। প্রতিটি ফোঁটায় ঝলমল ঝলমল করছে লোহিতকণিকা, হিমোগ্লোবিন। প্রতিটা ফোঁটা থেকে জন্ম নেব আর একটা আমি। আজ আর অর্থ নেই বলে কোনও দয়ার রক্তপরীক্ষার মধ্যে আমার কোনও মালিন্য নেই। আমি কোনও সম্ভ্রান্ত অর্থবান কারও কাছে আমার রক্তর পরীক্ষা করার না।
শুধু স্বাধীনতা, শুধু স্বাধীনতা চাইলে আর একবার আমি সব ক'টা নাড়ির মুখ কেটে দিতে পারি।

খোলা বারান্দায়

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

সাজানো সংসাবে
বৌদ্র এসে উঁকি দেয
মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নাও
খোলা বাবান্দাব এ এক মহিমা

জানলাব নীচে
চাঁপা গাছ আলোময
শান্ত বাতে আবো স্নিগ্ধ
ভোববেলা ঝবা ফুলে স্নাত পথ

বৌদ্র জানে জ্যোৎস্না জানে
বাত্রেব চাঁপাগাছও জানে
সংসাবেব ছন্দপতনেব কথা
ভাঙা মাত্রায বাতাস মন্থব

কার্নিশেব দু'একটা পাটকিলে মথ
চাঁপাডাল থেকে চ্যুত পাপড়ি
মেঘ ছিঁড়ে এক ঝলক বোদ—
বৃষ্টিব ছাঁট হুসহাস তাদেব তাড়ায

ঝিমধবা ভাদ্রেব দুপুব
সবুজ পর্দায নেমে আসে
বাবান্দাব মহিমা কুডায
মাঝে মধ্যে এক একটা নিঃসঙ্গ শালিখ।

জলোচ্ছ্বাসে

(বাক্ষসী সমুদ্র আর সুনামিকে)

অনির্বাণ দত্ত

দুঃখ ভালোবাসি বলেই কান্না দিলে জলোচ্ছ্বাসে?
মানুষ ব'লেই বলেছিলাম—দাঁড়াই পাশে।
ভালোবাসি সাগর-নদী, ঝর্না-গলা জলেব বীণা
অতল থেকেই এলে ছুটে—ভালোবাসো বলেই কিনা?

কাব পাশে আব দাঁড়াবো আজ, সবই এখন জলেব বালি
লাখো শবেব কবব দিতেই সমুদ্রতীব হচ্ছে খালি,
তবুও শুনি বাচালতা স্তাবক-কথাব গল্পগাছা—
'নদীব সঙ্গে হাঁটতে চলুন'—নির্বিকাবেই ডাকছে বাছা।

হাঁটছি পুতুল-পদক্ষেপে, হাঁটতে-হাঁটতে নদীব হাঁ-মুখ
জানিয়ে দিল—তুচ্ছ কত, তুচ্ছ আমবা কাদাব শামুক।
অনন্ত এ বিশ্ব-জুড়ে ঝবছে পালক যাবজ্জীবন
জীবন ভালোবাসি বলেই দাঁড়াই পাশে, মানুষজীবন।

কথা

জিয়াদ আলী

সে যখন কাছে আসে
পবম আদবে বলি যাও
যেখানে শিশুবা থাকে অনাদবে
সেখানে তাকাও।
যেভাবে একত্র হয মাটি ও মানুষ
সেই অনুভবে তুমি দুহাত বাড়াও।

উচ্ছল ঝর্নাব মতো প্রবাহিত হতে গেলে
জীবনেব খেলা জানা চাই
খেলা মানে ওঠা নামা চডাই উৎবাই
জলের শবীবে লেগে থাকা
যে বকম ঝকঝকে নুড়িব আশনাই।

স্বামী চলে গেছে

সুবোধ সরকার

স্বামী চলে গেছে অন্য মেয়েব কাছে
তবু জ্যোৎস্নার বৃহৎ অর্থ আছে।

স্বামী চলে গেছে কালো কঙ্কাল ফেলে
ব্যাঙ্কে, ড্রযাবে ক'টুকরো হাড় পেলে?

স্বামী চলে গেছে, যেন রক্তেব দাগ
নিযতিব লেখা এটাই প্রথম ভাগ।

চুল খুলে দাঁড়া, এনেছি বসন্তকে,
রোদে ঝড়ে জলে বাঁচতেই হবে তোকে।

এখনো সময় আছে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনো সময় আছে
জ্যোৎস্নাব আলো গাযে মেখে আমবাও
বেরিয়ে পড়তে পারি
যারা বেডাতে এসে শুধু ঘবেই থাকে
তাবা নিসর্গেব কোনো রহস্যই বুঝতে পাবে না
কেউ কেউ মধ্যবাতে ঘুমেব মধ্যে
হাঁটতে শুরু করে
বাইরেব ঘন অন্ধকারে
একটি দুটি পাতা খসে পড়ে
আচমকা একেবাবে অবহেলিত
ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিচ্ছে টুকবো মেঘ
বৃষ্টি এলে দৌড়ে ঘরেও ফিবতে পাববে না
ঘুমেব মধ্যে কেউ কি ফিবে আসতে পাবে

এখনো সময় আছে
এখনো পুরনো পোশাক খুলে ফেলতে পারো
হঠাৎ হাওয়া বদলের মতো
মেঘের রহস্য বুঝতে বুঝতেই
কখন জ্যোৎস্না ঢাকা পড়ে গেছে
বুঝতেই পারোনি

দর্পণের ভাষা

দীপা বিশ্বাস

সহস্র টুকরো হয়ে গেল ওই সাধের দর্পণ
ঝন্‌ঝন্‌ ভেঙে পড়ল হাসিতে
যাবার বেলায় কি বলতে চায়
আর ও নেবে না এই প্রেমের তর্পণ?

দশ বছর আগে আরো একবার হয়েছিল এমন
আয়না বলতে চায় এই তোমার জীবন
খান্‌খান্‌ ভেঙে যায় বার বার

পিছনে তাকিয়ে দেখ এপার ওপার
হাত ধরে দাঁড়িয়ে অশ্রু আর মনকেমন

সরাইখানা

প্রভাকর চক্রবর্তী

খেলনা পুতুল, নীল দোপাটি, সরাইখানা,
বৃষ্টি এলেই সবুজ গন্ধে হঠাৎ ছুটি,
আজ বিকেলে সঙ্গী এলে ছেলেবেলার
দেওয়াল জুড়ে সত্যি হবেন গণেশ পাইন।
সত্যি হবে মলাট-ছেঁড়া পঞ্চবটি—
রাম-লক্ষ্মণ, সীতা হরণ, ছুঁ—মন্তর,

আজ বিকেলে বৃষ্টি এলে সুখ ভিজবে
ভিজবে বাঙা হাতেব তালু, নীল পতাকা,
উলেব কাঁটা, কিম্বা কোনো অনিন্দ্য মুখ
গানেব মতো দুলবে বুকে নির্জনতায।

আজ বিকেলে হোক না সুলভ উল্টো চলন,
খাটেব নিচে বাক্সবন্দী লেখার খাতা,
চাযেব কাপে জমাট বাঁধুক তলানি সুখ
জমাট বাঁধুক মেঘেব ডাকে আস্মানি বঙ,
ঠিকানা থাক সন্ধেবেলাব ঠান্ডা জলে
জলেব মত্ত প্রলাপ থাকুক দবাজ হাওয়ায,
অন্ধকাবেব আযনা হযে মৌন থাকুক
নতুন দিনের সমীকবণ সম্ভাবনা।

এসেছি জলের থেকে

অনন্ত দাশ

এসেছি জলেব থেকে মেলাবো হাওয়ায
মাঝখানে ক'টা দিন বড ব্যস্ততাব
সুখেদুঃখে উচাটনে পৃথিবীর বুকে
বেজে ওঠে হৃদযেব দুটো সূক্ষ্ম তাব

যা ছিল অতীতে আব যা হয়েছে আজ
সবই তো নদীব মতো ভেঙে ফের গড়ে
পেয়েছি অনেক তবু অপ্রাপ্তিব স্বাদ
রযে গেছে এই বুকে অলীক অক্ষবে

ভেবেছি অনেক দিন বদলাবে সময
বদলাবে মানুষ আব স্থির প্রতিষ্ঠান
বিশ্বাসের চোবাবালি নেমে যায ধীবে
সমাজে কোথাও নেই আদর্শেব স্থান

কিছু পেযে যদি ভাবো কৃতার্থ জীবন
কে আব বইবে তবে শতদুঃখভাব
পিপীলিকা খেয়ে যায় স্মৃতির সঞ্চয়
অনেক তো দেখা হলো এই সভ্যতাব

এত রোদ জল হাওযা ছড়ানো সময়
তবু কেন মাঝে মাঝে আসে মৃত্যুভয

একা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সমুদ্রে বযেছে অগ্নি
আমি তাব উড্ডীন বস্ত্রেব
হাওযা মাত্র ছুঁযে আছি।
তাব জন্য নিযত দহনে
আমি ছুটে যাই আব ঘুবি,
আকাশ বাতাস মাটি
সকলই প্লাবিত হয, ভাসে—
আমি শুধু আবেগে দহনে
চূড়া স্পর্শ কবে ফেলি
অকস্মাৎ একা।

কথাকে বলি

ব্রততী ঘোষরায়

কতদিন ধবে কথাকে বলছি অত শব্দ হোযো না,
মযনা, টিযে তো নও গোটা মানুয,
ভুল শব্দে স্রোতও মিইযে যায ভেজা মুডিব মতো
হাতে গুনবে পানসেমাবা দিন
আসল কথা শোনাই হবে না।
বাতাসকে বলি, অত উতলা কেন গো?

সব ঘবে ঘবে যেতে হবে, বাউল বলেছে বলেই
অত একা একা ভালো দেখায না।
আজকে একটু ফাঁকি দিলেও কালকে বোদ আসবে
দু-একা আলপনাব গাছ লতা তোমাব পাযেও
ঝিলমিল কববে, দোহাই তোমাব—
গল্পে মশগুল হযে আস্ত একটা কেতাব লিখে
ফেলো না
ববং জল বইবাব খবব দিতে দিতে ছুট মেবো
যে-কোনো গাঁযে গঞ্জে।

নেশা

রাহুল পুরকায়স্থ

মনে মনে জাগে আলো
মনে মনে জাগে অন্ধকার

শান্ত এই গলিপথে
দেখা দেয প্রণয আবার

শান্ত ভাষা শান্ত ক্রোধ
শান্ত প্রেমিকেবা

সিন্ধুসংগীতেব ঢেউ
হাবানো ভিসেবা

প্রতি ক্রোধ সম্মোহন
প্রতি ভাষা সম্ভোগেব স্তব

অবদংশে মোহ তবু
সমাসঙ্গে স্থিব, পবাভব

একইভাবে স্থিব গলি
প্রতিবাতে বাসা খুঁজে ফেবা

কাগজকুড়ানি যায
পিছে পিছে ধায কুকুবেবা

নেই

(ভাস্কর চক্রবর্তীর জন্য কয়েক লাইন)

ব্রত চক্রবর্তী

আমাদের সঙ্গে থেকে,
পাশে দাঁড়িয়ে,
দুহাত দূর থেকে যিনি বলতেন, যে বলতো
এসো, সুসংবাদ এসো,
তার গলাটা আর পাবো না। নেই।
স্যারিডন কিনতে বেরিয়ে,
বাস্তায আবাব ব'লে পা রেখে বাস্তায,
সে, হঠাৎ, স্বর্গে চলে গ্যাছে।
শীতকাল আবাব আসবে, এবার-ও,
কিন্তু সুপর্ণা, স্যবি, হিমপবশেব দিনগুলোয
তোমাকে উষ্ণ খোঁজাখুঁজির সেই লোকটাকে
এবাব আব পাবে না। নেই।
তুমি বড়জোর যে-কোনও বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে
তার যে-কোনও বন্ধুর গলায
বলে উঠতে পাবো : তুমি কি ভাস্কব?

শ্রাবণের কয়েকটি রাত

প্রবীর ভৌমিক

১.
কী ভাবে মেলেছো শব্দ, বিছিযেছ অক্ষরেব মোহ
প্রতিটি বাত্রির ফেবি পূর্ণিমার ঘোর লাগা জলে
ঘুবে ফেবে অনিবার্য তেলেনিপাড়ার লঞ্চ ঘাটে
কী ভাবে মেলেছো তীব্র শবীরেব দ্রাঘিমা সংকট!
২
বৃষ্টি নেমে গেছে এই জন্মদিনের মাসে পূর্ণ শ্রাবণে
তুমি এসো ফুল, এসো পাখি, এসো নেশাতুবা—
যে ভাবে গর্জন আসে মদ আসে শবীরে-শবীবে
তোমার রোমেব থেকে তুলে নেব গার্হস্থ্য-প্রস্তাব।

৩
এই জলে ডুবিযেছি অসহিষ্ণু শীর্ণ ও তপ্ত শবীব
বিযোগ ব্যথার গান মনে পডে মনে পড়ে
দিগন্ত পেরিযে যাওযা ভালোবাসা উষ্ণ সংগীত
মনে আছে চুম্বনেব অতিবিক্ত আমিয উৎসব বাত।
৪.
কী পদ্ম ফুটেছে আহা পাথবেব ঘাত-প্রতিঘাতে
বক্তিম মাংসেব ফুল মধ্যাহ্নে উজ্জ্বল হল দেখে
ফণা তুলে স্তব্ধ সাপ ঘোব লাগা শবীর প্রত্যাশী
সুডৌল নাভিব মতো নেমে আসে বর্ষাব পূর্ণ জ্যোছনা।
৫
পাতালে ভেঙেছে জল, জল আব আমিয অক্ষব
কিভাবে বযেছো শান্ত হত্যা-বতিব মতো জ্বলন্ত দুপুরে
জেগেছে জলেব ক্ষুধা ত্রাস, উত্তেজনা, আলোড়ন
জেন 'শান্ত' তুমিও অস্থিব আত্মবতিব মতো আলস্যবহিত।
৬
দূবে থাকো, বস্তুত বযেছো তুমি ঘনবদ্ধ কথায কথায
মাঝখানে নির্জন ঘাটেব পূর্ণিমাব তীব্র শূন্যতা
আমাব ভিতবে নামো, নামো শান্ত স্তব্ধ ইঁদাবায
মনে হয শব্দ হলো, শব্দ যেন নিজের ভিতরে

লোকটা কবি

উৎপলকুমার গুপ্ত

লোকটা কবি, অথচ একটি কবিতাব জন্য তাকে ধবে নিযে গেল
পুলিশ
কাবণ ভযংকব পেযণ থেকে সে মুক্তি চেযেছিল মানুষেব।
সে ভেবে ভেবে অবাক হযে যাচ্ছে যে একটি কবিতাব
এমন শক্তি যে
তাব জন্য তাকে জেলে যেতে হল!
অথচ চাঁদ-ফুল-পাখি নিযে প্রেম নিযে কবিতা লিখলে
দোষেব কিছু ছিল না
কিন্তু দেশপ্রেম দেখাতে গেলেই বিপদ!

লোকটা বোকা, যা তার স্ত্রীও বলে—না হলে সোজা
বাস্তায হাঁটলে
কিছুই হত না।
যেমন খাচ্ছিল দাচ্ছিল ঘুবে বেড়াচ্ছিল, তা কবলেই হত।
আসলে জেগে জেগে ঘুমাতে তার কষ্ট হচ্ছিল—
তাই একটি নতুন কবিতা লিখে ফেলতে বাধ্য হযেছিল—
কারণ কলম তাব বশে ছিল না।
সে একথাই বলেছে পুলিশ সাহেবকে, দেখুন স্যব, কলম আমাব
বশে ছিল না—
স্যর মৃদু মৃদু হেসেছেন, তাবপব পুলিশকে বলেছেন, ঘোড়েল মাল—
দু'চাব দাগ ওষুধ পড়লেই
ঠিক হয়ে যাবে।

এখন লোকটাব হাতে পাযে কালশিটে দাগ, ডান হাতখানা জখম
তাই অভ্যেস কবছে
বাঁ হাত দিযে লিখতে।

এবার

আশিস সান্যাল

দেখেছি অনেক মুখ।
সব মুখে
দেখি না দু'চোখ মেলে
আলোব উজ্জ্বল?
কেন আজও
মানুযেব চোখ থেকে
ঝবে শুধু শব্দহীন
বেদনাব জল?

চেযেছি মানব-মুক্তি
দাসত্ব-শৃঙ্খল

ছিন্ন কবে
মানুষেব সার্বিক সমতা।
চেযেছি শোষণ থেকে
হিংসা থেকে
পরিশুদ্ধ চৈতন্যেব অপূর্ব রঙিন
নিরাময ভালোবাসা—
চেযেছি নির্মল শুভ্র প্রসন্ন সুদিন।

মুক্ত করো হে আকাশ
খুলে দাও
হৃদয়েব সব বাতায়ন।
ছড়াক সর্বত্র আজ
উচ্ছলতা
নির্মেঘ ভোবের মতো
পথে সাবাক্ষণ।

দেখেছি অনেক মুখ
সব মুখে
পড়ুক নির্ভয়ে আজ
জ্যোতির্ময় আলো।
সুখে থাক এ পৃথিবী
হে আকাশ
এবাব সর্বত্র মুখে
দীপশিখা জ্বালো।

মুদ্রাবিরহ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কেউ যে বলবে—এ কী, চোখে দ্যাখো না কি?
সেই চোখ কোথায়.. সে কোথায় .আমরা তো একাকী।
একা তাকে কোথায় যে বাখলে বলো তো—
ফগেঢাকা পাহাড়েব পথে থতমত!
দরজাজানলা ভাঙা তাব যে বাত্রি ঘনায,
কাচকালো মণি. দেখো, কেউ না সবায।
তর্জনী-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জুড়ে দুই হাত
মুদ্রাবিরহ আঁকে. .এবং হঠাৎ
নীডআঁকা পাখিডাকা থেকে সে গড়িযে—
ভুঁইযে নামে যে-মার্বেল খেলাব জলেব
গতি..সে কি লক্ষ করে দিনক্ষণঋতু?
চোখ মুখ চুলেব সম্পর্কে গা-ভাসিযে
গাছ মাটি মানুষেব অন্তঃস্থলেব
জল, স্নানে ডাকে। আব, দেখি জন্ম মৃত্যু।

সুখ

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

ফোনে এবকম লং-বিং বাজলেই আজকাল এ বাড়িব তিনটে লোক মুখ চাওযা-চাওয়ি কবে। কাবণ এ-ক্ষেত্রে প্রায় সব ফোনওলোই একজাযগা থেকে আসে। তুতুল এখনও বিছানা ছাড়েনি। সুলেখা স্কুলেব জন্য তৈবি হচ্ছে। আজ বান্নাব মাসি আসেনি। কাল বাতভোব বৃষ্টি হযেছে। সকালে মাসিব ছেলে এসে খবব দিযে গেছে ঘবে জল ঢুকে গেছে তাই মা আজ আর কাজে আসতে পাববে না। সুলেখা জানে পিছনেব ওই বস্তিটা একটু বৃষ্টি হলেই ভেসে যায। আর কাল তো বাতভোব যা বৃষ্টি। আজ খববের কাগজে ফ্রন্ট পেজে কাল রাতের বৃষ্টিব ছবি। এখনও পর্যন্ত এই মরসুমেব সেবা বৃষ্টি। অর্ধেক কলকাতা ডুবে গেছে। সকালেব দিকে বৃষ্টিটা ধবেছে। কিন্তু আকাশ এখনও মেঘে থমথমে। এখন মলিন আকাশ দেখলে একধবনেব কর্মবিমুখতা জাগে। অথচ এ বছব এব মধ্যেই কাবণে অকারণে এত সি-এল গেছে। অন্তত বাব পাঁচেক বালুবঘাট আব কলকাতা কবতে হযেছে। শুভেন্দু এসব ব্যাপাবে নিতান্ত আনাড়ি। সুলেখা ছাড়া যে একেবাবেই অচল। সুলেখা স্নান সেবে এসে জামাকাপড় পবছে।

শুভেন্দুর আজ বেলায ক্লাস। এখনও গবম চাযে চুমুক দিতে দিতে মৌজ কবে খববের কাগজ পড়ছে। প্রায তিবিশ বছবেব সংসাব জীবনে এই একটা কাজ একা করতে শিখেছে। দবকাবমতো চা-টা নিজে কবে নেয। শুভেন্দু ডাইনিং-স্পেসে বসে কাগজ পড়ছে। ফোনটা ড্রযিং কমে। ওব পক্ষেই সব থেকে সহজ এখন ফোনটা ধবা। আজকাল শুভেন্দুব মাকে দিযেই সাধাবণত ফোন ধবানো হয। তিনি এখন পুজোর ঘবে। এইসময পুজোব আসন থেকে উঠে এসে কখনোই ফোন ধববেন না। শুভেন্দু ফোনটা তুলছে না। অথচ ফোনটা দুবাব থেমে গিযে সামান্য বিবতিব পব ফেব একভাবে বেজে চলেছে। ফোনেব বিং শুনলে মনে হয যে ফোনটা কবেছে তাব দবকাবটা খুব জকবি। সে সহজে হাল ছাড়বে না। শুভেন্দু এই তৃতীযবাবেব ফোনের শব্দে নড়েচড়ে বসেছে। ওখান থেকেই গজগজ কবছে—ফোনটা সেই থেকে বাজছে, কেউ ধবতে পাবছে না নাকি? আবে গেলটা কোথায? অর্থাৎ সুলেখাকে তলব কবা হচ্ছে। স্কুলে বেবনোব সময় সুলেখা সাধাবণত মাথা ঠান্ডা বাখতে চেষ্টা কবে। এখন এই তাড়াহুড়োব সময়ে শুভেন্দুব দাযিত্ব এড়ানো কথা শুনেও তাই হজম কবে গেল সুলেখা। শাড়ি পরা হযে গেছে। মাথায চিকনি ওঁজেই ঘব থেকে বেবিযে এল। ডাইনিং স্পেস পাব হতেই দেখল শাশুড়ি এসে ফোনটা ধবলেন।

ঠিকই অনুমান কবেছে ওবা। বালুবঘাটেব ফোন। কী যে চায ছেলেটা এখনও ক্লিযাব নয। সব কিছু যখন একবকম মীমাংসা হযেই গেছে এখন শুধু কিছুদিন গোনাব অপেক্ষা

তখন নিছক এই কদিন অন্তর ফোন করার যে কী মানে সুলেখা বোঝে না। তুতুল তো ফোন ধরতেই চায় না। এতদিনে খুব জোর বার তিন চার তুতুলের সঙ্গে কথা হয়েছে। তবু ও ফোন করা বন্ধ করে না। অন্যদিন তুতুলকে খোঁজে। তুতুল নেই শুনলে ফোন নামিয়ে রাখে। এক কনকপ্রভা ফোন ধরলে দু-চারটে কথা বলে। আজ এখনও কথা চলছে দুজনের। সুলেখা নিজের জন্য ভাত বাড়ছিল রান্নাঘরে। সেখান থেকেই শুনতে পাচ্ছে। শুভেন্দুও কাগজ পড়তে পড়তে কান খাড়া করে রেখেছে ফোনের দিকে। সুলেখা শুভেন্দুর পাশে চেয়ার টেনে বসল। শুভেন্দুর চোখে নীরব প্রশ্ন অর্থাৎ এতক্ষণ কী কথা।

কনকপ্রভা ফোন নামিয়ে বউমার কাছে এলেন—কিছু দেব তোমায়?

—না আমি নিয়ে নিয়েছি।

—আকাশটা এখনও মেঘ করে আছে। আবার ঢালবে।

কনকপ্রভার এই এক ধরন। সময়ের কথাটা কিছুতেই সময়ে বলবেন না। উনি নিজেও খুব ভালো করে জানেন এখন সুলেখা শুভেন্দু দুজনেই কীরকম টানটান হয়ে আছে ফোনে অংশু কী বলল তা জানবার জন্য। অথচ দেখো এমন উদাসীন হাবভাব যেন আর পাঁচটা সাধারণ কেজো ফোনের মতো এও আর একটা।

শুভেন্দুর ধৈর্য কম। সেই জিগ্‌গেস করল—কী কথা বলছিল এতক্ষণ? কনকপ্রভা ডাইনিং স্পেসের গায়ে কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। উল্টো দিকেই একখণ্ড সবুজ। বাচ্চাদের একটা স্কুল পাশে। তাদের খেলার মাঠ। পার্ক আজ ভারি নির্জন। এই ধুম বৃষ্টিতে যে কটা বা বাচ্চা এসেছে তাদের কেউই মাঠে নামবার অনুমতি পায়নি। কনকপ্রভা অবসর পেলেই এই জানলায় এসে দাঁড়ান। বাচ্চাদের হুটোপুটি আর কলকাকলি দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়।

শুভেন্দু মায়ের ধরনে অভ্যস্ত। সে আবারও জিগ্‌গেস করল—আরে কী বলছিল বলবে তো?

—তুতুলকে খুঁজছিল। কনকপ্রভার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—আরে তুতুলকেই তো খোঁজে। তারপর অতক্ষণ কী বলছিল?

—এই আমি কেমন আছি জিগ্‌গেস করল। আমিও জানতে চাইলাম ওরা কেমন আছে এইসব টুকিটাকি।

সুলেখার খাওয়া হয়ে গেছে। এঁটো থালা নিচে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল—সে সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে তাকে টেনে বাক্য শেষ না করেই অন্য কথায় ঢুকে গেল—আপনিই বা এত অ্যালাও করেন কেন? তুতুলই যখন চায় না সম্পর্কটা রাখতে তখন আমাদের কীসের দায়? তাছাড়া আর কদিন পর যখন ডিভোর্সটা পেয়েই যাবে।

কনকপ্রভা এসব কথা তেমন আমল দেন না। তাঁর উদাসীনতার আড়ালে একরকম কাঠিন্য লুকিয়ে থাকে এত বছরের সংসারে জেনে গেছে সুলেখা। তাছাড়া সত্যি বলতে তুতুল জন্ম থেকে ঠাকুমার হাতে মানুষ। সুলেখা চাকরি আর সংসার সামলে তুতুলের দেখভালের জন্য কখনোই খুব বেশি সময় দিতে পারেনি। আর এইসব কারণেই মানে এইরকম

নির্ভরতা থেকেই সুলেখার ধারণা কনকপ্রভা তুতুলেব ব্যাপারে প্রযোজনেব থেকে অনেক বেশি অধিকারপ্রবণ। আজ কনকপ্রভা সুলেখার কথাব উত্তরে চুপ রইলেন না। যতখানি সময নিযে এবং যেভাবে কথা বললেন তাতে একে ঠিক সুলেখাব কথার পিঠে কথা বলা যাবে না অথচ সুলেখাব কথার সূত্র ধরেই খানিকটা নিবপেক্ষ মতামত যেন—এত বছব যে ছেলেটা বাড়িতে আসত-যেত, অর্থাৎ দু-বছবে সে এতখানি খাবাপ হযে গেল যে সে ফোন করলেও দুটো কথা বলব না, অত অভদ্রতা কী করে কবি। তাছাড়া ছেলে-মেয়ের বনাবনি না হলে অভিভাবকেবা চেষ্টা করে মিটমাট করে দিতে. এখানে আমরা তো শুধু ইন্ধন দিযেছি।

সুলেখাব পাবদ চড়ছে। কনকপ্রভার সব জেনেও এভাবে কথা বলাব মধ্যে একরকমেব হুল ফোটানো আছে। আর তাব উপলক্ষ্য যে সুলেখা, যেটা সে খুব ভালো করে জানে। কাবণ শুভেন্দু সব ব্যাপারেই সুলেখা-নির্ভর। শুভেন্দুব ভেতরে এক অযুত বিশ্বাসবোধ কাজ করে যে সুলেখা কখনও কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পাবে না বিশেষ কবে সাংসারিক ব্যাপাবগুলোতে।

সুলেখাব হাতে এখনও মিনিট কযেক সময আছে। এখনও বাচ্চু বিক্শা নিযে আসেনি। সুলেখা খুব কঠিন গলায বলল—কী নিযে বনাবনি হযনি, সেটা আপনি জানেন। তবে ওই ব্যাপারটা আপনার কাছে খুব ইমপর্ট্যান্ট নয। কিন্তু আমবা আমাদের একমাত্র মেযেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে লেখাপডা শিখিযেছি। একটা ব্রিলিযান্ট ডাক্তার গাঁযেব একটা চালাঘবে বসে বসে জ্বর আর পেটখারাপেব বোগী দেখে দেখে তাব ট্যালেন্ট নষ্ট করবে এটা মেনে নেবার কোনও কারণ নেই।

শুভেন্দু এই প্রথম কথা বলল—মেযে যদি সাদামাটা হত ঠিক ছিল। অত ভালো রেজাল্ট। অত ভালো কেবিযার, বাইবে যাওযাব সুযোগ হাতেব মুঠোয়. আবে বিদেশেব শিক্ষাটাকে তো অবহেলা কবে দূরে সবিয়ে রাখাব মধ্যে কোনও দেশপ্রেম নেই।

কনকপ্রভা দূবমনস্কেব মতো তাকিযে আছেন জানলাব বাইবে। আবাব ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। মাঠেব ফুলগাছগুলো এলোমেলো হাওযায এ এব গায়ে নুযে পডছে। মেঘ ডাকছে আকাশে। ভিজে ঠান্ডা হাওযা আসছে। গাছপাতার গন্ধ মেশানো। মাটির গন্ধ মেশানো। মাঠটা জলে সপসপ কবছে। জানলাব বাইবে একটা কাঠচাঁপা গাছ। ভিজছে।

কনকপ্রভা কেমন শুকনোভাবে যেন অনেকখানি বাতাস আটকে রেখেছেন এভাবে খুব আর্ত গলায় বললেন—বউমা ঘুরিযে তুমি আমায মুখ্যু বললে। আমি কিছু মনে করিনি। কেবিযাব একটা সম্পর্কেব চেয়ে দামি একথা আমি কখনও বিশ্বাস কবতে পাবিনি। তুতুল-ও খুব দোটানায ভোগে। সেটা তোমরা কখনও দেখতে পাওনি। তাছাডা কেরিযাবেব কথা যদি বলো, অংশুব কেবিয়ার তো আমাদেব তুতুলেব থেকেও হাজাব গুণ ভালো।.. শুভ্র তুই-ও তো ছেলে পড়াস। বলিসনি বাব বার, অংশুব সঙ্গে কথা বললে মন ভবে যায়। এত ঝকঝকে ছেলে..

শুভেন্দু এই অপ্রিয প্রসঙ্গটার এত দীর্ঘ আলোচনা চাইছিল না। তাছাড়া কোনও যুক্তিতেই শুভেন্দু অংশুর এই গোঁডামিকে সমর্থন কবতে পারে না। বালুবঘাটেব এক গণ্ডগ্রামে অংশুর

বাড়ি। বাড়ির একটা দিক এখনও মাটির এখনও সে বাড়িতে কাঠেব আগুন জ্বলে বান্না হয়। জযেন্ট ফ্যামিলি। জেঠা কাকা তাদের ছেলেমেয়ে বউ বাচ্চা সব মিলে প্রায় পঁযত্রিশ-চল্লিশটা পাত পড়ে দু-বেলা। এত ভালো কেবিযার শুধু শুধু ওই গণ্ডগ্রামে পচে পচে নষ্ট হবে এটা শুভেন্দুই মানতে পারে না সে সুলেখাকে দোষ দেবে কী করে। প্রথম যে-বার বিয়ের কথাবার্তা বলতে সুলেখার সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিল ফিবে এসে প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল দুজনেই। তুতুলকে বাব বার জিগ্‌গেস করেছিল—তুই ওখানে থাকতে পাববি! শুভেন্দুর মনে আছে তুতুলের হযে বারবারই কনকপ্রভাই উত্তব দিয়ে দিচ্ছিলেন—অংশু যদি ও বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে না পাবে তাহলে তুতুল পাববে না কেন? তুতুল তো ওই বাড়িতে বড়ো হওযা ছেলেটাকেই ভালোবেসেছে। সুলেখা কতবাব আক্ষেপ করেছে—শুধু তো অংশু নয, তুতুলেব তো আরও কত বন্ধুবান্ধববা বাড়িতে আসত। ভাস্কর, অর্ক, সম্রাট। এদের যেমন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড তেমন অ্যামবিশান। প্রথম প্রথম তুতুল বলত—মা দেখো, পবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বাইবে পড়তে যাব শুনলে ও না গিযে পাববে না। ও আমাকে কখনও একা ছাড়বে না?

অংশুও ঠিক একই কথা ভেবেছিল। বিযেব দিন ঠিক হয়ে যাবার পর কনকপ্রভা যখন বলেছিলেন—দেখো ভাই, আমাদের তুতুল তো বিদেশে গিযে আরও পড়াশোনা কবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ভালো করে কথা বলে নিযেছো তো? অংশু একগাল হেসে বলেছিল—ও নিয়ে তুমি ভেবো না ঠাম্মা। পবে সব ঠিক হয়ে যাবে। বিযের পব ওখানে গেলে ওখানকাব মানুষদেব দেখলে ওব আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করবে না।

বৃষ্টিটা আবাব জোরে এল। টপ টপ কবে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা মাঠের জমা জলের ওপর পড়ে বুদবুদ তৈবি কবে ফেটে ছড়িযে যাচ্ছে। জলেব ঝাপটা জানলা দিযে গাযে এসে লাগছে কনকপ্রভার। সুলেখার মাসিক বন্দোবস্তের রিক্সা এসে ওকে নিযে গেল। শুভেন্দু স্নানে ঢুকেছে। কাঠচাঁপা গাছের পাতাব ফাঁক দিযে শাদা বৃষ্টি যেন হাওয়াব মতো ছুটে আসতে লাগল।

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। শাদা হয়ে যাচ্ছে জানলার বাইবেব মাঠ। স্কুলের মাঠের ছোটো ছোটো ফুলগাছগুলো জলে ভিজে বিহ্বল। পাতাবাহার গাছগুলো দিশেহাবা। জলের সঙ্গে বাতাসেব ছাটে ফুলগাছের মাথাগুলো দিক পাচ্ছে না। হেলে দুলে বেঁকে চুবে ছটফট করছে। মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকে গেল আবার।

অংশু আজ জিগ্‌গেস কবছিল—তুতুলেব শবীর কেমন আছে? মাঝে মাঝে যে মাথাব্যথা করত সেটা কমেছে? টেস্ট করিযেছে কিছু? এসব কথা কনকপ্রভা ছেলেবউকে বলেননি। ওবা এমনিতেই বলে—এবকম মেযে পাবে কোথায? তুতুল চলে এলে ওব ক্ষতি। তাই বাব বাব ফোন কবে ওর মন নরম করাব চেষ্টা কবে।

অথচ তুতুল যখন বিযেব পব প্রথমবার দ্বিরাগমনে এল, কী ঝলমলে হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। যদিও মেযের মনে তখনই বিভাজনের বিষ ঢুকিযে দেওযাব কম চেষ্টা করেনি সুলেখা। ওর একমাথা সিঁদুর তাতে শাঁখা পলা গযনাগাটি শাড়িটাবি পবা দেখে অংশুব সামনেই

বলেছিল—এ কী বে? এবকম গেঁযো ভূতেব মতো সেজেছিস কেন? তুই না একটা ডাক্তাব? ছি ছি হাত ভরতি শাঁখা পলা মাথা ভবতি লাল বং কনকপ্রভা খেয়াল করেছিলেন অংশুব মুখটা কালো হয়ে গিযেছিল। আব সেবারই যখন তুতুল ফিবে গেল, মাথায চোখে পড়ে না—এমন হাল্কা সিঁদুরেব বেখা। কপাল পবিষ্কার, দু-হাতে বাহুল্যবর্জিত প্লেন দু-গাছা চুড়ি। পরনে বিযেব আগেব শালওয়ার কামিজ।

কনকপ্রভা খুঁটিযে খুঁটিযে জিগগেস কবেছিলেন তুতুলকে—হ্যাঁবে ও বাড়িব লোকজনবা কেমন? তোব সঙ্গে ভাবসাব হযেছে? অংশু তোব খেযাল বাখে?

তুতুল তখন কত হাসিখুশি ছিল। অনর্গল কথা বলত। কনকপ্রভাকে জড়িযে ধবে বলেছিল, জানো ঠাম্মা ওদেব বাড়িতে যে কত ঘব আব কত মানুষ, সবাইকে আমার এখনও মনেই থাকে না। আব সাবাদিন খালি এটা খাও সেটা খাও। অংশুর বাবা নিজে পুকুবে দাঁড়িযে মাছ ধরান আব বলেন, বউমাকে বেশি কবে মাছ খাওযাও। দুধ খাওযাও। ওব শবীবটা বড্ড বোগা আর তোমাব অংশু? সাবাদিন তাব দেখাই পাওযা যায না এক বাত্তিবটুকু ছাড়া। তাতে যে তুতুল খুব কষ্টে আছে এমন তো মনে হযইনি কনকপ্রভাব ববং কথাগুলো বলতে বলতে তুতুল হেসে গড়িযে পডছিল। সুলেখা সামনে ছিল। সে অবাক হযে বলেছিল—বলে বলেই উল্টা পাল্টা একগাদা খেযে নিও না যেন। গ্রামের মানুযের কোনও হেলথ্ কনশাসনেস নেই। আব অংশু সাবাদিন কী কবে যে তোমার খেযাল রাখাব সময পায না?

তুতুল ফিবে যাওযার পব সুলেখা নিযম্ কবে বোজ ফোন কবত। রুটিনেব মতো। নিজে কথা বলে শুভেন্দুকে দিত। কখনও কনকপ্রভাও কথা বলতেন। এরকম এক বাতেব ফোনে প্রথম কালো মেঘেব আঁচ পান কনকপ্রভা। কযেকমিনিটেব মধ্যেই ফোন রেখে সুলেখা প্রায ঝাঁপিযে পডে শুভেন্দুব ওপব।—অংশুর সাহস দেখেছো? শুভেন্দু কিছু বুঝে ওঠবাব আগেই ফের চিৎকার—বলেছিলাম না ওদেব সঙ্গে আমাদেব কিছুতেই মিলবে না। এখন বোঝো? আমবা বোজ ফোন কবে খোঁজ নিই বলে অংশু বলেছে—ওদের বোজ ফোন করতে না কোবো আর যদি ফোন কবেই, যেন বাড়িব লোকজনদেব সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলেন।

কনকপ্রভা সেদিনই বুঝতে পেবেছিলেন এ মেঘ হাওযায উড়ে যাবাব নয। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত দিযে তবে এ অন্য আকাশে যাবে।

তাঁর আশঙ্কাই সত্যি। সুলেখা শুভেন্দু বাববাব গিয়ে মেয়েকে কলকাতায নিযে আসবার চেষ্টা কবেছে। তাব কেবিযাব, তাব বিদেশ যাওযাব পবীক্ষার কথা মনে কবিযে দিযেছে। আব ততদিনে তুতুল আব অংশুব মধ্যেও সেই কালো মেঘ বীতিমতো তর্জন গর্জন কবে ঢুকে পড়েছে।

কিছু আগে শুভেন্দু বেরিযে গেছে। সকালে ভাবি জলখাবাব খায বলে দুপুবে ভাত খায না। বৃষ্টিটা মাঝে মাঝে থামছে আবার ঝেঁপে আসছে। তুতুলের ঘব থেকে মিউজিক সিস্টেমে কী একটা বাজনাব শব্দ আসছে। তাব মানে তুতুল জেগে গেছে। কনকপ্রভা দু-কাপ চা নিযে তুতুলেব ঘবে গেলেন। বিছানাব ওপব জানলাব গ্রিলে মাথা বেখে তুতুল

বসে আছে। একটা নীল কাপতান পবা। শবীবে কোথাও কোনও অলংকাব নেই। হাত কান সব খালি। শুধু গলায একটা সরু চেন ওব ফর্সা গলাকে জড়িয়ে থাকে। মাথাব সিঁদুব উঠিয়ে দিয়েছে অনেকদিন আগেই। আজকাল হাসে না। কথাও খুব কম বলে। সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে থাকত এতদিন। পবীক্ষা হয়ে গেছে। আজকাল বিদেশে ডাক্তাবি উঁচু ডিগ্রি নিতে গেলে অনেকটা অংশ দেশে বসেই পডা যায। তুতুল ভালো নম্বব পেয়েছে। আব মাসখানেকেব মধ্যেই তাব বিদেশ যাওযা। ভিভোর্সেব সার্টিফিকেটও পেযে যাবে আর দু-তিনদিনেব মধ্যেই। অথচ তুতুলেব মুখে হাসি নেই। সুলেখা যাকে পায তাকেই শুনিযে বলে—আব মাত্র কটাদিন। তুতুলটা একা একা অত দূবে গিযে কী যে করবে। ওখানে তো রান্না-বান্না সবই নিজেব হাতে করতে হয। এই বলার সময়ে প্রচ্ছন্ন অহমিকাটুকু হীবক জ্যোতির মতো ছলছল কবতে থাকে সুলেখাব চোখে মুখে।

শুভেন্দু তো ছুটিব দিনগুলো নিযম কবে তুতুলকে সঙ্গে নিযে কেনাকাটি সাবতে বেবয। মাঝে মাঝে সুলেখাও যায। বস্তাবন্দি কবে জামাকাপড় নিযে ফেবে। শীতেব দেশে যাওযাব প্রস্তুতি। তুতুল যায, ফিবে আসে। ফেব নিজেব ঘবে ঢুকে যায।

কনকপ্রভা দেখলেন জানলা দিযে ছাট আসছে তুতুলেব গাযে। বোধহয সবোদেব কোনও সিডি চালিযেছে তুতুল। কনকপ্রভা ডাকলেন—দিদিভাই, চা এনেছি। গাযে জলেব ছাট আসছে তো! জানলাটা বন্ধ কবে দিই। তুতুল সবে আসে। চা নেয। বলে—খোলা থাক। ঠান্ডা হাওয়া আসছে।

কনকপ্রভা বিছানায উঠে বসেন—শুনলি, অংশু ফোন কবেছিল। তুতুল যেন শুনতে পাযনি এভাবে বলল—খববেব কাগজটা কোথায় গো ঠাম্মা?

কনকপ্রভা এই নির্মমতা সহ্য কবতে পাবেন না। রীতিমতো সাত-আট বছব মেলামেশা কবাব পব বিযে। তাবপবও নয নয কবে বছবখানেকেব ওপব একসঙ্গে থাকা। ঝগড়া না ঝাঁটি না শুধু মতেব মিল হযনি বলে ছেড়ে চলে আসা। সেখানে মানুষ এত নির্লিপ্ত হয কী কবে? কনকপ্রভা চিনতে পাবেন না এই তুতুলকে। অথচ ওকে ছেড়ে যে খুব ভালো আছে এমনও তো নয। পাবতপক্ষে ঘব থেকে বেবয না। টিভি দেখে না। গল্প কবে না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আগে অত হই হুল্লোড় কবত, সে-সবও নেই। তবে? কনকপ্রভা একটু বিবক্তভাবে বললেন—আমি কী বললাম শুনতে পেলি না? অংশু ফোন কবেছিল।

—শুনেছি।

—একটা এত বছবেব সম্পর্ক, মানুষটাব ওপব একটু কৌতূহলও নেই? জানতেও ইচ্ছে কবে না ছেলেটা কেমন আছে?

—কী লাভ?

—এব মধ্যে লাভ ক্ষতিব কী আছে?

তুতুল একটু হেসে দিল। ঠাম্মা খেপে গেছে। অংশুকে ঠাম্মা খুব ভালোবাসে। আসলে অংশু এত কেযাবিং, এত খুঁটিনাটি বিষযে ওব খেযাল শুধু কি ঠাম্মা? ওর ভালোবাসাব মানুষদেবই দেখে এসেছে তুতুল। বাড়ির লোক আত্মীযস্বজন আশপাশেব গাঁযেব মানুষজন।

অংশু যেন সকলেব যা কিছু পরাজয তাব একমাত্র উত্তব। আসলে এত মানুষ ওব চারপাশে ঘিরে থাকে, তাদের ভালোবাসা স্নেহ মমতা মাযা দিযে, যে একা তুতুলেব ভালোবাসাব কোনও দামই নেই অংশুব কাছে। তুতুলেব ইচ্ছে অনিচ্ছে ভালোলাগা মন্দলাগা সবটাকে এক ফুঁয়ে উড়িযে দিতে পেবেছে অংশু। কনকপ্রভা স্থিব তাকিয়ে আছেন। বললেন—শোন দিদিভাই। বযস হয়েছে আমাব। তুই দূর দেশে পডতে যাচ্ছিস, কবে আসবি ঠিক নেই। এসে আমাব সঙ্গে দেখা হবে কিনা তাও জানি না। আমাব সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলবি?

তুতুল আগে হলে ঠাম্মাব এসব কথায বেগে যেত। চিৎকাব করত নয়তো ঠাম্মাকে জড়িযে ধবে আদর কবতে করতে বলত—কী হবে তোমাব অ্যাঁ? আমি তোমায অমরত্বের বর দিয়েছি না? আজ এখন এবকম কিছু ঘটল না। তুতুল একটু চুপ থেকে বলল— কী আব কথা? সেই তো অংশুব কথা। ওদেব বাডিব কথা। কে ভুল কে ঠিক সেই তর্ক। ধবে নাও না সব শেষ আমার।

তুতুলের গলাব বিষাদ। অপরূপ সুন্দব চোখ দুটো যেন এ ঘরে থেকেও নেই। চোখ আছে দৃষ্টি নেই। কনকপ্রভার বুকটা মাযায ভবে গেল। বললেন—নারে ওসব কথা জানতে চাইছি না। শুধু জানতে ইচ্ছে কবে তুই যা চেযেছিল তাই তো পেযেছিস। ওখানে থাকতে চাসনি, থাকিসনি। অংশুর সঙ্গে আলাদা হতে চেযেছিস, বিদেশে যেতে চেযেছিস, যাচ্ছিস! তবে তুই ভালো নেই কেন?

—কে বলল?

—আমি বলছি। একদিনের বাচ্চা থেকে এই এতগুলো বছব আমার হাতে বডো হযেছিস। তোকে আমি চিনি না?

—আমি নিজেই নিজেকে চিনি না ঠাম্মা। ভালো থাকা না থাকাগুলোও আজকাল কীবকম মিলেমিশে একাকাব হযে যায।

—অংশু আজও ফোনে তোব শবীবেব কথা জিগ্‌গেস করছিল।

—হ্যাঁ। ও একজন আইডিযাল ডাক্তাব। মানুযেব শবীবেব দিকে ওব খুব নজর।

কনকপ্রভা বললেন—কত বেলা হল খেয়াল আছে? দাঁড়া কিছু খাবার নিযে আসি।

তুতুল এখন ঘবে একা। মিউজিক সিস্টেমে আমজাদ আলিব সবোদেব ঝালা ঝড় তুলছে। অংশু খুব সবোদ শুনতে ভালোবাসত। কী আশ্চর্যভাবে অংশুব পছন্দগুলোই বহন করে যাচ্ছে তুতুল। অথচ অংশু তাব গ্রাম, বাডি ঘব ভাই বোন আত্মীযস্বজন পাডা প্রতিবেশী সকলেব মধ্যে নিজেকে ভাগ কবে দিতে কখনও আলাদা কবে তুতুলেব পছন্দেব কথা, তুতুলেব ইচ্ছেব কথা ভাবতেই চাযনি। ও বাড়িতে থাকাকালীন কখনও বিকেলেব দিকে আলপথ ধবে গ্রাম দেখাতে নিযে যেত অংশু তুতুলকে। দু-পাশে গাঢ সবুজ ধানক্ষেতেব মাঝখান দিযে পথ কবে যেতে হত। অংশু প্রাযই বলত, জানো তুতুল এখানকাব একটা ধানেব চাবাও আমাব এত প্রিয। জানো আমি চোখ বন্ধ কবে মাটিব গন্ধ শুঁকে গাছেব গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পাবব এটা আমাব গাঁযেব মাটি গাঁযেব গাছ। তুতুল জানে ওই মাটিব সঙ্গে মিশে যেতে পাবেনি বলেই তুতুল কখনও অংশুব আপন হযে উঠতে পাবেনি। তুতুলেব মাটি আলাদা।

অংশুব মাটি আলাদা। দুজনের আকাশও। অথচ তবু কী এক অসহ্য কষ্ট বুকেব ভেতব। অংশুবও নিশ্চযই। না হলে আব কদিন পবে সব কিছুব মীমাংসা হযে যাবে জেনেও কেন ফোন কবে এখনও। অংশুই তো বলেছিল—কযেকজন লোকেব সই ঠিক কবে দেবে আমাদের সম্পর্কটা থাকবে কি না। তুতুলের অভিমান তুতুলকে অংশু থেকে দূরত্ব তৈরি কবিযেছে। তুতুল হেবে গেছে। তার অধিকাববোধেব প্রভাব এমন নয অংশুর জীবনে, যা অংশুকে মাটিছাড়া কবতে পারে। তুতুল হেরে গেছে নিজের কাছেও। তুতুল অংশুকে মাটিছাড়া কবতে গিযে অংশুব মাটির অনেকটাই বহন কবে ফেলেছে তার স্বভাবে।

বাত অনেক। অনেক বাত। একটু আগে চার্চের ঘডিতে বাত দুটোব ঘণ্টা বেজেছে। ঘুমোননি কনকপ্রভা। তুতুলেব ঘরেব একপাশে একটা সিঙ্গল খাটে শোন তিনি। অস্পষ্ট একটা আচ্ছন্নতা চোখ জুড়ে বয়েছে। তুতুলও ছটফট কবছে। এপাশ ওপাশ কবছে। একবাব দু-বাব জিগ্‌গেস কবেছেন কনকপ্রভা—কীবে জল খাবি? শবীব খাবাপ লাগছে? তুতুল উত্তর দেযনি। পাশ ফিবে শুযেছে। কনকপ্রভা 'ভেবেছেন ঘুমের ঘোবে এপাশ ওপাশ কবছে।

অনেকক্ষণ এভাবে কেটে গেল। অদ্ভুত এক নির্মম নির্জনতা এ ঘবেব বিছানা দেওযাল মেঝে আব বাতাসের ওপর ঘন হয়ে জমে আছে।

কনকপ্রভা তন্দ্রার মধ্যেই খেয়াল কবলেন তুতুল উঠল। ভাবলেন বাথকম যাচ্ছে। কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল। তুতুল ফিবল না। কনকপ্রভা বিছানা ছাডলেন। ডাইনিং স্পেসের হালকা নীল আলোয দেখলেন তুতুল কাচেব জানলা খুলে দাঁড়িযে আছে। বাইবে এখন বৃষ্টি নেই। বরং মলিন আকাশে একফালি চাঁদ। সেই ঘোলাটে চাঁদনি সামনেব বৃষ্টি- ভেজা মাটিব ওপব এমনভাবে পড়ে আছে মনে হচ্ছে যেন ওই বৃষ্টিভেজা মাঠ একটা দেওযালেব মতো আকাশেব দিকে উঠে গেছে। কনকপ্রভা পাশে এসে দাঁড়ালেন। তুতুলেব গাযে হাত বাখলেন। তুতুল সামান্য চমকে তাঁব দিকে ফিবে তাকাল। কনকপ্রভা দেখলেন তুতুলের চোখে জল।

কনকপ্রভা আর কোনও প্রশ্ন কবলেন না। ধীব পাযে নিজেব বিছানায ফিবে এলেন। এতদিন বড়ো অসুখ ছিল। আজ অনেকদিন পর বুকেব ভেতব একটুখানি সুখ মুক্তোদানার মতো টলটল কবছে।

আশপাশেব কাদেব বাডি চাঁপাগাছ আছে। বাতাসে চাঁপাব গন্ধ ভেসে আসছে।

বিদ্যাধরীর মৃত টাওয়ার

শচীন দাশ

ওই ওখানি গেলি এখনও তাব দেখা পাওয়া যায—

হাত তুলে কোনাকুনি আকাশের জাযগাটা দেখিযেই আবাব হাতটা নামিযে আনে হাজেব আলি।

দীপেন তাকিয়েছিল। খানিকটা ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল ও ঘননীল আকাশের দিক থেকে চোখ সবিযে এনেই সে ঝুঁকে পড়ল এখন হাজেবেব দিকে।

দেখা পাওযা যায মানে! সে তো কবেই মবে গেছে—

আহা মবলিও তাব পাযেব বেখা তো আব মুছে যাযনি!

পাযের বেখা! দীপেন অবাক, মানে নদীখাতেব কথা বলছেন?

হ্যাঁ বাবু।

চাযেব একটা গেলাস ছিল হাতে। সেটা নীচে বাঁশেব বেঞ্চিটাব ধারে বেখেই আবাব মুখ খুলল হাজেব, তবে বাইবে থেকি বোঝা যায না। ঝোপজঙ্গল পাব হযি পৌঁছুতি পাবলি তবে দেখা যায—

আপনি দেখেছেন?

এই তো দেখতিছি বছর পাঁচ ধবি। বছবি একবাব কবি—

কেন, তাব আগে? দীপেন তাকাতেই হেসে ফেলে হাজেব, কেন বাবুবি যে বললম আমি এদিককাব লোক নই। আসতিছি সেই দণ্ডীবহাট থেকি। যাব এদিকিই এক সম্বুন্ধিব বাড়ি। বাবুব বুঝি মনে নেই?

বলতে বলতে উঠে দাঁড়িযে চাযেব পযসাটা মিটিযে দেয হাজের। তাবপব পাশ থেকে নাইলনেব ব্যাগটা তুলে নিতেই দীপেনও উঠে দাঁড়ায সঙ্গে সঙ্গে।

এখান থেকে কত দূব হবে জাযগাটা?

তা মন্দ নয। এখান থেকি বাস। বাস থেকে নেমেও আবাব হাঁটাপথ আছে অনেকটা—

দূবত্বের কথা শুনে প্রায চুপসেই গিযেছিল দীপেন। হাজেব সেটা লক্ষ কবুল।

বাবুব মনে হয জায়গাটা খুবই দেখাব ইচ্ছে—

দীপেন মৃদু হাসে, ইচ্ছে তো যোলো আনাই। কিন্তু

তাহলি আব কিন্তুব কী। বেবোযি পড়েন—

তা তো বেবোব কিন্তু বিকেলেব মধ্যে ফিবে আসা যাবে তো? হাজেবেব দিকে তাকিযে যেন সন্দেহ প্রকাশ কবে দীপেন। ওই তখনই হাজেবেব গলায আশ্বাস, হ্যাঁ হ্যাঁ—পাববেন না কেন! সবে তো দুপুব—

দুপুবেব কথায় হাত তুলে ঘড়িটা একবাব দেখে নেয দীপেন।

তাহলে চলুন। একবার ঘুরেই আসি না হয়।

তাই চলেন। হাজেরের মুখে খুশির ছোঁয়া, একা একা যাতিছিলাম এখন আপনারি পেয়ি দুডো কথা বলতি বলতি যাওয়া যাবে—

দোকান থেকে বেরিয়ে পাশের রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই বাস একটা। অতঃপর বাসে উঠে সামান্য পরেই এক উন্মুক্ত প্রান্তর। জলাজমি, খাল-বিল-ভেড়ি আর খোলা-মাঠেরই পাশে সরু এক নির্জন রাস্তায়।

নেমে এপাশে-ওপাশে তাকাচ্ছিল দীপেন। তাকাতেই আঙুল তুলল হাজের, ওই যে— ওই মাঠ ধরেই এখন হাঁটতি হবে আমাদির। আসেন চলি আসেন বাবু—

বলতে বলতে পিচ রাস্তা ধরে এগিয়েছিল। এই সময়েই রাস্তা থেকে লাফাল দীপেন। প্রায় লাফিয়েই একদম মাঠের ভেতরে। তাতে ঘাস কিছু সবল। কিছু লতাটতাও দোমড়ালো। আর দোমড়াতেই দু'একটা গঙ্গাফড়িং। এবং চোখ নামাতে নামাতে দীপেন দেখল, ছোটো ছোটো কিছু পোকাও উড়ছে এখন ঘাস ছেড়ে।

না না, এভাবি নামাটা আপনার ঠিক হলোনি বাবু—

কেন! দীপেন থমকে তাকাতেই হাজের এসে দাঁড়াল সেখানে।

কেন কী, এসব ঘাসের ভেতরেই এ সময়ে তেনারা সব শুইয়ে থাকেন। এই তো সিদিন। আল ধরি ধরি যাতিছি পা ফস্‌কি এমন ঘাসে পা পড়তেই ফস। বুড়ো একটা গোখুর। শামুক ধরতি ধরতি কখন ঘাসের ভেতরি আসি শুয়ি পড়িছে।

তাই নাকি?

তাহলি আর বলতিছি কী—

তবে এখন আর এদিকে সাপকোপ নেই তেমন। দীপেন মাথা নাড়ল আস্তে আস্তে, যা সব পেস্টিসাইডস দিচ্ছে আজকাল।

কী সাইডস বললেন? হাজের চোখ তোলে সন্তর্পণে। খোলা মাঠের হাওয়ায় তার লম্বা দাড়িতে এখন সাদা ফিনফিনে একটা ঢেউ।

দীপেন হাসল, পেস্টিসাইডস। পোকা মারার ওষুধ।

তা ওষুধ তো আমাদিরও দিতি হয় বাবু তবুও তেনাদির আনাগোনা কমে না। রাতের দিকি পেরায়ই শুনি ঠকঠক। শামুক ভাঙতিছে। একবার কী হল জানেন—

হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে আলের ওপর উঠে দাঁড়ায় হাজের আলি। তারপর হঠাৎই কী মনে পড়ায় দীপেনের দিকে ঘুরে তাকায়, তা বাবু গিয়িছিলেন এদিকি কোথায়?

দেখে দেখে পা রাখছিল দীপেন। বলল, হাতিশালা—

সেটি হল এদিকি কোথায়।

ওই তো ভাঙড়ের দিকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারি মনে পড়িছে। হাজেরের মুখে গালভরা হাসি, চাষবাসির নমুনা নিতি গিয়িছিলেন আপনি। আপনার সঙ্গি একজনা ছিল লম্বাপানা। হাতে একখানা যন্তর। চা-টা খেয়ি আপনার সঙ্গে কথাটথা কইয়ে চলি গেল—

দীপেন মাথা নাড়ে, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। জানায় তারপর, ওই ওরই সঙ্গে বছরভর এদিকার মৌজায় মৌজায় নেমে ধানপাট ও তিল-সর্ষের নমুনা সংগ্রহ করে দীপেন। এটাই তার চাকরি। আর এই চাকরি করতেই কখনও রানতলা, কখনও কড়াইডাঙা, কখনও শ্যামনগর, কখনও ভোজের হাট কিংবা কখনও বা আরার এই ভাঙড়েই। ঘুরছে তো ঘুরছেই। এমন ঘুরতে ঘুরতেই তো আজ দেখা হাজেরের সঙ্গে। ঘটকপুকুরে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। খেতে খেতে কত না গল্প, কত কথা। একসময় সে-কথায় কথা মিলিয়েছিল দীপেন। এবং ওই তখনই জানতে পেরেছিল বিদ্যাধরীর কথা। জানতে পেরেছিল তার মরা খাতের গল্প।

গল্প বলতে বলতেই হাঁটছিল হাজের। দীপেন তাকাল এই সময়েই।

আপনার সম্বন্ধির বাড়ি কোন দিকে চাচা?

হাজের থমকে দাঁড়িয়ে একটা হাত তোলে তার।

দীপেন থমকে তাকায়।

ও আপনি তাহলে এদিকেই যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ—

হাজেরের পান-দোক্তার দাঁতের ফাঁকে সামান্য একটু হাসি, আপনারি তখন বললাম না বাবু বছরি আসি একবার করি। ঠিক এমনই দিনি—

এমন দিনে! কেন? দীপেন অবাক।

এবারে দাঁড়িয়ে পড়ে যেন হাজের, বাহ্ আজ কী তিথি জানেন না?

তিথি! দীপেন ঠোঁট ওল্টায়, না তো—

আহা মাসটা তো মনে আছে?

হ্যাঁ তা আছে। ভাদ্র।

এই। হাজের হঠাৎই যেন দূরমনস্ক। ধবধবে দাড়িতে হাত রাখতে রাখতে যেন হারিয়েই গেল নিজের ভেতরে, আজ ভাদ্দরির দশমী। তায় আবার শুক্লপক্ষ। এমন দিনিই তো তিনি আসেন তাঁর প্রিয় শালিখির কাছে।

কার কাছে? দীপেন বোঝার চেষ্টা করে।

হাজের জানায়, মৃত এক শালিখ পাখিকে করর দিয়েছিলেন এক পিরসাহের। আর তারপরেই পাখির ওই কবরকে ঘিরে শতাব্দীর এক প্রাচীন কিংবদন্তী। আজও এদিকে লোকের মুখে মুখে ঘুরছে।

একটু থেমে আবার জানায় হাজের, পাখিটি ছিল পিরের খুবই প্রিয়। তাকে ভুলতে পারেননি তিনি। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের প্রতি দশমী তিথিতেই পির ঘোরেন তাই নিঃশব্দে। তার প্রিয় শালিখের কাছে। কাজেই শালিখ মাজারটি এখন খুবই জাগ্রত। জাগ্রত ওই মাজারে এমন দিনে তাই নিয়ম করেই আসে হাজের। আসে তার ছেলের জন্য।

কেন কী হয়েছে ছেলের? দীপেন ঘাড় ঘুরিয়েই লক্ষ করে একবার মানুষটিকে।

মানুষটি মাথা নাড়ে, নাহ্ ছেলি আমার ভালো নেই বাবু—

বলতে বলতেই তারপর জানায, ছেলে তাব জন্ম ভোগা। হাঁটে কিন্তু পা ফেলে না ঠিকমতো। হাসে, কিন্তু সে হাসিতে কোনো শব্দ নেই। বলে কথা-টথা, কিন্তু সে বলনে কোনো ভাষা নেই।

নিঃশব্দে, কথা না বলেই এবারে হাঁটতে থাকে হাজের আলি। অতঃপব দীপেনও তাব পেছনে পেছনে। সরু আল ধরে ধবে। কখনও বা আবাব আল থেকে নেমে মাঠ। দু'পাশে মাঝে মাঝে জল থাকলেও পরপর ক'দিন বৃষ্টি না হওযায় মাটি আবাব শক্ত। তবু পা চেপে চেপে হাঁটছিল দীপেন। হাঁটতে হাঁটতেই এরপব একসময এক নামাল জমিতে। নামাল জমি ধরে তাবপব আবাব নামা খানিকটা।

ওই দেখুন বাবু—

বৃদ্ধ দাঁড়াতে দীপেনও দাঁড়িযে পড়ে।

সামনে ঝোপঝাড়। কিছু বাগভেবেণ্ডা কিছু কালকেসুন্দ। মাঝে মাঝে তাবই ভেতব থেকে খানকযেক তাল আব' খেজুবের বৃক্ষ। গা বেযে তাবই লতানে কিছু জংলা আগাছা। হাজেব নেমে গেল ঠিক সেখানেই। তারপর জঙ্গলের ফাঁকে আঙুল তুলে দেখাল, ওই দেখুন গিযি নদীখাত—

কোথায়?

ওই যে।

উঁকিঝুকি মেরে ফোক ফাঁকবে তাকিযে দেখল দীপেন, শাদা একটা চওড়া বেখা। ধু ধু বালিতে আচ্ছন্ন হয়ে খানিকটা বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে।

সবসব কবে নেমে গেল দীপেন। তারপব শবীব ঘুবিযে জঙ্গলেবই ফাঁকফোকরে গলে গিযে সোজা নদীব বুকে।

এই তাহলে বিদ্যাধরী। এদিক থেকেই নদীটি সে-সময়ে প্রবল স্রোত নিযে দক্ষিণে ওই শামুকপোতায প্রবাহিত হত। তখন কী স্রোত তাব। যেমন স্রোত তেমনি তার গতি আব ছন্দ। যেমন ছিল চওডা তেমনিই আবাব বিপদসংকুল।

ঘুবে ঘুবে দেখছিল দীপেন, এমন সময়ই পেছনে কখন হাজেব আলি।

নদী তো দেখতিছেন তালি নদীপাড়িব বেত্তান্তটা শোনবেন না?

দীপেন চমকে ওঠে। নদীপাড়েব বৃত্তান্ত।

আজ্ঞি হ্যাঁ বাবু—

শ্বাস ফেলে ঘুবে দাঁডিযে দীপেনেবই মুখোমুখি এখন হাজেব। হাতেব ছাতাটা বন্ধ কবে তাকায়।

এই নদীপথেই যাতিছেল এক সওদাগব। সওদাগবিব সংগি এক শালিখ। যেমন সুন্দব তেমনি কথাও বলতি পারে মানুষিব মতো। তা চোখি পড়বি তো পড় অই পিরসাহেবের—

পিরসাহেব! দীপেনেব কপালে বেখাব কুঞ্চন, তিনি ছিলেন কোথায়?

কেন নদীব পাড়েতে। ওই তো একটু এগিযেই এক পাকুড়। ওই তারই তলায় মরুভূমির দেশ থেকে আসি ডেবা বাধিছিলেন তিনি। হঠাৎই চোখি পডল একদিন ওই পাখি।

তারপর?

দীপেন তাকাচ্ছে এখন হাজেরের চোখে। তারপরেই যেন জড়িয়ে যায় তার কথার গভীরে।

তারপর আর কী! সওদাগরির নৌকা থামায়ি পাখিডাকে চাইলেন তিনি। কিন্তু

কিন্তু! দিলেন না সওদাগর?

সওদাগর কি আর দেয়।

তাহলে?

তালি আর কী। হাজের চুপ। চুপ করেই রইল একটু সময়। তারপর আবার জানাল, বার কয়েক চেষ্টা না পেয়ে শেষে ক্রুদ্ধ হয়ি উঠলেন পিরসাহের। আর উঠেই তুফান তুললেন নদীতে।

তুফান উঠল। মেঘ ডাকল। বিদ্যাধরীও সেই সঙ্গে হয়ে উঠল উত্তাল। আর সেই উত্তাল ঢেউয়ের ঝড়ের ভেতরে নিশ্চিহ্ন হলেন সওদাগর। এবং ওই তখনই হুঁশ হল পির- সাহেবের। তাই তো। নৌকা ডুবেছে যখন পাখিও মরেছে তখন। হায় হায়, এ কী করলেন তিনি? পির ছুটেছেন তখন নদীর পাড়ে। আর ঝড় থামিয়ে ঢেউ নামিয়ে পাখিকেই নিয়ে এলেন এরপর। কিন্তু তখন সে মৃত। মৃত পাখিকে এরপরেই মাটি দেন পিরসাহের। আর দিনটি বোধহয় ছিল ভাদ্রেরই শুক্লা দশমী। শালিখকে মাটি দিয়ে তাই উধাও হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু ফিরতে লাগলেন আরার প্রতি ভাদ্রেই। ঠিক এমনই দিনে।

বলতে বলতে হঠাৎই কী মনে হয় হাজেরের। হাজের জিজ্ঞেস করে, বাবু কটা বাজল আপনার ঘড়িতি?

ঘড়ির কথায় খেয়াল হয় দীপেনের। তাই তো সেই কখন বেরিয়েছে। এ-সময়ে একবার অন্তত দেখা উচিত ছিল। কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখতে গিয়েই আঁতকে ওঠে দীপেন। প্রায় চারটে। এবারে অন্তত তার ফেরা উচিত। আর এখন না রওনা হলে শেষপর্যন্ত মাঠ ভেঙে ফেরাটাই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া বত্নাও যেন ভাবরে খুব। কেননা ভোর ছ-টায় বেরিয়ে যে মানুষটার তিনটের ভেতরেই ঘরে ঢুকে যাওয়ার কথা, সন্ধে পর্যন্ত সে না ফিরলেই চিন্তা তো হবেই।

কাঁধের চামড়ার ব্যাগটা খুলে হাত ঢুকিয়ে মোবাইলটা তুলে আনে দীপেন। এরপর বুড়ো আঙুলের মাথায় টিপটিপ।

হ্যাঁ—আমি বলছি,। ফিরতে একটু দেরি হবে—

এবং দীপেনের কানে এল বত্নার উদ্বিগ্ন গলা, কেন কী হল? ঠিকঠাক বাস পাচ্ছ না, নাকি?

না না, একটা সার্ভেতে ফেঁসে গেছি। এখনও আমি মাঠের ভেতরে—

সে কি। তাহলে ফিরবে কী করে?

ফিরব ফিরব। এই তো এরারে রওনা হচ্ছি। তুমি ঠিক আছো তো?

হ্যাঁ, এমনিতে ঠিকই আছি। শরীরেও কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু তুমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত.

না না, টেনশান কোরো না। এই তো আসছি—

টিপ করে আবার যন্ত্রে আঙুল চাপে দীপেন। আর ওই তখনই হাজের।

বউয়ের সঙ্গে কথা বললেন, না বাবু?

হ্যাঁ চাচা। দেরি হয়ে গেছে তো তাই জানিয়ে দিলাম।

কিন্তু মিথ্যে যেনো বললেন একটু?

মিথ্যে! দীপেন চমকে ওঠে। তারপরেই হঠাৎ হেসে ফেলে, হ্যাঁ তা একটু বলেছি। আসলে কোনো কোনো মিথ্যে তো সত্যকে আবিষ্কার করার জন্যই। মিথ্যে না হলে কি সত্য বাঁচে।

বাবু তো কথা বলেন বেশ।

হাজের বাঁদিকে সরে যায় একটু, তা দেশ হল আপনার কোথায় বাবু?

সে-ও এক নদীর ধারেই। দীপেন মোবাইলটা ব্যাগে রাখে, আডিয়াল খাঁ—

আড়িয়াল খাঁ! হাজের কী হাতড়ায় মনে মনে, এ নদীর দেশটি কোনস্থানে!

দীপেন ঘাড় নাড়ে, নদীর কি আর দেশ থাকে চাচা! তবে এটুকু বলতে পারি পদ্মারই কাছে মেঘনারই ধারে বুড়িগঙ্গা আর ধলেশ্বরীর পাশাপাশিই বয়ে চলেছে সে।

বুঝিছি। বুঝিছি সপ। বাবুরি আর বোলতি হবে না।

হাজারের দাড়ির ফাঁকে হাসি ফোটে এক টুকরো, আপনি হলেন গে নদীর লোক। নদীর কথা উঠতিই তাই অমন চঞ্চল হোয়ি উঠিছিলেন। আর নদীরি পেতেই অমন সরসর কোইরে নামতি পেরেছিলেন।

যেমন নেমেছিল কথায় কথায় আবার তেমনই উঠে এল দীপেন।

হাজের তখনই আবার বলে উঠল, যন্তরটা আপনার বেশ, না বাবু! কেমন টুক করে ঘরির সঙ্গি যোগাযোগ করলেন—

হ্যাঁ—এটাই এই যন্ত্রের গুণ।

দীপেন চোখ তোলে। আর তুলতেই কী মনে পড়ে ওর, ছেলের আপনার কী অসুখ চাচা?

পা বাড়িয়েছিল হাজের। দীপেনের কথায় একবার থমকে দাঁড়াল।

অসুখটা যে কী, তা কি আর বুঝতি পারলাম! আল্লার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। মুখি শব্দ আছে কিন্তু ভাষা নেই, ঠোঁটি হাসি আছে কিন্তু আওয়াজ নেই। সপসময়ি শুদু ওই আকাশি চোখ রাখতিছে। গাছ দেখতিছে। বাতাস ধরতিছে। বাতাসরে কি ধরা যায় বলেন বাবু?

দাড়ির মাঝে আঙুল ঢুকিয়ে গালটা বুঝি একবার চুলকে নেয় হাজের।

দীপেন হাঁটতে থাকে। নাহ্ এবারে ফেরা দরকার। এখনও অনেকটা যেতে হবে। বর্ষার মাস। এই ভালো তো এই আবার বুঝি গোমড়া হয়ে আসে আকাশটা। বৃষ্টি নামলে ফেরাই তখন মুশকিল।

ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দীপেন। এসেই আবার ফাঁকফোকর দিয়ে নদীপথটা লক্ষ করে। ইস্, আর একটু যদি থাকা যেত। দীপেন পেছনে ফেরে। আর ফিরতেই চোখে পড়ে মাথা নাড়ছে এখন আস্তে আস্তে হাজের।

জানেন বাবু, গাঁযের সপ বলে বিবিব গভ্যে জিনের হাওযা লাগিছে। কিন্তু ডাক্তাবে বলে অন্য কথা। মাথার অসুখ। এরি ওষুধ খাওযাতি হবে। ইলেকটিরি শক দিতি হবে। তা এসপে কি কম টাকা যায বাবু? তবুও তো কবলাম। কিন্তু কোথায কী। ছেলি আমার যেমন ছিল তেমনিই আছে। ভ্যাবলা মেরি তাকায়। আকাশ দেখে। আবাব মাঝেমদ্দি লুঙি তুলি মুসলমানি করা জায়গাটি ধরি দাঁড়াযে থাকে। আচ্ছা বয়সির ছেলি, এসপ কি মানায় বাবু, বলেন?

দাঁড়িযে থমকে তাকিযে দীপেনেরই চোখে চোখ বাখে হাজেব, শেষে এই মাজারিব সন্ধান পেযি এক সকালি—

একবার দাঁড়াতেই হযেছিল। তাই বলল এখন দীপেন, তা বযস এখন কত তোমার ছেলেব?

তা এই ভাদ্দবি এবার উনিশে পা বাখিছে—

ছেলে তোমাব এই একটাই না চাচা?

হাজের চুপ। চুপচাপই আবাব পা ফেলে। আগে ছিল দু'দুটো বিবি। কিন্তু বাচ্চা না হওয়ায় ছলছুতোয তালাক দিযেছে। শেষে নদীর ওপারে গিযে ইছামতীব ধাবেই বুড়ো বযসে এ বিবিবে গ্রহণ। বাচ্চাও এল তার গর্ভে। কিন্তু সে বাচ্চা যে এমন

হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকে ঘুবে যাচ্ছিল দীপেন। হাজেব দেখেই চেঁচিযে উঠল, না না ওদিকি নয বাবু। এদিকি। এই সোজা বাস্তা।

ফিরে এসে সে বাস্তাটা ধবতেই হাজেব বলল, যাতি পাববেন তো বাবু?

হ্যাঁ হ্যাঁ। দীপেন হাসে।

কখনো দণ্ডিবহাটি গেলে বাজাবি আমার খোঁজ করবেন। হাজেব আলি মোল্লা।

আচ্ছা—দীপেন ঘাড় নাড়তেই হাজেবেব ঠোঁটে ভাঙা এক ফালি হাসি, আপনাব সঙ্গি আলাপ হযি বড়ো ভালো লাগল—

দীপেন তাকাল, কিন্তু আপনি যাবেন এবাব কোনদিকে?

যেদিকে বিদ্যাধবীব চিতাভস্ম সেদিকেই চোখ তুলে বলল হাজেব, ওই তো খাত পাব হয়ি তাবপর যাব। একটু এগোলিই গেরাম দেখা যাবে। ওখানিই গাছ গাছালিতি ঢাকা আছে মাজারটি।

হাঁটতে শুরু করবে দীপেন ঘুবে একবাব তাকাল হাজেবেব দিকে, তা মাজাবেব দোযায ছেলে কি আপনাব ভালো আছে চাচা?

ভালো মানে..

হাজেব চুপ।

দীপেন এগিযে যায, আচ্ছা ঠিক আছে আসি চাচা—

পা বাড়িয়ে লম্বা পাযে মাঠ ভাঙে দীপেন। মাঝে একবার ঘড়িটাও দেখে নেয়। ঠিক চারটে চল্লিশ। পডন্ত বেলার রোদ এখন অনেকটাই পশ্চিমেব মাঠে। জলাজমি, খাল-বিল ও চাষেব খেতে নুইয়ে পড়েছে। একসময এভাবেই খেত থেকে সরল। খাল থেকে উঠল।

আর তারপরেই আচমকা কখন যে সূর্যটা ডুবল বুঝতে পারল না দীপেন, যখন বুঝল তখন সে ছাতাটা বন্ধ করেই থমকে দাঁড়িয়েছে।

এবার মাঠের ভেতরের রাস্তাটা যেন আলে এসে ঠেকল। এবার সে ঠিক কোন আলটা ধরবে! সামনে তাকিয়ে দিগন্তরেখায় রাস্তা দেখার চেষ্টা করল দীপেন। পিচ রাস্তায় নেমে, রাস্তা পার হয়ে তখন তো ঘোরের মাথায়ই ঢুকে পড়েছিল হাজেরের সঙ্গে। কিন্তু এখন ফিরতে গিয়ে তো থই পাচ্ছে না দীপেন। সেই পিচ রাস্তাটি কোনদিকে? দীপেন তাকাল আশেপাশে। যদি কাউকে পাওয়া যায়। কিন্তু না পেয়ে সে আলতো পায়ে আলেই নেমে পড়ল। এত বছর ধরে গাঁ-গঞ্জে ঘুরছে, খেত-খামারে নামছে, রাস্তা কি আর খুঁজে পারে না সে?

খুঁজতে গিয়েই এ-আল থেকে সে-আলে, সে-আল থেকে আবার এ-আলে। এবং এভাবেই আল বদলাতে বদলাতে একসময় বিকেলও ফুরোল। আর ফুরোতেই আকাশ ভাসিয়ে একখানা চাঁদ।

চাঁদ উঠতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল দীপেন। মনে মনে বুঝি ভয়ও পেয়ে গেল। ভয়ে সে তাকাচ্ছে, এই সময়েই চোখে পড়ল আবার সেই নদীখাত। একি! এখানে ওই নদীখাত কেন? দীপেন ভয়ে ভয়েই এগিয়ে গেল। আর এগোতেই দেখে সেই ঝোপঝাড়। তাল আর খেজুরের গাছ। যার ফাঁক-ফোকর গলে হাজেরের সঙ্গে একটু আগে সে বিদ্যাধরীর বুকে নেমেছিল। তাহলে রাস্তা হারিয়ে আবারও সে আগের জায়গায়?

বিনবিন করে কপালে ঘাম জমে উঠল দীপেনের। এখন সে কী করবে! কোনদিকে যাবে? হাজের আলি বলেছিল যেন নদীখাত পেরিয়ে একটু এগোলেই এক গ্রাম। ওই গ্রামেরই একপাশে গাছগাছালিতে ঢাকা আছে সেই মাজারটি। তার মানে তো দাঁড়াল, হাজের এখানেই আছে কোথাও, কাছাকাছি তার আত্মীয়ের বাড়িতে। খোঁজ করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে একবার বত্নাকে ধরা দরকার। ন'মাসের এগিয়ে থাকা অন্তসত্ত্বায় সে। খবর না দিয়ে দুশ্চিন্তায় রাখলে মাদার ও বেবি, দুজনেরই ক্ষতি।

ব্যাগ খুলে মোবাইলটা বের করে দীপেন। কিন্তু বোতাম টিপতে গিয়ে মোবাইলের আলোয় দেখল টাওয়ার পাচ্ছে না সে। সেকি, বিকেলের দিকে যে একবার কথা বলল বত্নার সঙ্গে?

কুলকুল করে ঘামতে থাকল দীপেন। ঘামতে ঘামতেই সে আরারও সে চেষ্টা করল। আরারও। আরও একবার। কিন্তু টাওয়ার নেই তাই লাইন পেল না দীপেন। না পেয়ে, ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় যখন খাত পার হয়ে এগিয়েছে সেই সময়েই কোথায়ও একটা শব্দ। শব্দটা যেন জলের। যেন হু হু করে ছুটে আসছে প্রবল এক জলরাশি। আর তারই চাপে গভীর এক শব্দনাদ।

চাঁদ উঠে এসেছিল। পেছন ঘুরে, তারই আলোয় কী দেখে চমকে উঠল দীপেন। মরা খাত থেকে বিদ্যাধরী কখন আবার জেগে উঠেছে। এখন তার বুকে ঢেউ। ঢেউয়ের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এবং সে শব্দের ভেতরেই দুলতে দুলতে একটা নৌকা যেন ভেসে আসছে।

নৌকাটাব সামনেব দিক ময়ূবেব মতো। যেন একটা ময়ূবই জল কেটে কেটে এগিযে আসছে এদিকে। তাব দু'ধাবে নৌকার গায়ে হবেকবকম ছোটো ছোটো পুতুল। আব মাঝখানে সাজানো একটা ঘর। সে ঘবের সামনে দাঁড়িযে কেউ একজন। কিন্তু হাতে ওটা কী তার! পাখি নাকি!

দীপেন ভযে কেঁপে উঠল। উত্তেজনায যেন নিঃশ্বাসও বন্ধ হযে আসছে তাব। এবাব কি তাহলে পাখিটা চাইতে আসবে সেই পিরসাহেব?

এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছিল। এ-সময়ে হঠাৎই মোবাইলটা, এই শতকের এক ঝর্নাধ্বনি নিযে যেন হুড়মুড় কবে বেজে উঠল। আব বাজতেই মোবাইলটা চটপট দীপেনেব চোখেব সামনে। কিন্তু আনতেই একসময অন্ধকাব। দীপেন টের পায বত্না। বত্নাই যে তাকে চেষ্টা কবে যাচ্ছে সে ব্যাপাবে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু.

দীপেন চমকে উঠল। অদূরে নৌকাটাব যেন গতি মন্থব এখন। দাঁড়িযে পড়বে কি?

ভাবতে না ভাবতেই এগোবে আচমকা আবাবও সেই মোবাইল। ঝটিতে যন্ত্রটা সামনে এনেই দীপেন ঝাঁপিযে পড়ে।

হ্যালো, হ্যাঁ—আমি বলছি। বলছি বলো। বলো বত্না—

কিন্তু বলবে কী! বলতে গিয়েই আবাব অন্ধকাব। আলো নেই ভাষা নেই সাড়া নেই। হতাশ দীপেন ততক্ষণে স্তব্ধই একবকম। একবার মোবাইল ও অন্যবাবে নৌকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একসময় সে টেব পায, গোলমাল কোথাও একটা হচ্ছে। আর সে গোলমালটা বোধহয সমযেব কোনো দূবত্বে। মাঝখানেব এই দূবত্বটা সবে গেলেই আবাবও সংযোগ ঘটবে বত্নার সঙ্গে দীপেনেব। কিন্তু ততক্ষণে

সংযোগেব একটা সেতুর জন্যই দীপেন নৌকাটা চলে যাওযাব অপেক্ষায থাকে, কিংবা কোনো লোককাহিনিব পুনবাবৃত্তিব।

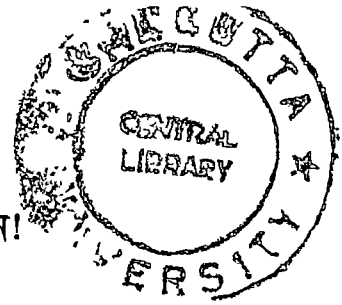

এই যে শুনছেন!

অভিজিৎ তরফদার

একটু দাঁড়াবেন। একটা কথা ছিল।

জানতাম, না দাঁড়িয়ে আপনি পাববেন না। পাববেন না, কারণ কথাব আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য কবা আপনাব পক্ষে অসম্ভব। কথা বলাব আকর্ষণ অবশ্য আবও অনেক বেশি। সে প্রসঙ্গে পবে আসছি।

জীবনেব প্রথম শব্দগুলোর কথাই ধরুন। গর্ভস্থ সন্তানও নাকি মাযেব কথা শোনে, মা-র কণ্ঠস্ববেব সঙ্গে তাব আত্মীযতা জন্মে ভূমিষ্ঠ হবাব আগেই। জন্মানো মাত্রই কান্না। শব্দেব মাধ্যমেই তাব নিজেকে প্রতিষ্ঠা। কান্না শুনে মাযেব ছুটে আসা, স্তন্যদান, গান গেযে ঘুম পাড়ানো। গানেব উচ্চাবণ সুবেব সঙ্গে মিশে আপনাব কর্ণকুহবে প্রবেশ কবেছিল বলেই না আপনি লক্ষ্মীছেলে হযে ঘুমিযে পড়েছিলেন।

মা-ব প্রতি আপনার ধ্বনি প্রয়োগ কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। অর্থহীন উচ্চাবণ ক্রমশ শব্দে সংহত হযেছে, ভাষায রূপান্তবিত হযেছে। মা-ই আপনাব ভাষাব প্রথম গুরু। মা-র ভাষাতেই আপনাব বাক্য বিনিমযেব সূচনা, খিদে-ঘুম ইত্যাদি জৈবিক প্রযোজন ছাড়িযে কথা আপনাকে আবও কতজনেব কাছে পৌঁছে দিল। কথাব কাছে আপনাব ঋণ অপরিসীম।

মাযেবও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ বলতে মূলত কথাই। 'আয ঘুম যায ঘুম দত্তপাড়া দিযে' গুরু, ওই 'চোখ বন্ধ করছি, দেখি তো কে গ্লাস থেকে দুধটা খেযে নেয' হযে 'সাবাদিন শুধু খেলা-খেলা-খেলা, এবারে পড়তে বস'। তাবপবেই 'ছি ছি ছি! এই তোব বেজাল্ট? সবার সামনে মুখ দেখাব কী কবে?' অবশেষে, 'বিযে তুমি কববে। কাকে কববে কেন কববে সেটা তোমার ব্যাপার, ওতে আমাকে জড়িও না'। এখন, 'টুকুব মেযেব অন্নপ্রাশন। তোর বিয়েতে টুকু সোনা দিযেছিল, মনে থাকে যেন।'

বাবাব সঙ্গে সে তুলনায আপনাব যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। কথাও হাতে গোনা। স্কুলবেলায 'দিনদিন খোদার খাসিব মতো ধাড়ি হযে উঠছ, লেখাপড়া কিছু হচ্ছে?' কলেজে ঢুকে, 'বাপের পকেট মেরে বিড়ি খেতে শিখেছিস? পেঁদিয়ে বাপেব নাম ভুলিযে দেব হতচ্ছাড়া।' এখন, দরজার কোনায় ঘাপটি মেবে দাঁড়িযে থাকেন বাবা।

'কী ব্যাপাব?'

'অর্শেব ব্যথাটা কদিন ধবে ভোগাচ্ছে।'

'তো?'

'অবনীডাক্তারকে বলে দুটো বড়ি এনে দে!'

'সে তো বোজই খাচ্ছ, কমছে কোথায? অপারেশন কবিযে নাও।'

'অপাবেশন? সে তো অনেক টাকার ধাক্কা।'

'কেন? পেনশনেব টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায?

বাবার শেষ কথাগুলো না শুনেই বেবিযে যান আপনি। শুনলে দেখতেন বাবা বলছেন, 'পেনশনেব টাকা আব চোখে দেখি কোথায? ঢুকতে না ঢুকতেই বউমা হাতিযে নেয়।'

বউমা, মানে আপনাব জীবন-সঙ্গিনী, সেখানেও কথাব ফুলঝুবি। বিয়েব আগে : 'তোমাব হাইটটা কী সুন্দব গো! খুব ম্যানলি।'

তাবপর · 'সবাই সমস্ত জেনে গেছে। এখন আমাব গলায দড়ি দেওযা ছাড়া উপায থাকবে না।'

বিযেব পব 'ওঃ দিনবাত তোমাব বাবা-মা আব বোন। যেন ঘাডেব কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। আমাকে এখান থেকে নিযে যেতে পাবো না?'

এখন : 'অনেক সহ্য কবেছি, লাথি-ঝ্যাঁটা খেযে গেছি, টুঁ শব্দটিও কবিনি। এতদিনে সময হযেছে। এতটুকু এটাব-ওটাব করেছ কি বধূ নির্যাতনেব দাযে গুষ্টিশুদ্ধ ঘানি ঘুবিযে ছাডব।'

পববর্তী প্রজন্মও মাথা তুলতে শুরু কবেছে।

'বাবা, নাচেব ক্লাসেব মাইনেটা, কালই লাস্ট ডেট।'

'বোজ রোজ বাসে কবে ফেবা, ডিসগাসটিং। একটা টু হুইলাব কিনে দিতে পারো না? বন্ধুদেব সবাব আছে। আমাব এত লজ্জা কবে।'

বাস্তায 'কী খবব ভাযা, আজকাল দেখাই যায় না? বাজাবহাটে জমি ম্যানেজ কবেছ শোনা যাচ্ছে?'

বিযেবাডিতে : 'আবে, তোমার মেযে তো একেবাবে লেডি হযে গেছে। সেদিন নিকোপার্কে দেখা, আমি চিনতেই পাবিনি। তবে সঙ্গেব ছেলেটা কিন্তু বেশ হ্যান্ডসাম, তোমাব মেযেব চযেস আছে।'

অফিসে 'উনিশ পার্সেন্ট বাকি, পাঁচ পার্সেন্ট ঠেকিযে মাথা কিনে নিযেছে। সামনে ইলেকশন, দ্যাখো না কেমন গেদে দিই।'

কথা, কথা, কথা। জীবনেব প্রতিটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা অনুভূতি প্রকাশে কথা ছাড়া আপনি অচল। বেডিও-টিভি যেখানে কান পাতুন শুধু কথা। বাস্তায-মিছিলে ছিটকে ছিটকে উঠছে কথা। পৃথিবীব এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে কথা। যন্ত্রবাহিত কথাব স্রোত এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চাবিত হচ্ছে দুরাবোগ্য ভাইবাসেব মতো।

২

কী বললেন?

'কথা কথা কবে পাডা মাথায কবছেন, জীবজগতে কোন প্রাণীটা কথা ছাডা থাকে বলুন? আপনাবাও কথা না থাকলে অচল।'

ভুল করছেন। কথা নয, ভাযা।

'কথা ছাড়া ভাযা সম্ভব নয।'

কে বলেছে? ভাষা আব কথা দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা ধাবণা। দাঁড়ান, আপনাকে উদাহবণ সহযোগে ব্যাখ্যা করাব আগে একটা গল্প বলি। গল্পের প্রথম অংশটা অবশ্য অন্যবকম। আমাদের সম্পর্কে আপনাদেব, মানে কথা-অন্ত মানবপ্রজাতিব ভাবনাটাবনাগুলো কেমন সে বিষয়ে ঘটনাটা আলোকপাত করবে।

এই তো সেদিন, কর্ড লাইন লোকালে আমাদেব ক'জন আসছিল গুড়াপ স্টেশন থেকে। শীতেব সন্ধে, গ্রামদেশে সাতটাতেই রাত গভীর হয়ে যায়। কাবওকে বিবক্ত কবেনি, পাকা ধানে মইও দেয়নি কারওর। কামবার এক কোনায নিবিবিলিতে ওরা চারজন নিজস্ব ভাষায় মত বিনিময কবছিল।

কামাবকুণ্ডু বলে একটা স্টেশন আছে নাম শুনেছেন? সেখান থেকে পিকনিক পার্টি উঠল। ছেলে-বুড়ো-মহিলা মিলিয়ে দলে কম করেও জনা তিবিশ লোক। ট্রেনে উঠেই হই হই হাসিঠাট্টা শুরু হযে গেল। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ডেকে ডেকে কথা-বলা চলতে লাগল। কথায় কথায় হেসে ওঠা, এব-ওব গাযে ঢলে পড়া। উঠতি বযসি ছেলেছোকবাও ছিল কজনা। পিকনিকেব হাঁড়ি-কড়া-ডেকচি যে কখানা ছিল, বাজিযে শুরু হযে গেল গান, সঙ্গে নাচ। প্রচুব শব্দেব সঙ্গে কোমব দোলানো, ঠোঁটে আঙুল দিযে সিটি, আনন্দ থই-থই করছিল ছোটো কামবাটাব মধ্যে।

কিন্তু ঠিক যেন জমছিল না। সারাদিনই তো এইই হযেছে, ফেবাব পথে একটু বৈচিত্র্য না হলে চলবে কেন? খ্যাঁটনের পর জোযানের আবক।

একজন খেযাল করল, কম্পার্টমেন্ট-এব এক কোনায আধো অন্ধকাবে ঘাপাটি মেবে বসে আছে চারজন মানুষ, যাদেব হাত-পা-চোখ-কান ইত্যাদি মানুষেব মতো হলেও তাবা আসলে মানুষ নয। তারা কথা বলে না।

ওদেব ভালো লাগল না।

কিন্তু কেন? আনন্দে অংশ নিচ্ছে না ওরা, সেইজন্য বাগ? হতে পাবে। নির্লিপ্ত উপেক্ষা, তাই অপমান? অসম্ভব নয। অথবা নিছকই আমোদ। চেঁচামেচি-গান-নাচেব মতোই আব একটা বিক্রিযেশন!

কযেকজন সামনে এসে বসল। একজন বলল, আপনাবা, সেই কী যেন বলে, মূক ও বধিব, তাই না? আব একজন খিঁচিযে উঠল, আবে গাণ্ডু, ওইভাবে বললে ওবা বোঝে? লেছিস মূক ও বধির, বধির মানে কালা, মানে শুনতে পায না। ওদেব মতো করে ওদেব বাঝাতে হবে।

ততক্ষণে দেখাদেখি উঠে এসেছে আবও কযেকজন। বিশ্বাস কববেন না, তাদেব মধ্যে হিলা ও বযস্ক পুকষও বযেছেন। শুরু হযে গেছে টিভিব খবব পাঠ, অন্যবা হাত ও মুখেব বিচিত্র ভঙ্গিমায সেটাই বোঝানোব চেষ্টা কবে যেতে লাগল। পাঠে অশ্লীল ইঙ্গিত ঘনঘন সে যাচ্ছিল, সেগুলোও হাতেব মুদ্রায প্রকাশ কবছিল শিল্পীবা। দর্শকবৃন্দ তাই দেখে হাসি মিলাতে পাবছিল না।

আমোদ কতক্ষণ চলত বলা শক্ত। কোন দিকে মোড় নিত, কোথায গিযে থামত তাও

নিশ্চিত বলা সম্ভব নয। কাবণ, হপ্তাখানেক আগেই খড়দা স্টেশনে হকাবরা আমাদেব দুটি ছেলেকে বেদম ঠেঙিয়েছে। খববটা জানা ছিল। তাই জনাই বোড স্টেশন আসতেই কাবওকে কোনও সুযোগ না দিয়েই দ্রুত ওবা নেমে যায। অবশ্য ট্রেনেব কামরা থেকে যেসব শব্দ বর্ষিত হতে থাকে, শুনতে না পেলেও ওদেব বুঝতে কষ্ট হয না, তাব কোনওটাই সুসভ্য মানবপ্রজাতি একে অপবেব উদ্দেশ্যে প্রেম অথবা ভালোবাসায নিক্ষেপ করে না।

সেদিন যথেষ্ট শীত ছিল। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে একটা কদমগাছেব নীচে নিবিবিলিতে বসেছিল ওবা। স্বভাবতই সেখানে ঠান্ডা ছিল আবও জমাট, আবও তীক্ষ্ণ। পবেব ট্রেন ধবে লিলুযা স্টেশনে পৌঁছতে ওদেব যথেষ্ট বাতই হযে যায।

লিলুয়া স্টেশনে তখনো কিন্তু বেশ ভিড। হাওডা থেকে ট্রেনগুলো আসছে যাত্রীবোঝাই হযে, লিলুযাতেও অপেক্ষমান অসংখ্য যাত্রী। একটা কবে ট্রেন ঢুকছে, আব যাত্রীব দল ঝাঁপিযে পড়ছে। বেশিবভাগই ঠেলেঠুলে জাযগা কবে নিচ্ছে, কোনও-না-কোনও কামবায সেঁধিযে যাচ্ছে। যারা পাবছে না, প্ল্যাটফর্মে ফিবে আসছে, অপেক্ষা কবছে পবেব ট্রেন-এব।

সেইবকম একজন, খুনখুনে বুড়ি, বগলে পোঁটলা-পুঁটলি, বাবে বারেই ট্রেনেব দবজায আছড়ে পড়ছে, আব ধাক্কা খেযে খেযে ফিবে আসছে, ওদের নজবে পড়ে গেল।

নিজেদের মধ্যে বোঝাপডা কবে নিতে ওদেব এক মুহূর্তও লাগল না। পবেব ট্রেন ঢুকতেই, বৃদ্ধা ততক্ষণে না-পেবে প্ল্যাটফর্মেব মেঝেতে বসেই পড়েছে, ওদেব একজন সামনে গিযে একখানা হাত বাড়িযে দিল। বৃদ্ধা চমকে উঠল। তাব পুরনো চোখে এক অচেনা দৃশ্য বহু যুগ পাব হযে সামনে এসে দাঁডাল। উঠে দাঁডাল বৃদ্ধা। তাবপব জনবাশিব ঢেউ-এব মাথায সাঁতাব কাটতে কাটতে চাবটি মানুষেব সবল বেষ্টনীব আডালে নিশ্চিন্তে অক্লেশে একসময ট্রেনেব কামরায জাযগা পেযে গেল বৃদ্ধা।

বিশ্বাস করুন, বৃদ্ধা একটা কথাও বলেনি। থ্যাংক্ ইযু বলেনি। ধন্যবাদ বলেনি, এমনকী বেঁচে থাকো বাবা, ভগবান তোমাব মঙ্গল করুন, তাও উচ্চাবণ কবেনি। বৃদ্ধা শুধু তাকিযেছিল। সেই চোখেব ভাষা, সেই না বলা শব্দপুঞ্জ বৃদ্ধাব সঙ্গে চলে গেল মগবা কিংব বলবামবাটি। ওবা থাকবে। শেষেব ক'দিন বৃদ্ধাব নিভন্ত চোখেব শেষ আলোব বিন্দুটিব মধ্যে ওই দৃষ্টি প্রোজ্জ্বল হযে থাকবে।

দৃষ্টি বোঝেন? চোখেব ভাষা?

ঠাকুব দেখতে বেবিযেছে কন্যা, মসমসে নতুন শাড়িতে ঘামে জবজবে অবস্থা, নতুন জুতোয গোড়ালিতে ফোস্কা, ঠাকুবেব সামনে জডো কবে কপালে ঠেকাতে গিযেই হাত থেকে গেল। ধুনুচি হাতে নাচছে যে ছেলেটা, ঝাঁকড়া চুল, টাইট জিনস্, ও কি এ পাডাব? আগে তো দেখিনি? নাচতে নাচতে যুবকেব চোখ গিযে পডল কন্যাব চোখে।

চলেছেন দূব-দেশে। দবজায হেলান দিযে দাঁডিযে মা। যেতে গিযে ঘুবে দাঁড়ালেন মাব ঠোঁট কেঁপে উঠল। শুনতে না পেলেও আপনি জানেন, মা বলছেন দুর্গা দুর্গা, বলছেন সাবধানে থাকিস বাবা, পৌঁছে চিঠি দিস।

এই চোখেব ভাষা আমবা শুনতে পাই। পাই, কাবণ আমাদেব জগতে কথা নেই, শ

নেই, উচ্চাবণ নেই। শব্দের মোড়ক ছাড়িয়ে ভাষার যে অবয়ব, ভেতরেব যে আত্মা, তাকেই ছুঁতে চাই আমরা। কথায় মন পাতলে এই দেখার ক্ষমতা হারিযে যায়।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

বেশ, ভাষাকে বাদ দিয়ে দিন। দেখাতেই আসুন।

আপনার বাড়ির উঠোনেব কাঁঠাল গাছটার পাতার বং চৈত্র মাসে কেমন বদলে যায় লক্ষ করেছেন? দেখেছেন আষাঢ মাসে প্রথম বৃষ্টির স্পর্শে তাব জেগে ওঠা? পাঁচিলের ওপর লাফিযে যাচ্ছে শালিক পাখি, পডন্ত রোদ তার ডানায কী বিচিত্র বর্ণসম্ভাব সৃষ্টি কবেছে খেয়াল কবেছেন? কালবৈশাখীর মেঘ আর শ্রাবণেব গর্ভিণী আকাশ যে এক নয়, জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবেন?

পারবেন না, কারণ শব্দে আপনার মনোযোগ এত গভীর যে দৃশ্য থেকে দৃষ্টি সংববণ করে নিয়েছেন আপনি।

স্পর্শ থেকেও।

একটু আগে যে বৃদ্ধাব কথা বলছিলাম, লিলুযা স্টেশনেব বৃদ্ধা, সে কিন্তু প্রথম যা অবলম্বন কবে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তা কোনও ভরসার বাণী নয, একটি স্পর্শ। সেই স্পর্শ বৃদ্ধাকে পৌঁছে দিযেছিল প্ল্যাটফর্মেব উত্তাল জনসমুদ্র থেকে ট্রেন-কামবাব এক নিশ্চিত বালিয়াড়িতে। ট্রেনে উঠেই কিন্তু হাত ছেডে দেযনি বৃদ্ধা। ট্রেন নড়ে উঠেছিল, তথাপি বৃদ্ধা, ছুঁয়ে ছিল সেই হাত, যা তাকে দিয়েছে বিশ্বাস-আশ্বাস-আশ্রয। পবিবর্তে বৃদ্ধাও, সেই স্পর্শেব মধ্য দিয়েই ফেরত পাঠিয়েছিল কৃতজ্ঞতা-স্নেহ-শুভকামনা।

বাবাব হাত ধরে বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িযে থাকা শিশুটিকে দেখুন। স্কুলবাস এলেই হাত ছাড়িযে ছুটে যাবে শিশু, বাসের পাদানিতে দাঁডিযে একটিবার ঘুবে দাঁড়িযে হাত নাড়বে, তারপর মিশে যাবে ভিড়ে। কিন্তু তার আগে? ওই যে হাত ধরে থাকা, সাবা দিনেব সমস্ত সাহস সব ভরসা কি ও আহরণ করে নিচ্ছে না স্পর্শেব মধ্য দিয়ে? এগিয়ে যান, ওই কোমল হাত স্পর্শ করুন, দেখবেন, হাতও কথা বলে।

স্পর্শ কি শুধুই মানুষের?

দরজা খুলে ঘরেব ভেতবে পা বাখবার সঙ্গে সঙ্গে পোষা বেড়ালটা আপনার কোলে ঝাঁপিয়ে আসে, তার তুলতুলে গলায আপনি হাত বুলিয়ে দেন, তার বাণী আপনি অনুভব কবেছেন? ওর চোখের দিকে তাকান, সেখানেই সমস্ত লেখা আছে।

ফোটা ফুলেব পাপডিতে আঙুল ছুঁইযে দেখুন, শিশুব নিদ্রিত চোখে ঠোঁট রাখুন, ধানের শিষ স্পর্শ করুন। ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত এরা সঞ্চয কবে রেখেছে আপনাবই জন্য। পাচ্ছেন না তো? পাবেন কী করে? স্পর্শ থেকে আপনি চৈতন্যকে বিযুক্ত করে নেন, মন-প্রাণ-অনুভূতি উন্মুখ হযে থাকে কেবলই ধ্বনিব জন্য!

গন্ধই কি কম?

ধরুন ধূপের গন্ধ। চোখ বন্ধ করুন। দৃশ্য থেকে শব্দ থেকে স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শুধুই গন্ধের মধ্যে ডুব দিন। ধূপ! কিন্তু একা ধূপই কী? ধূপের সঙ্গে মিশে আছে

আবও অনেক গন্ধ! চন্দন-ধুনো-ফুল-প্রদীপেব ঘিযেব গন্ধ? তাহলে এ পুজোব ধূপ। কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খেব হুঙ্কাবে এই গন্ধের যুগলবন্দি চাপা পড়ে যায়, তাই খেযাল কবেন নি। এবারে অন্য এক ধূপ। এখানে ধূপের সঙ্গে মিশেছে বাসী রজনীগন্ধাব বিষণ্ণ বাতাস, মিশেছে পোড়াকাঠের তীব্র হাহাকাব! ঠিক ধবেছেন। এ ধূপ শবযাত্রার অনুষঙ্গ।

গন্ধ দিযে মানুষ চিনেছেন কখনো? নারীর গন্ধ শিশুর গন্ধ, সরল ও জটিল মানুষের গন্ধ, সৎ ও লোভীর গন্ধ, ভিরু ও কামুকের গন্ধ আলাদা। অথচ গন্ধ নয়, কথাব জন্যই কান পেতে বাখেন আপনি। কামুক তার কামনাব কথা বলবে, লোভী বলবে লোভের কথা, প্রেমিক ভালোবাসা উচ্চাবণ করবে, ধার্মিক স্মবণ করবে ঈশ্বরকে। কথা দিয়েই মানুষ চিনতে হবে আপনাকে, তাই আঘ্রাণেব ক্ষমতাকে নির্বাসনে পাঠিযে বযে গেলেন খর্ব ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এক প্রাণী।

স্বাদ দিয়ে?

কী বললেন? স্বাদ দিযে মানুষ চেনা? আমি কি শ্বাপদ?

ভুল। শ্বাপদ আর দ্বিপদেব অন্যান্য অনেক পার্থক্যেব মধ্যে একটা হল, রসনাকে শিক্ষিত হবাব সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে আপনাব মতো দ্বিপদ। আচ্ছা, আপনিই বলুন, সন্তানেব কপালে চুম্বনেব স্বাদ কি প্রিযাব অধবের থেকে ভিন্ন নয়? অথবা চোখেব জলেব স্বাদ? তীব্র আনন্দ ও গভীব বেদনায নির্গত অশ্রুর স্বাদ কি এক ও অভিন্ন?

আমি জানি, এই প্রতিটি প্রশ্নেবই উত্তব আপনার অজানা। বসনায মনোনিবেশ কবাব কথা আপনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ভাববেন কেমন কবে? কাবণ স্বপ্নেও যে 'কথা'-ই ভাবেন আপনি!

কথা মানে শব্দ মানে ধ্বনি। এত কথা বলেন আপনি, এত কথা শোনেন! অথচ আপনি জানেনই না যে ধ্বনিকে আত্মস্থ কবতে গেলেও নিজেকে প্রস্তুত কবতে হয। আর তাব জন্য নিজেব দু-খানা শ্রবণেন্দ্রিয়ই যথেষ্ট নয়।

বিশ্বাস হল না?

বেশ।

গোপনে ফুল পাপড়ি মেলে, গর্ভকেশরে মুখ রাখে মধুকর, পরাগমিলন ঘটে গর্ভকোষে। শুনতে পান?

প্রভাতেব সঙ্গে রাত্রির যে মিলন, ঊষা ও গোধূলির চিরন্তন, তাব আশ্লেষ ও শীৎকাব আলোয আলোয ছড়িয়ে যায, চরাচব শান্ত হযে প্রতীক্ষা কবে মুহূর্তটিব জন্য, অবিরল, শুনতে পান?

বৃষ্টিশেষে গাছেব পাতায় দুষ্টু হাওযাব খুনসুটি, খিলখিল হেসে ওঠা, শুনতে পান?

একাকী নক্ষত্রেব শিশিরপাত, তার বিবহ-বেদনার একান্ত বাগিণী, শুনতে পান?

আমবা পাই।

আপনাদেব বাক্যময় ধ্বনিময কোলাহলমুখব জগতের যাবতীয় উচ্চারণ থেকে বিযুক্ত থাকি বলেই শ্রুতিব অতীত শব্দ তাব সমস্ত নিজস্বতা নিয়ে আমাদেব ঘুমিয়ে থাকা ইন্দ্রিযে হানা দেয়, ডাকে, তার সম্পদেব শেষ বিন্দুটুকু উজাড় করে আমাদের সমৃদ্ধ কবে।

আমবা সম্পূর্ণ হই।

৩

আমি কি কখনো সোহিনীকে বলেছিলাম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'? সোহিনী কি কখনো আমার উদ্দেশে তার ভালোলাগা অথবা ভালোবাসা ব্যক্ত করেছিল? প্রশ্ন করবেন, যার মুখে কথা-ই নেই সে আবার কেমন করে 'ভালোবাসি' 'ভালোবাসি' বলে পাড়া মাথায় করবে? না, মুখে না বললেও যে ভাষায় আমরা ভাব-বিনিময় করে থাকি, সেই ভাষাতেই তো আমরা একে অপরকে ভালো-লাগা জানাতে পারতাম। অথচ এর কোনওটারই আমাদের প্রয়োজন পড়েনি। ভিড়ের মধ্যে প্রথম যে-দিন সোহিনীকে দেখি, খুঁজতে খুঁজতে সোহিনী যেন আমাকেই পেয়ে তার দৃষ্টি আমার চোখে বিছিয়ে দিয়েছিল। আমিও অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করেছিলাম তার চোখ।

তারপর থেকেই আমার মধ্যে আশ্চর্য সব পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। বিশদে যাব না, শুধু এটুকু বললেই হবে, একদিন খুব বৃষ্টির পর আকাশজুড়ে রামধনু উঠলে দেখতে দেখতে চোখে জল এসে গেল, মনে হল এমন সুন্দর দৃশ্য সোহিনীকে যে দেখানো হল না। তেমনি, মিত্তিরদের গ্যারেজ-এর সামনে যেদিন ভরাপাগলা গাড়ি-চাপা পড়ল। আমার বুক হিম হয়ে গেল ভেবে যে একটু পরেই সোহিনী ফিরবে, ওর যদি চোখে পড়ে যায় এই ভয়ংকর দৃশ্য!

আমি জানি, সোহিনীরও একইরকম হত। পৃথিবীর যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হত, সমস্ত ঝড়ঝাপটা-দুর্যোগ থেকে আমাকে আড়াল করে রাখতে মন চাইত ওর।

আমরা একে অপরকে এই কথাগুলো কখনো বলিনি। অথচ দুজনে দুজনের চোখের ভেতরে তাকালেই স্বরলিপির মতো সমস্ত পড়তে পারতাম।

যেদিন দুজনে দুজনকে স্পর্শ করলাম। আমার প্রতিটি আঙুল ওর সমস্ত অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল, আমি জানি।

আমরা মিলিত হলাম। সমুদ্রের সঙ্গে আকাশের মিলনের মতোই শান্ত ও মহান সেই সঙ্গম। যথাসময়ে সোহিনী বুঝতে পারল, তার প্রাণের গভীরে জন্ম নিয়েছে আর একটি প্রাণ, দুজনের ভালোবাসার রস আহরণ করে বিকশিত হচ্ছে সেই বীজ।

সে কী আনন্দ!

দৃষ্টি দিয়ে সোহিনীর দেহের পরিবর্তন আমি অবলোকন করলাম। স্পর্শ দিয়ে সেই অনাগত প্রাণের স্পন্দন আমি অনুভব করলাম। সোহিনীর নাভিতে এখন কস্তুরী-মৃগের ঘ্রাণ। সোহিনীর অবয়বে এক আশ্চর্য পূর্ণতার জ্যোতি।

অথচ আমরা দুজনে কাছাকাছি হলেই একে অপরের দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিলাম। যেন কেউই কারও কাছে ধরা দিতে চাইছিলাম না। আমরা দুজনেই একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম। না পেয়ে কেউই নিজেকে মেলে দিতে পারছিলাম না।

কী খুঁজছিলাম আমরা?

আমরা জানতে চাইছিলাম, যে আসছে সে কেমন। আমরা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, আমাদের সন্তান কী? আমাদের মন-প্রাণ-অনুভূতি একাগ্র করে আমরা প্রশ্ন করছিলাম, তুমিও

কি আমাদেব দলেব? তুমিও কি আমাদেরই মতো শব্দহীন অথচ বাঙ্ময, তোমার পৃথিবীও কি আমাদেরই মতো স্তব্ধতায় রমণীয়?

নাকি তোমার পৃথিবীতে প্রেম-ভালোবাসা, বিচ্ছেদ-বেদনা, বিরহ-আর্তি সবই আসবে শব্দেব কাঁধে ভর দিয়ে? আমাদেব এই প্রশান্ত পৃথিবীতে কলহের প্রদাহ নিয়ে আবির্ভূত হবে না তো তুমি?

অবশেষে ভূমিষ্ঠ হল আমাদেব সন্তান। পুত্রসন্তান চেয়েছিল সোহিনী, আমার পছন্দ ছিল কন্যাসন্তান। সোহিনীই জিতেছিল বলে তার কী অহংকাবেব হাসি। বারবার আমাদের সঙ্কেত-ভাষায সে বোঝাতে চাইছিল, 'দেখলে তো, আমার ইচ্ছেই ফলে গেল।' আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম হাসির আড়ালে সোহিনী কিছু লুকোতে চাইছে। সোহিনী কি বুঝতে পেবেছিল?

জন্মমুহূর্তে শিশু কাঁদে। মাতৃগর্ভের নিবিবিলি সুখেব আশ্রয ছেড়ে নিষ্ঠুব পৃথিবীতে পা দিযেই শিশু অনুভব করে, নিজেব দাবি যথাযোগ্য স্থানে ঠিকসময পৌঁছে না দিলে তাকে বঞ্চিতই থাকতে হবে। দাবি আদায়েব একমাত্র উপায স্বর, সেই স্বর নাদসপ্তকে পৌঁছে দিযে সে চাহিদা-পূবণেব চেষ্টা কবে।

মূক ও বধিব শিশু কি কাঁদে না? কাঁদে। একটি স্বাভাবিক শিশুব কান্নায যেভাবে ভাষা ক্রমশ স্বরকে সরিযে জাযগা করে নেয, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কান্না যেভাবে হাহাকাব থেকে ক্রুদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠায উত্তীর্ণ হয, মূক ও বধিরের কান্না তা পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যুব দিকে বয়ে যাওযা জীবনপ্রবাহে তার কান্না শীতেব বাতাসেব মতো একইরকম মর্মান্তিক।

খুশি হয়েছেন? হবেনই তো! ভাষাসর্বস্ব একটি শিশুকে স্বাভাবিক বলতেই আপনাব মুখ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কী কবব? আপনাকে বোঝানোব জন্য আপনার ভাষাই তো ব্যবহার কবতে হবে।

তাহলে? কীভাবে বুঝব, আমাদের সন্তান কেমন? তাব ইন্দ্রিয়ে শব্দেব অবস্থান কোথায? তাব চৈতন্যে ভাষার গুরুত্ব কতখানি?

বুঝতে আমবা পারছিলাম, কিন্তু মেনে নিতে মন চাইছিল না। সোহিনীর হাতেব চুড়িতে ঠন কবে শব্দ হলে শিশু মাথা ঘুরিযে তাকায, জানলায় উড়ে বসা পাখির ডাকে চমকিত হয় শিশু, স্বাধীনতা দিবসে ড্রাম বাজিয়ে প্যারেড করে গেল ছেলেবা—হাত-পা ছুঁড়ে ব্যান্ডের তালে তালে শিশুর কী নেচে ওঠা!

সোহিনী ভাবছিল, আমি বুঝতে পাবিনি; আমিও চাইছিলাম সোহিনীব কাছ থেকে লুকোতে। আমার দুজনেই এই ঠকানোর খেলা চালিযে গেলাম প্রায একবছর।

আমরা একান্তভাবে চেষ্টা কবেছিলাম, আপনাদের সংশ্রব থেকে আমাদেব সন্তানকে আড়াল কবে বাখতে। আমবা চাইনি ভাষাব সঙ্গে ওব পরিচয় ঘটুক। আমবা ভুল কবছিলাম। পাঁচিল তুলে ভাষাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। শব্দ কোনও বাধা মানে না। কাব কাছ থেকে, কীভাবে শিখল বলতে পাবব না, কিন্তু একদিন বাতে সোহিনী যখন দুধ খাইযে শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে, শিশু বলে উঠল দা-দা, তাব ষষ্ঠ ইন্দ্রিযে সেই ভাষা শুনতে পেয়ে চমকে উঠে সোহিনী আমার দিকে তাকাল। আমি শুনতে পাইনি ভান কবে দেওযালের দিকে মুখ

ঘুবিযে শুয়ে রইলাম। কিন্তু আমরা দুজনেই বুঝতে পারলাম, আমাদের নির্বাক পৃথিবীতে ভাষার প্রবেশ ঘটে গিয়েছে। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি!

একদিকে আনন্দ! আমাদের সন্তান এক শব্দহীন প্রশান্ত শীতলতায জীবন অতিবাহিত করবে না, তার দৈনন্দিনতা রূপ-রস-গন্ধের মতো শব্দের ঝংকাবেও বেজে উঠবে; এক অন্য মানুষ হয়ে বেড়ে উঠবে সে।

অন্যদিকে যন্ত্রণা! শব্দহীনতা যে অপূর্ণতা নয, শব্দের অতীত যে ভাষা সেই ভাষাতেও যে কানায কানায ভর্তি আমাদেব বেঁচে থাকা, এই সত্য কি কখনোই পৌঁছে দিতে পাবব তার কাছে? আমরা সুখী হব তো? আমাদেব জীবনে কলহের কলবোল বয়ে নিয়ে আসবে না তো আমাদের শিশু-সন্তান?

অনেক ভেবেছি। চাঁদের আলোয শিশু-মুখেব সুষমা সন্দর্শন করে আকুল হযেছি, প্রভাতের প্রথম কিবণে সেই মুখেই শব্দময নিষ্ঠুরতা আবিষ্কার কবে বিষাদাচ্ছন্ন হয়েছি।

এইভাবে একটু একটু কবে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, নিজেদেব প্রস্তুত করেছি।

দেরি করিযে দিচ্ছ? মূল্যবান সময় নষ্ট কবছি? ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর একটুখানি।

যে অনাথাশ্রম থেকে আপনি আপনাব স্ত্রীর হাত ধরে বেবিয়ে এলেন, একটি শিশু-সন্তান দত্তক নেবার জন্য নিঃসন্তান আপনাবা বিগত ছ'মাস ধবে বাববাব যাওযা-আসা কবছেন, সেই প্রতিষ্ঠানেব বাইরে আমিও ঘুরে বেড়িযেছি বহুদিন। যাঁবা আসছেন তাঁদের প্রত্যেকের শরীরের ভাষা থেকে একটি প্রশ্নেবই উত্তব আমি খুঁজতে চেয়েছি, ভেতরেব মানুষটা কেমন! আরও পরিষ্কাব কবে বলতে গেলে, এঁবা কেমন জনক-জননী!

এইভাবেই আমি নির্বাচন কবেছি আপনাদের। আজ অবশ্য আপনি একাই এসেছেন। চিঠিতে আমাব যা কিছু বলাব ছিল, সমস্ত লিখে চাযেব দোকানের ছেলেটার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে আপনাকে দেখিয়ে দিলাম। ও চিঠিটা আপনাব হাতে দিযেছে, চিঠি খুলে পড়তেও শুরু করেছেন আপনি, ওই অবধি দেখেই আমি চলে এসেছি।

না এসে কী কবি বলুন? মোড় ঘুবতেই পার্ক, সেই পার্কের একটা বেঞ্চ-এ সবার অলক্ষে কাঁথায় মোড়া আমাদের সন্তানকে শুইযে দিযে এতক্ষণে বাড়ির পথ ধরেছে আমার সোহিনী। হাঁটতে হাঁটতে ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা, আঁচলে কান্না ধবছে না, যেতে গিয়েও ফিরে ফিরে দেখছে। ওব কাছে এখুনি না পৌঁছলেই নয়। ওর যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই!

আপনার চিঠি পডা হযে গিয়েছে। ছুটছেন আপনি। রাস্তা পার হলেন, সামনেই মোড়, ঘুবতেই পার্ক, পার্কেব নিবালা বেঞ্চ, বেঞ্চ-এ কাপড়-জড়ানো একটি প্রাণ। তুলে নিযেছেন, বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, আদব কবছেন। আমি জানতাম। কথাটা সোহিনীকে না-বলা অবধি আমার শান্তি নেই। ভালো থাকবেন। বিদায!

[এ' কাহিনিব সূত্র আন্তর্জাতিক সংবাদ-প্রতিষ্ঠান পবিবেশিত একটি খবব যেখানে বলা হয়েছে, মূক ও বধিববা চাইছে না তাদেব পৃথিবীতে মূক ও বধিব নয এমন মানুষেব অনুপ্রবেশ ঘটুক।]

সমুদ্রের মানুষ

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

ওই যে ঢেউ দেখছেন, আছড়ে পড়ছে সারাক্ষণ, সারা দিন, সাবা রাত, ওই ঢেউয়ের ওপাবে আছেন কাদল দেবী। আমাদের সমুদ্রের দেবতা। আপনাদেরও নিশ্চয়ই এমন দেবতা আছেন। সমুদ্র তো আপনাদের রাজ্যেরই নামে। কেন হল তা অবশ্য আমি জানি না। আমি মূর্খ মানুষ, লেখাপডা শিখিনি। আমাদেব গ্রামে লেখাপড়া শেখাব ব্যবস্থা নেই। আমাদের পবিবারেও সে-সবের চল নেই কোনো। আমরা মাছ ধরি সমুদ্রে, বাজারে সেই মাছ বিক্রি করি। ওতেই সংসাব চলে। আমাব দুই ছেলে, পাঁচ মেযে। আমাব স্ত্রীর নাম কৌশল্যা। চল্লিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল আমাদের। আমি কুট্টিযান্ডি ভেলাযুধম। তামিলনাড়ুব কুড্ডালোর শহর থেকে আমাদেব গ্রাম মাত্র পাঁচ কিলোমিটার।

কাদল দেবীর দেখা পেয়েছি আমবা বহুবাব। গভীর সমুদ্রে, বাত যখন গভীর, চারদিক অন্ধকার, আকাশেব তাবার ভরসায ভেসে আছি। তখন দেখেছি কাদল দেবীকে। কতবাব ঝড়, জল থেকে বেঁচে ফিবেছি তাঁব কৃপায়। কাদল দেবীকে প্রণাম না কবে নৌকা ভাসানো পাপ। বাবার কাছে শুনেছিলাম। ছোটোবেলায। বাবা বারণ কবত নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যেতে। আমার কিন্তু ইচ্ছে করত ভীষণ। একদিন দুপুরে বাবা বাড়িতে ঘুমোচ্ছিল। আমি বেবিয়ে পডলাম। কাট্টামারানে চেপে সমুদ্রে ঘুরে এলাম। সমুদ্র তখন এক নেশা। দু-ঘণ্টা পর জল থেকেই দেখি বাবা জলের ধারে পায়চারি কবছে। ঢেউযের জন্য ভালো বুঝতে পাবছিলাম না। বাবাব জামাব রং তো মনে ছিল। পাড়ে আসতেই বাবা ভীষণ বকাবকি কবল। চড, কিলও খেয়েছিলাম। আব বারবাব জানতে চাইছিল, আমি কাদল দেবীর নাম নিযে কাট্টামারানে পা দিয়েছি কিনা। যা সত্যি তাই বললাম। কাদল দেবীব নাম তো আমি নিইনি। আমার তো একা একা সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে করছিল বলে সেটাই করেছি। তাই শুনে বাবা আরও মাবল। শেষে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল। আমাকেও কবতে বলেছিল। মন্ত্রটা সেদিনই শিখেছিলাম।

সেই থেকে চলছে। আমরা সমুদ্রের ভরসায বেঁচে থাকি। সমুদ্র-ই আমাদের বাঁচায। আমাদের সংসার চলে সমুদ্রেব দযায়। সমুদ্র থেকে দূবে গিয়ে আমবা বাঁচতেই পাবব না। তবে চৌষট্টি বছর বয়সে জানলাম, কাদল দেবীরও রাগ আছে। কী ভয়ংকব রাগ, সে-কথা তো জানতেই পাবিনি ডিসেম্বরের ওই সকালের আগে। সমুদ্রের পাড়েই আছি সারাজীবন। ঝড় দেখেছি, জল দেখেছি। কিন্তু ওইরকম বিশাল বিশাল ঢেউ তো কোনোদিন দেখিনি। কয়েকটা মাত্র ঢেউ এল। আর আমাদেব সব কিছু ভাসিযে নিযে চলে গেল। ভাবতে পারেন, মাত্র দশ মিনিটে আমাদেব সারা জীবনেব সব সম্পদ আব সঞ্চয শেষ। আমাদের বাড়ির দেওযালটাও ফাটিয়ে দিয়েছে। ঘবের ভেতব থেকে টিভি, খাট, আলমারি, পাখা সব

টিনের চালসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে চলে গেছে ঢেউ। সবই এখন সমুদ্রের জলে। কাদল দেবীর ওপর আর ভরসা করতে পারছি না। না পারলে সমুদ্রেও যেতে পারছি না। দিনমজুবেব কাজ করছি। সমুদ্র সারাজীবন ধবে যা দিল, এক সকালেই তাব সবটা কেড়ে নিল। তাব চেয়ে তো কোনোদিনই কিছু না দিতে পারত। দেবতার গ্রাস এমন বিশাল হয় জানতাম না। কাদল দেবী কি আর সমুদ্রেব দেবতা আছেন? আমার তা মনে হয না। দেশের যদি রাজা বদলাতে পারে, প্রধানমন্ত্রী বদলাতে পাবে, সমুদ্রেবও তবে দেবতা বদলাতে পাবে। অসম্ভব কিছু নয়। নতুন দেবতার নাম না জানা পর্যন্ত জলে যেতে সাহস হচ্ছে না আমাদের। জলে যাচ্ছিই না আমরা। ত্রাণের টাকায আব বেশনে সংসাব চলছিল। এখন দিনমজুরি করে কষ্টেসৃষ্টে চালাচ্ছি। কতদিন এভাবে চলবে, জানি না। তবে সমুদ্রকে ছেড়ে থাকতেও যন্ত্রণা হচ্ছে। পঞ্চাশ বছব ধরে সমুদ্রেব সঙ্গে সম্পর্ক। তা কি শেষ কবে দেওযা যায?

তামিলনাড়ুর একেবারে প্রান্তে আমাদেব গ্রাম। দেবনামপট্টিনাম। ডিসেম্ববেব এক সকালের ঢেউযে গ্রামের অর্ধেকটাই ধুযে মুছে ভেঙেচুবে সাফ। চোখেব সামনে মবে গেল কতদিনের কত চেনা প্রতিবেশীরা। একশোর ওপর মানুষ মবল শুধু আমাদের গ্রামেই। কত লাখ টাকার সম্পত্তি ভেসে গেল সমুদ্রেব জলে। কী কবছিলেন কাদল দেবী? তাঁর নিজেবই দান আমাদের ওইসব কিছু। নিজেরই দেওয়া সম্পদ কোনো মানুষ এভাবে কেড়ে নিতে পাবে না। দেবতা হযে কাদল দেবী সেই কাজ কী করে পারলেন? নাকি, দেবতাদেব নিষ্ঠুরতা মানুষকেও ছাড়িযে যায? কাদল দেবীব মন এতটা বদলাল কেন? কী দোষ কবেছি আমবা? এতগুলো বছর ধরে যিনি আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছেন, ধনসম্পদ, ঘরবাড়ি দিযেছেন, তিনি এভাবে সব কেডে নিতে পারেন না আচমকা। তাই মনে হচ্ছে, সমুদ্রের এখন অন্য দেবতা। আমাদের বুঝিযে দিলেন, তাকে না মানলে, পুজো না কবলে কী হতে পাবে আমাদেব। সেই নতুন দেবতার নাম আমরা জানব কীভাবে? চেহারাটাও বা বুঝব কী কবে? এ কাজটুকু তো কাদল দেবীই কবে দিতে পারতেন? এখনও পারেন। আমরা কাদল দেবীর কাছে এখন সেটাই প্রার্থনা করছি।

জীবনে কত কিছুই তো দেখলাম। কত ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্র কত হাজাব বাব ফুঁসে উঠল, ঢেউ হল উথালপাথাল, কিন্তু এমনটা তো হয়নি কখনও। গভীব সমুদ্রে মাছ ধরতে গিযে তিন-চারদিন জলে কাটিয়েছি কতবাব। ফিবে এসে বউ, ছেলে, মেযে, ঘরবাডি সব ঠিকঠাকই পেযেছি। সমুদ্রের গভীবে অন্তত বাব তিনেক দেখেছি কাদল দেবীকে। মৎস্যকন্যাব মতো সাঁতাব কেটে চলে যেতে। তাকিযেছেন আমাদেব দিকে। কী ভরসা যে পেযেছি সেই চাহনিতে। কোনো দুশ্চিন্তা টিকতে পাবেনি মনের মধ্যে। এই যে বসে আছেন কাবনান মামু, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, উনিও দেখেছেন কতবাব। আমাদেব যাট-পঁযষট্টি বছবেব জীবনের একমাত্র আবাধ্য ছিলেন কাদল দেবী। এই গ্রামের যা কিছু সব ওনাব দেওযা। সমুদ্র আমাদের থেকে মুখ ফেরালে আমরা তো বাঁচতেই পারতাম না। গত সাত-আট মাস ধবে আমবা কি আর বেঁচে আছি? সমুদ্রে যাওয়াব সাহস নেই। জীবনে সমুদ্র নেই, জীবনেও তার মানে নেই। সমুদ্রই যে জীবন আমাদের। সেই সমুদ্রে যেতে না পাবলে কেমন থাকে সমুদ্রের মানুষ?

তার জীবনে আর কী থাকে? জীবনও কি থাকে আব কোথাও?

যিনি এত বছর ধবে সমস্ত সংকটে আমাদের পাশে ছিলেন, আমাদের বাঁচালেন সব বিপদ আপদ থেকে, গত আট মাসে তাঁব কি আমাদের দুর্দশাটা একবাবেব জন্যও চোখে পড়ল না? দেখার চোখ আর মন কি তিনি হারিয়ে ফেললেন? অথবা, নষ্ট হযে গেল তাঁর সব সংবেদন, অনুভূতি, উপলব্ধি? আমবা তাহলে কার কাছে যাব এবার? কার দিকে চেয়ে থাকব?

সেই প্রথমবাব সাহস করে কাট্টামারান নিয়ে জলে ভাসার পব একদিন বাবা নিজেই আমাকে ডাকলেন, 'চল, সমুদ্রে মাছ ধরতে।' বাবা, দাদা আব আমি জলে ভাসলাম। তাবপব থেকে বোজ। ভোববেলা বেবিয়ে পডতাম। ফিবতাম সূর্য মাথার ওপব থাকতে থাকতে। বাজারে না হলে মাছগুলোই তো বিক্রি হবে না। তখন সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা বোজগার হত। পঞ্চাশ বছর আগে পঞ্চাশ টাকাব কেমন দাম ছিল, বুঝতেই পাবছেন। কাছাকাছি মাছ না পেলে চলে যেতাম দূব সমুদ্রে। তিনদিন, চারদিন পবেও ফিরেছি কতবার। বিপদে পড়লে একটা ছডা বলতাম। তোমার ভালোবাসার চুম্বনে আমরা থাকি বেঁচে, তোমাবই করুণায় আমবা ঘরে ফিবি ঢেউ থেকে। বাবার কাছে শেখা। আমার ছেলেকেও শিখিয়েছি।

আগে তো কাট্টামারানই ছিল ভরসা। নিজেদেরই বানানো সেই নৌকা নিয়েই জলে ভাসতাম। আমার ছোটো মেযেটা যখন জন্মাল, তারপর থেকে ফাইবাবের বোটে চাপা শুরু হল। ডিজেলে চলে, ঝামেলা নেই। মেযের বয়স এখন চব্বিশ। ফাইবার বোটে অনেক কম সময়ে অনেকটা দূব জলে যাওযা যায়। মাছ ধবা অনেক সহজ হযে গেল। মাছও পেতাম অনেক অনেক। সপ্তাহে আট হাজার টাকাও বোজগার করেছি এক সময। সমুদ্র তখন আমাদের দু-হাত ভবে দিযেছে। তারপরই এল বড় বড় ট্রলার। সেই ট্রলারেব ক্ষমতার সঙ্গে আমবা পাবব কেন? মাছেব কারবাব তখন ফুলে ফেঁপে লাল। আব আমাদের মতো মাছ ধবার লোকজনেব পেটে প্রথম টান। ট্রলাব এত মাছ ধবতে সুরু করল যে বাজারে মাছের দাম ভীষণ কমে গেল। আমরা পিছিয়ে পড়লাম। কোনোরকমে সংসার চলতে লাগল।

তখন সরকাব থেকেই আমাদেব কম দামে ডিজেল দেওযা শুরু হল। তাতেও খরচায কুলোয না। সবাই বলল, ভেলাযুধম, ব্যাংক থেকে টাকা ধাব নাও। নাহলে সামলাতে পারবে না। আমি রাজি হইনি। ধাব করা আমার পছন্দ নয়। ধাবেব টাকায আমি বাঁচাব বা স্বপ্ন দেখার সাহস পাই না কিছুতেই। কখনও। বছব পাঁচেক আগে পবিস্থিতি আরও খারাপ হলে আমি ফাইবাবেব বোটটা বিক্রি কবে দিতে বাধ্য হলাম। বড ট্রলাবে কাজ শুরু করলাম। তাও আবাব দৈনিক মজুবিতে। সমুদ্রের কঠোরতা টেব পাচ্ছিলাম। কিন্তু পুবোটা সমুদ্রকে দোষ দিতে পাবছিলাম না। জলে ভাসলেই প্রচুব মাছ, কিন্তু তা পাচ্ছে অন্য লোকেবা। আমাদের কোনো মাছ নেই, আমাদেব বড ট্রলাব নেই। আমাদেব চোখে জল আছে। আমাদেব ঘরে কান্না আছে। আমাদের জীবনে যন্ত্রণা আছে। তবু, আমাদেব কাদল দেবী আছে।

মাছ ধরাব দিনমজুব হয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত। দিনে পেতাম ৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। যেদিন যেমন মাছ ধবতে পারতাম, তেমন মজুরি। তবু তো চলছিল। ছেলেদেরও হতে হল দিনমজুর। বাপ-ছেলে মিলে তিন দিনমজুরে মাছ ধরা। চলছিল খারাপ না। জীবন-

থেমে তো যাযনি। আমাদেব গ্রামের মাছ ধরার সবকটা স্বাধীন লোক কেমন করে পরাধীন হযে গেলাম। পরাধীন হলেও তো জীবন। মাছ ধরা, বাড়ি ফেবা, টিভি দেখা, সবাই মিলে সময় কাটানো, এই নিয়েই চলে যাচ্ছিল।

তারপবই এল ডিসেম্বর। এল বড়দিনের হৈ চৈ। রাতে জ্যোৎস্নায ভেসে গেল যেন চারপাশ। আহা, কতদিন চাঁদের আলোয সমুদ্রের এমন আশ্চর্য সুন্দর চেহারা দেখিনি। অথচ জলেই তো থেকেছি বছবের পর বছর। আসলে মনটাই তৈরি হয়নি আমাদের। সেদিন কী ভেবে তাকালাম রাতের সমুদ্রের দিকে। কেন যে মনে হল, এমন চমৎকার দৃশ্যটাই এতদিন দেখিনি মন দিয়ে। শুধু নিজেরা আর একটু ভালো কবে বেঁচে থাকার জন্য সমুদ্রের কাছ থেকে নিয়েছি বছবের পর বছর। কত আরও নেওযা যায়, পাওয়া যায় সে-কথা ভেবেছি। নিজেকে কেমন হীন, স্বার্থপব মনে হতে লাগল। কাদল দেবীকেও যে নিজেদেব জীবনের আর অস্তিত্বের স্বার্থেই বন্দনা করেছি, প্রণাম করেছি, শরণ নিযেছি তাও বুঝতে পারলাম। পঞ্চাশ বছর সমুদ্রেব সঙ্গে ঘব করাব পব এই নতুন ভাবনা মাথায এল। নিজেকে কেমন অন্যরকম মনে হতে লাগল, ভাবনাটা আসার পব থেকে। ভাবলাম, এসব বোধহয় বার্ধক্যের চিহ্ন। অথবা, মানুষ কোনো-না-কোনো সময়ে ঠিকই বুঝতে পাবে নিজের দেখাব বা শেখাব ভুল। স্বীকাব করুক বা না করুক, ঠিক বুঝতে পারে।

আমিই কি এসব স্বীকারোক্তির সুযোগ পেতাম জীবনে, যদি না পরের সকালে ঢেউ এসে আমাদের নিঃস্ব কবে দিয়ে চলে যেত? সকালে জলখাবাব তৈরি হচ্ছিল বাড়িতে। আমি গিয়েছিলাম বাজারে। ফিরে আসার পরই ওই কাণ্ড। চোখের সামনে ভেসে গেল গোটা সংসাবটা। এত বছর ধবে জীবনেব যা কিছু উপার্জন সবই তো ওই জল থেকে। জলেই ফিবে গেল সব। ভেসে গেল। আমাদের তিনটে সাইকেল ছিল। একটাও নেই। গাছেব উঁচু ডালে আটকে ছিল আমার বউযেব শাড়ি। আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। কাদল দেবীকে প্রণাম। প্রাণে বাঁচিযেছেন আমাদের। অনেকে তো প্রাণেই বাঁচল না। এখন নিঃস্ব হযে বেঁচে আছি। জীবনের ওঠাপড়া, ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা কবছি। এমনও যে চিন্তা আসতে পারে মানুষের মনে, আগে কোনোদিন টের পাইনি। নিঃস্ব না হলে কি মানুষ জীবনের ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা করাব সুযোগ পায় না? ভালো, আরও ভালো জীবনের নেশায বেঁচে থাকে ঘোরেব ভেতর। আমিও হয়তো তেমনই ছিলাম। সেই আচ্ছন্নতা আমাব কেটে গেছে। ঢেউ এসে আমার ঘোব ভেঙে দিযেছে। আগেব জীবন গেছে, এ এক নতুন জীবন। নতুন চিন্তা না এলে বোধহয় জীবন নতুন হয না কিছুতেই।

জীবনে প্রথম লাইনে দাঁড়ালাম ঢেউযের দুদিন পব। খাবার দেবে, টাকা দেবে, জামাকাপড় দেবে বলে সকলের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িযে হাত পাতলাম। আমার খুব দেমাক ছিল, জীবনে ধার করি না বলে। সত্যিই ধার কবিনি কখনো, একটা টাকাও না। লাইনে দাঁড়িযে, পাযে পাযে এগিয়ে বিলিফেব টাকা, খাবার, জামাকাপড় নেওয়ার সময পুরনো দেমাকেব কথা ভাবছিলাম। তবে পুবনো, ব্যবহাব কবা জামাকাপড়গুলো আমরা গায়ে দিইনি। আমাদের চেয়েও যাদেব খারাপ অবস্থা, বাড়িতে বযস্ক বা বাচ্চারা রযেছে তাদের দিযে দিযেছি। টাকা

দিয়েছিল চার হাজার। নিযেছিলাম। আর একটা তাঁবু দিযেছিল, নিইনি। আমাদেব বলেছিল, সমুদ্রের ধারে ভাঙা ঘরে যেতে হবে না। তাঁবু টাঙিযে দূরেব জমিতে যাও। যাইনি। নিজেদের বাড়ির ছাদে ফের টিন বসিয়েছি। বাড়িতেই থাকি। কোনো কাজ নেই। সবকাব মাসে এক হাজার টাকা করে দিত, আর বিনা পযসাব বেশন। ওই দিযে চলেছে যা হোক।

আমাদের বাড়িটা সমুদ্র থেকে দুশো মিটারেব মধ্যে। সবকার বলেছে, ওই বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরে যেতে। নিরাপদ এলাকায গেলে সবকার নিজের খরচায বাড়ি বানিয়ে দেবে। ভালো বাড়ি, পাকা। বর্ষার আগেই এসব দেওয়াব কথা বলেছিল। তবে তাব আগে সমুদ্রের ধারে আমাদের জমি, বাড়ি সরকারকে দলিল করে দিযে দিতে হবে। দেবনামপট্টি-নমেব প্রায় ১৭০০ পরিবার ছিল এমন। সাড়ে ছশো পবিবাব প্রস্তাবে রাজি হযেছে। আমবা রাজি হইনি। রাজি না হওয়ায সবকাব বিলিফ বন্ধ কবে দিয়েছে। আসলে সবকার চায এই বিচ এলাকা খালি করে নিতে। এমনিতে পাবছিল না। ঢেউ এসে সবকাবকে সুযোগ এনে দিযেছে। লোকে তো ভয় একটা পেযেছে, ক্ষতিও হযেছে অনেক, মানুষ মারা গেছে। ভেসে গেছে সমুদ্রে, চোখেব সামনে। তাই সরকাব টোপ দিযেছে। লোভ দেখাচ্ছে।

আমবা লোভেব ফাঁদে আব পা দিচ্ছি না। জমি, বাড়ি ছেড়ে যাব না কোথাও। এলাকা খালি হলে সরকার ওখানে হোটেলওযালাদেব ডাকবে। নতুন ঝকঝকে হোটেল হবে। গাড়িতে চেপে লোকজনবা আসবে, থাকবে, সমুদ্রেব পাড়ে বসে ঢেউ গুনবে, আর হোটেল মালিক গুনবে টাকা। আমাদেব শান্ত গ্রামটা আর শান্ত থাকবে না। গ্রামেব লোকগুলো চলে যাবে সমুদ্র থেকে দূবে আব বাইবেব লোক এসে পযসা খরচ কবে সমুদ্র দেখবে। এটা আমরা হতেই দেব না। কিছুতেই না।

সমুদ্রের ধারের গ্রামে যাবা বাস কবে তাদেব কাছে সমুদ্রই তো সব। আমবা তো সমুদ্রেরই লোকজন। সমুদ্র ছাড়া আমবা বাঁচতেই পারব না। মেবে যদি ফেলে তো সমুদ্রই মারুক। সমুদ্র থেকে দূবে গিযে আমরা বাঁচতেও পাবব না, মবতেও না। সমুদ্র আছে বলেই আমাদেব জীবন আছে। সমুদ্রেব দযাতেই আমরা আছি। সমুদ্র নির্দয হলে কারই বা কী কবার থাকবে? আমাদেব দেবতা একজনই, কাদল দেবী। এত বছবের জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, ঝগড়া-ভালোবাসাব জীবন ছেড়ে সমুদ্র থেকে দূবে আমবা যেতেই পারব না।

এই তো সেদিন, আবাব গিযেছিলাম ঢেউযের ওপাবে। মাছ ধবলাম সারাদিন। দেড়শো টাকা পেলাম। আবাব সমুদ্রের স্বাদ। আবাব ঢেউযেব দোলা। যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। জলকে আমি ভয পাই না। ঢেউকেও না। ভয শুধু একটাই, আমি জল থেকে ফিবে আবাব আমাব বউ, ছেলে-মেযেদেব যদি দেখতে না পাই? ওদেব নিযেই আমাব চিন্তা। আমার ওপর ওবা যে ভীষণ ভবসা করে। আমাব মুখেব দিকে চেযেই ওরা বাঁচে এখনও। ঠিক যেমন আমি বাঁচি সমুদ্রেব দিকে চেযে। এ জীবনে সমুদ্র ছাড়া আব কিছুই যে জেনে উঠতে পারলাম না। এখন আব নতুন কবে জানাব সুযোগ নেই। মনও নেই। যে কযেক বছব বাঁচব ওই সমুদ্রকেই জানব। ওই যে বললাম, নতুন কবে দেখতে শিখেছি জীবনকে। নতুন করে তাহলে সমুদ্রকেও দেখা যাক।

ওই যে ঢেউ, একটার পর একটা আসছে আর আসছে, ওর কি সত্যিই কোনো শেষ আছে? সারা জীবন ওই ঢেউ আসতেই দেখছি, থামতে দেখিনি তো কোনোদিন। এমন অশেষ আর কী আছে পৃথিবীতে? চাঁদ, সূর্য, আকাশ, বাতাস ছাড়া? এই ঢেউকে জানাবও তো তাহলে শেষ নেই। ডিসেম্ববের সকালে যে ঢেউ আমাদেব সবকিছু ভাসিযেছে, সেই ঢেউ বাববাব আসতে পাবে না। এলে আসবে। সর্বনাশ তো হয়েই গেছে। সব ভেসে গেলে তাকেই তো সর্বনাশ বলে। এবাব ঢেউ এলে আব ভেসে যাওয়ার মতো কিছু নেই বাড়িতে। যাওয়াব মতো আছে শুধু এই শবীব, কযেকটা। প্রাণ। সাবাক্ষণ তো সমুদ্রেই কাটাই আমরা, নোনা জলে। চোখের জলের আব আলাদা স্বাদ নেই আমাদের জীবনে। চোখেব জলেব স্বাদ পায না যে মানুষ, তার কি সত্যিই কোনো নিজের কথা থাকতে পারে? অন্যকে বলার মতো কথা?

ভিখারিনী বেশে

অজয় চট্টোপাধ্যায়

থলেটা বাড়িয়ে দেয। হাতের বালা এবং মুখের পেশী খেলায। মাযামায সুকুমার মুখশ্রীতে রুদ্র স্বব ঝবায।—আর দেরি করলে উনুনে হাঁড়ি চডলেও শুধু জল ফুটবে।

মুখ ঝামটাব উৎস স্ত্রীমুখ বিরক্তিতে কঠিন। প্রসন্ন ভোরেব টিলেঢালা ম্যাক্সিতে ছটফট কবছে। পোশাকটা ব্রতীনকে মনে করিয়ে দেয অনসূয়া ২৪ ঘণ্টায় ৪ প্রকার পোশাক পরে। সকালে ম্যাক্সি। চান কবে হাউসকোট। বিকেল গডিয়ে গেলে স্নিগ্ধ হয জলের সেবায। ত্বক চর্চা সেবে তার প্রিয় সাজ শাড়ি। বাতে খাওযাদাওযার পাট সেবে বাসনকোসন যা এঁটো এককাট্টা কবে, টুকটাক গোছগাছ সম্পন্ন কবে ফেব জলে যায। জলকেলিব পর নাইটি। চাব প্রকার সজ্জায চাব ধবন ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে। ম্যাক্সিতে চটুল কিশোরী। হাউসকোটে পাকা গিন্নি। শাড়িতে আমোদিনী। নাইটিতে কুহকী।

ঘড়ির দিকে তাকায ব্রতীন। বাজাবেব ও হচ্ছে লেট কাস্টমাব। সেটা ধবলে ত্রাসেব কিছু নেই। ঘডি থেকে চোখটা সবিযে স্ত্রীমুখে ফেলে। খব দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে চোখ টাটায। ইচ্ছে হয বলে, হ্যাঁগো ছাদনাতলাব সেই শুভদৃষ্টি কখন খোযালে?

এই সময ত্রস্তে বৃন্দাব প্রবেশ। শ্বাস টেনে নাক সিটকোয়। বলে,—কী বানাচ্ছ মা? পচা দুধের গন্ধ আসছে।

—সরবত বানাচ্ছি। বেলপানায দুধ মেশালে তাব স্বাদ দারুণ হয। তুই পচা গন্ধ পেলি! বৃন্দা নাক টেপে। —সত্যি মা পচা গন্ধ ভাসছে। গোলা বেলে দুধ মিশ খাচ্ছে না। কেটে যাচ্ছে।

—তুই কীবে। শ্রীফল দেবতাব খাদ্য জানিস না! দেবতাব সঙ্গে ভাব হবে না এমন হয়। চোখ ঠাবে বৃন্দা।—কোন দেবতা মা? সে কী ব্রতীনবাবু?

মটরদানা বালায স্বাস্থ্য খেলিয়ে তেড়ে যায অনসূয়া। তবে রে, ওরুজন নিযে মসকবা!

সমাবোহ দীন হলেও অনশন ভঙ্গেব আযোজন নাগালে। প্লেট-এব ওপব আলুভাজা কটি পড়ে আছে সৎকাব প্রতীক্ষায। খাদ্য ও খাদক ছাড়া আব কোনো অস্তিত্ব নেই। টিফিন হোক অথবা ভোজ হোক—উদর সেবার সময় কেউ সঙ্গ না দিলে বড দুঃখী লাগে। এমন ক্ষণে ব্রতীনের বোধে আসে সে বড স্নেহ কাঙাল। এই বয়সে যা উটকো এবং প্রশ্রয়চ্যুত। অথচ সমগ্র অস্তিত্ব জুডে কোন কোন পলে কুরে কুবে দংশায, সিনিয়ব সিটিজেন হোক বা না হোক কাউকে ছাড দেয না। স্বজনবা এটা বোঝে না বযস গড়িযে যায কিন্তু স্নেহকাতরতায পশ্চিমী ছায়া পড়ে না। এটা অনুভব করতে সক্ষম মা। একেই বলে মায়েব জাত। কোলেব শিশু থেকে নাতিপুতির জনক-জননী পুত্রকন্যা তার কাছে অনুক্ষণ ক্ষুধিত। পিপাসার্ত। প্রার্থী। মা বেড়ে এবং বাড়িয়ে দিতে সপ্রতিভ। গ্রহণে ও ছিল তৎপব। চাকা

ঘুরে যায স্ত্রীব খপ্পরে পডলে। আস্কারার অবসান। স্ত্রী বাড়িয়ে দিতে কৃপণ। ঝোঁক যা তা ক্যালরি সরববাহে। জোগানে চাহিদা মেটে কিন্তু বসনার তৃপ্তি চলে যায লাটে। ভাবে গূঢ় রহস্য ফাঁস করা জকরি। কিন্তু কার কাছে করবে? কাম্য অনসূযা উধাও। সে গেছে পড়শির কাছে। নতুন রেসিপির প্রশিক্ষণ নিতে।

ব্রতীন জানে তাড়া সত্য। কিন্তু মিথ্যেব পাইল আছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে গত নিশিশয্যায ওকে শীর্ষ সংবাদ হিসেবে সংবাদ দিয়েছে, অফিসে কাজের চাপ বাড়ছে।

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। অবুঝ ছাত্রীসুলভ ড্যাবডেবে দৃষ্টি অপলক।

অগত্যা খোলসা করি। কাল থেকে চেম্বারে বসব। আর একটা প্রোমোশন হয়েছে।

তুকতাক। দারুণ প্রতিক্রিয়া, জলবৎ তরল হযে যায ইশারা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তোলে। যুক্তকব কপালে ঠেকায়। ওমা তাই' জয সন্তোষী মা। ফি শুক্কুরবার উপোস দি এমনি! ফল ফলবেই।

সমৃদ্ধ সন্তোষে সে কী ফূর্ততাব ঢল।'হাফ গেরস্থ ঢঙে বিকশিত এবং লাস্য হয। রাতটা উত্তেজনাব। থরথর অপেক্ষাব। রাত পোহাতেই তর সয় না। এঁটো খববু হাট কবতে পড়শি সমীপে। অবদমন নিকাশে পরবাসে।

অনসূয়া নেই। আব একবার চা বিপিট হবে সে আশা দুবাশা। এদিকে সময বযে যাচ্ছে তির তিব করে। অগত্যা ব্রতীন গা ঝাড়া দেয়। সে লেট কাস্টমাব এটা ঠিক। তারও তো একটা সময়সীমা আছে। সেটা মান্য না কবলে ডিসপোজাল সেলেব খদ্দেব বনে যেতে হবে। ও দেরিব খদ্দেব। তার একটা কাবণ হচ্ছে দিনেব প্রথম প্রহব খরচ কবে আলস্য উপভোগে। এছাড়া অন্য দিকও আছে যা পরিকল্পিত। লাভেব দিক। সাশ্রয সঞ্জাত। ওর নিবিড সমীক্ষা-প্রসূত সিদ্ধান্ত হচ্ছে ৮টা পর্যন্ত চলে ফুটন্ত বাজাব। যে বাজারে পণ্য ও খদ্দের বাছাই। দাম চড়া। এরপর শুরু হয় পড়ন্ত বাজার। উৎকৃষ্ট এবং মন্দের পাইল হয়ে যায পড়তা পোযাতে। খদ্দেররা টিপেটুপে পরখ কবে। দরাদরি করে। এই বাজার চলে ৯টা অবধি। তারপব বাজারে ঝপ করে নেমে আসে মন্দা। ঢিলেঢালা ভাব। যাকে বলে ভাঙা বাজার। পড়ে যায় দাম। মূলত অবসরভোগী এবং সস্তাভোগীদের যুক্তফ্রন্ট এই বাজাবের গ্রাহক। ঈদৃশ গ্রাহক ব্রতীন। সস্তার দিক তো আছেই। কিন্তু সেটাই বড় দিক নয়। বড দিক হচ্ছে বয়স ভাঁড়িযে নিজেকে চিহ্নিত কবতে উদগ্রীব অবসরভোগী হিসেবে। এব আড়ালে আছে অন্য এক প্রবল টান। গণসংযোগ। প্রায় সংকীর্ণ হযে আসা সামাজিকতার বিকল্প হিসেবে এই বাজার গণসংযোগের উপায হিসেবে গণ্য হয়।

ব্রতীন বেরচ্ছে। অনসূযা ঢুকছে। ঠোক্কব লাগে লাগে। অনসূযা বলল, ঘটা করে বাজার যাচ্ছ যাও। ট্যাকে পয়সা নিও। মাছ আনলে শুধু টাটকা আনলেই হয না। পবিমাণটাও খেযাল বাখতে হয। বেড়াল স্বভাব প্রকাশ কবল। মাছ চাই। এবং টুকবো যেন বড় এবং বেশি বেশি হয়।

কথা কথা টানে। ব্রতীনও যুক্তি ছোঁড়ে।—উৎসাহ কি এমনি আসে! সামন্ত যুগে কর্তারা বাজাব যাবাব আগে খোঁজ নিত আজ কোন বউ হেঁসেলে ঢুকবে।

ইঙ্গিত স্পষ্ট। অনসূযা তেড়ে আসে।—কী—! কোমরে হাত রাখে। রক্তিম হয। খাজুবাহো ভঙ্গি। অবশ্য ভঙ্গিই সার। গঠনে অন্য ইশারা। প্রত্যঙ্গে লঘু-গুরু বৈষম্য লোপ। সবই অপবিমেয। গুরুর সম্ভার। যাকে বলে গাবদা গোবদা। সংহাবে উদ্যত অনসূযা বলল,—কী-ই.আমি বাঁধতে পারি না! কিপটেব পাল্লায় পড়লে জুত কবে ভালোমন্দ রাঁধা যায! এমন মাছ আনো শোভাও খচে যায। একদিন দেখি মাছ ধুতে ধুতে চাব ভাগ করছে আব ছড়া কাটছে মা, আধপো দুধ বেখেছি

কে কে খাবে?
ইপিন খাবে বিপিন খাবে
সনাতন কোলেব ছেলে তাকেও একটু দিতে হবে,
টিযাটার দুধ না হলে কচে না, তাকেও একটু দিও
কুকুবটা দুধ ছাডা ভাত খায না, তাকেও একটু দিও

বোঝো কাণ্ড। লজ্জায লুকোই আব কি।

ব্রতীন রণে ভঙ্গ দেয়।

তাত বাড়ছে। সকালেব কাল শেষ। দুপুব হানা দিচ্ছে। আব গড়িমসি মানে সমূহ ক্ষতি। এ বিলাস পোষায় না। তাছাডা ব্যবহাববিধি—মতামত—আকাঙ্ক্ষার ধাত আঁচ কবাব ক্ষেত্র বাজাব তাকে টানছে। ব্যাগের হাতল মুঠিবদ্ধ কবে উঠে দাঁডায ব্রতীন। ঘবছাডা হয ত্বরিতে।

এবাব ব্রতীন জনপদে। নজবে আসে ব্যস্ততা ওর একাব নয। জনসমাজে নেমেছে ব্যস্ততাব জোযার। বাবমুখো তাডা। তুঙ্গে। রাস্তায জট। সাইকেল বিক্সাকে পাশ দিতে ব্রতীন কাত হয়েছে, গাযে গাযে বিক্সা থামল। কাঁধে পডল সস্নেহ থাবা।—এই যে ভাই ব্রতীন, তুমি তো আমার ঘরেব হাঁডির খবব জানো। মেযেটা যে দিন দিন বুড়িযে যাচ্ছে। ডিপ্রেশন এসেছে। সমাজের মান্যগণ্য লোক তুমি। একটা সুপাত্র জোগাড় কবে দাও ভাই।

—সবিতা অত্যন্ত ভালো মেযে। দেখতেও সুশ্রী। ওকে নিযে টেনশনের কিছু নেই। আমি চোখ কান খোলা বাখছি। আপনিও চেষ্টায থাকুন।

—আমি তো উঠে পডে লেগেছি। কিন্তু বাবাজীবনবা সব মগডালে। পাডতে পারছি কই।

পেছনে অধৈর্য হর্ন। অববোধ মোচনে রিক্সাচালক প্যাডেলে পা রাখে। প্যাডেল ঘোরায।

ব্রতীন চলিষ্ণু।—কী দাদা আজ মাছ না মাংস?

—যা দাম। ভেজ চলছে।

—ভেজই ভালো। ভিটামিন এবং প্রোটিন দুই পাওয়া যায। চালিয়ে যান।

একজন যায আব একজন আসে। লয নেই।—এই যে দাদা শিক্ষিত লোক হয়ে আপনাবা যদি মুখ বুজে থাকেন তাহলে বল মা তাবা দাঁড়াই কোথা!

কী ইঙ্গিত কবছে ধবতে না পেরে ব্রতীন প্রশ্নবোধক। ব্যাখ্যা আছড়ে পড়ল।—খড়িব গণ্ডি হিন্দুর বেলায়। লুপ ছিল পিল ছিল লাইগ্রেসন ছিল। ফ্রি সার্ভিস। আল্লার পোলাপানরা একটা সার্ভিস নিল না। প্রমোদেব লক্ষ্য ধার্য হল উৎপাদনে। হিন্দুব বেলায জন্ম মানে পয়দা।

বাড়তি। অতএব গর্ভসঞ্চারে লকআউট। কাটাদেব বেলায় ভালোবাসাব ধন। হিন্দুর ক্ষেত্রে স্ত্রী চর্চাব খালাস। নীতির দু-মুখো ফলা হয়ে যাচ্ছে না!

আর একদিকে মুখ ফেবাতে,—কী ব্রতীনবাবু আছেন কেমন? বলে বাজাবভর্তি থলে নাকের ডগায তুলে নমস্কার ভঙ্গিতে শুধোলেন পোস্টমাস্টার সুধাময়। স্বাস্থ্যের বার্তা জানাতে উদ্যোগী হযেও স্থগিতাদেশ, যেহেতু ব্রতীন দেখল সুধাময প্রশ্নব্যাকুল হলে কী হয় জবাব প্রত্যাশী নন। অনেকদূর এগিযে গেছেন।

কথা। কথা। কথা। মানুষ বড কথাপ্রিয়। মানুষের এতো কথা আছে। কথা যেন বিরাম মাগে না। নাহলে আশ্চর্য এটা কোনো চায়েব ঠেক নয। পার্ক নয়। অফিস নয়। মুখোমুখি বসিবার নিরালা আযোজন নয়। তাতে কী। মুখোমুখি হওযা মাত্র গড়ে ওঠে পাড়াগাঁব চণ্ডীমণ্ডপ। প্রশ্নে জবাবে অভিযোগে কৈফিযতে উথাল পাথাল হতে থাকে পবিবেশ। যুক্তি তর্ক নিযে চলে মাকু ঠেলাঠেলি।

—কী ব্রতীন বলিনি ইংরেজি হটাও পলিসি সরকাব ধরে বাখতে পারবে না। গবিবেব কথা বাসি হলে ফলে। আবে বাবা দলটা চালাচ্ছে কাবা? পৃষ্ঠপোষক কারা? শুষ্টিশুদ্ধ বঞ্চিত মনস্তত্ত্বের শিকাব। ওত পেতে আছে মওকা পেলে এলিট বনবে। গণসংস্কৃতিব আবরণে গাযে ফুসকুড়ি ওঠে। উঠবে না? কোষে কোষে আভিজাত্য পিপাসা। অনেক জলঘোলা করে সেই ইংরেজি ফিবিযে আনলি। মাঝখানে বিপুল এক ছাত্রসমাজ প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বযে গেল। যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে। অথচ কোনো প্রতিবাদ নেই। বুদ্ধিজীবীরা সব বুদ্ধজীবী বনে গেছে। অবশ্য ওদেব ধর্মই ওই। মেধা বিক্রি এবং বিক্রিত কবাই স্বভাব। বাজসভাব কাছে গড হওযাই ধর্ম। পববশেই পূর্ণতা।

ব্রতীনের জিভ ছলবল করে।—আপনার উপলব্ধি অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। মানছি। কিন্তু এর বাইবে অন্য ঘটনাও কথা বলে। কথিত আছে এক গ্রিক বীর এক সময় এক গ্রিক দার্শনিকেব নিকটতম হয়ে শুধিযেছিলেন, আমি দিগ্বিজযী বীর আলেকজান্ডার। আপনাকে আমি সব দিতে পারি। বিনিময়ে আনুগত্য চাই। বলুন আপনি কী চান!

জবাব দিয়েছিলেন গ্রিক দার্শনিক,—আমাব কোনো প্রার্থনা নেই। আমি চাই আপনি সবে দাঁড়ান। আলো আসুক।

—সাবাস। আলোচনা মুলতবি বইল। সাইন ডাই। চলি।

কথোপকথন আলাপচাবিতা—এরই মধ্যেও টুকটাক আনাজে ভর্তি কবতে থাকে থলি। হঠাৎ চোখাচোখি হয। প্রতুলদা যে—!

—হ্যাঁ আমিই সে অধম। কী তথ্যপ্রযুক্তির দম্ভ পোঁযায ভবে দিল তো! দম্ভের পেন্টাগন গুঁড়িযে গেল।

আবো অনেক কিছু বলতে গিযে থেমে যায। একটা সি এল নষ্ট কবে কোন বোকা। ক্ষিপ্র পাযে ট্রেনমুখী হযে ফেব পিঠটান।—হ্যাঁবে তোব ব্যাঙ্কিং হয়েছে?

—না।

—কেন?

—অনেক ঝক্কি। খাটনি—সময়—হ্যাপা কে পোহায়। বই পড়তে আর ভাল্লাগে না। সঙ্গে সঙ্গে ধাতানি,—আহা কলির যুধিষ্ঠির রে—। এখন কেউ বই পড়ে! পড়ে না। খাতা পড়ে। মজুমদার কোচিং-এ সেঁটে যা। ব্যাঙ্কিং—ডক্টবেট যাবতীয় চাবা সেলে বিক্রি হচ্ছে। যা পুঁজি ঢালবি ২ বছরে উঠে আসবে। তারপর সুদ ভাঙিয়ে খাবি।

ঘোষণাটি এমন ডিগ্রি-সার্টিফিকেট যেন গঙ্গার ইলিশ। জলেব দামে বিকোচ্ছে। গূঢ় বার্তা ছড়িয়ে লোকসানি তাড়ায় প্রতুলদা হাঁটাকে দৌড়ের স্তবে নিয়ে যায়। ব্রতীনও কেনাকাটায় মনঃসংযোগ করে। সমযের কথা মনে আসতে অলসতা ঝরে যায। থলিব ভাবে ঈষৎ নুয়ে দ্রুত হাঁটছে।'পরিশ্রান্ত। একটু জিরিয়ে নিতে থলিটা মাটিতে রাখে। থামে। আঙুলেব আঁকশি দিয়ে কপালের ঘাম চাঁছে। ক্লান্তি নিরসন হলে থলি হাতে নেয। চলবে বলে মাথা তুলেছে আঁতকে ওঠে। এই রে, একটা মুখ ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। এদিকে এগিযে আসছে। ভযে ব্রতীন কাঁটা। আগুয়ান মাথা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সূর্যেব নিচে যত বিষয আছে সব বিষয়ে প্রাজ্ঞ। শঙ্কা সংকট নির্বাস। বসতি শুধু প্রত্যয়। তদুপবি বয়স হযেছে। বয়স হলে যা হয, হযে পড়ে, বাড়াবাড়ি কথকপ্রবণ। ফুরিয়ে যাওযা মনস্তত্ত্বেব খপ্পবে। খালি ত্রাস, আব বোধহয সময মিলবে না। অথচ অনেক বলাব আছে।

ঘনায়মান সংসর্গ আভাস দিতেই ব্রতীন কৌশলী হয। এমন পজিশন নেয ভিড়াক্কাব তাকে অপহরণ কবে।

২

গোধূলি শাখা। ২টো থেকে ৮টা। হিসেব কবলে অপবাহ্ন এবং সন্ধ্যাব দিকেই সময়েব ভাগ বেশি। যে সময়টা মানুষেব নীড প্রেম প্রবল তখন এই অফিস ফুটছে। খোলা জানালা দিয়ে ব্রতীন দৃষ্টি ভাসায। সুজলা সুফলা কোনো চরেব উদ্ভাস দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ কবে না। ইট-কাঠ-বালি-সিমেন্ট-পাথরের সমাহাব। বাগানেব আদলে কংক্রিটেব জঙ্গল। প্রকল্পেব শৃঙ্খলা। কক্ষ বিন্যাস টপকে বাতাস প্রবাহন অব্যাহত। ক্লান্তিহবক শীতল অনুভূতিব প্রলেপ। আবামদায়ক। হাওয়াব গোধূলি। প্রকৃতির মনোহর কোনো খণ্ড অংশও চোখে পড়ে না। কিন্তু চোখে পড়ে আকাশ। আকাশ আছে আকাশেব মহিমায়। জাঁক কবে বসিয়েছে তারার আসব।

অফিস বন্ধ হবার অনেক আগে অফিস ছাডবে। একথা আগাম জানিযে বেখেছে ব্রতীন। সঙ্গে জুড়ে দিযেছে জুতসই কাবণ। জুতসই তবে অভিনব নয। অফিসজীবীরা গণহারে ধবতাইটা প্রযোগ কবে। মেযেকে ডাক্তাবেব কাছে নিযে যেতে হবে। সাক্ষাৎকাব সময়শাসিত। মেযেকে সঙ্গ দিতে হবে। কাবণটা যথার্থ। ভেজাল হচ্ছে রোগেব উল্লেখ। দুধে জল মিশিযে ছুঁড়ে দেয় ইস্তেহার। কতটা দুধ কতটা জল তোমবা বুঝে নাও।

বুঝে নেয বস এবং কলিগ অমনিবাস। কিন্তু খসডা খুব আবেদনমূলক। যুক্তি তক্ক ধামা-চাপা পড়ে যায়।

অফিসমুখী যাত্রা। সদব দবজার বাইরে পা রেখেছে। সুতে মচমচ ধ্বনির জাগবণ পিছু ডাক। আষাঢ়ে ঝর্নাব উচ্ছ্বাসে বৃন্দা বলল,—বাবা তাড়াতাডি ফিবো। আজ সন্ধেটা

সেনাবাহিনীর সবুজ প্রান্তরে হাত ধরাধরি করে হাঁটব। ঘাসের বিছানায় বসব। ফুচকা-আলুকাবলি-ভেলপুরিতে লাঞ্চ সারব।

ব্রতীন জিজ্ঞাসু—মা রাজি?

—ভাবা যায়! বাত বাধা। শরীরে ভাঁজ ফেলতে পারে না। যা-তা খেলেই চোঁয়া ঢেকুর। অম্বল। আজকের সন্ধে শুধু তোমার আমার। এগ্রি?

আশ্বাসিত হতে বৃন্দার ব্যাকুলতা তুঙ্গে। ব্রতীন বলে,—আই প্রমিস। বেড়ি হয়ে থাকিস। ফিরব। বেরিয়ে পড়ব।

ব্রতীনের এলানো হাতে লুটিয়ে পড়েছে নবজাত সন্ধ্যার বিষণ্ণ কিরণ। বড় মায়াময়। উদাসী আহ্বান। ঘোর ছিন্ন হতে আবিষ্কার করে এক অদ্ভুত দুঃখে ভেতরটা ছেয়ে যাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়েও নিহিত উৎস খুঁজে পায় না। সে-রকম কোনো সমস্যায় দীর্ণ নয় সে। তবু মাঝে মাঝে কেন সে ভয় পায়। যেন ভূত দেখে। বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল,

প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন ভূত?

ভূত একাকীত্বের। হয়তো মুদ্রাদোষেই হচ্ছে আলাদা। তবু অবসর মুহূর্ত পেলেই তাড়া করে। বিধ্বস্ত করে।

ব্রতীন মনস্থির করল একাকীত্ব উপভোগের মধ্য দিয়েই সে জয় করবে একাকীত্ব। সাথে সাথে ঈদৃশ ভাবনায় লগ্ন হয়ে যায় অঙ্গীকার। আজকের সন্ধ্যা তার একার সন্ধ্যা। প্রয়োগ প্রস্তুতিতে ফোনে নাকচ করে মেয়ের আর্জি। বজায় রাখে ছুটির ফন্দি।

পলে পলে মনোজ্ঞ সন্ধ্যা ক্ষয় হচ্ছে। অপেক্ষা মানে সুন্দর ক্ষণের বিয়োগ। ব্রতীন ত্রস্ত হয়। অফিস বয়কট করার প্রাক্কালে কিছু পুরুষালি প্রসাধনের তাড়া আসে। প্রধান অঙ্গ হিসেবে জল হচ্ছে উপকরণ।

ঝটপট টেবিল সাফ করে ব্রতীন টয়লেটে ঢোকে। প্রচুর জলে হাত মুখ চোখ ধোয়। গোটানো হাতা কবজি অবধি টেনে বোতাম আঁটে। আকৃতি স্মার্ট হয়। অবয়বের ঊর্ধ্বাংশ আয়নায় প্রতিবিম্বিত হতে মুখ মেঘলা হয়। কাঁচাপাকা চুল শ্যাম্পুতে ফাঁপানো। আলগা দৃষ্টিতে ভড়কি উতরে যায়। ঈগল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে চর। টাক উঁকি দিচ্ছে। বিরলে ব্রতীন ভেংচি কাটে। স্বগতোক্তি করে। বাছা ঝরে যাচ্ছে। রূপের ডাঁট পশ্চিমে হেলছে। ব্রতীন মাথা নিয়ে পড়ল। প্রাচুর্য আছে কিন্তু অসম বিস্তার। চিরুনির সাহায্যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে কিছু চুল সরিয়ে ঘাটতির দিকটা ছেয়ে দেয়। ভর্তুকির বিন্যাসে টাকের অনেকটা পুষিয়ে যায়। বন্ধ্যা অংশ ঈষৎ জোচ্চুরিতে আবছা।

ঝরঝরে হয়ে কোলাহলের খোঁয়াড় থেকে মুক্ত হয় ব্রতীন। লিফট না নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। এ যেন নামা নয়। অবরোহণ। এই প্রক্রিয়ায় সে যাত্রার মেজাজ পায়।

বাস্তায় নেমে ব্রতীন আকাশে চোখ তোলে। দু-এক খণ্ড মেঘ টুকি দিচ্ছে। ধোঁয়া ধুলো বাতাসে মাখামাখি হতে হতে ব্রতীন পদাতিক। হকার অধ্যুষিত পথে বোনাল্ডো ভঙ্গিতে মানুষ

এবং পসরাব স্তূপে পথ কেটে কেটে ব্রতীন হাঁটছে। কতটুকুই বা পথ! ভাবল হেঁটেই মেরে দেবে গন্তব্য।

হাঁটছে। ঘোরের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। ঘোর লাগলে পদপাতে যে ছন্দ আসে সেইভাবে। এক সময সংবিত এলে জ্ঞাত হয এখন সে চৌরঙ্গীতে। বস-রসাতলের রঙ্গভূমি। আলোর প্লাবনে ভাসছে। সবকিছু মোহময। ভিড়ও।

বসুন্ধবা যেন তৃপ্তিব অবগাহনে। মাথাব ওপর বিশাল বিশাল হোর্ডিং-এর ছযলাপ। অফুরন্ত বিজ্ঞাপন। আবেদনে বিলাসের নিঃশব্দ হাতছানি। পণ্য সম্ভারেব সুলুক-সন্ধান। খাই খাই মহিলার হিল্লোলিত ইশারা। যার নির্গলিত আহ্বান · জীবন দুদিনেব জন্য বই তো নয়। এসো উপভোগ কবি। এখানে ঠাঁই নেই আমলাশোল ইতিহাস। কালাহাণ্ডি দূর অস্ত। আমলাশোল নেই। কালাহাণ্ডি নেই। পড়ে নেই ভগ্নস্তূপও। ঈশ্ববেব পৃথিবীতে বিবহ নির্বাস। আছে সুখ। শুধু সুখ। সুখেব চাদরে মুড়ি দিযে আছে ধরিত্রী।

ভাবনা চলছে। দৃষ্টি ঘুবপাক খাচ্ছে। গতি বিবাম মানে না। অবলোকনে ছেঁকে তুলছে অভিজ্ঞতা। গৃহগত বৃদ্ধের পড়ি মবি চলন্ত আবোহণ। হাসপাতাল ফেরত দেউলে উদভ্রান্ত মুখশ্রী. বোমান্স গড়াব ইশাবায ইতস্তত ঘুরপাক খাওয়া মোবাইল স্ত্রী চাই মালিস চাই, শিশি হাতে ফেরিওযালাব ডাক.. চাই গবম চা, হাঁক...বসন্তেব বাতাস গাযে লাগা মনে চাপা গলায নব-নাবীব গদগদ আলাপ.. । যাবতীয নাগবিক শ্রী-হতশ্রীব সমৃদ্ধ কুটুম্বিতা প্রত্যক্ষ কবতে কবতে একসময তাব খেয়াল হয শ্রান্তিতে পদযুগল গতিস্তব্ধ। কার্জন পার্কেব ইঁদুব কলোনি বিশ্রামার্থে টেনে ধরেছে।

—কাছে আছে দেখিতে না পাও।

সুবেলা ছন্দোবদ্ধ কণ্ঠস্বব। ব্রতীন দেখতে পেল। তখন সে পবেব কলি ধবেছে।—তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও। গাযকীতে করুণ বসের আধিক্য।

ব্রতীন দূবে যায না। অন্য কোনো সন্ধানে ইতিউতি তাকায না। দৃষ্টি লেপটে থাকে। বক্ত ছলাৎ করে। আশ্চর্য এই পবিবেশ। এই সামাজিক জনগোষ্ঠী। এব মধ্য দিযে উঠে আসছে রবীন্দ্রসংগীত। শুধু তাই নয। নির্বাচনে জড়িযে আছে হিসাবি ছাপ। আবেদন তির্যক। ভাবতে গিযে ব্রতীন তাজ্জব বনে যায। বিহ্বল হয়। ধাক্কাব প্রথম চোট সযে গেলে চমক অবসন্ন। মনে হয সবই স্বাভাবিক। মেধা শ্রম শিল্প অনুভূতি সকলি সেলেবেল। সেক্ষেত্রে ববীন্দ্রসংগীত যে হাটে বিকিকিনির যোগ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

মজা লুঠ না সুবেব মূর্চ্ছনা, কীসেব টানে কে জানে বিপুল জমাযেত। বৃত্তাকাবে উত্তেজনায টান টান। বৃহৎ আকারেব পথ—জলসাব রূপ পূর্ণাঙ্গ। হাবমোনিযামের বিডে আঙুল রেখে বাযেন চোখ বোলায। টলটল কবছ সমাবেশ। বাযেন হারমোনিয়ামে তীব্র সুব জাগালো। অসংখ্য দৃষ্টি সংহত হল। পাঁযতাবাব অবসান। শুরু হল গান।

ভালো কবে জরিপ করল ব্রতীন। একটি দল। কাচ্চাবাচ্চার সংখ্যা অনেক। খড়ির গণ্ডি দিযে সীমানার বেড়া। হামাগুড়ি দিযে একটি শিশু গণ্ডিব বাইবে পড়ে থাকা পযসা কুড়চ্ছে, কৌটোয জমা বাখছে। শিশুটি যেন মেদমাংসেব ফানুস। যে-কোনো মুহূর্তে দু'হাত ছড়িযে

নক্ষত্রের দিকে যাত্রা শুরু করবে। আব একজন, কিশোব সে। বসে আছে ঠ্যাং-টা মেলে দিযে। প্রদর্শনযোগ্য কবে। হাঁটু থেকে অবরোহে দগদগে ঘা। পুঁজ পড়ছে। থেকে থেকে বাদামি ছিট ছিট দাগ। মাছি ভনভন করছে। যিশুর ভঙ্গিতে মাথাটা এলানো। মানুষ দেখছে। আঁতকে উঠছে। পযসা দিচ্ছে।

সামান্য দূরে বসে আছে এক বৃদ্ধা। দলছুট হয়ে। কঙ্কাল সর্বস্ব কাঠাম। ধুঁকছে। কোনো এক সময নাবী ছিল। এখন নাবী নেই। পড়ে আছে নারীব ভগ্নস্তূপ। এই দেশ এই কাল সর্বস্ব হরণ কবেছে। খুচবোব সন্ধানে ব্রতীন পকেট হাতড়ায়। বৃদ্ধা তা লক্ষ কবে চিঁ চিঁ সুবে বলে, পযসা নেহি। খানা দে।

কাঁধে ঝাঁকা নিয়ে ঘুবঘুর কবে ফিবি করছিল এক হিন্দুস্থানি। তাব পশবা শাঁকালু। ব্রতীন বড় সাইজেব একটা শাঁকালু খরিদ কবল। ফলটি বৃদ্ধার দিকে আলতো ছুঁড়ে দিল। বৃদ্ধাব কোলে ফলটি পডাব আগেই ১৬/১৭ বছরের এক কিশোবী ছোঁ মেবে ফলটি ছিনতাই কবে। ত্বরিতে ফলটিতে কামড় বসায। কামড়ের চোটে মুখ উপছে কনুই বেযে বসেব ধাবা। কিশোবী লকলকে জিভে চেটেপুটে শোষণ করে নিতে মগ্ন। সহসা বৃদ্ধার সতৃষ্ণ নযনে তাব চোখাচোখি হয। তার দযা হয। কামড়ে এক খাবলা শাঁকালু সে ওই প্রাচীন মুখেব গহ্বরে পুবে দিতে তৎপর হয। বৃদ্ধা হাত নেড়ে বাধা দেয। আপন মুখ নিশানা কবে। কিশোবীব জ্ঞানে এল বৃদ্ধাব দাঁত নেই। আঙুল দিয়ে কিশোরীব মুখ তাক কবে। কিশোবী ধবতে পাবে ইশাবা। নিজের মুখে খণ্ডটি পুবে চিবিযে চিবিযে জীর্ণ এবং বসসিক্ত কবে তোলে। তারপব মুখ থেকে বেব কবে হাতের তালুতে বাখে। দলা বসে চপচপে নয়। কাবণ রসেব মূল ভাগ ইতিমধ্যে তার কণ্ঠনালী গ্রাস কবেছে। অবশিষ্ট ভগ্নাংশ নিংড়ে বিন্দু বিন্দু ধাবা সে বৃদ্ধাব ফোকলা মুখে সিঞ্চন কবে দিচ্ছে। ধীরে ধীবে বৃদ্ধাব মুখ অপার্থিব আভায ঝিকিমিকি।

ব্রতীনের মস্তিষ্কে ইতিহাস টোকা দিচ্ছে। অনশনক্লিষ্ট আমলাশোল উন্মূল হযে কার্জন পার্কে ঘাঁটি গেড়েছে। বসবাস কবছে। শুধু বসবাস নয উপবাস কবছে। ব্যতিক্রম একজন। বধূটি। মুমূর্ষু সংসর্গে স্বাস্থ্যেব দীপ্তি। দীঘল কাঠাম। যেসব খাঁজ বক্রতা সুন্দরীর দাবি তা তাব খুবই চোখা। এবং এক্ষণে স্ফুবিত প্রয়োগে সিদ্ধ।

পাশের লোকটি কনুই দিয়ে ঠেলা দেয। ফিসফিস করে।—কী ফিগাব! হা-ঘবেব হযেও কী কবে যে ধবে বাখে। বঞ্চিত আক্ষেপ পাত্তা না দিযে ব্রতীনের দৃষ্টি গাযিকাতে নিবদ্ধ। ও দেখল পরনে চেযেচিন্তে পাওনা শাড়ি। দামি কিন্তু জীর্ণ। স্থানে স্থানে তালিতাপ্পা। সূক্ষ্ম ছেঁড়াও চোখে পড়ছে। ধান্য মঞ্জবীর মতো দীঘল পেলব গঠন যেন ঐশ্বর্য বাই-এব বস্তি সংস্কবণ। স্বাস্থ্যেব স্ফূবণ না বিস্ফোবণে অনবদ্য মোহ। স্বব ও সুব প্রক্ষেপে নাকেব পাতলা পাটা স্ফীত। কপালের আল বেয়ে নিবিড চুলেব ঝোপ। গ'হন অমাবস্যাব বাজত্ব। গানেব খেলা তলপেটেব ঘূর্ণিজাল প্রাণপূর্ণ উরুদেশেব সঞ্চালন বিস্তাব করছে মাযাজাল।

গান এবং অঙ্গভঙ্গিব অনবদ্য কসবত ছাপিযে ব্রতীনের চেতনায অন্য এক সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আলোড়ন তোলে। বধূটি বয়স—শরীবী ধন—গাযন নৈপুণ্য ত্রিবিধ গর্ব সম্বল করে যদি বেছে নিতে ঢলাঢলির রাস্তা তো সুখ সমৃদ্ধিব মুখ দেখতে পেত চটজলদি।

সে পথে না হেঁটে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে টিকে থাকতে বেছে নিল খাটনির উপায়। তার অর্থ কি এই নয় যে সমাজ থেকে নৈতিকতার টান পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি।

তবু কেন এমন মনে হয়! মনে হল ব্রতীনের এই যে পরিবেশ দানা বাঁধছে তার অন্তর্গতে ইন টো-টো দুঃখ প্রপীড়িত সংসার এবং জলসার আকর্ষণ নয়। আকর্ষণ গায়িকা। বধূটি। তার গঠন। বিভঙ্গ। সর্বাঙ্গে লেপটে থাকা যৌনতার বিকট প্রকাশ। বিনিয়োগ কুশলতা। খাসা টোপ।

গান এবং বিভঙ্গের একান্নবর্তিতায় দর্শকবৃন্দ আপ্লুত। জলসায় থেকে থেকে বিশ্রাম। সে-অবসরে কয়েন পড়তে থাকে। টাকা উড়ে আসে।

ভাবের ঘরে সিঁদ না কেটে ব্রতীন অন্তর্গতে স্বীকার করল ক্রোমোজোমে বাসা বাঁধা প্রবৃত্তি ওকে ওসকাচ্ছে। অর্থাৎ নারীপ্রীতি উথলোচ্ছে। পকেট ভারি। মাসকাবারি তুলেছে। মন প্রসন্ন। পকেট হাতড়ে একটা নোট তোলে। বাড়িয়ে দেয়। দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝরিয়ে বধূটি হাত পেতে গ্রহণ করল অনুদান।

মেদের ফানুস, হাড়জিরজিরে শিশু, শীর্ণ কিশোর, অকালে বার্ধক্য জর্জর পুরুষ—পারিবারিক অমনিবাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা কয়েন—টাকা কুড়োতে রত। দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকের নিকটতম হয়ে হাত পেতেও আদায় করে অনুদান।

সংগ্রহ সারা হলে ফের শুরু হয় জলসা। রবীন্দ্রসংগীতের আধিক্য। ফাঁক ফোকরে বাউল, সিনেমার গান;—তোমার দেখা নাইরে—পরিক্রমা সেরে;—তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে। রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে যবনিকাপাত।

বৃহৎ সমারোহ টাল খায়। ছত্রভঙ্গ হয় না। নানাবিধ সংলাপ ব্রতীনের কানে ধাক্কা দেয়।

—আবাগীরা গত জন্মে মুৎসুদ্দিগিরি করেছিল। তার দায়ে এ জন্মে ভিক্ষে সম্বল।

অন্য একজনের টিপ্পনি : দুঃখ কষ্ট সহানুভূতি, সংস্কৃতি সেক্স কী নেই। মশলাদার উপকরণ দিয়ে কড়া পাক। পারিবারিক প্রয়োজনায় উপভোগ্য শো। চালু কারবার। যাবতীয় কামাই একই উনুনের চাহিদা মেটায়ে।

রাত্রি সমৃদ্ধ। ভাঙা জমায়েত। পাততাড়ি গুটিয়ে দলটি দৃষ্টির আড়ালে। একটু আগে অনেক কিছু ছিল। এখন শূন্য শূন্য। মনটা উদাস হতেই পেটে টান পড়ে। পাকাশয়ে অগ্নিদের দৌরাত্ম করছে। দৃষ্টি এবং চিন্তা বিহারে স্থগিতাদেশ দিয়ে ব্রতীন পায়ে পায়ে এগোতে থাকে। নিশানা ডেকার্স লেন, চিত্তদার দোকান।

৩

দময়ন্তীর আখ্যান-মনস্কতা ঘা খায়। বসের নির্দেশ কানে আসে।—দশ কি এগারো নম্বর হবে—খাটাউ কনস্ট্রাকশন ফাইলটা বার করুন তো—।

নারী মাত্রই দিনবসানের তাড়া সাজ। দময়ন্তী এই দায়ি সদ্য পূরণ করেছে। অর্থাৎ প্রসাধিত হয়েছে। পরিপাটি হয়ে নভেলের পাতায় চোখ রেখেছে। তির তির করে বয়ে যাচ্ছে হরফের ওপর। প্রাক ছুটির মনোহর উদ্যোগ। এমন ক্ষণে একী গেরো রে বাবা। এখন আবার ফাইল

ঘাঁটাঘাঁটি। একে এলার্জির ধাত। বস বলে যদি কিছু থাকত অফিসারটাব।

তৎকাল প্রতিক্রিয়ায পাতা মুড়ে রাখে দময়ন্তী। অপবিমেয় ক্লান্তিতে ভরাট হাই তোলে। দু'হাত ভাঁজ করে মাথার পেছনে আনে। মন্দিব চুড়ো খোঁপায লগ্ন কবে। আঙুল এবং ক্লিপের খেলায় বত থাকে। দ্রষ্টব্য হয় উদোম বাহু। কাঁধ থেকে বহে এসেছে। আঙুলের ডগা অবধি প্রবাহিত ধারা নিরাভরণ। ডান হাতে কবজি ঘড়ি আর বাঁ হাতের কনুইতে মাদুলির বন্ধন—এই হচ্ছে ছাড়। সময় শাসন এবং বিপদভঞ্জন ঐক্যবদ্ধ প্রতিষেধক।

—ফাইলটা খুব জকরি। প্লিজ বার কবে দিন।

দ্বিতীয় দফা তাগাদা হানা দিচ্ছে। বডই ধৃষ্ট। কিন্তু এবার আর উপেক্ষা করতে পারল না। কোনো উচ্চবাচ্য না কবে সাড়া দেয় শবীবী ভাষায। চোখ তুলে এবং দৃষ্টি আযত কবে ভাসিযে রাখল।

অগত্যা ব্রতীন কেরানি-দৌরাত্ম সমীহ কবে নিজেই হাল ধবতে উদ্যোগ নেয়। চেয়াবে পাছা বিযুক্ত হতে দেখে দময়ন্তী আসন ছাড়ে। গুটি গুটি পাযে এগোয। ব্যাকের সামনে যাচ্ছে। ফাইলটা দেবে। চবণে চবণে তাবই পূর্বাভাস।

ফাইলটা পেযে ব্রতীন নথিতে একাগ্র হব হব টেব পায় পবিস্থিতি ঘোলা এবং ও পরিবৃত।

মুখোমুখি দময়ন্তী এবং ওর হয়ে ঘিবে আছে কর্মী সংকলন। দময়ন্তীকে নিশানা কবে ইউনিযন প্রধান বলেন,—সংকোচ কী, তুমি শুরু করো।

নাকেব ডগা ভেঙে দময়ন্তী শুরু কবল,—স্যাব—।

কানে বাজল সম্বোধন। এমনিতে দাদা বলে ডাকে। মাখামাখি আছে। এখন অন্য সুব। বুঝল দময়ন্তী অফিসিয়াল হচ্ছে। অর্থাৎ রগড়াবে।

ক্ষণকালীন বিরতি। প্রস্তুতি পর্ব। অতঃপর হোমওযার্ক থাকলে যেমন হয—সাবলীল গড়গড় করে।

—আপনাব বাড়াবাড়ি কাজের আঠা আমাদেব অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটাচ্ছে। বেলাশেযে অতিবিক্ত তোড়জোড় বাহানা। আসল ধান্ধা হচ্ছে হেনস্থা কবা...ভোগানো. ।

ব্রতীন থতমত।

পবিস্থিতি বাগে আনতে ইউনিযন নেতা প্রবৃত্ত হন ব্যাখ্যায।—আপনি কি ন্যাকা—জানেন না ওযার্ক টু কল চলছে। কর্মচাবীবা লড়াই করছে আর আপনি কি-না নিজের হাতে ফাইল নিয়ে নিয়মকানুন ভেঙে কাজেব শো দিচ্ছেন! তেলবাজি কবে ওপবে উঠবেন?

উত্তেজনা এবং মুদ্রাদোষেব দ্যোতক—ব্রতীন পকেটে হাত ঢোকায। পকেটেব ভেতব আঙুল যৌনাঙ্গেব স্পর্শতা পেতে আস্থা আসে। পুরুষ হিসেবে ভাবনার আলোকে উদ্বুদ্ধ হয। ফলে, ফোঁস কবতে উদ্যত।

উদ্যত হয় কিন্তু ছোবল দেয না। একপ্রকাব চিন্তাব উদয—ঝাড়ফুঁকের কাজ করে। অবসন্ন পৌরুষের উৎস : ছিল ক্লার্ক। আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে হযেছে পদস্থ অফিসাব। সোজাসুজি অফিসাব হিসেবে যাদেব নিযোগ তারা কুলীন। বাকিবা প্রমোটি অর্থাৎ পেডিগ্রি নেই। জাত গেল মান পেল না। এই হচ্ছে এদিককার খাস খবব। ওদিককাব খোঁজখবরে

প্রকাশ উচ্চতম কর্তৃপক্ষেব নজরে প্রমোটি মানে ঘসটে ঘসটে উন্নীত। উঠাইগিরি একজিকিউটিভ। সমক্রাস নয়। জালি। পঁচিশ পার্সেন্ট সংবক্ষণের প্রোডাক্ট। প্রান্তিক। পদে পদে ক্লার্কবা টের পাইযে দেয় ও রেনিগেড। বনেদি কর্তৃপক্ষ গণ্য কবে ধর্মান্তরিত কলমজীবী। অবজ্ঞা সম্বল কবে কি শিবদাঁড়া খাড়া বাখা যায! স্ট্যান্ড পয়েন্ট যে নেবে সুরক্ষার জন্য কেউ নেই। নাথবতী অনাথবৎ।

তলা এবং ওপর উভয চাপেব অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞতার শিক্ষা হচ্ছে : যে সহে সে রহে। ব্রতীন সহে যায।

কচলানোব পাট শেষ। তো অন্তিম দাবি পেশ করলেন।—আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। দময়ন্তী অপমানিত বোধ কবছে। সহকর্মীব ইজ্জত আগে।

ছক কষা ছিল। নেতা রগড়াবে। ক্যাডাবরা হাওয়া দেবে। তাই হল। প্রস্তাব পাড়া মাত্র অনুগতবা ধ্বনি ভোটে উসকে দিল।

দাবি প্রতিপক্ষ কোর্টে ঠেলে দিয়ে এখন শুধু অপেক্ষা. অপেক্ষা...। লাঞ্চনাব বিশ্রাম।

প্রস্তুতি ছিল। প্রস্তাব আসামাত্র অতএব ইউনিযন চরণে সেবা লাগে।—সবি। আমি আমার ব্যবহাবের জন্য ক্ষমা চাইছি। ব্রতীনের মুখ মুখব হয। হাত জোড় হয।

এক কোণ থেকে বাতাস বহন কবে আনল প্রচণ্ড কবতালি। চমকিত ব্রতীন চোখ তুলতে নেতা বলেন,—ও কিছু না। খৈনি।

নিগ্রহ-ব অধোগতি। আপাতত শান্তি কল্যাণ। জযধ্বনি দিতে দিতে জমাযেত প্রস্থানার্থী। অন্তর্ধানেব প্রাক মুহূর্তে সাঁঝবেলাব সাজে আকীর্ণ মুখশ্রী থমকায। ব্রতীনেব মলিন মুখ পবখ কবে আনন্দ পায। পুলকের চোটে ফেব কড়কায।—আমবা চাই অফিসাব—স্টাফ বিভেদ ভুলে কাজ কবতে। শান্তি বজায বাখতে। খুঁচিযে খুঁচিয়ে আপনাবা পবিবেশ দূষণ করেন।

ব্রতীন অসহায বোধ কবে। ভাবে ভাবনার জগৎ আব প্রযোগের জগৎ—এব মধ্যে কোনো সাঁকো নেই।

ফাঁকা ঘব। ক্যান্টিন বন্ধ। এই সময নীচ থেকে চা আসে। গলা খুসখুস কবছে। কনডিশনাল বিফ্লেক্সে আনচান কবছে শবীব। প্রতীক্ষাব অবশেষ। চা এল। এক হাতে কেটলি আব এক হাতে বালতি ঝুলছে। বালতি থেকে ভাঁড় বার কবে টেবিলে রাখে চা-বালক। কেটলি কাত করে চা ঢালে। ব্রতীনেব বিবক্তি আসে। ওর ধারণায ভাঁড়ে খায তাড়ি। গেলাসে খায হুইস্কি। চা পানের উৎকৃষ্ট আধাব বোন-চাযনাব কাপ। বিকল্পে চিনামাটিব কাপ। যে কাপ এখন আলমারিতে বন্দি। বিবাগ জলাঞ্জলি দিযে চুমুকে চুমুকে চাপানে শেষ করে ব্রতীন। আজকের মতো কাজ লাটে। গ্রাহক পবিষেবাব প্রত্যক্ষ দাযবদ্ধতা অস্ত। ওযার্ক টু কল চলছে। সর্বোপরি খুচরো সংঘাত ঘটে গেল সদ্য। সব কিছুর ধকলে অফিসে বিবাজ কবছে গাঢ অবসাদ। এই অবকাশে অন্তর ফুঁড়ে ওঠে অন্য চিন্তা। আজ আবার তাকে যেতে হবে কার্জন পার্ক। বোকামির খেসারত। হযেছে কী—গত সন্ধ্যায কার্জন পার্কের সান্ধ্য আসব. .আলো আবছা মোহময পবিবেশ। ঘটে গেল বিভ্রান্তি। দিতে চেযেছিল পঞ্চাশ টাকাব নোট। দিয়ে

ফেলেছে পাঁচশো টাকার নোট। বাড়িতে ফাঁস কবেনি। কাবণ বল্লে অন্যমনস্কতা নিযে অনুযোগ, বকেয়া সহবিস্ফোরণ ঘটত। ক্যাবলা অভিধায জর্জব হতে হত। সত্যি বলতে কি অনসূয়াব কাছে ও মাইনে ছাড়া আর সব বিষযে মাইনর। কাছাখোলা হওযা মানে খাল কেটে গঙ্গনাব স্রোত আবাহন করা। সুতরাং ও পথ বর্জন। কিন্তু হজমও যে কবতে পাবছে না গুনাগার। অনেকগুলো টাকা চোট। গেলে আব কি ফেরত পাওযা যাবে! দ্বিধা আসে। ভাবে চেষ্টা কবলে ক্ষতি কী! অনেক সময ফল ফলেও তো। সংশয় ছিন্ন কবে। ক্ষীণ আশা ভবাট আগ্রহ সম্বল করে ব্রতীন উঠি উঠি। পলে পলে সময খবচ হয। সহসা ঝটকা দিযে উঠে পড়ে ব্রতীন।

৪

পথে নামতেই ব্রতীন দেখল সুন্দর গোধূলি নেমেছে শহরেব বুকে। বাতাসে দক্ষিণী টান—গা শিরশির কব। গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্যে মাখামাখি হযে ব্রতীন হাঁটছে। উদ্বিগ্ন মনে একসময এসে পৌঁছে যায় ইঁদুর কলোনিতে। চোখ পড়তেই বুকটা ধড়াস কবে। একী! সব ভোঁ ভাঁ। ভাঙা যাত্রা আসর। ছিল অনেককিছু। এখন খাঁ-খাঁ। হাহাকাব। আশপাশেব চিত্র ভিন্ন। কোনো শূন্যতা নেই। বিচিত্র জীবনের অমৃতধাম। কানাকানি হল্লা ফিসফিসানি আব আড্ডার প্রবাহে ব্রতীন উদভ্রান্ত। 'চাই আতর' বলে পাক খেযে খেযে একজন ঘুরছে। পিতলেব ঘড়া ঝুলিযে চাওয়ালা হাঁক দিচ্ছে 'চাই গরম চা—'। ঝোপ থেকে খিলখিল শব্দ ভেসে আসছে নাবী কণ্ঠেব। দিশাহাবা দৃষ্টিতে ব্রতীন চতুর্দিক তাকায। খেযাল কবেনি কখন গাযে গাযে এসে দাঁড়িয়েছে এক পুরুষ। খেযাল হলে দেখল তাব পবনে পাজামা-ফুলহাতা সার্ট। কাঁচাপাকা বাবরি চুল উলটে আঁচড়ানো। লম্বা গঠন। দাঁড়িযেছিল। আবার সবে গিয়ে নির্দিষ্ট এক বৃত্তে পাক খাচ্ছে। কোনো হেলদোল নেই। তাড়া নেই। সন্ধানী দৃষ্টিতে পাক খেযে যাচ্ছে। কাছাকাছি হতে ব্রতীন তাকে শুধোয,—আচ্ছা বলতে পাবেন কাল সন্ধ্যায এক দুঃস্থ পবিবার গান গেয়ে বোজগার করছিল। তারা কি রোজ আসর বসায় না!

—বসায। তবে এক আধ দিন কামাই দেয। তথ্য জোগান দিযে শুধোয।—কেন বলুন তো।

ব্রতীন ঠেকায় পড়েছে। কারণটা প্রকাশ কবল। লোকটি ঘন হযে শুনল। বলল,—আসুন আমার সঙ্গে।

বৃহৎ চিৎকৃত শব্দেব সঙ্গে খাপ খাইযে ব্রতীন হাঁটতে থাকে। এখন সে অনুগামী। কথাব শৃঙ্খলে না জড়িযে মূক পদাতিক। চলন তাড়া তাড়িত নয। আবার চলতি কা নাম গাড়িও নয়।

চলতে চলতে অলস দৃষ্টি বুলিযে ব্রতীন আহবণ কবছে বাত্রির চৌবঙ্গির লাস্য নকশা। পা থেমে যায়। দৃষ্টি লেপটে যায শ্রমদানীদেব হিল্লোলিত মহোৎসবে। ওব এ এক দুর্বলতা। হলে বসে উপভোগ নয। পথ-সংগীত, পথ-নাটক, পথ-জলসায় ওব আসক্তি। পথ...পথ...পথ..পথের পাঁচালিতে ওর টান। ওব প্রত্যয আটপৌরে আযোজন এবং

আঙ্গিককে নম্র সহচব কবে যে সংস্কৃতিব সৃজন—তাব মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য মুখ্য হযে ওঠে। ভড়কি বেকাব।

ব্যাখ্যার স্মবণ পিছলে যায। লক্ষ্য হযে ওঠে নাগবিক পটভূমিতে লোকায়ত অনুষ্ঠান :

ঝর্না-পাহাড-বহ্তা স্রোত। সবুজ বনানীব নিবিড সমারোহ। কৃত্রিম সৃজন। শহবের বুকে গড়ে তোলা হয়েছে টবের ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক ভূঁই। প্রাকৃতিক প্রতিবেশে সাজানো হযেছে বিশাল অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ড ঘিরে জডো হয়েছে নব-নাবী। হাতে হাত ধবে কোমরে হাত জড়িয়ে নৃত্যচটুল ছন্দে আগুপিছু করছে। দমকা হাসিতে উথলে পড়ছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢেউ জাগছে। ক্লান্ত হলে থেকে থেকে শৃঙ্খল বিযুক্ত হচ্ছে। চলে যাচ্ছে পাশে বাখা কলসির কাছে। কলসি উপুড় কবে গলায ঢালছে তরল দিশি। আগুনের বিহবণে মাযাময অপার্থিব দ্যোতনা এসেছে পবিবেশময়। রহস্যালোকের প্রেক্ষিতে গানে গানে নাচে নাচে উদ্দামতা তুঙ্গে। বক্তে কেবলই সুর বাজে। সুবেব ভেতব কথকলি শুনতে ব্রতীন উৎকর্ণ। শুনল ·

চিকা জরেইউ পান জোবেড
ঘুঘু মাংসা হাপচা
ওকই মালাম মালাম
বনেইউ
ওকই আসন হেপা

অর্থ বোধগম্য হয না। শুধু বুঝল সুরে ছন্দে বর্ণে উৎসবের আশ্বাসেব বেঁচে থাকাব বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে। নাবী আছে। সুবা আছে। ঝলসানো মাংস আছে। পায়ে আছে নৃত্যের ছন্দ। মদালস কণ্ঠে আছে সুরেব মূর্চ্ছনা। কলকাতার বুকে বানানো প্রকৃতি নিলাজ প্রমোদগন্ধী উৎসবে ভাসছে। ভাবা যায!

কাঁসর-মাদল-কাড়া নাকড়াব সুবে বাতাসে বিদীর্ণ। যৌবন উদ্দামতায মাদকতাময তাণ্ডব। কলকাতা এক প্রমোদ বরণী। হাঃ হাঃ হাঃ।

অনেকটা এগিযে পথপ্রদর্শকেব হুঁশ হয যে অনুগামী বিচ্ছিন্ন। পাশে নেই। পেছনেও নেই। সঙ্গীর খোঁজে পিছু হটে। অনেটা হটে এসে সঙ্গীর খোঁজ পায। নিকটতম হয়ে কাঁধে মৃদু থাবা বসায।

ব্রতীনেব বিভোরতা ছিন্ন হয। শুনতে পেল পথপ্রদর্শক ধারাভাষ্য দিচ্ছে।—ওবা সব এসেছে বাঁচি থেকে। গর্ত খুঁড়েছে। বুজিযেছে। অনেককিছু তৈবি কবেছে। কাজ শেষ। কাল ভোব ৪-৫০-এর বাঁচি প্যাসেঞ্জাবে চলে যাবে। আব হযতো ফিবে আসবে না কোনোদিন। কোনো ঠিকাদাবেব হাত ধবে এক একজন চলে যাবে বায়পুর-গাজিযাবাদ-হরিয়ানার নানান মুলুকে নযা টাউন বানাতে। ওরা চলে যাওয়াব আগে সারা বাত পবব কবে। তাঁবুতে ঢোকে না। চলুন যাওয়া যাক।

তাগাদাব চোটে ফেব পথ চলা। মেট্রো গলি হযে মতি শীল স্ট্রিট। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হযে ওযেলেসলিতে ঢুকল। বোড থেকে লেন, লেন থেকে বাইলেন পরিক্রমা সেবে আলো-অন্ধকাবময স্যাঁতসেঁতে এক সংকীর্ণ পরিসবে এসে পথ চলা শেষ। বোঝা যায় এখানে

অন্ধকারের বিক্রম ২৪ ঘণ্টা। ব্রতীন প্রত্যক্ষ করল বিদ্যুৎ আছে। বিদ্যুৎ দিয়ে অন্ধকারের ধার মেরে দেওযার পৌর প্রতিষ্ঠানিক চেষ্টা আছে। আপন মনে ব্রতীন হেসে ফেলল। চেষ্টাটা মনে কবিযে দেয় ভারতের স্পুটনিক ছোঁড়ার সংবাদ। যে স্পুটনিক মহাকাশে যদি ওড়ে ৩ বার তো আছাড় খায ৭ বাব। বিদ্যুতের ছলনায ছমছম করে গা। ব্রতীন শংকা প্রকাশ কবে।—দেখা কবে লাভ হবে কী!

প্রশ্ন ঝুলে বইল। পথপ্রদর্শক কোনো সাপটা জবাব দেয না। বিস্ময়াভূত অভিব্যক্তিতে ঝরে গূঢ় ইশারা। যা চণ্ডীদাসী আস্থা মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ মনে গেঁথে দেয আশ্বাস।

আশ্বাসিত ব্রতীন জবাব না পাক শুনতে পেল হাঁক।—ক্ষীর খাবেন। ক্ষীর। বেঙ্গলি ক্ষীর।

হেটো ধুতি পবিহিত আডবানী গোঁফের এক সুগঠিত কাঠাম ব্রতীনেব সামনে খাড়া হয। মাথা থেকে লাল শালুতে মোড়া মাটির হাঁড়ি মাথা থেকে নামায। পাদদেশে বাখে। গামছার বিড়ে খুলে ঘুরিযে ঘুরিয়ে বাতাস লাগায়। ঘাম মোছে। ধাতস্থ হলে কৃৎকৌশল বোঝায ফেরিওযালা।—আসলে বাঙালি ক্ষীর। ঘন করে জ্বাল দেওযা দুধ। বাঙালির কাছে যা ক্ষীব অবাঙালির কাছে তাই কুলপি। তফাত বলতে একটা জমাট। আব একটা তবল। একটা ক্ষীর ক্ষীবই। আব একটা ছাঁদে বন্দি হযে কুলপি। আমি দাদা ক্ষীবকে ক্ষীর বলি। যাবা সাপকে রাতে লতা বলে তাদেব দলে নেই। দুটো মাত্র আছে। মেবে দিন।'

গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক গোলাপ গোলাপই। সার বাক্য। ক্ষীর বা কুলপি কিছু এসে যায না নামে। মাল তো এক। জ্বাল দিযে দিয়ে ঘন কবা দুধ। দুটোই ব্রতীনের কাছে উপভোগ্য খাদ্য।

প্রতিযোগিতা হলে ওইসব ভাদিলাল-কোযালিটি-বোলিক-তুলিকা শেষ বাঁশি বাজার আগে পাততাড়ি গুটিয়ে চম্পট দেবে। বন্ধু উৎপলের সাফ বায আইসক্রিম বনাম কুলপি? কীসে আব কীসে। চাঁদে আব পোঁদে।

কুলপিব ইদৃশ মূল্যায়ন সত্ত্বেও অন্য এক উত্তেজনায় টান টান ব্রতীন হ্যাংলা বিবহী।

লোভের অন্তর্জলি। ঝোঁক আসে পর্যবেক্ষণে। ইতিমধ্যে পথপ্রদর্শকের সঙ্গতায় গন্তব্যেব আঙিনায় পা পড়েছে। সম্পন্নরা আদব করে যে পরিসবকে বর্ণনা দেয় ডাইনিং স্পেস বলে—এখানে সে গৌবব খাটে না। তবু ভোজের আয়োজনে সস্তা নড়বড়ে চেযার টেবিলের ব্যবস্থা আছে। গোছানো ঘবকন্নায আদবযত্নের ছাপ স্পষ্ট। গাঁটরি বাঁধা মুসাফিবের আবার ঘরকন্না কী—ধারণাটা ভ্রম। উপকরণ সস্তা দীন এবং ম্লান। তা হোক তবু আছে। সেট বা ম্যাচ করা বলতে যা বোঝায় তা বিরল। যখন যেমন অর্থ সমাগম হযেছে হাট ফুটপাথ থেকে দরাদবি কবে সওদা করা হযেছে আসবাবপত্র এবং টুকিটাকি ভোগ্যপণ্য। কচি এবং দামে সামঞ্জস্য নেই। দড়িতে অন্তর্বাস শুকোচ্ছে। রথেব মেলা থেকে কেনা আলনায় গোছানো আছে ব্যবহার্য পোশাক। বাতিল শাড়ি দিযে তৈরি পর্দা জানালায় দরজায ঝুলছে। দরিদ্র হলেও গৃহস্থালি গৃহস্থালি ভাব চোখে পড়ে। অন্তর্গতে চাপ চাপ উদ্বেগ। ফলে পর্যবেক্ষণেব ঝোঁক ওপর ওপর। দৃষ্টি মনস্কতা ছাপিযে কানে ঝাপটা দেয় শব্দতবঙ্গ। ভেতরে চলছে কথা

নিয়ে মাকু ঠেলাঠেলি—বসাও। টাইম লাগবে।

এই সময় ধুতির ওপর হাফসার্ট পবা এক পুকষ চৌকাঠের ওপরে দাঁড়ায। হাঁকে : চাই বেলফুল মালা।

ব্রতীন দেখল কবজিতে জড়ানো এবং ঝাড়িতে মালার স্তূপ নিয়ে অপেক্ষায় লোকটি। সুরেলা গলায় সে হাঁকছে।—বৈশাখে নবীন ফুলে, ভ্রমর বেড়ায় ডালে ডালে।

ভেতরে তখন কথা কাটাকাটির জের চলছে। পথপ্রদর্শকের গলায় আচমকা ধাতানি।—ভাবিস না তোর গর্ভের কাছাকাছি যেতে ছোঁক ছোঁক করছে। বলছি ও খদ্দের হযে আসেনি রেখা, এসেছে অন্য দরকারে।

—ও কাগজওয়ালা বুঝি। ভাগাও। ফালতু রোজগার নষ্ট।

—আবে না-না। এ অন্য লোক। এসেছে অন্য দরকারে। ঠেকায় পড়ে। চট করে একবারটি বাইরে আয়। সাজতে হবে না। যেমন আছিস তেমন আয়।

ব্রতীন হতবিহ্বল। ওর সেই ফকিরেব দশা। ভিক্ষে চাই না মা। কুকুর সামলাও।

নদীর বর্ণনা

আবদুস সামাদ

সইফুলের দুঃখে কেন পদ্মফুল রুমাল হাতড়ায়
সইফুলেবা জানে?
বিপত্নীক বুড়ো কেন কিশোরী দাসীকে রোজ
জিলিপি খাওয়ায
কিশোরী জানে না।
পুলিশেব রুল সেও মাঝে মাঝে গ্লিসারিন খোঁজে।
খড়ের বাছুর চেটে দুধ দেয় অবলা জননী।

এমনি বিবিধ জানা অজানার কাঁধে ভর দিযে
হেঁটে যায় আমাদের আলো অন্ধকাব।
শিশির তারই তো অশ্রু রোদে তার ক্রোধেব সংবাদ।

অলৌকিক ভ্রমণ

নমিতা চৌধুরী

তুমি যে শব্দটিতে জোর দিযে কবিতাটি
পড়বে-ভেবেছো আমি ঠিক সেখানেই
তোমার ইচ্ছেমতন শব্দ বসিযেছি
তোমার পড়তে ভালো লাগবে বুঝে দু'একটি নদীপথকে
এইদিকে বাঁক নিতে বলেছি। গিরিখাতের মধ্য দিযে
সার্চলাইট ফেলে মন্থর গতিতে বেলগাডিব যাত্রাপথ
ঘুরিযে দিযে ভাবছি, জানি তুমি পাহাড়েব ঢালপথে
ধাপচাযেব পাশে বসবে খানিকক্ষণ
থাকুক না ফড়িং-এব ওড়াউড়ি, কিছু বুনো নীল ফুল,
সবুজ চা-পাতাব সুঘ্রাণ। শেষ বিকেলেব কমলাবঙেব বোদ
তোমার মুখে এসে পড়ুক। ধীবে ধীবে তোমাব প্রতি বোমকূপে
জেগে উঠুক অনির্বচনীয ভাষা

একমাত্র তুমিই জেনেছো কোন অলৌকিক শব্দেব বাগানে
তুমি ভ্রমণ সেরেছো একা-একা

সূর্যগ্রহণ

রমেন আচার্য

যে কলমে পদ্য ঝরে, সে কলমই মৃত্যুদণ্ড লেখে।
একদিকে স্পর্শ মানে প্রেমের স্বীকৃতি, অন্যদিকে
সেই স্পর্শ—অচ্ছুত, অচ্ছুত!

খর্বাকৃতি মানুষের বিনীত ছায়াকে
পড়ন্তবেলার সূর্য দীর্ঘতম করে
পদতলে এনেছিল। চমকে তুমি
দু'হাত ছিটকে সরে গেলে।

বিশ্বপরিক্রমা শেষে সূর্য এই অন্ধকারে এসে
নিজ অক্ষমতা বুঝে বিষণ্ণ হতেই
রাহু তাকে গ্রাস করে নিল।

অন্ধকারেব গ্রাসে ডুবে গেল বর্ণপরিচয়,
মঙ্গলপ্রদীপ, আলপনা আর উদ্‌গত সঙ্গীত।
নিজেকে জ্বালিযে নিয়ে কেউ
পোড়াতে পেবেছে ওই সর্বগ্রাসী কালো।

কিছু কিছু ক্যালেন্ডাব ছাড়া তাঁদের ধূসব মুখ
কাবও বুকে আজ বেঁচে নেই।
যে কলম আলো লেখে, যে কলমে আছে মৃত্যুবাণ
নির্বাক সে কলম আজ
নিলামে উঠেছে।

জেগেছি ঈশ্বরের মতো একা

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

...আর তাবপর
সবকটা ঝাড়বাতি নিবে গেল একে একে।
তুমি বললে,
পুরনো বন্দর থেকে নাবিকেরা চিঠি দিযেছে নীল খামে,
আর সেই খামের ভিতরে
তাদের ধূসর শার্টের বুক থেকে ছিঁড়ে নেওযা কালো কাপড়ের লেবেল,
তাতে লেখা পরম কারুণিক তুমি!

ও আমার হাঁটুজল স্কুলপথ,
ও আমার পাপলগ্ন কৈশোবের ব্যর্থ এপিটাফ থেকে তুলে আনা
একটিমাত্র মৃত ক্রিয়া-বিশেষণ,

ও আমার স্বপ্নাদ্য নীল,
দেখো ওই সূর্য ডুবল মেঠো ঘাসে হৃদযের দূরত্বে একা-একা,
মহাপ্রাণ ইন্দ্রিযেব শেষ ধাতু চূর্ণ হল ক্লীব বিকিবণে,
আব ক্লীবতায় সকলই হারাল!

ক্লীবতায় সকলই হাবাল,
আর তুমি বললে,
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে,
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায পূর্ণমেবাবশিষ্যযতে!

তুমি বললে,
প্রেম এক ত্রিমাত্রিক প্যাগান ট্র্যাজেডি ছাড়া কিছু নয়,
এই জেনে'
পুরনো বন্দর থেকে চিঠি দিয়েছে ধূসর নাবিকেরা,
তারা দেখেছে
কবন্ধ জলযান যেন মৃত্যু-নিরপেক্ষ কোনও বিমূর্ত মাস্তুল ঘিরে
জেগেছে ঈশ্বরের মতো একা।

জেগেছি ঈশ্বেবর মতো একা,
আর,
সবকটা ঝাড়বাতি নিবিয়ে দিয়েছি একে একে।
তুমি বললে...

বুবাই, তোকে

সৌমনা দাশগুপ্ত

আগুন জ্বলেছিল হঠাৎ, নিভেও গেল বাষ্পের ধরনে।
সোপ-অপেরা নয়, ভালোবাসি শীতের ধারাবাহিক।
এই দুদিন বাদেই আসবে সে তিথি,
জন্মের ধূসর ছাড়িযে চলে যাব আরও একটা বছর...
না কি সেই শীর্ণ মোমবাতি, যার জ্বলে ওঠাই মৃত্যু?
ঠিক এভাবে বলতে চাইনি, ঠিক কীভাবে বলব
আমার বং পুড়ে পেকে গেলে কতবাব চেষ্টা কবেছি
একটা বিবাট পুষ্পপাত্র লিখবার।
ফুলের বোঁটায জমা বিষ—মা বলত, ছুঁস না কষ লাগবে
আব কবরীব বীজ, ওদেব থেকে দূরে দূবেই থাকিস।
কত কীই তো বলত মা, কিছুই পারিনি।
মেঘ পুড়ে গেছে সেই কবে, বৃষ্টি কত দূব।

শীতেব ধারণা হাতে বসে আছি..

তোর ঠিকানা পাঠিযেছিলি—ই-মেল অ্যাড্রেস।
আমি তো সবটাই কাশফুল, চবের উদ্দামে ভাসি ডুবি।
ঐ দেখ, প্রথম টেলিগ্রাফেব তার,
তাব নিচে ভিজে উঠি বৃষ্টিতে। এমন
কর্কটবেখার এ প্রান্তে জমেছে শুধু·ওতঃপ্রোত,
ওদিকে অতীত ফাটিয়ে কত স্রোত!

ওকে তুই একটা হিমেল ঋতু দিস,
দিযে দিস শেয়ালকাঁটাব ঝোপে বিযণ্ণ হলুদ—
তুলতে চাইলেই যে ফুল ভেঙে যেত অবসাদে।
তোর মনে পড়ে চোবকাঁটা? ইচ্ছে করে গেঁথে তুলতাম
কাপড়ে জামায, একটু একটু কবে খুঁটে নেব বলে।
কিংবা ধর সেই মধুবাবুর ঘাট,
হঠাৎ খুঁজে পাওয়া বুনোগোলাপেব লতানো আভাস?
আর সে ঘবটা, সেই যে আমরা ভাবতাম

ঘবের ভেতরে কেউ থাকে, কেউ থাকবে
কোনো জলদস্যু অথবা ডাইনি;
আমি যেন কেশবতী কুমারী, তুই রবিনসন।
অবশ্য যুদ্ধ জমেনি ঠিকঠাক।
দস্যুব নিপাট বর্মের তলে আলাদিন—
আশ্চর্য প্রদীপ থেকে নেমে এসেছিলেন ঈশ্বর!
এবপব কীভাবে বল, আমি তো কিচ্ছু ভাবতে পারি না এরপর।
ক্রুশের আহ্লাদ ব্যেপে সেই বলে—ব্লাডিবিল!
একটা জং ধরা ছুবিব উত্তরপ্রযাণ তোকে তুলে দেয়,
যে ছুরি বক্তের নিষ্প্রভতা বলেছিল,
তুখোড় আবেশ থেকে খুলে পড়া হিম।
ঠিকমতো ডাকিনীসিদ্ধ হতে পারিনি সেই দিন।

মনে আছে, ইস্কুলেব চলন্ত ফোযারার পাশে ডেকেছি
নতুন দেখাবো বলে—হঠাৎই সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম
নবীন স্তবক দিল, ঘাসেব শিবায শিবায কত দীর্ঘনিশ্বাস!
ঈষৎ বেগুনিতে ঠেস দেওযা স্বপ্ন আমাব, খুলে যায় মাতাল প্রদাহে।
ফুঁ দিযে উড়িযে দিই তোব দিকে, এতটা ব্যথিত বং,
বাকি থাকা অনেক শৈশব—দেহ জুড়ে আনত বিষাদ।

বহুদূর থেকে উড়ে আসা তোব কথা টুকবো টুকবো হয সাইক্লোনে।
বাতাসেও অনেক ডুবোপাহাড় আছে, তুই দেখিসনি?
আসলে এসব কিছুই পাঠানো যায না ই-মেলে।
একদিন আমিই, একদিন তোব দেশে অনেক বরফ,
তুই কেটে উড়িযে দিবি সবটা।
তুই কি সত্যিই উড়িয়ে দিবি সবটা!

তোমাকে

দুলাল ঘোষ

এখন তুমি মুখবন্ধে থাকো
এলোমেলো অনেক কথাব ফাঁকে
তোমায দিলাম ঠাঁই

এবাব আমি আসল কথায় আসি
যুক্তি আর পাদটীকাব আলোয়
তথ্য দিযে বোঝাই তোমায কী কী আমি চাই

বাঃ ঠিক ধবেছো—মিলছে সবটাই

বাকি বইল উপসংহাব—
কী লিখি কী আব বাকি
আকাশ পাতাল ভাবতে গিযে শেষে
উৎসর্গে লিখে ফেললাম তোমার নামটাই

বুলাইচাঁদ

শ্বেতা চক্রবর্তী

ওই যে ওই মণিহাবী, সাদা আকাশের মতো উন্মুক্ত নির্জন
গঙ্গা ও কোশীর সঙ্গমরেখা ধ'বে
উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ানোব ছলে আমাদেব বনফুল আর তাব
বাঘা কুকুরেব দুটি পা ছুটছে ছুটছে তো ছুটছেই
ওখানেই সব দৃষ্টি থাক্
একাদশীব দিন মা গো কেন তুমি উপোসেব শেষে
বাঘাকেও ডাক দাও—'মহাপুরুষ বে!'
আমি? আমিও কি দুঃখপুরুষ নই?
মহাপুকষেব চেয়েও নিবিড়, গভীর, উচ্চতায দীর্ঘদিনমান যাব
কেটে কেটে ধুলোব শরিক?

আমি আবো আবো আরো বড় ভরপুর মহাকালেশ্বর,
আমি লিখব ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোক,
আমি লিখব অন্ধকার পাশাপাশি কেন চলে
আবো দূর অন্ধকার পথে
আমি লিখব অঙ্গের সৌরভ ঘিরে প্রদীপ আগুন হয়ে জ্বলে,
আমি লিখব মুষলধারার অর্থ মুছেফেলা দুঃখ-ক্রোধ
আগুনদহন,
আমার বিবাহ হবে আলোক-পরির সাথে, মা।

বাঘা, তুই, তুই শুধু মহাপুরুষই
শাপভ্রষ্টতার ছলে, তার আবার একাদশী। তায় আবার সংস্কারের বশে,
তাও আবার আমারই মায়ের কোলের সবটুকু
তোকে ছেড়ে দিয়েছি বলেই। আমি,

কোল থেকে উড়ে যাওয়া দুঃখ-চাঁপাফুল।

কল্পচোখের ফোকাসে

অমিতাভ চক্রবর্তী

এও তো আর এক সুজন মাঝির গল্প
যাকে আমি দেখি কল্পচোখের ফোকাসে বারবার
আর সম্মোহনে কারুফ্রেমে ভূরি ভূরি ছবি আঁকি তার
তাতে দিলদার হয়ে রং মাখাই লাল নীল কালো ফিকে
আরও নানা রঙে তুলির টানায় সবকিছু মিলেমিশে
একাকার হয়ে শেষমেশ পটে খোলতাই হয়ে ওঠে
সাতরঙা এক নির্বিকল্প আমার ভালোলাগার রামধনু।

সুজন খালি কি অতীত? তা নয়—হালেও তো এটা সত্যি
এখনও তো চাঁদ ওঠে ফুল ফোটে সূর্য তেজে জ্বলে
বাতের আকাশে ভরা তারা বাতাস নিজের ছন্দে খ্যালে
পাখির কাকলি শুনে আঁধার দারিয়ে ভোর হয়
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তাও চক্রাকারে আদি অকৃত্রিম

পাতা নড়ে জল পড়ে মেঘও ডাকে মন্দ্রে অবিকল
মানুষেব দবকাবে জান বাজি বাখা খালি মানুষই সম্বল।

ধাপ থেকে ধাপে এগোনো—এই তো জীবনশিক্ষা
সাবেক জানতে উদ্‌গ্রীব আমি তুমি আব সবাই
পৃথিবী আজও সচল—কাবণ অন্তে ফল্গু সুজন
কাল থেকে কাল উত্তরণেব সে-ই তবে হকদাব
বর্তমানও তো পায না কল্কে সুজনকে বাদ দিযে
সব উবে গিযে আমরা যেকলে সেকাল বর্তমান
বিষ হতাশায ছাই ঢেলে গাও সুজনেব জযগান।

তবু আমি আছি

শঙ্কর বসু

এই দ্যাখো জন্মদাগ, নাভি, নীববসাযব
পটিযে পাটিযে নিযে গেলে ঝোপেব আড়ালে
ঢেকে দিলে চোখ
ভুলে গেছ তুমি ছিলে আমার প্রথম গ্রাহক।
আবেগে ভাসিযে দিযে নিযে গেলে শহবে
দাঁতে নখে পিষে দিলে কুঁড়িভাঙা স্তন
ছোটো ছোটো আশাগুলো কামড়ে খেলে ঘৃণ্য হাঙব।

নষ্ট মেযেব নষ্ট সবুজ
স্বপ্নহীন এঁটোকাটা খেয়েও এত অবুঝ।
মুছে গেছে নাম
আজ তুমি পাবুল, লক্ষ্মী বা মিস মনোবমা
হাযেনাব দল,
চেটে খায কাঁচা মাংসে ভেজানো থ্রি এক্স বাম
তবু, তুমি আছ শিবোনামে
অশ্রুব গভীবে কান্না, নদীব ভিতরে মাছ
যেমন শুযে থাকা আত্মার গভীরে বক্ত ঝবে
কফিনে বাষ্প ছুঁড়ে দাও তুমি অন্তিম মর্মবে।

বাংলাদেশ

অজিত বাইরী

অই যে দ্যাখ্‌ছেন, ওপারে বাংলাদেশ, মাঝি বলল।
আমরা পার হচ্ছি ইছামতী, চাঁদ উঠছে।
আমাদের ডিঙিনৌকোর মতোই ভাসমান
বর্ষা অতিক্রান্ত শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ।
ওপারে যে বাংলা, এপারেও সেই বাংলা—
একই ভাষা, একই মাটি, ইছামতীর তীর ছুঁয়ে
একই বনরেখা—কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি
ভাবালুতায়, দিবাস্বপ্ন দেখা মানুষের মতো
অসম্ভব বাসনা হঠাৎ উঁকি দেয় বুকে—
যদি মেলানো যেত দুটি ঢেউকে!
দুই পারের মানুষ আর দুটি দেশকে যদি মেলানো যেত!
সংবিৎ ফেরে মাঝির কথায়, অই দিকে দ্যাখেন,
অই হল সীমা, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।
চোখ রাখি আকাশে, সন্ধ্যার আকাশ উজিয়ে
পুরে পশ্চিমে দেখি শুধু পাখিদের পারাপার।

প্রত্নরমণী

রমা চট্টোপাধ্যায়

এখানে সিঁদুর ওখানে আয়তি শাঁখা
বাহিরে সাজানো অনন্ত শিলালিপি
ক্ষয়ে গেছে দূর ভিতর মহল প্রান্ত
বুকে ডাকে কোন দূরাগত জলপিপি।

পাথরপ্রতিমা সন্ধ্যালগ্নে করে
মনে মনে জানে সমাজ সমর্পিত
দু-চোখ ভাসানো সে প্রেমের কলরবে
নিষ্ফল দিন বিরহে অবসৃত।

চিরজনমেব কবে কার কোন রাধা
ইতিহাস খোঁজে শতাব্দী জুড়ে প্রেম
প্রত্নবমণী সৃষ্টিলগ্নে জানে
চিবদিন আমি তোমাবই প্রণয় হেম।

ঈশ্বর ঈশ্বরী

সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী

ভালোবাসলে কী হয কে জানে
জলে যায, ধুলো পাযে হবে হযতো
ভালো না বাসলে কী হয সে জানে
আমি যতবাব ভালোবাসতে গেছি
দু-হাত বাড়িযে বুকে নিতে গেছি
দেখি কাঁটা ও বক্তে নিজেকেই বিঁধিযে ফেলেছি

ধুর ছাই বলে, প্রেম আমি জলাঞ্জলি দিযেছি শ্মশানে
সে তখন কাঁদে, কেঁদে উঠে আলো হয, গান হয, বৃক্ষ হয, জল...

ভালো না বাসলে কী হয সে জানে
আমাব দু-চোখে, আমাবি ওষ্ঠে ও অধরে থামে
ভালোবাসলে আমিই ঈশ্বব
ভালোবাসলে আমিই ঈশ্বরী।

আজকাল

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

১

কুযাশাব পর্দাব উপব ফুটে উঠছে জ্যোৎস্না, বন্ধুব হাতেব স্পর্শেব মতো
ছুঁয়ে যাচ্ছে বুক, জ্যোৎস্নাব আলো। ভর্তুকি বাত্রিব জন্য নিস্তবঙ্গ অন্ধকাবেব নদী
ফুলে ফুলে উঠছে। সাত সমুদ্র তেবো নদী পাব হব বলে কিনেছি জ্যোৎস্নাব সজ্জিত
জাহাজ
ফুল ফুটছে আলো ফুটছে ধানলোপাট নিমগ্ন নিস্তব্ধতায শুধু কুযাশা আব কুযাশা।

২

স্নায়ুতে সঙ্গীত। তুহিন উপসাগবের ঢেউ। তুষার হানছে পৃথিবীতে শীতার্ত
আলোব রশ্মি। শব্দ নকল কবছে কবিতা, কবিতার পিঠে আরো অনেক কবিতা—
পদ্যের অবতাবণা করছে যে সময, তাকে ঋজু হতে বলো। স্তব্ধতার সম্পৃক্ত সময
আমাকে খুঁড়ছে, যেভাবে কবর খুঁড়ে বের হয বন্দি আত্মার মৃতদেহ। স্বপ্ন নয় নির্বাসন।
এই গান যেন সমুদ্রের ঢেউ তুষাব ঝড হানছে অবিরত।

ফাঁক, চিচিং

নাসের হোসেন

একটা ছোট্ট ফুলকির থেকে চলো আরো অজস্র ছোট্ট ফুলকিব
দিকে যাওযা যাক, পার্ক থেকে বেবিযে আসছে বংবেরঙেব
পোশাক পবা ছেলেমেযেরা, ঘাসেব সবুজ আব বড়ো বডো
গাছেদের সবুজ একাকাব, চিচিং ফাঁক বলতেই
সেইসব ছেলেমেযে পার্ক খালি কবে বেবিযে পডে বাস্তায
সেখানে গাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে উধাও, ফলে বাচ্চাদেব
ছোটাছুটিতে কোনো অসুবিধে বইল না, তাদের কচিকণ্ঠের
আওযাজ চাবপাশেব যাবতীয দূষণকে বিলীন কবতে থাকে

ঝড়

ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্তব কিলোমিটাব বেগে আসছে ঝড
সতর্ক হয মাঝি—,
নদীব বুক থেকে তডিঘডি তীবে ফেবা
অথচ আবহাওযার কথামতো এল না ঝড।

দু'দিন পব হঠাৎ-ই এল ঝড়
হিংস্র বুনো মোষেব মতো বোষে
গিলে খেল বিদ্যুৎ, গাঢ অন্ধকাব

দৈত্যেব দাপটে নষ্ট হল ফসল
উপড়ে দিল বড বড গাছ
ঘর-বাড়ি, কলকাবখানা দিল গুঁড়িযে
খাল-বিলে নদীব স্রোত নামে
ডুবে যায় পাড়া
এ যেন অন্য কোনো দেশ অচেনা, অজানা।

উত্তববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ তছনছ কবে
ঝড় গেল সরে
চারিদিকে হাহাকাব
দুপুব মুছে বাত্রি নামে।

তবুও তো কেউ থেমে থাকে না
এদিকে ভাঙন, ওদিকে সৃষ্টি
ঝড়েব বাতে কবিব অভিসাব।

ভাঙনের শব্দ

শ্যামল সেন

১ কত অন্ধ বাত গেছে জ্যোৎস্নায ভেসে
মা আমাব কোলেপিঠে পদ্মাকে ভালোবেসে
একদিন পদ্মাবতী হযেছিল,
পশ্চিমেব আলো মেখে আজ তাব ম্লানমুখ
জলমগ্ন হযে আছে গঙ্গাব অতলে।

২ বাপ-মা দিযেছে চোখেব জলে বিদায
গৌবীদানে মেযে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি,
কিছুকাল পবে বাক্ষসীবেলা শেযে
বসতবাড়িতে তিনজন মিলে গলাগলি কবে কাঁদে।

৩ শূন্য হাত পূর্ণ হল যেদিন
ভেসে গেলে তুমি ঘূর্ণিব চোবাজলে,

চোখের তাবায় ছিল যে-আগুন ছাইচাপা
চিরজন্মের মতো নিভে গেল নিশ্চুপে।

৪. বাবো ঘব এক উঠোন নিযে জন্মেছে যে-মানুষ
টুকরো সুখেব লোভ এসে তার গাল চাটে।
শেষেব সে-দিন ঘনিয়ে এলে
মুখে একফোঁটা জল দেবে কে? কেউ নেই কাছাকাছি,
একবিংশতিব ভালো মানুষেবা বলে :
এই তো বেশ, আমবা সুখেই আছি।

৫ ডাকবাক্সেব হাজাব চিঠি কোন্ দেশে উড়ে যায?
ছেলে চলে গেছে ঘব ছেড়ে
মাব লেখা শেষ চিঠিটা আজও
কেন সে পেল না হাতে।

সংবাদপত্রে যা উহ্য

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মহীন ঘোড়াটি কাল ভোবে মাবা গেছে।

হাওযা ছিল না বুঝি শূন্য রেড বোডে।

শূন্যতা নয়, সে আব কোথায পাবাব
পেট্রল-হাউই এসে একটু ঘেঁযেছে

অত সজলতা পাবে নাকি
বিষধোঁযা নিতে?
পাবে নাকি, সবে
যেতে, হাওযা ঘুবে গেলে, সুযোগ বুঝে
ঘাসেব ব্যথাব দেশ ছেড়ে!

সময়কে বলি 'দাঁড়া'

কাজল চক্রবর্তী

—কে বলো আসবে এই অবেলায নির্জনতা ছাড়া
—কী যে বলো ছাই, শুকিয়ে যাচ্ছে সব বস-কষ, জল দেবো এক ঘড়া!
—বলেছি সঠিক এসেছিল উড়ে মযূবপুচ্ছ ঝড়ে
তাকে এতটুকু আদব কবিনি অনাদবে গেছে সরে
—ভালোই করেছ মযূবপুচ্ছ কাকেব কী প্রয়োজন—

—কে বলো আসবে এই অবেলায নির্জনতা ছাডা
—তাকে নিযে চলো দুজনে থাকব, সমযকে বলি 'দাঁডা'

যুগলবন্দি

অলোক সেন

অনেক দিনেব পবে
আমবা যুগল
মধ্যবাতে গাইছি যে গান পবস্পব

আমবা যুগল
ওঃ আনন্দ,
দেখছি তোমায খুব নিকটে

বইয়ের পাতা ঢাকতে ঢাকতে

আমবা যুগল
দাঁড়িযে আছি সুস্থিব,
মৃত্যু এবং অন্ধকারেব কাছে

প্রস্তাব

কানাইলাল জানা

প্রতিদিন কাগজে এত খুন ও ধর্ষণেব খবব পড়ি যে
তাবা মবচে ধবা পেবেক হযে বেঁধে আমাব বুকে।
তাব জ্বালা জুড়োতে গাছতলায যাই। গাছ আমার কানে
কানে বলে ধর্ষকাম মানুষেব চোখে আবো মধু ঢালো।
তাদেব বুকে আবো জ্যোৎস্না ভবো, ক্রুশবিদ্ধ চিন্তাকে
ভাসাও আশ্বিনেব মেঘে।

তখন আবো ঘন কবে আমাব বেদনা থেকে মধু ঝবাই।
আবো অন্ধকাব নাড়িয়ে জ্যোৎস্না ছড়াই, যে-কোনো
মেঘকে ডেকে বলি বর্ষা শেষ হলেই আমাব হাত ধবো
যাতে দেহ বক্তশূন্য কবে একটুখানি তুলে ধবতে পারি ভরসাব
এলাকায.

ভাঙাগড়া

রমা সিমলাই

অস্ত্যমিলেব পাণ্ডুলিপি নাই বা এল হাতে
নাই বা আসুক হিংসুটে চাঁদ আমাব বাবান্দাতে
জটিল জটায মন্দাকিনী উৎসমূলে শিব
নাচছে আগুন নাচছে আগুন কামার্ত উদগ্রীব
হচ্ছে কোথাও গোপন শলা শঙ্খচূড়ে বিষ
ঈর্ষাকাতব মেযেব বুকে জ্বলছে অহর্নিশ
থামছে কোথাও সুখেব নাড়ী অস্তাচলেব শেষে
রূপকথাবা হলুদ নদী সকূলে যায় ভেসে
অন্যবকম যন্ত্রণাতে জীবন খেলে পাশা
ভাঙব বলে তাসের সে ঘর তোমাব কাছে আসা

সম

সুস্মেলী দত্ত

কিছুটা সুদূবজলে তোমাদের স্বচ্ছ চলাচল
নিযমিত ডুবুবিব অনুকূল সফেন উৎসবে
আমরাও মাতি।
কুডিযে নিযেছ আজ অনায়াস যাপিত জীবন
নিমেষের ব্যবধানে স্বাভাবিক জীবিত ও স্থিব
উপকূল সহবাসে আমবাও চুপ
সহজ মাত্রায়।

কষ্ট তাড়াতে

শ্রাবণী ঘোষ

কষ্ট তাডাতে আমি সমুদ্রেব পাব,
গিযে দেখি সেইখানে কষ্টেব পাহাড।
কালো মাঝি নৌকে, মাঝসমুদ্দুব,
মুখে যেন লেগে আছে, বেদনাব সুব।
ছোটো ছেলে খালি গা, ঝিনুকেব মালা,
নিচ্ছিবে তুই কি খেতে পাস দুবেলা?
প্রেমিকাব নাম লেখে, একটি কিশোব
অন্য পাযে মুছে যায স্বপ্নেব ঘোব।
কালো জলে, ভবা ঢেউযে, সুখ পেতে আসি,
ভুলে যাই সুখ নাই, বাত হয় বাসি।
কষ্ট তাড়াতে আমি সমুদ্রেব পাব
গিয়ে দেখি সেইখনে কষ্টের পাহাড়..।

একটি কবিতার জন্য

অত্রি ভৌমিক

একটি কবিতাব জন্য
মাঝবাতে শিকাবীব বেশ
একটি কবিতাব জন্য
প্রিয শব্দ খুঁজে বাত্রিব শেষ
একটি কবিতার জন্য
নিজের সাথে দেখা
একটি কবিতাব জন্য
হঠাৎ আমি একা
একটি কবিতাব জন্য
ত্যাজ্যমান সুখ
একটি কবিতাব জন্য
কাছে আসে পৃথিবীব মুখ
একটি কবিতাব জন্য
অতলেতে নামি
একটি কবিতাব জন্য
বেঁচে থাকি আমি।

সঠিকভাবে তাকাও

জয়তী রায়

সঠিকভাবে তাকাও,
সে যেভাবে চাইছে সেভাবে নয,
তুমি যেভাবে চাইছো সেইভাবে,

অনেক সময পুবনো অনেক কিছু
ছেড়ে যেতে হয,
নষ্ট ফলেব মতো নষ্ট সময—
ভেবে দেখ নতুন ঘর বানাতে গেলে
তুমি কী কী মশলা নেবে,
কোন কারুকৃতি দিযে তাকে সাজাবে,
হৃদযন্ত্রেব হাওযাকে দূষণমুক্ত কবে
কোন সুগন্ধ ভবে নেবে বাতাসে,
খোলা জানলা থেকে যতখানি দেখা যায
তাব কতটা তুমি ধবে বাখবে
তোমাব প্রতিদিনেব এ্যালবামে,
সেটা তোমাকেই ঠিক কবে নিতে হবে—

সঠিকভাবে তাকাও,
সে যেভাবে চাইছে সেভাবে নয,
তুমি যেভাবে চাইছো সেইভাবে।

অ্যান্টিডোট

ঋত্বিক ঠাকুর

ফ্লুবোসেন্ট নেশা নিয়ে মাতালেব লোফালুফি খেলা।
আলেযা মন্থন থেকে এব চেযে বেশি আব কী শেখাব!
জানতে পাবলাম না
অন্ধকাব আলপনা না আঁকলে অমৃতেব জটা থেকে চাঁদ খসে
পডত বাবোয়াবি বাবুদেব গল্পগাছা হযে।

আমবা দেখিনি কোনও সম্পূর্ণ আঁধাব। পাইনি পাগল চোখ
কেঁদে কেঁদে ডেকে আনবে খুনি বাত। খুঁজিনি তেমন একটা
শ্মশান যেখানে কালান্তক নক্ষত্রেব চিতা বুকে আগলে
ঈশ্ববকে সর্বনাশ শেখাচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানী ডোম।

একেক সময মনে হয ঘুম গিলে খাই প্রতাবক সূর্য অহংকাব
গুলে নিযে আদিম অসভ্য পেগে। সেই ঘুম মাতলামি উলঙ্গ
কবে জন্ম দেবে কুমাবসম্ভব মহাপৃথিবীব। সে বালক দুধ-
দাঁতে ভেঙে দিত কাচেব বোদ্দুব। স্বপ্ন পাযে পিষে দিত
নিযননিযমে গডা কাঙালি মেঘেব তাঁবু।

খুঁজছি জ্যোৎস্নাব কার্তুজভবা অ্যাসল্ট পিস্তল।
এলোপাথাড়ি উল্লাসে ঝলসে যাক
বার্বিব ব্যাটাবি বুক ভেপার ধুকপুক।

জল শুধু

প্রবালকুমার বসু

জলেব উপবে শুধু অন্ধকাব
জলেব গভীবে শুধু কালো
এত বিষণ্ণতা চাবিদিকে, কত মিথ্যাচাব
তবু অন্ধ পাডি দিযে এসে
সেই ঘোলাজল ছুঁল

আমরা আলোক দেখি, নাকি
যা দেখি অন্ধকার
অন্ধ হলে সবকিছু জনান্তিকে
জলেরই আকার

চিত্রাঙ্গদা চক্রবর্তীর দুটি কবিতা

দ্বীপ

দ্বীপ দেখেছো কোনোদিন?
সাদা ক্যানভাসে এক নির্জন বৈধব্য
যেন, দলছুট হাঁসের মতো সাম্যহীন
শস্যহীন তৃণের মতো এক তরল গভীরতা

পরমায়ু

ফুলের ভেতর থেকে গান নিয়ে এসো
ফুলের ভেতর থেকে ঘ্রাণ নিয়ে এসো
জন্ম-তন্তু ছিঁড়ে প্রাণ নিয়ে এসো
ভোরের কবিতা হয়ে ত্রাণ নিয়ে এসো

গোখরো কুসুম

তাপস রায়

অমন শান্ত মেঘের ভেতরে কত ঈর্ষা-বিদ্যুৎ তান
গোপনে গভীরে জমে কত ঘন অভিমান
অলৌকিক বসে থাকে, শুধু তুচ্ছ উষ্ণতায়
গল্পগাথার মতো হঠাৎ কখন ঘর ভেসে যায়

আমার পদ্মপাতারা প্রতিদিন ভেবেছে কৌতুকে
আর নয়, ভ্রান্ত জানালার ওই দু'চোখের সমীপে

আব নয, একা থেকে থেকে গাঢ চুম্বনেব তৃপ্ত দিনও
তুলে দেযা নয, একবাব স্তবেব ভেতব ঘুবে দাঁডানো
যেতে পাবে—নাভিকুণ্ড থেকে লতাটিকে ছিন্ন কবে
ও কুসুম কোথায় উডাল ডানা, স্বপ্নচবে

আদব মাখানো ওই ফুলদানিটিব 'পবে
তীব্র গোখরো এক সাজানো রযেছে গৃহস্থেব ঘরে

বাংলার গান

বিশ্বজিৎ রায়

নীচে জল
ওপবে সুডৌল পৃথিবীতে
আমি একখণ্ড মানুষ—
আমার চেতনাব নীচে খলবল কবে খিদে
খিদেব আগুনে ক্ষযে ক্ষয়ে
ক্রমশ বাঁচাব অনুশীলনে .

পৃথিবী আমাদেব উপেক্ষা কবে
শেখায় এতোলবেতোল গান
আমবা সেই গান খেযে বাঁচি
ঘবে তুলে আনি শস্য—
খবায়-বন্যায ঐ গান
ঢিল বেঁধে ছুঁড়ে দিই বাংলাব ঘবে ঘবে

নিভে গেলে আগুন, জেগে ওঠে
খিদে পুড়িযে পাওযা জ্যোৎস্না,
তাবপব যখন
লিখতে বসি কবিতা
পাতায পাতায ছড়িযে পড়ে অসংখ্য
গ্রহ-তারা-জীবন—
আমাদেব ভাইবোন, আমাদের আত্মীযস্বজন

খচ্চর

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

—আমাব লেখা শেষ হযেছে। শুনবে?

সুপর্ণা সবে এল। বলল, 'শুরু কবো।' চশমাটা চোখে পরে কাগজগুলো গুছিয়ে নিযে স্থিব হযে বসলাম পড়াব টেবিলে। তাবপব একটু থেমে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'তাহলে শুরু করি।'

'আমি অবিনাশ প্রসঙ্গে কিছু বলব।' কৌতূহলী মন নিয়ে আবও এগিযে এল কাছে।

—আর কৌতূহল চেপে বাখতে হবে না। অসুস্থ অবিনাশেব কথা তুমিও জানো। সে কথায লিখছি। জানি না কেমন হযেছে। তবু মন দিযে শুনবে। গল্পেব প্রযোজনে কিছুই বদল কবিনি। তাই গল্পটা অচেনা লাগাব কথা নয।

গল্পেব প্রাবম্ভিক টুকিটাকি

এক পৃথিবীর সামগ্রিক সংকটেব নিরিখে সমস্যা তেমন জটিল নয। বস্তুত পাবিপার্শ্বিক সম্পর্কে তাব অনুভূতি ক্রমশ জটিল হচ্ছিল। আব তাই পাবিবাবিক জীবনেও তাব স্বস্তি ছিল না। কাবণ তার সম্ভ্রম, অফিসেব বাস্তবতা ও ইতিহাস না মেনে সে ক্রমশ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীতে রূপান্তবিত হচ্ছিল। আব সেটা স্ত্রীর কাছে ধবা পডাব ভযে অহেতুক হৃদয় যন্ত্রণায দিনযাপন কবছিল।

দুই তবু বলি, অবিনাশকে আমবা চিনি, অবিবত দেখছি পারিপার্শ্বিকে। এবকম বহু অবিনাশ প্রতিনিযত গল্পেব নাযক হযে আমাদেব বেখেছে অপেক্ষায়, ধৈর্যে ও জিজ্ঞাসায। আমবা কি কেউই প্রস্তুত নই? কোথাও, কোনো ভাবে? আমবা কি যখন তখন যে কেউ অবিনাশ হতে পাবি না?

তিন অবিনাশেব একটা বোগ আছে। ভয পাওযাব। অকস্মাৎ ভয পেযে আঁতকে ওঠে। অহেতুক ভয পিছু তাডা কবে। ভযেব উৎসে কোনো যথার্থ কাবণ থাকে এমন নয। তবু ভয পায, কাবণে অকাবণে ভয। নিছক কৌতুকে ভয। আলতো ধমকে ভয। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্ববে ভয। ভয অবিনাশেব ধাতে। মজ্জায মজ্জায। 'ভয আমাব পিছু নিযেছে' ছত্রটি অবিনাশকে নিযেই লেখা হযেছিল কি না, জানা নেই।

চাব অবিনাশেব বাবা বলতেন, অবিনাশ বিপ্লবী হতে চেযেছিল। কিন্তু কোথাও যেন একটা গোলমাল বেঁধে গেল। পবমা, পড়শিব মেযে, ভালোবেসে ফেলল অবিনাশকে। প্রেমডোবে এমন বেঁধে ফেলল যে অবিনাশেব আব বিপ্লবে যাওযা হল না।

পাঁচ. ভয় পাওয়াটা অবিনাশের ব্যামো। ঠিক কবে থেকে অবিনাশ ভয় পেয়ে অসুস্থ হতে শুরু করেছে, তা ঠিক কেউই মনে করতে পারে না। অবিনাশের বাবা স্মৃতি হাতড়ে বলতেন, চাকরি পাওয়ার পর থেকেই অবিনাশটা যেন কেমন হয়ে গেল।

প্রস্তুতির উৎসপর্ব

গল্পটা অবিনাশের হলেও আসলে অবিনাশের নয়। 'গানের ভিতর দিয়ে, যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে, চিনি আমি, তখন তারে জানি'—এই চেনা বা জানার প্রক্রিয়ায় অবিনাশ কে চিনলে তখন মনে হবে অবিনাশ নিমিত্ত মাত্র। অফিসের 'পরম্পরা' (শব্দটি বহু বামপন্থী মানুষের মুখেও উচ্চারিত হতে শুনেছি) যখন কেন্দ্রীভূত হয় অবিনাশের ব্যক্তি-সংবেদী সত্তায়, ব্যক্তি অবিনাশ যখন হারিয়ে যায় মূল্যবোধেরই ঘোলাজলে, সহকর্মীদের 'খচ্চর' উচ্চারণে, তখন যে সংকট তৈরি হয়, তা তখন শুধু আর অবিনাশে কেন্দ্রীভূত থাকে না, ছড়িয়ে যায় অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে। তাই অবিনাশকে নিয়ে গল্পটা বলার আগে অবিনাশের পারিপার্শ্বিক জনমণ্ডলীর এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

৯

গল্পের কেন্দ্রিকতা

অবিনাশ আয়কর অফিসের কর্মিক। অমুক ভিলার অমুক তলার অমুক দিকে পঞ্চম টেবিলে অবিনাশের অবস্থান। কথিত আছে, উক্ত ভিলা থেকে বহু নাগরিকের পশ্চাতে 'Bamboo' প্রেরণ করা হয়। গল্পের আলোচ্য যেহেতু এটি নয়, তাই, 'কথিত আছে প্রেরণ করা হয়' ছত্রটি গল্পের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে না। বরং অবিনাশের পঞ্চম টেবিলের অবস্থানে নিবিষ্ট হই। অবিনাশের নামে যখন পঞ্চম টেবিল নির্দিষ্ট হয়েছে, অতএব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে ১ম, ২য়, ৩য়, ও চতুর্থ টেবিলের অস্তিত্ব বাস্তবে আছে, এবং নিশ্চয়ই শুধুমাত্র পাঁচটি টেবিলেই অফিসটি সীমাবদ্ধ নয়, পাঁচের অধিক অবশ্যই আছে। এবং এটাও সহজে অনুমেয় যে প্রতিটি টেবিলের সঙ্গে চেয়ার আছে চেয়ারের সঙ্গে কর্মী আছেন। কিন্তু গল্পের বাধ্যবাধকতায় আমি শুধুমাত্র পাঁচটি টেবিল, অথবা টেবিল সংলগ্ন চেয়ার অথবা চেয়ার সংলগ্ন কর্মীতে সীমাবদ্ধ থাকব। এবং অবশ্যই তা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ এই কারণে যে আমার এই বিবরণের উৎস শুধু আয়কর অফিসকেন্দ্রিক। উক্ত কর্মীদের 'বসবাস ভিলা' কেন্দ্রিক নয়। আমার গল্পের অভিমুখ কিছুতেই বসবাস গৃহাভিমুখে ধাবিত হতে দেব না। কারণ তাহলে বহু গোপন তথ্য আমার গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে হাজির হবে, তা সর্বজনসমক্ষে এলে একটি তরল অতিপরিচিত সাধারণ গল্পে রূপান্তরিত হবে। তাই একটি পক্ষপাতদুষ্ট অনুসন্ধানের ঝুঁকি নিয়েও গল্পকে কেন্দ্রীভূত করতে চাই অফিসভিত্তিক পরিচয় বৃত্তে।

গল্পের পার্শ্বচরিত্র

এক এক নং টেবিল অথবা টেবিল সংলগ্ন চেয়ার অথবা চেয়ার সংলগ্ন কর্মীর বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। চোখে চশমা। মৃদুভাষী। সদাহাস্য। কর্মদক্ষ,

দপ্তরের বহু পুরনো অথবা হারিয়ে যাওয়া নতুন ফাইল নিমেষে খুঁজে আনতে পারেন সাহসী ক্ষিপ্রতায়। প্রয়োজনে অতীতের যে-কোনো দিনাঙ্কের 'রিসিভ স্টাম্প' বর্তমানের কাগজে মেরে দিতে পারেন নিঁখুত দক্ষতায। দক্ষিণা ব্যতীত কর্মে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান না। নিয়মমাফিক কাজে তিনি বিরক্ত বোধ করেন, কিন্তু যে-কোনো অনিয়মেব কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত।

দুই. দুই নং টেবিল, টেবিল সংলগ্ন চেযাব, চেয়াব সংলগ্ন কর্মী উচ্চপদস্থ। ঠাঁটবাট অননুকরণীয়। 'নো স্মোকিং' বিজ্ঞপ্তিকে হেলায় উপেক্ষা কবে 'চেনস্ স্মোকার,' বাম হস্তে সিগারেট, দক্ষিণ হস্তে কলম সর্বদা। টেবিলে স্তূপাকৃত ফাইল। সদা ব্যস্ত। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

তিন. তিন নং টেবিল, টেবিল সংলগ্ন চেযার, চেযার সংলগ্ন কর্মী, দুই হাতের আটটি আঙুলে ভিন্ন ভিন্ন পাথব সজ্জিত আংটি। চিবকগ্ন। টিকালো নাক। ফুলসার্ট বোতামে আঁটোসাটো। বুকপকেটে তিনখানি পেন, টেবিলেব সামনে চেয়াব, চেয়াবে ভিড় সহকর্মীদের। ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা। জোরালো কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ সমাধানেব আশ্বাস। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার, ভাষা শালীন বর্হিভূত কখনও।

চার. চার নং টেবিল, টেবিল সংলগ্ন চেয়াব, চেয়ার সংলগ্ন কর্মী সুবেশী ভদ্র। করদাতাদের অনুনয়-বিনয়-প্রশ্ন মনোযোগ সহকাবে শোনেন। দেয় ধার্যকবের হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত উপায যত্ন সহকারে বোঝান, ১নং টেবিলেব সঙ্গে এ বিষযে যোগাযোগ করতে বলেন এবং পুনরায় নিজ কাজে মনোনিবেশ করেন।

পাঁচ. এবং সর্বশেষে ৫নং টেবিলেব কর্মী আমাদেব অবিনাশ। তিনি অফিসের ব্যতিক্রম, এই ব্যতিক্রমী প্রকৃতিব জন্য সহকর্মীরা তাকে 'খচ্চব' বিশেষণে ভূষিত কবেছেন। করদানের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁরাই তার সঙ্গে মিলিত হতেন, তাঁবা সহজেই টের পেতেন 'খচ্চর' নামকরণ যে যথার্থ হযেছে।

খচ্চবের ইতি বৃত্তান্ত

॥ এক ॥

খচ্চরকেন্দ্রিক সহকর্মীবৃন্দ অবিনাশকে যথাসম্ভব উপেক্ষা করে চলতেন, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মতো 'কাজের বিনিময়ে অর্থ'ই ছিল অফিসের মূলমন্ত্র। কমবেশি সকলেই প্রায দীক্ষিত ছিলেন এই মন্ত্রে। আর এই অফিসেও যাঁরা কাজেব জন্য আসতেন, 'অর্থেব বিনিময়ে কার্য সিদ্ধি'-ই ছিল একমাত্র লক্ষ। তাই 'দিব আর নিব মিলায়ে মিলাবো' কোরাস কণ্ঠে ধ্বনিত হত অফিসের মধ্যে। দুই পক্ষের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কখনও কোনো অসুবিধা হত না একমাত্র অবিনাশ ছাড়া। অবিনাশ তাই ব্যতিক্রমী খচ্চব।

॥ দুই ॥

বিবাহের পূর্বে 'খচ্চর' নামকরণটি তার মনোজগতে বিশেষ কোনো বিরূপ প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি করতে পারেনি, 'কাজের বিনিময়ে অর্থ'—এই নীতিতে সে বিশ্বাসী নয়। অর্থের বিনিময়ে কার্যোদ্ধারেব পবম্পরায সে বিশ্বাসী নয়। কেন যেন এই অনৈতিক কাজে মনেব সাড়া পেত

না। তাই সে বাঙাল গোযার্তুমিতে সব কিছুকে নৈতিকতার প্রশ্নে বিচাব কবে সকলেব বিরাগভাজন হত। আব এই 'খচ্চর' নামকবণটি যে উক্ত ক্রিযারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার উপব বর্ষিত হচ্ছে, তা মেনে নিতে অসুবিধা হযনি, উপরন্তু চাকবি রক্ষার বাধ্যবাধকতায 'খচ্চব' সম্বোধন মাঝে মাঝে কর্ণকুহরে প্রবেশ কবলেও মাছি তাডানোর আলতো উপেক্ষায তা বর্জন করেছে। কিন্তু উপেক্ষাব এই অভ্যাস কিছুদিনেব মধ্যেই ক্লান্তিকর মনে হল এবং এই টানাপোড়েনেব মধ্যেই বিবাহকার্য সম্পূর্ণ হল অচিবাৎ।

॥ তিন ॥

একদা বিবাহ-উত্তর পর্বে পুবীব আদ্গিন্ত নীল সমুদ্রেব উত্তাল জলরাশি নিবিষ্ট মনে পর্যবেক্ষণ কবছিল নববধূর সঙ্গে। অকস্মাৎ পেছন থেকে, 'ওই দেখ, খচ্চবটা বসে আছে বউকে নিযে'—বাক্যরাশি শুনে লজ্জায় কুঁকডে গেল অবিনাশ। নববধূর কাছে তাব সহকর্মীদেব দেওয়া 'খচ্চর' বিশেষণটি নিশ্চয় সম্মানেব নয, একথা যখনই ভাবে, ভয পায। স্ত্রীব কাছে সম্মান হাবানোব ভয়। ভয পাওযা রোগের সূত্রপাত এখান থেকেই। আজ অবিনাশ এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে, উক্ত বাক্যমালা তাব প্রতি বর্ষিত হয়েছে, একথা স্ত্রী কল্পনাতেও আনতে পারবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে অনুরূপ বাক্যমালা বাবংবাব একইভাবে তাদের উপস্থিতিতে যদি বর্ষিত হয তবে? আজ যেমন হয়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে উক্ত বাক্যমালা তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হতে পারে এবং এইভাবে প্রতিনিয়ত উক্ত বাক্যমালা নিক্ষেপেব অজানা আতঙ্কে দিন কাটতে লাগল।

॥ চার ॥

অবিনাশ ইতিপূর্বে ভয বিশেষ পাইনি। কিন্তু এই ঘটনাব পর অবিনাশ বদলে গেল। মেজাজী অবিনাশ একটু ম্রিযমান হল। কিন্তু অফিসে তার কর্মপদ্ধতিব বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটাল না। অফিসে অবিনাশের দাপট কমল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহাব কবল সহকর্মীবা। তাবা আব 'খচ্চব' বিশেষণে ভূষিত কবেই ক্ষান্ত হল না। তার পেছনে লাগা শুরু কবল। একদা একটি কাগজেব গোলা অবিনাশে উদ্দেশে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হল যে, সেটাকে আর উপেক্ষা কবতে পারল না, শুদ্ধভাষী অবিনাশ, 'খচ্চর' নামধাবী অবিনাশ, নৈতিকতার প্রশ্নে আপসহীন অবিনাশ। সমস্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে হেলায উপেক্ষা কবতে বপ্ত অবিনাশ হঠাৎ জ্বলে উঠল। 'শুযারের বাচ্চা'—ইত্যাদি অধিকতব অশালীন গালিগালাজে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ল যে অফিসের বড়কর্তা একটি 'শো-কজ' নোটিশ ধরিযে দিলেন তাব হাতে। তিন দিনেব মধ্যে সন্তোষজনক উত্তব না পেলে 'সাস্পেন্ড' করা হতে পাবে এমনও হুমকি থাকল নোটিশে।

॥ পাঁচ ॥

নিরাময় ডাইগনাস্টিক ল্যাবরেটারি হযে বাড়ি ফিবছে অবিনাশ। স্ত্রীর গর্ভধাবণের সম্ভবনার মূত্র পবীক্ষাব ফলাফল 'পজেটিভ' হযেছে। গুমোট গরমেব মধ্যে হাল্কা বাতাস বওযাব আনন্দ এল মনে। বুকপকেটে বয়ে নিয়ে চলল অবিনাশ, তাব উত্তরাধিকারের জন্মসম্ভাবনাব

দলিল। 'শো কজের' চিঠিটা থাকল একই পকেটে। খুশির আনন্দে স্ত্রীকে টেস্ট বিপোর্টের পবিবর্তে ধবিযে দিল 'শো কজে'ব চিঠি। ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত বদলে নিল কাগজটাকে।

॥ ছয় ॥

শো-কজ এব নোটিশ পেযে অবিনাশ প্রথমেই গিযেছিল ইউনিযনেব নেতার কাছে, আর্জি জানিযেছিল উত্তর লিখে দেওযাব জন্য। দশ আঙুলে আটটি আংটি পবা ইউনিযনেব নেতা দু-হাত নেড়ে জানিযেছিল তাঁব অপাবগতা। ন্যায-অন্যায-এব প্রাসঙ্গিক যুক্তি দিযে অবিনাশ তাঁব সমর্থন চাইল। 'সংখ্যাধিক্যেব মত ন্যায, বিপরীত মত অন্যায'—এই যুক্তিতে তৎক্ষণাৎ একঘরে কবে দিল অবিনাশকে। অবশ্য পবামর্শ দিল ক্ষমা চেযে চিঠি লেখাব জন্য। কিন্তু কাব কাছে ক্ষমা? কীসেব জন্য ক্ষমা? এসব কিছুই বুঝতে পাবল না অবিনাশ। অবশেযে অবিনাশ যুক্তিহীন ভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা কবল তাব কৃতকর্মেব জন্য।

॥ সাত ॥

'শো-কজ'-এব নোটিশ বনাম টেস্টেব বিপোর্ট ওলোটপালট হযে গৃহে যে বিভ্রাটেব সৃষ্টি হযেছে তাব অশনি আশঙ্কায় অবিনাশ আবও ভয পেল। সে ভাবল, অনতিবিলম্বে 'খচ্চব' নামটি তাব স্ত্রীব কাছে প্রকাশ হযে যাবে। স্বামী পদমর্যাদাধাবী অবিনাশেব হীন পবিণতিব কথা ভেবে ভযেব মাত্রা আবও দ্বিগুণ হল। ভাবনাব প্রাথমিকে কুণ্ঠিত হলেও সে ভাবছিল অফিসেব সমস্ত ঘটনা স্ত্রীকে বলে হালকা হবে। তেমন প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছিল অবিনাশ। কিন্তু তাব এই বিভ্রাট সম্পর্কে স্ত্রীর মনে কোনো আশঙ্কাই গড়ে ওঠেনি কাবণ প্রথম চিঠির বিষযবস্তু স্ত্রীর নজব এড়িয়ে গিযেছিল অথবা অফিসেব তুচ্ছ কাগজ ভেবে পড়াব প্রযোজনীযতাও উপলব্ধি করেনি, ববং স্ত্রী এত বেশি আহ্লাদিত হযেছিল যে তাব হবু সন্তানেব পিতাকে আলতো চুম্বন উপহাব দিযে সেলিব্রেট কবেছিল ওই সংবাদকে।

॥ আট ॥

'খচ্চব' অবিনাশ তাব অফিসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক লুপ্তপ্রায জন্তব মতো দর্শনীয হতে থাকল। সহকর্মী থেকে শুরু কবে সকলের কাছেই মর্যাদা হাবাল অবিনাশ। 'অর্থের বিনিমযে কাজ' এই বীতি গ্রহণ না কবাব প্রবণতাকে বিপদজনক ভাবতে শুরু কবল অন্য সহকর্মীবা। কিন্তু এব বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত আক্রমণ সম্ভব নয। কিন্তু সংগঠিতভাবে অতি চাতুর্যে হাস্যকব করে তুলল তাব ব্যক্তিত্বকে। পেছনে লাগাব মাত্রা উত্তবোত্তব বৃদ্ধি পেল। চটি খুলে নিবিষ্ট মনে কাজ কবছিল অবিনাশ, হঠাৎ টেবিলেব তলা থেকে চটি উধাও। বেচাবা অবিনাশ কোনো প্রতিবাদ না কবে নতুন চটি কিনে বাড়ি ফিবল সেদিন। স্ত্রীব কাছে মিথ্যা গল্প বলে সেদিনেব মতো বেহাই পেল বটে কিন্তু আগামী যে-কোনোদিনই স্ত্রীব কাছে প্রকাশ হবেই এই সমস্ত ঘটনা, আব তখন কী ভাবে স্ত্রীব মুখোমুখি দাঁড়িযে কথা বলবে এই প্রাগৈতিহাসিক যুগেব লুপ্তপ্রায 'খচ্চব'। অবিনাশ ভযে আঁতকে উঠল। আশঙ্কা যে-কোনো দিনই ধবা পড়ে যেতে পাবে।

॥ নয ॥

অবিনাশেব স্ত্রীব গর্ভসঞ্চাবেব সময সীমা পাঁচমাস অতিক্রান্ত। অবিনাশ আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে স্ত্রীকে সুস্থ বাখাব। মাসিক ডাক্তাবেব কাছে রুটিন চেক্ আপ অবিনাশ নিজেব উদ্যোগেই করে। গৃহস্থলীর কাজকর্মেও সময় দেয় বেশি। তবু এক অজানা ভয অবিনাশকে তাড়া করে ফেবে। মনে মনে প্রস্তুতিও নেয় বাস্তবের মুখোমুখি হবার, ভেবে মনে সাহস সঞ্চয় করে। কিন্তু যখনই স্বামী অবিনাশের বিপবীতে 'খচ্চব' অবিনাশকে সামনে আনে, তখনই হৃৎকম্পন শুরু হয। প্রতিদিন অফিসে তাকে যে নির্যাতিত হতে হয়, মানসিক পীড়ন সহ্য কবতে হয়, তা কীভাবে পেশ কববে স্ত্রীর কাছে?

॥ দশ ॥

স্ত্রীব গর্ভধারণেব সমযসীমা এখন ছ'মাস। সাবা জামায কালি মেখে অফিস থেকে ফিবল অবিনাশ। আজ আব কোনোভাবেই সামাল দিতে পাবছে না নিজেকে। কোনো যুক্তিগ্রাহ্য গল্পও মনে আসছে না এই কালির উৎস বিববণে। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে একটা দম্‌কা হাসি নিয়ে স্ত্রীর মুখোমুখি হল যাত্রার কাযদায।

—এত কালি দেখে বিমর্ষ হযো না প্রিযে। আমাদেব ভালোবাসা এভাবে কালিমালিপ্ত হতে পারে না, তবু এত কালো মেখেছি আমি এতকাল ধবে।

হঠাৎ এমন হেঁযালি কথা শুনে থম্‌কে দাঁড়াল স্ত্রী। এরকম কাব্য কবে কোনোদিন কথা বলতে শোনোনি অথচ .? ঘাড় বেঁকিযে ঈষৎ আড়াআড়ি চোখে তাই শুধু প্রশ্ন,

—এত কালি কীসের? অফিসেব সমস্ত কালি কি তুমি জামায মেখেছ নাকি?

—ও কিছু না। তুমি কি কালি দেখলে ভয পাও?

—কালিকে ভয পাবো কেন? আর ভযেব প্রশ্নে আসছে কোথা থেকে? জামায কালিটা লাগল কী কবে সেটা তো বলবে?

—সে কথাই তো বলছিলাম। কালি দেখে যারা ভয পায, কালি লাগাব রহস্য শুনলে তাবা তো আবও ভয় পাবে। তাই আমি জানতে চাইছি, কালি দেখলে তুমি কতোটা ভয পাও?

—কিন্তু কালি তো আর বক্ত নয যে ভয পাবো?

—কিন্তু কখনও কখনও কালি বক্তের চেযেও ভযঙ্কব হতে পারে। তুমি যদি প্রস্তুত থাকো, আমি বলতে পাবি।

—কালি কী কবে জামায লাগল, তা জানাব জন্য আবার প্রস্তুতি কীসেব?

—মনেব। মনেব জোব আছে তোমাব?

—মনেব জোব? কীসের জন্য? কেন?

—শোনাব মতো মনের জোব আছে তোমাব? কতটা?

—যতোটা জোব আমি তোমাব কাছে পেয়েছি।

অবিনাশ ভাবে, বলাব মতো যথেষ্ট প্রস্তুতি নিযেছে সে। স্ত্রী... ও প্র...ত করেছে। এবার

তার 'খচ্চর উপাখ্যান' সে অবলীলায় ব্যক্ত করতে পারে। অতএব আর ভয় নয়, সাহসী হচ্ছে অবিনাশ ক্রমশ। স্ত্রীর কাছে খোলাখুলি সমস্ত কিছু ব্যক্ত করবে আজ। তার 'খচ্চর' হওয়া, তার 'পেছনে লাগা' ইত্যাদি। কিন্তু এবারও সে সুযোগ হল না অবিনাশের। এই কথোপকথনের অন্তিমে গর্ভবতী স্ত্রী অসুস্থ বোধ করল। অতঃপর ডাক্তার ও চিকিৎসাপর্ব সমাপ্ত করে যখন ঘরে ফিরল, রাত তখন এগারোটা।

স্মর্তব্য : প্রাসঙ্গিকে বলা প্রয়োজন যে-কোনো স্ত্রীর নিকট তার স্বামী আলেকজান্ডার। বিশ্বজয়ী বীর। যে-কোনো হেনস্থা স্ত্রীর নিকট স্বামী ভাবমূর্তির প্রতিকূল।

॥ এগারো ॥

স্ত্রীর গর্ভধারণের সময়সীমা এখন সাত মাস। যত দিন গেল পেছনে লাগার নিত্য নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হল। এদিল অবিনাশ পেছনে লাগার নূতন গুপ্ত কৌশল ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। অসতর্ক মুহূর্তে 'খচ্চর' শব্দটি বড় করে লিখে জামার পেছনে সেঁটে দিয়েছে কোনো সহকর্মী। অবিনাশ সেই 'খচ্চর' শব্দ বহন করে একটা সুদৃশ্য ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরছে। ইলিশ খাওয়ার ইচ্ছা অবিনাশের স্ত্রী প্রকাশ করেছিল ক'দিন আগে। অবিনাশের পিসিমা বলতেন, গর্ভবতীরা কিছু খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা পালন করতে হয়, নয়তো আসন্ন উত্তরাধিকার সেই অতৃপ্তি নিয়ে জন্মায়। কথিত মুখ দিয়ে সরসময় লালা ঝরে। স্ত্রীর ইচ্ছাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে আজকের এই ইলিশটি ছিল অবশ্যই দর্শনীয়। যখন সে ইলিশ বহন করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, সকলেই তার দিকে তাকিয়ে। অবিনাশ গর্ববোধ করে এই ভেবে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ অবশ্যই ইলিশের জন্য। সে ইলিশটিকে আরো দুলিয়ে দুলিয়ে বীরদর্পে রাস্তার বাকি অংশটুকু হেঁটেছে। সে যতই হেঁটেছে, তাকে দেখার জন্য পথচারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্‌গ্রীবভাবে একজন দেখেছে, অন্যকে ইশারায় দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সমগ্র রাস্তা জুড়ে সে ক্রমশ দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠল কেন, অবিনাশ বুঝতে পারল না। বরং ইলিশের কারণেই সে দর্শনীয় হচ্ছে, এই গর্বে তৃপ্ত হয়ে যখন গৃহে পদার্পণ করল, স্ত্রী তো বিস্ময়ে হতবাক্।

—একী!

—কেন তুমিই তো খেতে চেয়েছিলে।

এবারও অবিনাশের ওই একই ভুল হল বুঝতে। এবারও ভাবল 'একী' প্রশ্নটি অবশ্যই ইলিশের জন্য। গোটাপথ জুড়ে সে যে কেন দর্শনীয় বস্তু ছিল, পথচারীদের চোখের ভাষায় অবিনাশ বুঝতে পারেনি। কোনো সুধী পথচারীও অবিনাশকে এসে বলেননি আসল কারণ। স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। সে আর চুপ থাকতে পারল না, রাগে ও লজ্জায় জিজ্ঞাসা করল সরাসরি।

—তোমার পেছনে ওটা কী লেখা? থর থর করে কেঁপে গেল ঠোঁট সাতমাসের গর্ভবতী স্ত্রীর।

অবিনাশ তখনও জানে না তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। সে জামাটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করে—

—কোথায? কী লেখা আছে?

স্ত্রী বাক্‌রুদ্ধ। হাতেব ইলিশমাছ হতেই থাকে। অবিনাশ জামাটা খুলে পেছনে দেখে স্পষ্ট কবে লেখা 'খচ্চর', হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে অবিনাশ। স্ত্রীর বুকে আছড়ে পড়ে। গর্ভবতী স্ত্রী কোনোবকমে টাল সামলে বোঝার চেষ্টা কবে স্বামীর আসল বুকের ব্যথাটা কোথায? স্বামীকে দুর্বল হতে দেয না বুদ্ধিমতী স্ত্রী। পরিবেশ সহজ করাব চেষ্টা করে। অবিনাশ ধাতস্থ হয। খচ্চরেব ইতিবৃত্তান্ত, যা এতদিন গোপন কবাব আপ্রাণ চেষ্টা কবেছে, যা প্রকাশেব ভয়ে সে ক্রমশ ভয পেতে পেতে অসুস্থ হযে পড়েছে, যা বহুদিনেব চেষ্টায় বলে ওঠা হয়নি, আজ সে বলতে শুক কবেছে। স্ত্রী প্রাথমিকপর্বে কিছুটা মনোযোগ দিযে শুনে, তাবপর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল,—এখন থাক। আগে ইলিশেব ভাপাটা করে নিযে আসি। তাবপব খেতে খেতে সব শোনা যাবে।

স্মর্তব্য অবিনাশ এখন অনেক হাল্কা বোধ কবছে। 'খচ্চব' শব্দটি অফিস থেকে পিঠে বহন কবে এনে স্ত্রীকে দেখিযেছে নিজেবই অজান্তে, তবু স্ত্রীব এতটুকু সম্ভ্রম হাবায়নি। মর্যাদা-হানি ঘটেনি। ববং তাব স্ত্রী আবো কিছু শোনাব কৌতূহল না দেখিযে ইলিশ বাঁধাব কাজে লিপ্ত হযেছে। অতএব অবিনাশ এখন ভযমুক্ত। অবিনাশ এখন স্ত্রীব কাছে এক ঘোষিত 'খচ্চর

॥ ইতি খচ্চবের ইতিবৃত্তান্তের পবিসমাপ্তি॥

মানুষেব ইতিবৃত্তান্ত

প্রাক্‌কথন

অবিনাশেব স্ত্রীর গর্ভধাবণেব সময়সীমা আট মাস পেবিযেছে প্রসবের দিন নির্দিষ্ট হযেছে আগামী সোমবাব। আজ শনিবার। অবিনাশ ভাবে ববিবাব সকালে নার্সিংহোমে ভর্তি কবিযে দেবে। কিন্তু শনিবাব গভীর বাতে শুরু হল গর্ভযন্ত্রণা এবং রবিবাব সকালেব মধ্যেই অবিনাশ এক সুস্থ কন্যাসন্তানেব পিতায রূপান্তবিত হল। এই রূপান্তব পিতা অবিনাশেব মনেও রূপান্তব ঘটাল। অন্য পাঁচজন সহকর্মীব মতো পিতা অবিনাশ 'মানুষ'-এব পবিচযে বাঁচতে চাইল কন্যাসন্তানেব জন্মেব প্রথমদিন থেকে। কাবণ তার স্ত্রী খচ্চর অবিনাশকে গ্রহণ কবলেও কন্যাব কাছে ওই পবিচযে সে কিছুতেই বাঁচতে চায় না। কন্যাসন্তানের জন্ম-মুহূর্তেই সে সিদ্ধান্ত নিল সে বদলাবেই।

॥ এক ॥

সোমবাব অফিসে গিযেই আত্মসমর্পণ কবে সকলেব কাছে। প্রথমে তাব সামনে বসা দশ আঙুলে আটটি আংটি পবা নেতার কাছে পিতা হওয়াব সুসংবাদ জানায এবং শিশুব মতো বলে, "আমি বদলাতে চাই মদনদা, আমাকে একটু আপনাদেব মতো তৈবি করে নিন।" পোড়ু খাওযা ট্রেড ইউনিযন নেতাব বুঝতে অসুবিধা হয় না অবিনাশ কী বলতে চায। আব অবিনাশেব এই সদিচ্ছাব খবব বিদ্যুৎগতিতে গোটা অফিসে প্রচাবিত হযে যায়। সকলে অবিনাশেব সঙ্গে দেখা কবতে আসে, সুসংবাদ চায় কন্যাব। স্ত্রীব কুশল জিজ্ঞাসা কবে। অবিনাশ

অনুভব করে খচ্চর থেকে সে ক্রমশ মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। নযতো গত ক'দিন আগেও যাবা তাকে হাস্যস্পদ করে তুলেছিল, গত এক দেড় মাস আগেও যারা 'খচ্চর' লিখে পেছনে সেঁটে দিয়েছিল, তাবা কত সহজে তাব আপন হয়ে গেল। মানুষে উন্নীত হতে পেরে অবিনাশ আজ যাবপরনাই খুশি।

॥ দুই ॥

অবিনাশের কন্যার বযস আজ সাতদিন। স্ত্রী কন্যা আজ নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরবে। সকাল সকাল ট্যাক্সি কবে বাড়িতে নিযে আসে নবজাতিকাকে। গোটা বাড়ি জুড়ে একটা খুশির হাওযা। শ্বশ্রুমাতা হাজির তার কর্তব্য পালনের জন্য। অবিনাশ আজ অফিসে এল একটু দেবি করে।

সাতটা আয়কর রিটার্নের ফাইল আজ অবিনাশেব টেবিলে। হঠাৎ কবে এত কাজ অবিনাশ কল্পনা করেনি। এতদিন অবিনাশের কাছে প্রাযই কোনো ফাইল-ই পাঠানো হত না। চেঁচামেচি কবলে দু'একটা ফাইল আসত বটে, কিন্তু যাদেব ফাইল আসত তাবাও যে খুব সন্তুষ্ট হত তা নয, বরং তাদেব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম বুঝে বিমর্ষ বোধ কবত। অবিনাশের কাছে ফাইলেব অর্থই সবকাবি কোষাগাবে অতিবিক্ত কব জমা। এতদিন যে সমস্ত কবদাতাবা বিশেষ সুবিধালাভের জন্য বিশেষ কিছু দান কবতে অভ্যস্ত ছিল, তাবাও অবিনাশের টেবিলে ফাইল গেলে বুঝে যেত খচ্চবের টেবিলে যখন ফাইল গেছে সে সম্ভাবনা আব নেই। সমস্ত বিধি নিষেধ এখন লাগু হযেছে। অবিনাশ মানুযে রূপান্তবিত হযেছে একথা করদাতাবাও জেনে গেছে। অতএব সাতটা আযকর বির্টানেব ফাইল কোনোরকম গোলযোগ ছাড়া অবিনাশের টেবিলে পৌঁছে যায় এবং দ্রুত নিষ্পত্তি কবে ফাইল বন্ধ কবে। ঘবেব প্রথম টেবিল, টেবিল সংলগ্ন চেযার, চেয়াব সংলগ্ন কর্মী অধিক দ্রুততায তা নিযে যায কমিশনারের ঘরে। স্বাক্ষর হযে বেবিযে আসে ফাইল। অবিনাশেব কাজ শেষ, ড্রয়াব বন্ধ কবে। দিনেব শেষে হিসাবমাফিক অবিনাশেব প্রাপ্য পৌঁছে যায় অবিনাশেব কাছে। অবিনাশের মানুযে রূপান্তরিত হবাব প্রথম দিন একরকম নির্বিঘ্নেই কাটে অফিসে। এবার বাড়ি ফেবার পালা। টানটান, ভযহীন ভাবে বাড়ি ফেরে অবিনাশ। পিতা অবিনাশ।

॥ তিন ॥

টাকা বুকপকেটে আছে। যে বুকপকেটেব তলায এতদিন শুধু ভয়-এর হৃদ্‌স্পন্দন শুনে এসেছে। এখন তাব পবিবর্তে শুনতে পাচ্ছে টাকাব ঝন্‌ঝনানি। টাকা পেযে প্রথমেই কেনে এক বাক্স কড়াপাকেব সন্দেশ, গাঙ্গুবাম থেকে। একটা নতুন শাড়ি ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউসেব। সদ্যজাত কন্যাব জন্য কে, সি, দাশেব পাঁচখানা জামা। বোম্বে ডাইং-এর তোযালে, বেডিং হাউসেব মশাবি। আরো টুকিটাকি অনেক। অতিরিক্ত আয-এব প্রকাশ ঘটে প্রতিটি কেনাকাটায।

ইলিশমাছ কেনার দিনটিব কথা মনে পড়ছে অবিনাশেব। 'খচ্চব' শব্দ পিঠে বহন করে গোটা রাস্তা হেঁটে গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দর্শনীয় জন্তুব মতো। ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়। সে সম্ভাবনা আজ আব নেই। আজ যে ভযহীন 'মানুষ' অবিনাশ। হেঁটে চলেছে রাস্তায

আর পাঁচজন মানুষেবই মতো। হাতে সদ্যকেনা জিনিস, তবুও নজর নেই কারো অবিনাশের দিকে, অবিনাশ যথারীতি বাড়ি পৌঁছোয় অপর পাঁচজন মানুষের মতো।

অবিনাশেব স্বাভাবিক বাড়ি ফেরা দেখেও স্ত্রীব ভালো লাগে না তার অস্বাভাবিক কেনাকাটার জন্য। বাচ্চাটাও তারস্বরে কেঁদে ওঠে অবিনাশকে দেখে। অবিনাশের স্ত্রী যথাসম্ভব চেষ্টা করে বাচ্চাকে শান্ত করাব। বুক আলগা করে দুধ দেয বাচ্চাকে। শান্ত হয় পরিবেশ। অবিনাশ চেয়ে থাকে একমনে। অবিনাশের এই স্বাভাবিক আচবণ স্ত্রীর কাছে অস্বাভাবিক মনে হয। ইতিপূর্বে তার বহু অস্বাভাবিক আচরণও স্বাভাবিক মতো হত, কিন্তু আজ আর কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অবিনাশের অস্বভাব-মূলক 'স্বাভাবিক আচরণকে। সরাসরি প্রশ্ন করে,

—এত কেনাকাটা কীসের?

অবিনাশ অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তব দেয়,

—নতুন অতিথিকে সেলিব্রেট করতে হবে না।

—ও তো অতিথি নয়। থাকতে এসেছে আমাদেব সঙ্গে। তার আবার সেলিব্রেশন কীসের?

অবিনাশ এবার কোনো জুতসই উত্তর খুঁজে পায না, বলে,

—হাতে কিছু অতিবিক্ত টাকা এল, তাই... ।

—অতিরিক্ত টাকা মানে? টাকা আবার কখনও অতিরিক্ত হয় নাকি? পরিশ্রমের রোজগার আবার অতিরিক্ত কী?

—ওসব তুমি বুঝবে না।

স্ত্রী বুদ্ধিমতী। আর কথা বাড়ায না।

বাচ্চাটা আবারও কাঁদছে। খুব কাঁদছে। অবিনাশ ভাবে তার সন্তান কি তাব এই 'মানুষ'-এ রূপান্তর মেনে নিতে পারছে না। তার জন্যই কি ওই কুটি কুট্টি হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ। অথচ অবিনাশ তার সন্তানের জন্যই 'মানুষ' হতে চাইছে। সন্তানের কথা ভেবে, স্ত্রীর কথা ভেবেই তার এই রূপান্তর। নতুন কবে আবার ভাবতে বসেছে অবিনাশ। ভাবতে ভাবতে অতলান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। ভাবনার শেষ হচ্ছে না।

॥ চার ॥

বিবাহের কিছুদিন পবই অবিনাশেব ভয় পাওয়া লক্ষ করে তার স্ত্রী। এবং সহজাত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারে এই 'ভয'-এর নিহিতে লুকিয়ে আছে এক মূল্যবান সম্পদ যা অন্য পাঁচজন পুরুষের মধ্যে নেই। সেই থেকে তার স্বামীকে এমন উচ্চাসনে বসিয়েছে আপাততুচ্ছ 'কালিছেটানো' 'চটি চুরি করা'র মতো সহকর্মীদের হাস্যকব ক্রিযাগুলিকে কোনো আমলই দেযনি চিন্তার মণিকোঠায। এমনকি 'খচ্চর' লিখে পিঠে সেঁটে দেওয়াঁব ঘটনাও তাকে টলাতে পারেনি ওই বিশ্বাস থেকে, তবু আজ যেন কেমন দিশেহারা লাগছে অবিনাশের স্ত্রীকে।

বাচ্চাটা বড় দুষ্টু হযেছে, রাত পর্যন্ত জাগিয়ে বাখে দুজনকেই। অবিনাশ প্রথমে পা দুটো মেলে জড়ো করে। পায়ের প্রাথমিক একটা বালিশ দিয়ে বাচ্চাকে শুইয়ে দেয় পদপাদের গতিতে। পাদুটো নাচায, নির্দিষ্ট ছন্দে। ছন্দের তালে তালে শিশুও ঘুমিয়ে পড়ে অধিক রাতে। ক্লান্ত চোখ মেলে দেখে অবিনাশ তখনও ঘুমায়নি।

—ঘুমোওনি এখনও?

—না, ঘুম আসছে না।

—তোমার পেছনে আজকাল আর কেউ লাগে না?

—না।

—তোমাকে কাগজের দলা পাকিযে আজকাল আর কেউ মাবে না?

—না, এত কথা তুমি জানলে কী কবে?

—তোমাব চটি আজকাল আর কেউ চুবি করে না?

—না।

—টিফিনে তোমার টিফিন বাক্স আর কেউ লুকিযে রাখে না?

—না।

—আজকাল আর তোমাকে কেউ খচ্চর বলে ডাকে না?

—না।

—কেন? কেন? কান্নায় গলা জড়িয়ে আসে অবিনাশেব স্ত্রীব।

অবিনাশ শান্ত, স্থির। উত্তর দেয়,

—আজকাল আমি 'মানুষ' হযে গেছি।

—কিন্তু 'খচ্চর' অবিনাশকেই যে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এখন আমার কী হবে?

গুমরে কেঁদে ওঠে, অবিনাশেব বুকে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

দু-মাস আগে নিজের হাউমাউ করে কান্না সঙ্গে আজ স্ত্রীব ফুঁপিয়ে কান্নার একটা মিল খুঁজে পায় অবিনাশ।

॥ ইতি মানুষের ইতিবৃত্তান্তেব পবিসমাপ্তি ॥

খচ্চরেব ইতি বৃত্তান্ত : পর্ব দুই

সূচনা

পবদিন অবিনাশ আবার ক্রমশ খচ্চরে রূপান্তরিত হয। আবার যথাবীতি জুতোচুরি, কালি ছেটানো...।

মহারাজাধিরাজের সন্তানেরা

সোহারাব হোসেন

—হ্যাল্লো, বড়দা বলছেন?—ফোনেব একপাব উদ্বিগ্ন প্রশ্ন কবেন!

—হ্যাঁ!—ফোনের এপার গম্ভীর উত্তর দেন! কিছু সময শব্দহীন থাকার পব মন্থব গলায জানতে চান—কে মেজোভাই বলছো?

—হ্যাঁ!—ওপার সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিমযেও না-গিযে ফের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন বাখেন—আমাদের শান্তিস্তম্ভ, মানে আমরা ক'ভাই মিলে যে শান্তি-সৌধটি তৈবি কবছিলাম সেটা নাকি ওবা গুঁডিযে দিযেছে?

—হ্যাঁ!

—সৌধটির কোনো অস্তিত্বই নাকি নেই?

—তুমি ঠিকই শুনেছো মেজোভাই। আমাদের সম্মিলিত প্রযাস যেটাকে আমরা আকাশভেদী অমব কীর্তি হিসেবে গড়েছিলাম, সেটা এখন মার্টিব সঙ্গে মিশে গেছে!

—প্রযাস বলছেন কেন বড়দ'। ওটা তো আমাদেব সম্মিলিত গর্বেব স্থাপত্য তৈরি হচ্ছিল।

—আমি তো শুধু গর্ব ভেবেই থামতে চাইছিলাম না, আসলে ওটাকে আমি আমাব, থুড়ি, আমাদের সম্মিলিত অহংকাব হিসেবে গডে তুলতে চাইছিলাম। অথচ...।

—অথচ কী বড়দা?

—অথচ বেজম্মাগুলো সেই অহংকারেই আঘাত হানল! আমাব মাথা হেঁট কবে দিল! অনেক প্রজা মাবা গেছে। দেশেব নিবাপত্তা নিযে কোশ্চেন উঠেছে! কী যে করি।

—আপনি অস্থির হবেন না দাদা। আমি আগামী কালই যাচ্ছি! .সেজো-ছোটোব কী খবব? আপনাব সঙ্গে যোগাযোগ কবেছে?

—করেছে! ওবাও কাল আসবে।

—তবে কালকেই প্রতিবোধেব ছক গড়ে ফেললেই হবে, কেমন? আজ ছাড়ি!

—হ্যাঁ!

ওপার ফোনেব সংযোগ বিচ্ছিন্ন কবা-মাত্রই এপাব, মানে বড়দা, আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। একে তো সকাল থেকেই উদ্বেগে ছিলেন। সকাল থেকে বললে ভুল হবে, উদ্বেগে আছেন গতকালকের গভীর রাত থেকে। উদ্বেগ-বলে-উদ্বেগ, এবারই প্রথম সব হিসেব লণ্ডভণ্ড কবে দিযে তাব প্রথম অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। যাচ্ছে ওই নচ্ছার মেযেছেলেটার অসম্ভব বাড়াবাড়ির কাবণে। মনে-মনে বিবক্তির একশেষ ছিলেন বড়দা—'আবে তুই কি একলা আমার সঙ্গে শুযে গর্ভ ধরেছিস নাকি? তোর আগে, রানি ছাডা, পঞ্চাশ-পঞ্চাশটি মেয়েছেলেরে গর্ভবতী করেছি! সবাই সন্তান খালাস কবে ঝাড়া-হাত-পা এখন। অথচ তুই শালি বেঁকে বসলি। কী চাই, না, 'তোমাব ঔরসেব সন্তান চাই!' বিড়বিড়ানি

ভাবনার দাপটে ঘেমে ওঠেন বড়দা। সত্যি বলতে কী ক'দিন ধরেই ঘামছিলেন তিনি। তাঁব একান্ন নম্বব এই শয্যাসঙ্গিনী অর্থ-সম্পদ-ভোগ-বিলাসময বিনিময না-গ্রহণ করে একটি জীবন্ত সন্তান প্রসবের বাসনা কবাব মাহেন্দ্রক্ষণ থেকেই তিনি ঘামছিলেন। এমনটা তাব কামবিলাসেব দস্তুব নয। অথচ মা-হতে-চাওয়া নাবী নাছোড় :

—দ্যাখো তুমি ভুবনেব রাজা হতেই পারো প্রজাব কাছে। বস্‌ও হতে পারো চাম্‌চাদেব। কিন্তু আমাব কাছে তুমি এক কামুক পুরুষ ছাড়া আব কিচ্ছু নও।

—মানে?—পৌরুষ জাগিয়ে বড়দা-বাজা একটু হুঙ্কারমতো দিয়েছিলেন—মুখ সামলে কথা বলো মেযেছেলে! যা বলছি তাই শোনো। পেটেব বালাই মেরে ফ্যালো!

—না।

—না কেন?

—না এই জন্য যে আমি তোমার সঙ্গ-কবেছিলাম প্রেমে ভেসে। আমাব সন্তান সেই প্রেমের সৃষ্টি!

—কিন্তু আমার দিক থেকে কোনো প্রেম ছিল না, তা জানো তো?

—জানি।

—তবে?

—তবে আবাব কী? আমার সন্তানকে মাবতে চাইলে সব ফাঁস কবে দেবো!

—কিন্তু আমাব সম্মান? সন্তান জন্মালে দেশে-বিদেশে কলঙ্ক বটবে যে!

—রটবে না। সব দায আমাব!

এমন কথা-বিনিমযেব পব বিগত ছ'মাস আগে 'মেযেছেলেটা' বড়দা-রাজাব সংসর্গ ত্যাগ করেছিল। গতকাল গভীব রাতে, কেবল, একটা ফোনে জানিযেছিল আগাম-প্রসব সংবাদ—'আগামী কযেক দিনেব মধ্যেই কোনো সুন্দব এক সূর্য-খালাস সকালে আমি মা হবো।' অতঃপব বড়দা-রাজাব ঘুম ছুটে গিযেছিল। নিঘুম বাতে একটাব-পব-একটা নির্দেশ পাঠিযে ষড়যন্ত্র ঘনিযে তুলেছিলেন। মাতৃসদনে কড়া নির্দেশ পাঠিযেছিলেন—'আমাব আব পঞ্চাশটা অবৈধ সন্তানের যে পবিণতি হযেছে, এটাবও তাই হোক।' তাবপব ভোব থেকে চলছিল অপেক্ষা। কিন্তু তার আগেই এল দুঃসংবাদ। শান্তিস্তম্ভ-ধ্বংসেব বার্তা। এবং একটি চিঠি। রাজদূত, কাঁপতে-কাঁপতেই, চিঠি তাঁব হাতে তুলে দিযেছিল। এখন মেজোভাইযেব ফোন পাওযার পব ফেব একবার চিঠিটি পডতে লাগলেন .

ছিচবণেষু গড্‌ফাদাব,

পত্রের শুরুতে আমার স্যালুট নেবেন। আপনার দিন ভালো যাচ্ছে না জানি। যাতে আগামী দিনগুলোও ভালো না-যায তার জন্য এই পত্র লিখছি। চর মাবফত্ সংবাদ পেলুম আপনি আপনার একান্নতম অবৈধ সন্তানকে খুন কবে ভূমিষ্ঠ কবানোব নির্দেশ দিযেছেন। এতেই আমার আপত্তি। কাবণ আমিও তো একপ্রকাবে আপনাব অবৈধ সন্তান। গোপনে তালিম দিযে এক সময আপনিই আমাকে অস্ত্রবিদ্যা, মানুষ-ধ্বংসকাবী অস্ত্রবিদ্যা শিখিযেছিলেন। সেই হিসেবে

আপনি আমাব গড্‌ফাদার হযেও ফাদার। তাই আপনাব যত অবৈধ সন্তান সবাই আমার ভাই। আপনি আমাব অনেক ভাইকে মেবেছেন। এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ এই ভাইটিব জন্য মনটা কেঁদে উঠল। তাই পাল্টা দিলুম। গর্ভপাত করিযে দিলুম আপনার। আপনি বৈধ সন্তান হিসেবে যে শান্তিস্তম্ভেব জন্ম দিচ্ছিলেন তাকেই খুন করে দিলুম। ওদিকে ডাক্তারকে থ্রেট দিয়ে আপনাব একান্নতম অবৈধ সন্তান আব আমার ছোটো সহদবকে জ্যান্ত অবস্থায ভূমিষ্ঠ কবাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি। পারলে আটকাবেন।

জীবনে এই প্রথম আপনাকে পত্তর লিখলুম। খচবামি করে 'পাকজনাবেষু'র বদলে 'ছিচরণেষু' সম্বোধন কবলুম। চিঠিতে অনেক বেযাদপি কবেছি, নিজগুণে সেসব ক্ষমা করবেন।

ইতি

আপনাব পালিত অবৈধ সন্তান

সারাটা শবীর রি-রি জ্বলছে বড়দা-বাজার। সেই সঙ্গে ঘামছেনও তিনি। এ-সন্তানটিকে তিনি কোন্ সমযে লালন-পালন কবেছিলেন তা আঁচ করতে চেষ্টা কবলেন। ব্যর্থও হলেন। ফের চিঠির দাবিমতো তাঁর সর্বকনিষ্ঠ অবৈধ সন্তানটি সম্পর্কে এত্তেলা কবলেন। তাব নিদান-মোতাবেক কাজ হচ্ছে কিনা খোঁজ নিলেন। খবব এল চিঠির দাবিবই পক্ষে। শুনলেন দুঃসংবাদ—গর্ভবতী সেই জননী নিখোঁজ। নিখোঁজ তাব ডাক্তার সমেত। ফলে তিনি অস্থিব হলেন। রাজপ্রাসাদের নির্জনতম কক্ষে বেহিসেবি পায়চাবি করলেন অনেকক্ষণ। তারপর দাঁতের ওপব দাঁত চেপে উচ্চারণ কবলেন—'গড্‌ফাদাব কাকে বলে তোকে বুঝিযে ছাড়ব শালা!'

রূপকথার দেশে, তাবপর, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বড়দা-রাজা যে-দেশেব অধীশ্বর সে-দেশের সর্বত্র সতর্কতা জারি হল। মহারাজাধিবাজ বড়দা-বাজা স্বযং জাতির উদ্দেশ্যে তাঁব বাণী রাখলেন। মহামন্ত্রী, মহাসেনাপতি, রাজকবি-সহ পাত্রমিত্রদেব সঙ্গে জরুরি মন্ত্রণা বসালেন। কর্তব্যকর্ম স্থির করে তাঁর অনুগামী দেশসমূহের মেজোভাই, সেজোভাই ও ছোটোভাইকে আবারও একবার তলব করলেন। দেশের, সবকটি মিত্র দেশেব, সেনাবাহিনীকে যে-কোনো বকম আক্রমণ-মোকাবিলাব জন্য তৈবি থাকার আদেশ দিলেন। মহাবাজাধিবাজের এমন তৎপবতায় দেশবাসী শান্ত হল। প্রজাদেব মধ্যে যে হুডোহুডিব সৃষ্টি হযেছিল তা মিলিযে গেল। কিন্তু মহারাজাধিবাজ বড়দা-রাজাব দেহ থেকে জ্বলন গেল না। তিনি রি-রি জ্বালা নিযেই প্রিয় তিন ভাইয়েব সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন :

—দুনিযা থেকে সমস্ত সন্ত্রাসীকে আমি নিশ্চিহ্ন করতে চাই!—গোলটেবিলেব ওপর ইয়াব্বড়ো একটা চাপড় মেবে বড়দা-রাজা জানতে চাইলেন—তোমাদেব মত কী মেজো-সেজো-ছোটো?

—আমিও তাই চাই। সেইসঙ্গে শযতানেব পাণ্ডাকে নৃশংসভাবেই খুন কবা দবকার

বড়দা—মেজো-রাজা মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিযে বলে ওঠেন—যাতে আব কোনো শয়তানেব বাচ্চা জগতের শান্তি নষ্ট করতে সাহস না পায সে-ব্যবস্থা করুন বড়দা।

—আমি শুধু-শুধু কথা বাড়িযে সময় নষ্ট করতে চাই নে! আমি অ্যাকশনে বিশ্বাসী! আপনি অবিলম্বে সন্ত্রাস-দমনে নেমে পড়ুন বড়দা!—সেজোরাজা চোখ গোল-গোল করে কথা ছাড়েন।

—শান্তিসৌধকে ধূলিস্যাৎ কবে যারা পৃথিবীর শান্তি কেড়ে নিয়েছে তাদেরকে আগামী একপক্ষ কালেব মধ্যে বিনাশ করি চলুন!—ছোটোবাজা উত্তেজনায দাঁড়িয়ে পড়েন!

—তালে তোমবা আমার পাশে আছো তো?—বড়দা-রাজা ফের জানতে চান!

—আছি!—তিনভাই সমবেত সঙ্গীতের সুবে কথা বলে সম্মতি জানান!

—অনেক রক্ত ঝরবে কিন্তু!

—বক্ত ছাড়া শান্তি কবে কোথায এসেছে বড়দা?

—ফেব আব একটা কথা!

—কী বড়দা?

—গুঁড়িযে-যাওযা শান্তি-সৌধ ফেব আমি তৈবি কবতে চাই!

—আমবা আগেববাবেব মতোই সমর্থন ও সাহায্য করব।

—শোনো, এই দু-ধাবাব কাজ, মানে সন্ত্রাস-দমন ও সৌধনির্মাণ, আমি একলাই তুড়ি মেবে মেবে কবার ক্ষমতা বাখি, কিন্তু একা আমি করব না। সবাইকে সঙ্গে নিযে করতে চাই। কেন জানো?

—জানি বড়দা! পৃথিবী-বাজ কৈফিযৎ চাইলে আপনি যাতে পাব পেযে যেতে পারেন সেজন্য আমাদের সঙ্গত দরকার!

—তালে বাহিনী নামাই!

—নামান বড়দা।

বড়দা-বাজা মুহূর্তেই বগল-বাজিয়ে আনন্দে মাতেন। দীর্ঘদিন দিগ্বিজয়ে বেরোনো হযনি। দীর্ঘদিন কেন, বড়দা-বাজা স্বযং কখনো দিগ্বিজয়ে বের হননি! সুযোগ আসেনি! সে সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁব পিতা সিনিযাব-বড়দা-বাজা। সেসব যদিও মহারাজাধিরাজ বড়দা-রাজা বিদ্যালয-জীবনে দেখেছেন-শুনেছেন। তাই মনে-মনে একটা আপসোস ছিল। এবাব সে-আক্ষেপ মিটবে। তাই হাপু-টানিযে নধব বালকেব মতন তিনি বগল ও মুখ বাজাতে লাগলেন। তা-দেখে অন্য তিন ভাই মোহিত। তাবা সেই বাজনাব তালে-তালে দুলতে লাগলেন। সমবেতভাবে!

রূপকথার দেশে যুদ্ধ-আওয়াজ ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ নেই এখন। সাতসাগব এখন তোলপাড। তেবো নদী শুকিয়ে গেছে। তেপান্তবেব মাঠে শুধু বাকদেব গন্ধ। ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমিব দাম্পত্যজীবন বিপর্যস্ত। বড়দা-বাজার বাহিনী শত্রুদেশ চিহ্নিত করে ফেলেছে। তাঁব অবৈধ-পালিত-সন্তানটি কোথায লুকিযে পড়েছে এখন তার সন্ধান চলছে। দেশে-দেশে

প্রজাদের কান্নাব রব উঠছে। সর্বত্র ভয-বিহ্বল পরিবেশ। তা দেখে বড়দা-রাজা সন্তুষ্ট। পুনবায শান্তিস্তম্ভ সোনা-রোদ্দুবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। মহাবাজাধিবাজ কঠোর প্রহবায় প্রাযশই সে-নির্মাণেব তদাবকি কবতে যান। তেমনি এক ব্যস্ত দিনে ফেব শুক-পক্ষীব ঠোঁট বরাবব তিনি সেই বিদ্রোহী-শযতানটিব একটি পত্র হাতে পেলেন। পাওযামাত্রই পড়তে শুরু কবেন :

ছিচবণেষু গড্‌ফাদার,

তুমি আমাব বাপ হলেও হাবামজাদা-নাম্বার-এক আছো। তোমাব গর্ভ-ফেঁড়ে যে সন্তানটাকে ভেঙে দিয়েছিলুম তার স্বপ্ন ফেব দেখছো তুমি। দ্যাখো ক্ষতি নেই। কিন্তু এটা কি তোমাব জানা নেই ফাদার, নষ্ট-গর্ভে সন্তান দাঁডায না। তোমাব বিজ্ঞানীবা কি সব ঘুমোচ্ছে নাকি? ওদেব জাগাও। আব শোনো, আবাব গর্ভপাতেব জন্য তৈবি থেকো।

ইতি

তোমাব অবৈধ-পালিত-পুত্র।

বি দ্র আব একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বলছি, ফাদাব, এখনো সংযত হও। নইলে, আমার বিমাতাকে (বিমাতা = আমাব একান্নতম সর্বকনিষ্ঠ ভাইযের মাতা) দিযে মুখ খোলাবো। তখন কেলেঙ্কাবির একশেষ হবে। বুযোছো?

চিঠি পড়ে বাগে গবগব করতে লাগলেন বড়দা-বাজা। শান্তিসৌধেব নিবাপত্তাকে একশো গুণ বাড়িযে দিলেন। ডাককর্মী শুক-পাখিটিকে খপাৎ করে ধবলেন। থরথব কাঁপতে-কাঁপতে শুক জানালো—'আমি হুকুমদাস মহাবাজ। পত্র এলে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওযাই আমাব কাজ।' বডদা-বাজা কটমট তাকালেন। যেন খেযে ফেলবেন পাখিটিকে। কিন্তু না তেমন কবলেন না। ছেড়ে দিলেন। তাবপব স্তম্ভ-পবিক্রমা ত্যাগ কবে মন্ত্রণাকক্ষে গেলেন। শুক কবলেন অস্থিব পাযচারি। দাঁতে-দাঁত ঘষটে উগবে দিতে লাগলেন ক্রোধ—'তোব বকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে তুই বেশ্যা-সন্তান। আমি কখনো বেশ্যা-সঙ্গ কবেছি বলে মনে পড়ছে না। যদি কবেও থাকি বেশ কবেছি। তোর মতো জাবজ ছেলেদেব যে নিদান বাববাব দিযেছি তোবেও তাই করব। নিস্তার পাবিনে তুই। কোথায পালাবি? শোন্ তুই ব্যাটা-পযলানম্বব-ইব্‌লিস, শুধু তোবেই না যে তোবে আশ্রয দেবে আমাব সেই ভাযবাভাইকেও ছাড়ব না। আমাব সৈন্যদের লেলিয়ে দিযেছি। ওবা বেলজিয়াম-কাচেব জাফবি-কবা জাবে বন্দি কবে তোব বক্ত আমাকে উপহাব দেবে। দেবেই। আরও শোন্, তোব শেষতম বিমাতা ও সর্বকনিষ্ঠ ভাইযেব প্রতি যে দবদ তুই দেখাচ্ছিস সে-সাধ তোব মিটবে না। আমাব অপকর্মেব সাক্ষী আমি জগতে বাখিনে। ওরা খুন হবেই। তাব আগে তোব পালা। বুঝলি খোকা! দবকাব হলে আমাব বিশ্বস্ত হনুমানেবা বিন্ধ্যপর্বত উপড়ে আনার মতো পুবো জগৎটাকেই উপড়ে ফেলবে। তৈবি থাক।'—কথা থামিযে হাঁফাতে থাকেন বডদা-বাজা। দবদব ঘাম এখনো ঝবলেও মনটা যেন একটু হালকা ঠেকছে। যেন একটু স্বস্তিব বাতাস খেলা কবছে ফুসফুসে। কিন্তু সে আব কতক্ষণ? এক-দুই-তিন ক'টা দণ্ড যেতে-না-যেতেই, চোখেব পলক পডতে-না-পড়তেই শুকপাখি ফিবতি-পত্র এনে টুপুস কবে ফেলে দেয বড়দা-বাজাব টেবিলে। রাজা

চমকে ওঠেন। এবং বিড়বিড় করে চিঠি পড়েন :

ছিচরণেষু গড্‌ফাদার,

তোমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি বলে আমি বেইমান বা নেমোকহারাম নই। ভক্তি-ছেদ্দা যা-করার এখনো তোমাকেই করি। কেননা, জেহাদের ও সন্ত্রাস-চালানোর যাবতীয় কলকাঠি তো আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছি। তাই পারমানেন্ট জেহাদে যাবার আগে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি!

মনে আছে ফাদার, প্রথম দিকে আমি নিষ্ঠুর কোনো কাজ করতে চাইতাম না। ভয় পেতাম। ন্যায়নীতির প্রশ্ন তুলতাম। আর তুমি সব খণ্ডে দিতে। একদিনের সেই বিদ্যাশিক্ষার কিছু অংশ খুব বলতে ইচ্ছা করছে। শোনো তোমার-আমার কথা-কাটাকাটির বিশেষ তরজটা বলি, শোনো .

—খুনে-বিদ্যা, সন্ত্রাস-শিক্ষা, আমি শিখব না ফাদার।—আমি বলেছিলাম!

—আমি তোর ফাদার নই গড্‌ফাদার। যা বলছি তাই শোন্।—তুমি মিচ্‌কে হেসেছিলে।

—কেন শুনব? কেন শিখব ওসব?

—শিখবি তোর আখেরের জন্য।

—মানে?

—মানে এ সব শিখে আমার হাতের পুতুল হয়ে নাচার জন্য। নেচে-নেচে আমার বিরোধী সব রাজা-রাজড়ার চোখের ঘুম কেড়ে নিবি। বিরোধী দেশগুলোতে নাশকতামূলক কাজ করবি। আর ঠিকঠিক যদি নাচতে পারিস তো তোকে, তোর আগামী চোদ্দপুরুষকে, আমি দুধে-ভাতে রাখব।

—আমার ভয় করে ফাদার।

—দুদিনেই ভয় কেটে যাবে।

—কিন্তু এ তো অন্যায়! পাপ!

—খামোশ!—তোমার চোখ দিয়ে, ফাদার, আগুন বেরিয়েছিল হঠাৎ—মহারাজাধিরাজরা কখনো অন্যায় করে না। শাস্ত্র কখনো তাদের নামে পাপ ঘোষণা করেনি আর করবেও না।

—মানে এসব শাস্ত্রমতে পুণ্যকাজ গড্‌ফাদার?

—হ্যাঁ। শোন্। তোকে শাস্ত্রবচন শোনাই শোন্। আর্যাবর্তের রাজা যে-শাস্ত্র মেনে চলেন তার একটা কাহিনি শোন্। সে শাস্ত্র বলে, আমরা এখন যারা রূপকথার দেশে বাস করছি তারা সব লব ও কুশ দু'ভাইয়ের বংশধর। নিজ অপমান সহ্য করতে না-পেরে মাতা সীতাদেবী পাতাল-আশ্রয়ে গেলে লব-কুশ দুই ভাই গার্জেনশূন্য হয়ে পড়ে। পরে সন্তান হিসেবে লব মান্যতা পেয়ে রাজা হলেও কুশ মুনিসৃষ্ট-বলে ত্যাজ্য হয়। পরের দিকে রাজা লব কুশকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু কুশ তা মেনে নেয়নি। বিদ্রোহ করেছিল। সে লবের রাজ্যে বারবার হানা দিতে থাকে। জেহাদি-কুশের বংশ তুই। আমি তোর আশ্রয়দাতা।—এতে পাপ নেইরে বোকা! নে বোমা-বানানো শেখ্!

—তালে, ফাদার, বোমাটোমা-অস্ত্রটস্ত্র, বানানো সব শাস্ত্র-অনুমোদিত?

—হ্যাঁবে-ব্যাটা-হ্যাঁ। এমনকী সন্ত্রাস চালানো, নাশকতা-করা, এসব কাজ এক অর্থে বঞ্চনার বিরুদ্ধে পবিত্র প্রতিবাদেবই নামান্তর। এসবও শাস্ত্রসম্মত।

—বলেন কী ফাদাব? এসব পাপ কাজও শাস্ত্র-অনুমোদিত?

—আবার পাপ বলছিস? এসব পাপ নয়। তোদের, মানে মেসোপটেমিয়ার রাজা যে-শাস্ত্র মেনে চলেন সেখানেও বযেছে এসবের অনুমোদন! জানিস নে!

—না ফাদার।

—তবে শোন। কাহিনি প্রায় এক। শুধু নামধাম আলাদা। এ শাস্ত্র বলছে আদি-পিতা আদম ও আদি-মাতা হাওযাব ছিল দুই পুত্র—হাবিল ও কাবিল। তো সম্পত্তিভাগেব সময় এক্ষেত্রেও পিতা হাবিলকে রাজত্ব দিল, আর কাবিলকে কবল ত্যাজ্য। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, না, সে সন্ত্রাসী। বাপের অন্যায় ব্যবহারে কাবিল তো খেপে লাল। তাব বাড় আরো বেড়ে গেল। হানাদাবি শুরু কবল হাবিলেব বাজ্যে। জেহাদি সে-ও। বুঝলি ব্যাটা?

—হুম!

—তালে কী দাঁড়ালো, তুই এবাব থেকে হতে চলেছিস কুশ কিংবা কাবিলেব পবিত্র উত্তরাধিকারী! এতে অন্যায় নেই, পাপও!

পাকজনাবেষু, বর্তমানে তোমার বিরুদ্ধে চিব-জেহাদে নামতে চাইছি আমি। চাইছি বলে পিতৃঋণ শোধ করার জন্য কিছুটা ভক্তি-ছেদ্দা জানাচ্ছি। আজ-যে দুনিযাশুদ্ধ সবাই, মায় তুমি ইস্তক, আমাকে ভয পাচ্ছো তার ষোলোয়ানা ক্রেডিট তোমারই। কেননা, তুমি যদি সেদিন শাস্ত্রকথা না-শুনিযে আমাকে উদ্দীপ্ত না-কবতে তবে আমি বাসায়নিক বা পাবমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে শিখতাম না। ফের সন্ত্রাসে পাপ-নেই বলে যে গুরুমন্ত্র তুমি আমাব কানে দিযেছিলে সেটাই এখন আমার পাথেয। রূপকথাব দেশে যত রাজ্য আছে সব জায়গায এখন আমি লবের সঙ্গে কুশের. হাবিলেব সঙ্গে কাবিলের লড়াই দেখছি। সত্যিই শাস্ত্রবাক্য-অনিবার্য। তুমি আমাব স্যালুট নিও।

যাক এসব কথা। যে হুঁশিযারি দেওযাব জন্য তোমাকে দ্বিতীযবাব পত্র লেখা তা নিবেদন করি। বলছি, তুমিও আদি পিতাব মতো অন্যায় করছো কেন? আমাকে-সহ সব অবৈধ ভাইকে মাবতে চাইছো কেন? বিশেষ কবে আমার একান্নতম ভাইটির কথা বলছি। ওকে ভূমিষ্ঠ হতে দাও। গোঁ-ধরে থেকো না। এখনো পর্যন্ত ব্যাপাবটা আমার-তোমার মধ্যে গোপন আছে। তুমি গোঁ না-ছাড়লে আমি পাব্লিকলি সব চাউর করে দেবো, হ্যাঁ!

ইতি

কুশ ও হাবিলের বংশধব তোমার অবৈধ সন্তান এক।

শযতান-পুত্রেব এমন বদ্-নাহাজ মনোভাবে বড়দা-বাজা ভিতরে-ভিতরে একটু দমে যান। শান্তিস্তম্ভ পুনবায় তৈরি হয়ে গেছে। ক'দিন পর জগৎবাসীব উদ্দেশ্যে এটির আববণ উন্মোচন কবা হবে। ফের বড়দা-রাজাব মাথা রূপকথার সব-কটি দেশে সগর্বে উঁচু হবে। তো তেমন মহিমাময় সোনারঙের দিন ফিবে আসার প্রাক্কালে এই একান্নতম অবৈধ-সন্তানটা ঝামেলা পাকাচ্ছে। কেচ্ছাটা ফাঁস হযে গেলে এমন শুভদিনের আগে বড়দা-রাজার গায়ে কাদা লাগবে।

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। তাই একবার তিনি জেহাদি এ পুত্রের সঙ্গে আপস করার কথা ভাবলেন। পরক্ষণে সে-ভাবনা বাতিল করলেন। শান্তিস্তম্ভ-ধ্বংসের কথা মনে পড়তেই ফের তাঁর সারাদেহ রি-রি জ্বলে উঠল। তিনি সংকল্প করলেন গাঢ়—'শোন্ আহম্মক, কলিযুগের রীতিটাই আলাদা। কুশ-কারিলের ওপর আমার যে সমর্থন ছিল তা প্রত্যাহার করেছি। ওরা এখন জগৎ-স্বীকৃত অবৈধ-সন্তান। হ্যাঁ, শাস্তর এখন উল্টে গেছে। বিশেষ করে অবৈধ জারজ সন্তানদের বাঁচার কোনো অধিকার নতুন শাস্তর দেয়নি। তোর একান্নতম ভাইকে মরতেই হবে। তাতে গায়ে কাদা লাগলে লাগুক। ও-কাদার দাগ আমি শান্তিস্তম্ভের ছ'টা দিয়ে ঢেকে দেবো! খামোশ!'

বড়দা-রাজার গুপ্তচরেরা এবার সক্রিয় হল। মহারাজাধিরাজ সরাসরি লাল সুইচ টিপে বাছাবাছা সব গুপ্তচর-পুতুলদের ছুটিয়ে দিয়েছেন। দিয়ে অপেক্ষায় থেকেছেন। এবং মনে-মনে যা আশঙ্কা করছিলেন সেই অশুভ সংবাদই পেলেন। গুপ্তচরদের দলপতি এসে নিবেদন করল—'মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর ডাক্তারকেও।' মহারাজাধিরাজ নীরব। তিনি হজম করছেন শয়তান-পুত্রের আঘাত। সামনে দাঁড়িয়ে গুপ্তচরবাহিনীর প্রধান ব্যাপার দেখে প্রমাদ গোনে। রাজদস্তুর তার জানা। এরপর অবধারিত নেমে আসবে শাস্তির খাঁড়া। সে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মহারাজাধিরাজ অদ্ভুত শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন—'সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় তল্লাসী করা হয়েছিল?' গুপ্তচর বাহিনীর নেতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে বড়দা-রাজা পুনরায় নির্দেশ দিলেন—'আরারও তল্লাস চালান। কিছুতেই ওকে জীবন্ত সন্তান প্রসব করতে দেবো না আমি।'

লোকটি চলে গেলে বড়দা-রাজা বেশ খানিকক্ষণ পায়চারি করেন। বিড় বিড় করেন আপনমনে—'বেটা আমার কলজেয় আঘাত করলি! আমার রাজ্যেই আমার নাগরিককে লুকিয়ে রেখেছিস, অথচ গুপ্তচরেরা খুঁজে পাচ্ছে না?' ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ পায়চারি থামান মহারাজাধিরাজ। দেহটা পুনরায় রি-রি জ্বলতে লেগেছে। বুকের গর্তে একবার ডান-হাতখানা আলতো করে বোলালেন। একটা দীর্ঘশ্বাসও বুঝিবা ছাড়লেন। তারপর দ্বিগুণ-বেগে পায়চারি করতে লাগলেন। এবং স্থির করলেন সংকল্প—আগামী অমাবস্যায় হবে শান্তিস্তম্ভের শুভ উদ্বোধন।

দিন-ক্ষণ-ঘণ্টা-মিনিট মায় সেকেন্ড পর্যন্ত মাপা। শুধু বড়দা-রাজার রাজ্যে নয় রূপকথার দেশের সর্বত্র সাড়া পড়ে গেছে। আজ পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিনার হিসেবে শান্তিস্তম্ভের শুভ উদ্বোধন। রূপকথার দেশের সমস্ত রাজা-রাজড়ারা হাজির। আলোকমালায় ঝলমল করছে স্তম্ভ। নগর-বন্দর-সড়ক-পানশালা সর্বত্র গর্বে মেতে উঠেছে প্রজারা। সঠিক সময়ে স্তম্ভটির আবরণ-উন্মোচনকারী সুইচটিকে অন করলেন মহারাজাধিরাজ বড়দা-রাজা। পাশে তার হাস্যমুখী তিন ভাই। স্তম্ভের উপর থেকে আবরণ খসে পড়তেই ফুটে উঠল আলো, শব্দ ও আনন্দধ্বনি। ধন্য-ধন্য করছেন সবাই। করতালি আর থামতেই চায় না। স্তুতি যেন

এয়াররুভিশনের নরম-মোলায়েম-শীতল শিরশিবানিব মতো এসে লাগছে বডদা-বাজাব সারা গাযে। বুকটা ভরে যাচ্ছে বডদা-রাজাব। বুকটাকে সই-ভরন্ত করার জন্য তিনি যেই-না অহংকার-স্তম্ভটির দিকে তাকালেন অমনি জাদু, বড়দা-রাজা দেখতে পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন না-মানে শুধু স্তম্ভটিকেই দেখতে পাচ্ছেন না। পাত্রমিত্র, মেজো-সেজো-ছোটোভাই, বিদেশি রাজা-মহাবাজা সবাইকে দেখছেন খুব স্বাভাবিক কিন্তু স্তম্ভটিকে নয়। পবিস্থিতি সামাল দিতে কব্জি-উল্টে দু'দুবার চোখ রগড়ালেন। ফের চোখ মেললেন আকাশে। না স্তম্ভটিকে তবু দেখতে পাচ্ছেন না। পরিবর্তে তাঁর চোখের সামনে দৃশ্যমান হল অদ্ভুত এক খাবলা আলো। সে-আলোর মাঝখানে খোদিত আছে একটা পত্র। মহাবাজাধিরাজ পড়লেন চোখ পিটপিট কবে—'ঠিক যে মুহূর্তে তুমি স্তম্ভ-সুইচ অন কবেছো, সেই শুভক্ষণে আমাব একান্নতম ভাইটি ভূমিষ্ঠ হযেছে ফাদার।'

এ ধ্বংসভূমে

অনিল ঘোষ

এ যেন বাসা নয়, যেন ধ্বংসস্তূপ। আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়ি মার্কা চেহাবা। দাঁত বাব করা, হাডগোড় বার কবা, বট-অশ্বত্থেব শিকড় নামানো ঘর-দুযাবে তবু প্রাণের সাডা অটুট। আট খোপে বত্রিশ জনের চ্যাঁ-ভ্যাঁ কিচির-মিচির হা-হা হি-হি দিন থেকে বাত। রাত দিন। মযলা, তেলকালি পড়া, ধোঁয়া ধুলোয দম বন্ধ হওয়াব জোগাড়। না পেরে লতিকা বলে, এবার যাবোই যাবো। আব আমায কেউ আটকাতে পারবে না। তুমি ব্যবস্থা কবো।

অশোক হাসে। মাথা নেড়ে বলে, এই নিযে পাঁচবাব হল।

—এই শেষ।

—আমি ভুলছি না।

—আর হবে না। বিশ্বাস কবো আমি আব পাবছি না। এখানে থাকলে নির্ঘাত মরে যাবো।

—আগেব চাববাবও এই ডাযলগ ছিল।

—আগের পবিস্থিতি এবাব নয। এবার যেতেই হবে। হয তোমাব সঙ্গে, নযতো ট্রেনের তলায।

অশোক আব কথা বলে না। হাসে মিটিমিটি। কথাগুলো নতুন নয। শুধু পবিবেশনা নতুন। একটু অন্যবকম।

পায়রার খোপেব মতো ঘরগুলো এখন ভূতেব মতো নিশ্চুপ। অন্ধকার শ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। এই বোধহয গভীব রাত। তাই বুঝি ধ্বংসস্তূপ এখন মৃতময়। কটা বাজে এখন! একটা না দুটো! ঘরের দেওযালে ঘড়ি আছে। টিপ টিপ করে সমযের শব্দ জানাচ্ছে। কিন্তু তাব রূপ নেই। অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে আছে। দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে। সেই শব্দ বাতের ডানায় ভব করে ভেসে আসে এই পাযরার খোপে। লতিকা যেন তাতেই সচকিত। ঘন ঘন দেখে নিচ্ছে এদিক-ওদিক। ত্রস্ত ভাব। কেউ জেগে নেই, তবুও ভয। অশোক হেসে ফেলে। অবশ্য এই পাযরাব খোপে কে কখন ঘুমোয, কে কখন জেগে ওঠে—সে জানা বড়ো দুষ্কব। এক একটা খোপে এক একটা ভবা সংসাব। দুজন তিনজন মায সাতজন পর্যন্ত। কী অদ্ভুত মানানসই। সামঞ্জস্য বুঝি একেই বলে। শুধু অশোকই এখানে বেমানান। সে একা। একারই সংসাব। তাই কিচিব-মিচিবে তাব অস্বস্তি, কখনও অসন্তোষ, বাগও। রাগটা গিলে নেয়, নিতে পারে শুধু লতিকার কাবণে। সে যেমন এই পায়রাব খোপে একা আছে, তেমনি লতিকার মতো পাঁচ প্রাণীর কূজন আছে। বাবাব হাঁফেব টান, মা-র বাত, দিদিব মাথাব অসুখ, শুধু দাদাব আযে দিন গুজবান। তবু এর মধ্যে প্রেম, এর মধ্যে সংসাবেব স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন বচনা করা সম্ভব। বিশেষত এই মাঝবাতে। মোহময নিস্তব্ধতাব অলীক আড়ালে। অশোক

তার ঘবে। লতিকা বাইবে জানলাব ওপাবে। শুধু মুখটুকুই ভেসে আছে অন্ধকার প্রেক্ষাপটে কালো বেখাচিত্রের মতো। সে-মুখে কী আছে? আবেগ, না স্থির বিশ্বাস? বোঝা যায না। প্রেমিক-প্রেমিকার এই নিবিডতম মুহূর্তে প্রবল ব্যবধানেব যে দেওযাল, তা-ও বুঝি ভেঙে যায। যেতে চায়।

অশোক স্থিব, হযতো স্থবিব। জানলায লতিকার সিল্যুযেট মুখটা নডছে। ফিসফিস করে বলে, আব নয গো, বিশ্বাস করো। এখানে থাকব কেন? আমাকে তো কেউ চায় না। এখানে শুধু দিযে যাও। কেন? এত করছি তবু কাবও মন ওঠে না! এবার বোধহয মবতেই হবে। দাদা টাকা খেযে এক ডিভোর্সির সঙ্গে বিযে দিতে চাইছে, দিদি চাইছে আমি বিযেই না কবি। এখন তুমি বলো আমি কী কবব?

অশোক হেসে ফেলে। শব্দহীন হাসি। এসব কথা নতুন নয়। আগেও শুনেছে। হয়তো বাত বলেই নতুন লাগছে।

হঠাৎ কোনও খোপের দবজা খুলে গেল ঘটাং শব্দে। অশোক সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চুপ। মিস্ত্রিব ঘব বোধহয। বাথরুম কবতে উঠল। বাইবে এলেই তো সর্বনাশ। লতিকা প্রায সামনে। দেখে ফেললে রক্ষে আছে। হযতো কাল সকালেই খোপে খোপে বকম-বকমের মাত্রা চড়ে যাবে। হযতো হইচই পডে যাবে। অশোক ভযে বিছানাব নিবিড আশ্রযে সেঁধিযে যায। তার আগে অবশ্য জানলায চোখ মেলে দেখে নিযেছে, জানালা ফাঁকা। লতিকা নেই।

অশোকেব গা দিযে যেন জ্বব ছাড়ল। লতিকা নিজেকে আডাল করতে পেরেছে তাহলে। মিস্ত্রিব গলা খাঁকাবি শোনা গেল। বাবান্দায দাঁড়িয়ে ছড় ছড় কবে প্রস্রাব করছে। এই নোংবামিগুলো দেখেও দেখতে নেই। অশোক মজা পায। খোপের সকলেই প্রায এই কাণ্ড করে। কথা উঠলে বলবে, আমি তো কবিনি। দুর্গন্ধে টেঁকা দায হলেও বাথরুমে যাওযার কষ্ট কববে না কেউ। অবশ্য বাথরুম বলে যেটা আছে, সেটাকে নবকেব প্রবেশদ্বার বলাই ভালো।

বিছানায শুযে অশোক টেব পেল, মিস্ত্রিব ঘরের দবজা বন্ধ হল। একটু পরে বিকশাচালক মাদাবদাব ঘবে গলা খাঁকাবি শোনা গেল। তাব মানে সে-ও এবাব ঘরেব বাইবে আসবে। একই কাণ্ড সাববে।

এই সমযটুকু অশোক নিজেকে ছেড়ে দেয নিজস্ব ভাবনায। লতিকা কি ওর ঘবে চলে গেছে? কেউ দেখতে পায়নি তো? ভয হয যেমন, বাগও হয। মন বিদ্রোহ কবে। কেন আমাকে এভাবে চোব হযে থাকতে হবে? আমি তো কোনও অন্যায কবিনি। লতিকাকে ভালোবেসেছি। ভালোবাসা কি অপবাধ? ওকে নিযে যদি ঘব বাঁধতে চাই, এব মধ্যে অন্যায কোথায? দিনেব পব দিন এই লুকোচুবি অসহ্য। নিজেব চালচুলোহীন জীবন। বাবা মা কবেই নেই। দূব সম্পর্কের এক দিদিই সম্পর্ক বজায বেখেছে। মিউনিসি-প্যালিটির ময়লা ফেলা গাডিব ড্রাইভাবেব চাকরি না পেলে নিজেব অস্তিত্ব বলে থাকত কিছু!

সব আবাব নিস্তব্ধ। পাযবাব খোপেব ডানা ঝটপটানিও আব নেই। অশোক নিশ্চিন্ত, লতিকাকে

কেউ দেখেনি। এই রাতের অভিসার রাতের অন্ধকারের মতোই চাপা আছে। অবশ্য কেউ দেখল কি দেখল না, জানল কি জানল না—এসবে অশোক নিজে ভ্রূক্ষেপ কবে না। দেখল জানল ভারি বযেই গেল। ও কারও খায না, পবেও না। তবুও ভয়টা আছে। সেটা লতিকাকে নিয়ে, বিশেষ করে ওর দিদি মণিকাকে নিয়ে। একটা ছিটিয়াল মেযে। বিযে হযনি। হবেও না বোধহয়। হতকুচ্ছিত মেয়েটা নিজেও বোধহয় বুঝে গেছে— বিযেব যোগ্যতামান পেবোতে গেলে রূপ-গুণের সঙ্গে ধনক্ষমতার প্রযোজন, যেটার অভাব ভীষণ। আর বোধহয সে কাবণেই মেয়েটা এখন ভব কবেছে লতিকার উপব। বোনকে ও আগলে আগলে বেড়ায। সবসময শ্যেন দৃষ্টিতে নজরে রাখে। বোন যেন বাজে খপ্পরে না পড়ে, কাবও সঙ্গে না মেশে। অশোকের সঙ্গে লতিকাব ব্যাপারটা ও জানে। আর এটাই হযেছে কাল। মণিকা অশোককে পছন্দ করে না। পৃথিবীর কোনও পুরুষকেই ও দু-চক্ষে দেখাতে পারে না। ওর ধাবণা পুরুষমাত্রই ধাপ্পাবাজ, শয়তানের বংশধর। লতিকাকে সে অশোক সম্পর্কে সাবধান করে দেয। শুধু সাবধান নয, লতিকা যাতে অশোকের সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ কবতে না পাবে, তাব জন্য পাহারাদার সেজে বসে থাকে। বলতে গেলে অশোক আর লতিকাব মধ্যে বিবাট বাধাব পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে মণিকা। দেখেশুনে লতিকা গোপনে অশোকের সঙ্গে পালিযে যেতে চায। একেবারে বিযে কবে ফেললে দিদি আর কী করবে। কিন্তু যতবাবই সে পালানোব প্ল্যান করেছে, ততবারই অলৌকিক মন্ত্রবলে মণিকা জানতে পেবে গেছে। বলতে গেলে সে হাতে নাতে ধবে ফেলে লতিকাকে। তাবপর বাড়ি মাথায় কবে চিৎকার। গালাগালি। অশোক একটা ধাপ্পাবাজ চরিত্রহীন লম্পট—এই হল ওর মূল বক্তব্য। লতিকা অশোকের সঙ্গে পালিযে গেলে প্রচণ্ড ভুল করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়ি মাথায় কবে ওব কান্নাকাটি, শেষে অজ্ঞান হয়ে বিরাট নাটক জমিযে ফেলে।

এই পাযবার খোপগুলোর কাছে অশোক যেন বিবাট অপরাধী। সবাই ওকে সন্দেহেব চোখে দেখে। পবপর চারবার পালানোর ফন্দি ব্যর্থ হয়ে যেতে অশোকও আর উৎসাহ পায না। গুটিয়ে থাকে নিজের ভিতরে। তাবপর থেকে লতিকাও আব প্রকাশ্যে দেখা কবতে পারে না অশোকেব সঙ্গে, শুধু এই বাতেব আড়ালটুকু ছাড়া। মণিকাকে বাতে ঘুমেব ওষুধ খাইযে রাখা হয। এই সময়টুকুই মুক্তি লতিকাব। তখন সে দ্বিগুণ উৎসাহে অভিসারে বের হয। এতে রোমাঞ্চ আছে, গা শিবশিবে উত্তেজনা আছে। কিন্তু কোথাও যেন একটা ভাটার টান অনুভব করে অশোক। পালিযে যাওযার ব্যাপাবে ওব সায় ছিল না কোনও সময়েই। পালাবে কেন? অশোক অযোগ্য নয, অক্ষম নয। লতিকাকে ওব সঙ্গে বিয়ে দিতে ওব বাবা মা দাদা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। তবে এত গোপনীযতা, এত চাপাচাপি কেন?

কথাটা লতিকাকে অনেক বুঝিযেছে অশোক। প্রতিবারই লতিকা ওব মুখ চাপা দিযেছে। বলেছে, দিদির সামনে তোমার গলায মালা দিতে পারব না। মবে গেলেও না।

জানলাটা নড়ে উঠল আবাব। সেই সঙ্গে ফিস ফিস কণ্ঠস্বব, ঘুমোলে?

অশোক তড়াক্ করে লাফ দিযে উঠল। জানলাব গবাদে মুখ চেপে বলল, তুমি কোথায় ছিলে!

লতিকা হেসে বলল, এখানেই।

—কেউ দেখতে পায়নি তো?

—দেখলেই বা।

—ও বাবা খুব সাহস যে! তবে পালালে কেন?

—সে তো বাত বলে। এখন কেউ দেখা মানেই আবাব চিৎকার চেঁচামেচি। ভালো লাগে! না-না তুমি ঠিক করো। আমি সত্যিই আর থাকব না।

—তোমাব দিদি!

—বাদ দাও তো। ওর জন্য আমি ভুগব কেন? এই জানো, দিদিকে না অ্যাসাইলামে পাঠানো হবে। ওখানে চিকিৎসা হলে দেখবে, দিদি ভালো হয়ে যাবে।

লতিকা এমনভাবে বলল, যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে। অশোক হেসে ফেলল। বলল, এসব কথা তোমার আসল সময়ে মনে থাকবে না। তখন এই দিদিব জন্য তোমাব প্রাণ কাঁদবে।

লতিকা হঠাৎ ওব হাত জড়িযে ধবল, কেন বারবাব এক কথা বলো! আমাকে তোমাব বিশ্বাস হয না?

অশোক মাথা নেড়ে বলল, তোমাকে বিশ্বাস কবি বলেই তো—।

—তবে ওই কথা থাকল্। আমি যাচ্ছি—।

—না, আব একটু দাঁড়াও—।

অশোক অন্য হাত দিযে ওকে জডিযে ধবতে গেল। লতিকা চকিতে সরে গেল, ইয়ার্কি না! আমি কিন্তু খোঁজ নেব কাল—।

লতিকা আর দাঁডাল না। অন্ধকারে অন্ধকাব হযে গেল।

২

—কী ঠিক কবলে?

কালকের পব আজ আবাব। সেই এক কথা। বক্তাও সেই এক। শুধু বদলেছে পরিবেশ। রাতের বদলে এখন ঝকঝকে সকাল।

অশোক চমকে ওঠে রীতিমতো। যে কণ্ঠস্বর রাতেই অভিপ্রেত, দিনে তার সাড়া মিললে নিয়মছাড়া বেখাপ্পা মনে হয।

অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল অশোক। আয়নার সামনে দাঁডিযে চুল আঁচড়াচ্ছিল। লতিকার কথায ওব হাত কেঁপে যায।

জানলার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লতিকা। চোখ মুখ আকুল প্রত্যাশায উন্মুখ। অশোক অস্বস্তিতে পড়ে যায়। যে মুখ বাতে ছাড়া দেখা যায না, শুধু কথা শোনা যায়, দিনেব আলোয় সেই মুখ চোখ সমেত আস্ত শবীবেব ছাযা ভেসে উঠলে অস্বস্তি হবেই।

নাহ্, তবে মিথ্যে নয, রাতের অন্ধকাবে অন্ধকাবময়ী যখন জানলার পাশে দাঁড়াত, তখন অনেক সময় মনে হত সত্য নয। মনে হত স্বপ্ন কিংবা অলীক কল্পনা। বাস্তব এখন চোখেব সামনে, তবু বিশ্বাস করতে মন চায় না। তবে কি লতিকা সত্যিই জয কবতে পেবেছে ভযকে?

অশোক সহজ হয। কাল বাত্রে যা ঘটেছে, যে সমস্ত কথা হযেছে, তার কোনওটাই মিথ্যে নয তাহলে!

লতিকা বোধহয সেটাকেই খুঁচিয়ে দিতে হেসে বলল, কী হল, ভ্যাবলাব মতন তাকিয়ে আছো কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! তোমার ঘরে যাবো?

অশোক হ্যাঁ বা না বলার আগেই লতিকার মুখ সবে গেল জানলা থেকে। পরক্ষণেই ভেজানো দবজা ঠেলে বসন্তের দমকা বাতাসেব মতো ঘবে ঢুকে পডল শাড়ি ব্লাউজে ঢাকা আস্ত একটা নাবী শবীর। এত কাছে আর এত অনাযাসে যে হাত বাডালেই ছোঁওযা যায, কিংবা টেনে আন্া যায় বুকের উপব। এতদিনেব বুকের চাতক পাখিটা যে প্রত্যাশায ফটিক জল-ফটিক জল বলে চেঁচাত।

এ-ও কি সম্ভব! অশোক স্থির, স্থবির। এ যদি মিথ্যে হয়, তবে সত্যকে বিশ্বাস কবাও মুশকিল। লতিকা হেসে বলল, কী, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!

বলতে বলতে অশোকের আরও কাছে এগিয়ে এল লতিকা। ওব নিশ্বাসেব তাপ টেব পাচ্ছে অশোক। ও যে সত্যিই এসেছে, সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব বাধাব প্রাচীব ভেঙে আসতে পারে, তার প্রমাণ দিতে অশোকের কাঁধ ধবে ঝাঁকানি দেয সজোবে। হিংস্র আবেগে বলে চলে, এখনও অবিশ্বাস করবে তুমি? এখনও?

অশোকেব মুখে কথা নেই। কী বলবে, কী-ই বা বলা যায়! সেই উপযুক্ত বাক্যবন্ধ এখনও মস্তিষ্ক থেকে মুখের অর্গল পর্যন্ত পৌঁছযনি। সকালের রোদ্দুর চলে এসেছে ঘবেব মধ্যে। এই পায়বার খোপে বোদ আসে ভযে ভযে। চলে যায দ্রুত পাযে। ঘব থেকে দেখা যাচ্ছে বাইরে উঠোন জুড়ে লোকের আনাগোনা, বাচ্চাদের চিৎকাব। পাযরাব খোপেব ঢাকনিগুলো খুলে গেছে এখন। তারস্বরে বকম-বকম চলছে। ওবা কি কেউ দেখছে না? আর লতিকাবই বা কী সাহস! এতদিন তো ওদের ভযেই কাঁটা হযে থাকত। ওই কে দেখে ফেলবে, যদি লাগিয়ে দেয দিদির কানে! ভয় তো ওই দিদিকেই।

—কী হল কথা বলছো না কেন? বাবারে বাবা, কখন থেকে সাধছি! লতিকা বিনা সংকোচে বসে পড়ল অশোকের বিছানায়। পা দোলাতে লাগল।

অশোক এতটা আশা করেনি। তাই সে খানিক ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, কী বলব সেটাই তো বুঝতে পাবছি না। আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

—ওফ্ এই মানুষ নিয়ে হযেছে আমাব জ্বালা। লতিকা হাত বাড়িযে অশোকের মাথার চুল ঘেঁটে দিল।

অশোকেব দৃষ্টি চকিতে ঘুবে গেছে দবজাব দিকে। পাযরাব বকম-বকম চলেছে অবিবাম। কেউ কি দেখছে না? নাকি লতিকাব এ ঘরে ঢোকার মতো আজ সব অন্যরকম!

অশোক কোনওবকমে হেসে বলল, আজ হঠাৎ!

লতিকা পা দোলাতে দোলাতে বলল, কী হঠাৎ?

—খুব সাহস দেখছি।

—কীসের?

—এই ঘরে আসাব।

কথাটা শেষ করতে দিল না লতিকা। মুখ ঝামরে বলল, বাহ্ আমার ঘরে আমি আসব না।

—তোমার দিদি।

—বাড়ি নেই।

—ও তাই—!

—ও তাই কী। দিদি আমায় চিরকাল বাঁধবে নাকি। আমার মন বলে কিছু নেই!

কথা এমন, অশোকের বুকের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। এ যে নতুন লতিকা। নতুন শোনাচ্ছে ওর কথা। এমন কথা শুনলে শরীর মন ঠিক থাকে!

অজান্তে অশোকের দুটো হাত উঠে গিয়েছিল উপরে। শূন্যে ভাসতে ভাসতে ধেয়ে যাচ্ছিল লতিকার দিকে। একবার, শুধু একবার। এমন কথা যে বলে, তাকে জড়িয়ে ধরতে চায় হাত। এমন শব্দ যেখান থেকে উৎসারিত হয়, সেই ঠোঁটে একবার, অন্তত একবার তৃষ্ণার জল পান করতে চায় মন। তবেই না শান্তি, তবেই না বিশ্বাসের নদী অবরোধ ভেঙে গতিশীলতায় পরিশুদ্ধ হতে পারে!

লতিকা তার আগেই সরে গেছে দরজার দিকে। খিলখিল করে হেসে ওঠে, চালাকি না!

অশোক কাতর অনুনয়ে বলে, লতু একবার—।

লতিকা কপট শাসনের তর্জনী তুলে বলে, উঁহু এখন নয়। আগে সব ঠিকঠাক করো তারপর তো আমি তোমারই। মোটে হ্যাংলামো করবে না। আমি রাতে আসব।

অশোককে আর কথা বলতে না দিয়ে দরজা ঠেলে চলে গেল লতিকা। একঝলক হাওয়া চু-কিত-কিত খেলতে খেলতে ঢুকে পড়ল ঘরে। মিলিয়ে গেল শূন্যে।

ঘরে অশোক একা। হতভম্ব। এ কি স্বপ্ন, না মায়া!

৩

সারা দিন আর কোনও কাজে মন বসাতে পারল না অশোক। যা করছে, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবু তার মধ্যেই মাথা ঠান্ডা করে কলকাতায় বন্ধু বিমানের কাছে ফোনটা করতে পারল। সব ঠিক করতে সময় লাগল মাত্র দশ মিনিট। তারপর থেকে বুকের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ঢাকের বাদ্যি। আগেও এমন হয়েছে। যতবার লতিকাকে নিয়ে পালানোর ছক করেছে। ততবার। কাজে গণ্ডগোল। খাওয়া শোওয়া—সবেতেই গোলমাল। হাত পায়ে কাঁপন, শরীরও বেসামাল। উৎকণ্ঠা উদ্বেগে মনে হয় সময় চলছে না, থেমে আছে।

দিন পেরিয়ে আবার রাত। রাত ক্রমে গভীর, গভীরতর। খাঁচায় আটকানো পশুর মতো ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে অশোক। লতিকা কই। এখনও আসছে না কেন? ক'টা বাজে এখন? বেডিয়াম লাগানো হাতঘড়িতে দেখল এগারোটা। এখনও কি সময় হয়নি লতিকার? অবশ্য আসবেই বা কী করে! পাহারার খোপে তো এখন সন্ধে রাত। রকম রকম চলছে

তাবস্থবে। মিস্ত্রিব ঘবে স্বামী-স্ত্রীতে লেগেছে। এখন গালাগালি খিস্তি খেউড়ের পর্যাযে আছে। হাতাহাতি না হওযা পর্যন্ত থামবে না মনে হচ্ছে। অতএব অপেক্ষা। অন্তহীন অপেক্ষা। এ ছাড়া উপায কী।

অশোক হতাশ হযে নিজেকে ছেড়ে দেয বিছানায়। লতিকার ঘবের দিক থেকে কোনও সাড়া শব্দ আসছে না। এখনই শুযে পড়বাব লোক নয ওবা। আজ যেন ওদিকটা বড্ড বেশি চুপচাপ। সকাল থেকে ওর দিদি মণিকাকে দেখা যায়নি। আগে অন্তত ঘণ্টায ঘণ্টায ওকে দেখা যেত অশোকেব ঘরেব সামনে ঘুরঘুর কবছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। চোখে মুখে তীব্র সন্দেহ। দেখে অশোকের হাসি পেত। আজ তাবও কোনও সাড়াশব্দ নেই। কী ব্যাপাব, লতিকা কিছু বলেছে নাকি! নাকি মণিকাকে সত্যি-সত্যিই ঘুমের ওষুধ খাইযে রাখা হযেছে। অশোকের কৌতূহল হয়, কিন্তু সেটা মেটানোব কোনও উপায় নেই এই মুহূর্তে।

অশোক বিরক্ত হয়। খানিকটা নিজেব উপবই। কী দবকাব ছিল এই অহেতুক ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়াব! দেশে কি আর মেযে ছিল না? লতিকাই কি সব? তাব উপব ওই ছিটিযাল মণিকা। ঘন ঘন অজ্ঞান হওযা ওর বোগ। ওর জন্য সাবধান থাকতে হয অশোককে। লতিকার সঙ্গে কথা বলা প্রকাশ্যে সম্ভব হয় না, এমনকী আকার ইঙ্গিতেও নয। সারাদিন অচেনা হযে থাকা এবং না থাকাব মতো বাস করতে হয়। রাতেব এই গোপনীয সময়টুকু তাই লোভনীয়। এব জন্য তীর্থেব কাকের মতো বসে থাকা। উন্মুখ হযে সময গোনা—কখন বাত আসবে, কখন ওকে ডাকবে! এই চলছে দু-বছর। দিনেব বেলা অচেনা অশোক পাযবার খোপে বক-বকমহীন প্রাণী হযে চাকরি কবতে যায। মুখে গাম্ভীর্য, বুকে অভিমান। ওব কী এমন কমতি আছে, কেন সে লতিকাকে ডাকতে পাববে না? কথা বলতে পাববে না? ওর মতো চাকুবে পাত্র হাতে চাঁদ পাওযার শামিল। অফিসেব বতনবাবু তো সমানে কানেব কাছে মন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছেন, চলো ভাই, আমার শালিকে একবাব চোখেব দেখা দেখবে। অশোক এড়িযে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয ঠিক কবেনি। গেলেই হত। কী দরকাব এই ঝামেলায জড়ানো! নোংবা পরিবেশে বাস কবা হাড়-হাভাতে ফ্যামিলিব নগণ্য এক মেযেব ন্যাকামিকে প্রশ্রয দেওযার কোনও মানে হয!

সত্যিই মানে হয না এভাবে গোপন প্রেমিক সাজার। তবু কোথায় যেন একটা বহস্য রয়ে গেছে লতিকাকে ঘিরে। বহস্য নাকি টান, নাকি তীব্র আকর্ষণ! ব্যাখ্যা করার মতো শব্দ বাক্য ভাষা বা মনেব ভাব-ভাবনা নেই অশোকের। ভেদহীন বহস্যেব প্রতি মানুষের যেমন দুর্নিবাব আকর্ষণ থাকে, অশোকেব অবস্থাও তাই। রহস্যটা আছে বলেই অশোকেব টান আছে, আকর্ষণ আছে। কতদিন ও নিজেকে প্রশ্ন কবেছে, নিজেকে ভেঙেচুবে জিজ্ঞেস কবেছে, এমন কী আছে ওই মেযেটার মধ্যে যে মাঝরাত্রে ওকে চোব সাজতে হয়! না রূপ, না বংশগৌরব, না ধন-গৌরব। কিছুই নেই, তবু কেন এই তীব্র টান? কেন দুর্নিবাব আকর্ষণ? এর নাম কি ভালোবাসা? অশোক মাথা নাড়ে নিজেব মনে। কি জানি, লতিকার জন্য সব ভুলেছিল। সব। বোধহয নিজেকেও। সেদিন চৈত্রমাস ছিল কিনা জানে না, তবে লতিকার চোখে যে সর্বনাশ ছিল, সেটা বুঝেছিল সর্বনাশ ঘটে যাওয়াব পর। আব সেইদিন থেকে

তৈরি হযে আছে ঘন কুয়াশাব মতো জমাট রহস্য। হযতো রোমহর্ষক। যা ভেদ করতে না পারলে মনে শান্তি আসে না। তাই বারবার ব্যর্থ অভিযানেব পরও অশোকের আকর্ষণ কমে না। বরং বাড়ে। বেড়েই চলে। রহস্য একবার ভেদ হযে গেলে কি এই টান বা আকর্ষণ থাকবে! কি জানি। যদি না থাকে! অশোক কেঁপে ওঠে অজানা আশঙ্কায়।

অশোকের শরীর জুড়ে দীর্ঘশ্বাসেব ঢেউ। হতাশা ওকে গ্রাস করে। মিস্ত্রির ঘবে ঝগড়া এখন শান্ত। প্রচণ্ড শব্দবর্ষণেব পর এখন আশ্চর্য নির্জন। শব্দহীন। অশোকের চোখে ঘুমের আবেশ। উৎকণ্ঠা ক্লান্ত করে। বিবশ করে। লতিকা আদৌ যাবে! ওকে কি বিশ্বাস কবা যায? এই যে মাঝরাত্রে ওর জন্য ছটফট করছে, লতিকা কি টের পাচ্ছে না? নাকি আগের চারবাবের মতো এবাবও ওকে নিয়ে কোনও খেলাব প্রস্তুতি নিচ্ছে!

ভাবতে ভাবতে অশোকের চোখ জুড়ে শবীর জুড়ে উথাল পাথাল ঘুম নেমে এল।

৪

—ঘুমুলে নাকি! কী হল?

একবার দু-বার তিনবার—একই কথা। চাপা স্ববে। ধড়মড় কবে উঠে বসল অশোক। প্রথমটায মনে হল, ও বুঝি স্বপ্ন দেখছে।

—বাবারে বাবা কী ঘুম! সেই কখন থেকে ডাকছি!

কথা এবার স্পষ্ট। অশোক তড়াক্ কবে লাফ দিযে উঠল। নাহ্ তবে স্বপ্ন নয়। সত্যি। লতিকাই কথা বলছে। ওই তো জানলাব ওপারে দাঁড়িযে।

অশোক প্রায ছুটেই গেল জানলায়। বাগ মিশিয়ে বলল, এই তোমার সময় হল?

লতিকা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, কখন থেকেই তো আসবাব জন্য ছটফট করছি। এমন মরণের বাড়ি যে, ঘুমোয না কিছুতেই।

অন্ধকাবে লতিকার মুখ দেখা যাচ্ছে না। নইলে বোঝা যেত ওব মুখে কী আছে, হাসি না আকুলতা? সকালে যেমন দেখা গিযেছিল। অশোক হাতঘড়িতে দেখল বাত একটা বেজে গেছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। এমনকী কোথাও কুকুবের ডাকও নেই।

অশোক বলল, আর এসে কী হবে, এখনই তো বলবে চলে যাবো।

লতিকা ওর হাত ধরে বলল, আরে বাবা বাগ কবতে হবে না। সবাই না ঘুমুলে আসা যায় নাকি!

—তাহলে সকালে এলে কী কবে?

—বাহ্ তখন দিনের বেলা না!

একটা বাচ্চা ছেলেকে ভোলাচ্ছে, এখন আদরকড়া গলায় কথা বলছে লতিকা। অশোকের রাগ অভিমান জোর পাচ্ছে না। ঠান্ডা হযে যাচ্ছে। রহস্য । ধন্ধ। যে মেযেটা আজ সকালে সব ভয় তুচ্ছ করে ওর ঘরে ঢুকেছিল, রাতে আবার সেই পুবোনো ঘেরাটোপে ফিরে যায় কী করে? রহস্য। দিন হলে সব তুচ্ছ—লজ্জা ভয় দ্বিধা, এমনকী গোপনতাব পাঁচিলও ভাঙা যায়, আর রাত হলেই অবগুণ্ঠনে ঢেকে ফেলা। রহস্য। সত্যিই রহস্য।

অশোক তবু ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, আমি বাঘ না ভালুক!

লতিকা হেসে উঠল, ছাড়ো তো। কী ঠিক কবলে?

—ঠিক তো হয়েই আছে, এখন মহারানির মর্জি।

—কখন?

—কাল সকালে, আটটার ট্রেন। আমি স্টেশনে থাকব।

—কোথায় যাবো?

—প্রথমে কালীঘাট, তারপর সোজা ডায়মন্ডহাববাব।

—আবার ডায়মন্ডহারবার কেন?

—বাবে, বিয়ের পব হনিমুন হবে না!

—অসভ্য।

—এর মধ্যে অসভ্যতামির কী আছে। বিয়ের পর হনিমুন তো করতেই হয।

—তোমার যা অবস্থা দেখছি, আমায পেলে তুমি ছিঁড়ে খাবে।

—না-না, দুধের মতো চুক চুক কবে খাবো।

—ইস্, বললেই হল! তোমার পাগলামি আমি ঘুচিযে দেব। দেখো।

—কাব সঙ্গে কথা বলছিস রে লতু?

পিছন থেকে মণিকার গলাব আওযাজ। তীব্র তীক্ষ্ণ। গভীর রাত্রির তলপেট ফেটেফুটে চৌচির হযে গেল। অশোকের মনে হল ঘব জুড়ে তীব্র আলোব ঝলক পড়ল, তারপরেই বাজ পড়াব কড় কড় আওযাজ।

অশোক বা লতিকা দুজনেই স্তব্ধ। অনড়। যেন দুটো পাথরের মূর্তি। যেন প্রাণের সাড়া নেই। নিশ্বাস পতনেবও কোনও শব্দ নেই।

পায়বাব খোপ জেগে উঠেছে মণিকার গলাব আওযাজে। ফাটা বাঁশেব মতো গলা মণিকাব। আব সেই গলা বেয়ে অবিরল উপছে পড়ছে গালাগাল হুমকি ধমকি, খিস্তিব অনর্গল বৃষ্টিধারা। তাবই সাড়া পেযে ঘটাং ঘটাং শব্দে খোপগুলোর দরজা খুলছে। বিস্ময়ের থেকে মজা আর নিষিদ্ধ আনন্দ লোটাব খোঁজ বেশি। কেউ সামনে আসছে না, অন্ধকাবে তীক্ষ্ণ চোখ আর কান মেলে দাঁড়িযে আছে।

অশোক মুহূর্তের জন্য দেখল, মণিকাব চোখদুটো জ্বলছে। লতিকাব পিছনে দাঁড়িযে আছে ও। লতিকা সরতে পাবেনি। জানলার শিকে ওর মুখ ঠেসে ধবেছে মণিকা, চিৎকার কবে বলল, বোকা মেযে, তোকে কতদিন বলেছি ওই শযতান লোকেব পাল্লায় পড়িস না। ও তোকে খাবে, তাবপর ছিবড়ে হযে গেলে ফেলে পালাবে। পুরুষ জাতটা শয়তানেব। তুই জেনেশুনে ওই ফাঁদে পা দিলি!

অশোকেব সংবিৎ ফিরল এতক্ষণে। সে নবম গলায শান্ত করতে চাইল মণিকাকে। বলল, আপনি ঘরে যান—।

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল ওব দিকে। লতিকাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। নিজেই

এবার জানলার সামনে এগিযে এল। চিৎকার করে বলল, কী বলছিস শালা? পাজি নচ্ছার বদমাযেস, মাঝরাতে কেষ্টলীলা মারাচ্ছিস! আমার বোনটাকে নষ্ট করাব মতলব! শযতানি তোব আজ ঘোচাব।

অশোক নিশ্চুপ। কী বলবে! বলাব তো কিছুই নেই। পাথবের মতো দাঁড়িযে বইল। চাবদিক জুড়ে ধ্বংসের বালি ঝরছে ঝুর ঝুর করে।

মণিকা চিৎকার করতে করতে অশোকের জানলায ধাক্কা মাবল, ছুটে এসে দরজায় লাথি মাবতে লাগল। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল, বেরিয়ে আয় শালা। আমার বোনকে ফুসলে নিয়ে যাবাব মতলব! তারপর মজা ফুরিয়ে গেলে ছেড়ে দিবি! তোকে শালা চিনি না!

মণিকা একনাগাড়ে চিৎকার করে যাচ্ছিল, কী বলছে সব শুনতেও পাচ্ছে না অশোক। ও অসহায দৃষ্টিতে লতিকাব দিকে তাকাল।

লতিকাকে টানছে মণিকা। জোব কবে সরিয়ে নিতে চাইছে অশোকেব সীমানা থেকে। তাবপবই ধপ কবে শব্দ। মণিকা অজ্ঞান হযে গেছে। লতিকা ভ্রূক্ষেপ করল না, অশোকেব দিকে তাকিযে দৃঢস্ববে বলল, যা খুশি হয় হোক, আমি শুনছি না, তোমার সঙ্গে যা কথা, তাই হবে। তুমি পিছোবে না বলে দিলাম।

৫

স্টেশনেব প্ল্যাটফর্মে ছটফট করছিল অশোক। সাড়ে আটটা বেজে গেল, এখনও লতিকাব দেখা নেই। প্ল্যাটফর্মে লোক গিজগিজ করছে। ছুটির দিন নয, দেখতে দেখতে ডেলি প্যাসেঞ্জারদেব ভিড বাড়তে শুরু কবেছে। আব ছ-সাত মিনিটেব মধ্যে ট্রেন এসে যাবে।

বাস্তাব দিকে বার বার তাকাচ্ছে অশোক। কত মুখ চোখে পডছে। চেনা অচেনা। দেখা নেই শুধু সেই প্রিয মুখেব।

অশোক ঘনঘন হাত ঘড়ি দেখছে। লতিকা আজও—। গতরাত্রে লতিকাব শেষ কথাগুলো, ওর চোখ মুখের দৃঢতা, কাঠিন্য—সবকিছুই অশোককে বিবশ করেছিল, লতিকা এবাব অন্তত পিছু হঠবে না। ঠিক চলে আসবে। ওর জন্যই তো এবাবের পবিকল্পনা। প্রথম দিকে যা ছিল অনীহা, শেষে প্রচণ্ড আবেগে পবিণত হয়। অবদমিত আকাঙ্ক্ষা যেন অন্ধকাব গহ্বর থেকে অগ্নুৎপাতের মতো বেবিযে আসতে চায়। লতিকাকে পাওযাব ইচ্ছা ভূতের মতো পেয়ে বসে। এব আগেও এমন হযেছে। যতই নিজেকে দমন করুক সংযত করুক—লতিকার ওই এগিযে আসা, উপছে পডা আবেগে ভেসে গেছে বাববার।

অশোক হতাশ হযেছে, রেগেছে, এমনও প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে লতিকার মুখ দেখবে না। তা সত্ত্বেও লতিকার সামনে, ওর হাসি, মিষ্টি ধমক, কাতর অনুনযে ভুলে গেছে সব। আবাব নতুন উদ্যমে উঠে দাঁড়িযেছে। লতিকা যে একটা বহস্য, ঘন কুযাশাব মতো রহস্যের জাল বিছিযে ওকে গ্রাস করে আছে—সেটা বুঝেও অশোক পিছিযে আসতে পারেনি।

দূবে ট্রেনেব হুইসিল। অশোক চকিতে ফিবল বাস্তার দিকে। ওই তো! আহ্ অবশেষে আসছে। ওই তো, মুখ নিচু কবে, সলাজ কিশোরীর মতো চপল পায়।...

ছবি, জলছবি

সুদর্শন সেনশর্মা

হ্যাঁ আপনি লিখে নিন। আমি শ্রীকুমার ভৌমিক। বৈচিডাঙা হেলেঞ্চা বাজার থানা বাগদা পো. হেলেঞ্চা কলোনি, বনগাঁ স্টেশন থেকে আসবেন? বনগাঁ স্টেশন থেকে বাইশ কিলোমিটাব। বনগাঁ স্টেশন থেকে রিক্সা করে বাগদা বিবানব্বই নম্বব বাসস্টপে (বনগাঁ-দত্তফুলিযা) বা ৯২এ (বনগাঁ-বয়ড়া) আসবেন এবং যে-কোনও বাসে হেলেঞ্চা বাজার। হ্যাঁ কাজটা আমি একটু তাডাতাড়িই সেরে ফেলতে চাইছি, বুঝলেন কিনা! বনগাঁ থেকে আপনাব রিক্সায় পনেরো মিনিট। বাসে দেড়ঘণ্টা টোটাল একঘণ্টা পঁযতাল্লিশ মিনিট। হেলেঞ্চা বাজারে নেমে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার নাম করলে যে কেউ দেখিযে দেবে.. একদম খেলার মাঠের কাছেই হলুদ দোতলা বাড়ি। ও, আপনি সব চেনেন বলছেন তবে তো কথা নেই। ছুটির দিন, রবিবার দেখে প্লিজ আসবেন.. ছুটিব দিন ছাড়া আমাকে কিন্তু পাবেন না। হ্যাঁ দোতলা হালে করেছি...হ্যাঁ হ্যাঁ পুবোটাই...নমস্কার, আচ্ছা..

ফোনটা রেখে শ্রীকুমার ভৌমিক স্ত্রীর দিকে তাকান। মুচকি হাসেন, বললেন, শোভা—আর একজন। দেখো জয়দুর্গা বলে পুজোব আগেভাগেই যদি সব মিটিয়ে দিতে পাবি।

স্ত্রী স্বামীর মুখেব দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি প্রাণে ধবে বাঁপ ঠাকুর্দার বসতবাড়িটা বেচবে? ঠিক...

—তবে এসব কি এমনি এমনি করছি

—যে বাড়ি কিনবে তাকে আমাদের নৌকোটাও দিযে যাবে তো .

ভালো মনে করেছ তো, শ্রীকুমার বললেন নৌকোটাকে ছাদে তুলে দিতে হবে...বর্ষা নামাব আগেই যদি সব মিটে যেত; নৌকোটা দেখলে আবাব যদি..

কিন্তু ঠিকঠাক ব্যাটে-বলে হচ্ছে না তো শোভা। সেই যে দালাল কুঞ্জকে ধরলাম... লোক তো সে ধবে আনছে, কিন্তু ক'দিন? বর্ষা নামলেই তো সে পেশা বদলে রিলিফবাবুদের আড়কাঠি হযে যাবে...ঠিক সুযোগটা কাজে লাগাতে পারছি না শোভা ..ঠিক গাঁথতে পাবছি না। তল্লাটেব কেউ জলেব দবে বাড়িটা বাগাতে চাইছে...?

বাগাতে চাইলেই হল? ছাড়ছে কে—শোভা বলে উঠলেন। কিন্তু দ্যাখো, শ্রীকুমার মিন মিন কবেন, যেই আসছে—তাকেই বন্যার ভাঙানি দিচ্ছে. বলো ইছামতীর সংস্কাবটা ঠিকঠাক হলে, কেউ বাপ ঠাকুর্দার ভিটে ছেড়ে চলে যেতে চায়? এ তো প্রতিবছব বর্ষায হাতেব তালুতে প্রাণ নিয়ে. তোমরা পঞ্চাটাকে বাবা বাছা করছ, রোজ খাওযাচ্ছ .ব্যাটা অকৃতজ্ঞ ..

শোভা নরম গলায বলেন, ওর ওপব খামোখা রাগ করছ কেন? ওব কে-ই বা আছে.. চেয়ে চিন্তে খায়। নামেই ঘবামি ..বন্যা তো ওব সব নিল...যে বাচ্চাটা বেঁচে আছে সেটারও গভীর অসুখ...

না রাগ করবে না? শ্রীকুমাব বলছেন, এই তো গত রবিবাব একটা সেটলমেন্ট হযেই যাচ্ছিল। কুঞ্জ বাড়ি দেখতে আসা লাটের পয়সাঅলা লোকটাকে বলল একটা জিনিস কিন্তু একদম ঠিক—এইখানে বাঙালের উৎপাত নাই। কুঞ্জ নিজেই যদিও ঢাকাব বাঙাল— চেপে চুপে কথাটা বলেছে তো...

সে আব বলতে! শোভা হেসে ওঠেন, বন্যা নামলেই রিলিফবাবুদের তোল্লাই-এ কুঞ্জই তখন বাঙাল নায়েব.. বন্যার্তদেব কাকুতি মিনতি একদম কানেই নেয না...পঞ্চার কী হাল করেছিল ভুলে গেছ? পঞ্চা ঘবামিব নিজেবই ঘব নেই.. খড়ের গাদায ভেজা খড়ের ভেতব কোনওক্রমে মরে বেঁচেছিল..বৌ বাচ্চার তখন খবব নেই..

সে শোধ পঞ্চা এখন নিচ্ছে তো .!

কুঞ্জ বাঙালের উৎপাত নাই বলতেই পঞ্চাটা তখনই বলে কিনা..তবে বানাব উৎপাইত আছে...বনগাঁ ইস্টিশান থেকে আসিতে একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে। আর দু'হাজাব-এর বন্যায শ্রীকুমারদা জেদ কবে সকাল সাড়ে ছ'টায় হেলেঞ্চাব বাড়ি থেকে বেরিযে বনগাঁ ইস্টিশানে পৌঁছেছিলেন বাত সাড়ে নটায।

—পনেবো ঘণ্টা।

—হ্যাঁ সেবার শ্রীকুমারদা তো তলিযেও যেতে পাবতেন ঘণ্টার হিসেব কী আর বন্যায থাকে?

লোকটা তখন বলে, সে কি এতসব তো কেউ আমায বলেনি, বর্ষাব সময একটা নৌকো লাগবে তবে..

মুখপোড়া তখন বলে কিনা আপনার পযসা থাকলে স্পিডবোটই ভালো—বন্যাব সময় ভাড়াও দিতে পাববেন।

কুঞ্জ তখন তো পঞ্চার দিকে দাঁত কড়্মড়্ কবে তাকাচ্ছে, পঞ্চাব কোনও হেলদোল নেই..শালা আমাবই খাবে আবাব দাড়িও ওপ্ড়াবে! পঞ্চা ঠিক লোকটাব পেছন পেছন বাসস্টপ থেকেই!

লোকটা জিজ্ঞেস কবল, প্রত্যেক বছবই বন্যা হয় নাকি?

কুঞ্জ আড়াল করে—না না সেরকম কিছু নয।

তাকে থামিয়ে দিযে পঞ্চা হারামিটা সরি শোভা, ঘরামিটা বলে কি না—কী বলছ গো কুঞ্জদাদা প্রতিবছর না হলেও প্রায বছরই তো হয়। দু'হাজার সালের পুজোর সময় কীবকম বিপদে পড়েছিলেন শ্রীকুমারদা বলেন বৌ একদিকি মেযেবা একদিকি..বাড়িটা তো সে জন্যেই...

লোকটা চলে যেতে কুঞ্জব সঙ্গে পঞ্চার প্রায় হাতাহাতি হযে যাচ্ছিল। আমাব কাজে ভাঙানি দিবি তো মুখ মেরে ভেঙে দেব ঘরামিব ব্যাটা হারামি! খুব নোলা হয়েছে না।...কলকাতার লোকদেব ঘরবাড়ি সব তুমি হাতাইবাব তাল করিছ..। কুঞ্জ তখন বাগে ফুঁসছে।

পঞ্চা তখন বোকার হাসি হাসে—আমি হাতাইব কি আমার হাতই নাই! শোভা হাসেন,

পঞ্চা ঘবামি তো মিথ্যে বলে নাই। নিজেরই তো ঘর নাই। কুঞ্জ ওব জমি জিরেত কেমন ছল ঘরে..ইছামতীব জলে ওব বৌ গেল সব গেল..এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয।

প্রত্যেক বছব এক ভয নিযে থাকা। ভয নিয়ে বাঁচা। কিন্তু এই ভযেবও একটা অহঙ্কার আছে। এ অহঙ্কারেব একটা ভয মেশা তৃপ্তি আছে। এই বাড়ি, তোমাব আমাব ছবি, ছোটো মেযে কবণী এবং এই বন্যার জলছবি এছাড়া আমাদেব জীবন ভাবা যায। পঞ্চা ঘরামিও আমাদেরই জীবনচরিতের এক অচ্ছেদ্দ অংশ হযে আছে। গত বন্যায ওর বৌকে হাবিযেও ও তোমাব বৌকে পাহাবা দিযেছে। ছবি যে পঞ্চাঘবামিকে রোজ খেতে দেয় সে কৃতজ্ঞতাতেই তো..

শ্রীকুমাব তখন তলিযে যেতে থাকেন। অফিস তো হৃদযপুবে—বড়মেয়ে তাব কাছে, কলকাতায পড়ে যে ছোটোমেযে আব তার মা থাকে হেলেঞ্চাব বাড়িতে...

ছোটোমেযে পুজোব বাজার কবতে এসেছে হৃদযপুরে। দুই মেযেকে নিযে কলকাতায পুজোব বাজাব। শ্রীকুমারেব ব্যাঙ্ক সেদিন ছুটি। পঁচিশে সেপ্টেম্বব হেলেঞ্চার বাড়ি থেকে ফোন করে পঞ্চা জানায এদিকে বন্যা আসছে..বৌদি ফোন কবতে বললেন, দেবি কবলে বাড়ি আব বাঁচানো যাবে না। বৌদি বলেছেন মেযেদেব হৃদযপুবেব বাড়িতে রেখে আসবেন...বনগাঁয় বাস বন্ধ হয়ে গেছে..

বর্ষায় জল তো জমে। কিন্তু এরকম সাংঘাতিক অবস্থা শ্রীকুমাব তো স্বপ্নেও ভাবেননি। ছোটোটাকে বুঝিযে, বড় মেযেকে দাযিত্ব দিযে হৃদযপুব থেকে বনগাঁ লোকাল—বনগাঁয নেমে শ্রীকুমাব দেখলেন কোনও বাস চলছে না। বাসট্যান্ড জলে ডোবা। এত জল আসছে কোথা থেকে? বিক্সাকে অনেক বুঝিযেও বাজি কবানো গেল না—পাইকপাড়া অব্দি হাঁটতে হাঁটতে..জল-জল।

এক ভ্যানঅলা ঠেলে ঠেঁলে একটু এগিযে দিল-অটো ষাট টাকা নিযে নৌকোর মতো ভুটভুটিব মতো হেলেঞ্চাতে নামায—ঘরে ঢুকে শ্রীকুমাব দেখে ভযে অচৈতন্য শোভাকে পাহারা দিচ্ছে পঞ্চা. নিজেব বৌ, বাচ্চা নিযে কোথায আটকে আছে..পঞ্চার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—

শোভাব নাকে মুখে জল ছিটিযে শ্রীকুমার বলেন আমি, আ-মি এসে গেছি শোভা। বাস্তা দিযে লোক তখন নিবাপদ উদ্দেশ্যে ছুটছে। শ্রীকুমার বললেন, পঞ্চা যাহ্ যাহ্ তোব বৌ বাচ্চা কোথায় আছে, খোঁজ করগে যা—

চাবিদিকে শোঁ শোঁ জলের শব্দ। বাস্তা, বাসবাস্তায, বিবানব্বই-এব দত্তফুলিযা বোডে এক কোমব জল। চতুর্দিকে কূলপ্লাবী প্লাবন। প্লাবনেব শব্দ। ইছামতী নাকি ফুঁসছে। বাত দশটা বাজতে না বাজতে ঘরে চাবফুট জল। স্রোতে বাস্তা পেবতে পাবছেন না শ্রীকুমাব। ছোটো মেয়ের বই। জিনিসপত্র ছাদে তুলে দিযে স্ত্রীকে নিযে কী কববেন ভাবছেন। সকালবেলা জল ছাদ ছুঁই ছুঁই—স্রোত ঠেলে ঠেলে কোনওক্রমে উল্টোদিকে শ্রীকুমাব বৌকে নিয়ে তাব জামাইবাবুর ছাদে আশ্রয নিলেন..চাল ডাল সেদ্ধ..জলস্রোতে তখন খোলামকুচি ভেসে যাচ্ছে..আসবাব ভেসে যাচ্ছে...গবাদি পশু ভেসে যাচ্ছে মানুষ ভাসাব চেষ্টা কবছে-এক

একটা ছাদে দুশো তিনশো লোক। জামাইবাবুর ট্রানজিস্টার দুপুরের দিকে ঘোষণা করে বাগদায় জল বাড়ছে লাইনে জল উঠে যাওয়ায় চাঁদপাড়া অব্দি ট্রেন যাচ্ছে .

শোভা বললেন—কী ভাবছ?

—উ

—দেখো এ বাড়ি আমরা বিক্রি করতে পারব না। কাউকে কিনতেও দেবে না.. আস্তে আস্তে বেহাত হয়ে যাবে..পঞ্চা ঘরামিকে দিয়ে দাও—

মনে আছে সেই যে তুমি সেবার মেয়েরা কেঁদে কেটে মরে যাবে ভেবে আমাকে রেখে জাঙিয়া পরে, গামছা কাঁধে দেড়শো টাকা নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলে—ভাবিনি তো তোমাদের আর ফিরে পাবো..এখন বাড়িটা গেলে যাক এসব ভাবনা আর ভাবি না, সে তুমি পঞ্চাকেই দাও বা কোনও ভূতকে।

সেই তো হেলেঞ্চা বাজারের সবাই চিৎকার করে বলল, দাদা রাস্তায় এই ছ' ফুট জলে কোথায় যাবেন? চতুর্দিকে জল যতদূর দেখা যায়—বাবলা গাছ শিরিষ গাছ রাস্তার পাশের নিশানা—জলে বিষাক্ত পোকা। বাজার পেরতেই জনমানবশূন্য—অন্ধকার, আবার বৃষ্টি নামছে। জানা পথ তো শ্রীকুমারের গ্যারাপোতা বাজার অব্দি। সাঁতরে সাঁতরে পাটশিমুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র—কম্পাউন্ডার ছাদ থেকে চেঁচাল কে যাচ্ছেন? ডাক্তারবাবু ছাদে উঠে আসতে বলছেন।

মুখ ফিরিয়ে শ্রীকুমার দেখলেন ছাদে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে মানুষের সঙ্গে ধোপার গাধাটা। সে ছাদে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিকট স্বরে ডেকে উঠল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার শ্রীকুমারকে একদিন বলেছিলেন গাধাটাকে ওর মালিক এত মারে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে পালিয়ে এসে ডাক্তারবাবুর জানলায় মুখ রেখে কাঁদে সেই গাধা নীরব নিশীথিনীতে.. ডাক্তারবাবু গাধাটাকে ভালোবেসে ফেলেছেন এখন এসব ভাবার সময় নেই তবু পশুটার কথা যে এবার ভুলে যায়নি।—স্রোত দুই ফুট উঁচু এক বৃদ্ধ বলছেন বাবা যাসনে.আলো আছে সেই ভরসায় যাচ্ছিস?.জল যে বাড়ছে। আকাশে হেলিকপ্টার ডনরক্ষো স্কুল আধডোবা—শ্রীকুমার সুন্দরপুর অঞ্চল পঞ্চায়েত অব্দি এসেছেন একটা বাড়ির ছাদ থেকে এক মহিলা চেঁচিয়ে বললেন—বাবা নৌকো যাচ্ছে তো—নৌকোয় উঠে পড় ভেসে যাবি নাকি। নৌকোও তো কলম বাগান নামিয়ে দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে গেল।

কখনও ভেসে, কখনও সাঁতরে—কোথাও পা ঠেকাতে গেলে গলা অব্দি ডুবে যাচ্ছে—দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে কারা?—দড়ি ধরে ভেসে ভেসে গ্যারাপোতা চাঁদার দিকটায় ভারত সেবাশ্রম খিচুরি রান্না করছে এখন খিচুরি খাওয়ার সময় নেই। বিকেল হতেই অন্ধকার আরও গাঢ়। শ্রীকুমার প্রাণপণে সাঁতার কাটছেন। সাঁতরে সাঁতরে চাঁদা বাজার। জলের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। পাখিরা পালিয়েছে। ঝিঁঝি পোকার ডাকও শোনা যাচ্ছে না। ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে না। দূরে কোথায় কোনও গভীর ডাক আর্তনাদের মতো শোনাল। জলস্রোত আসবার ভাসছে—একটা মরা কুকুর, মৃত ওল্টানো সোনাব্যাঙ, টেলিফোন তার জল ছুঁয়ে আছে কলাগাছ গলাজলে. ঘাট বাওরে নদী মাঠঘাট সব একাকার চাষের মাঠ ধরে ধরে

এগোবেন শ্রীকুমার ভাবলেন—একটা ডোবা বাড়ির দেযালে একটু জিবিয়ে নেবেন বলে দু'হাত বাখতে সেটা ভেঙে পডল—লাফিয়ে সরে এলেন।

ঘাটবাওবের বাঁশ বাগান কলাবাগান নাবকেলবাগান জলে থৈ থৈ। একটা সাপ। একটু স্থির হযে দেখেন জলঢোড়া উল্টো দিকে যাচ্ছে—শো শো আওযাজ উঠল—ঝোড়ো বাতাস মহাপ্লাবনেব সংকেত দিচ্ছে কি! কোন দিকে বনগাঁ—শ্রীকুমার বুকের কাছে একটা হিম স্পর্শ অনুভব কবেন—সীমান্তেব দিকে ভেসে যাচ্ছেন না তো! হঠাৎ একদিকে পাযে একটা মাচা ঠেকল...এটা একটা বিল. .পা বাখতে গিয়ে দাঁড়াতে গিযে পুবো ডুবে আবার ভুস করে ভেসে উঠলেন .সাঁতাব সাঁতাব ছাড়া গতি নেই.. হাতে পাযে খিল ধরছে যে ঠাকুর..

সাতটা সাডে সাতটা বাজে নিশ্চযই। পাইকপাড়ায এক বাডিব ছাদ থেকে একজন চেঁচিযে উঠলেন, কে গো বাবা .এমন দুঃসাহস. কোন যমালযে যাচ্ছ? এগিও না। যাচ্ছ কোথায?

—বনগাঁ যাবো বাবা

উত্তরমুখো হযে আছো যে দক্ষিণে ঘোরো .দক্ষিণ দিকে যেতে হবে..

পডে যাওযা বাড়িব টালি, বাঁশেব খুঁটিব দেওয়াল ধবে ধবে যেন ট্রাপিজেব খেলা দেখাচ্ছে শ্রীকুমাব। দর্শক কেউ নেই। পাইকপাড়া বাজারের কাছটায পবখ কবতে গিযে পাযেব তলায় বাস্তা পেলেন—জনমানুষশূন্য চতুর্দিক সাঁতাব কাটছেন শ্রীকুমার. এ যেন ছেলেবেলাব সেই জযন্ত বর্ধনেব অবিরাম সন্তরণ। সেই জয়ন্তদা তো সাঁতার দেখাতে দেখাতে বর্ধমানে হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হযে ...মনে জোব আনছেন, তাকে তো মেযেদের কাছে পৌঁছতেই হবে.. আবাব ফিরেও আসতে হবে এখানে.. টেলিফোনেব তাব ধবে ধবে এগিযে হঠাৎ বুঝতে পাবেন বাসের দেওযালে গোত্তা খেলেন। বিবানব্বই বাসস্ট্যান্ডেব এটা কোনও বাসেব ছাদ। শরীব ছেড়ে দিতেই ইছামতীব স্রোত আট হাত ঠেলে নিযে গেল এক ধাক্কায—একটা টেলিফোনেব খুঁটি ধবে, দু-হাতে জডিযে শ্রীকুমাব তখন হাঁপাচ্ছেন—লড়াই চলছে—স্রোতেব সঙ্গে লড়াই কবে বনগাঁ থানা—ডান দিকেব এস ডি ও কোর্টের ওখানে পাযের তলায মাটি পাওয়া গেল। মিলিটাবি বিলিফের ব্যবস্থা কবেছে। বানভাসি মানুষেব ভিড. ওই তো ওই তো পঞ্চার বৌ. হাডগিলে ছেলেটা. .রোগা রোগা হাত-পা পেটটা টিন টিন ..শ্রীকুমাব হাঁকেন এই রাঘবেব মা এখানেই থাকবে..পঞ্চা তোমাকে নে যেতে আসছে. শ্রীকুমাব কী কবে দাঁডাবেন। যদিও গা হাত পাযে অসহ্য ব্যথা.. শবীব বইছে না.. শ্রীকুমাব এবার হাঁটেন। রাত সাড়ে নটায় বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছে নাচাবের মতো অসহায়ের মতো পাশেব একটা বাড়িতে আশ্রয় চান। তাদেবও বাডন্ত বুড়ো বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই ও. তবু লঙ্কাপোড়া পান্তা পেয়ে যান। শবীবটা ধাতস্থ হয়..

ছোটো মেযে ঠেলল. বাবা কী ভাবছ? বাবা দিদি ডাকছে কাল ক'টার ট্রেনে হৃদয়পুরে ফিববে?

শোভা বললেন—দাঁড়া করবী ..তোব বাবাকে আবাব বন্যায পেযেছে এখন শুকনো ডাঙায় সাঁতাব কাটছে। শ্রীকুমাব একগাল হেসে বললেন, কববীমা সে মাইতি কে আমি এ জীবনে ভুলব না.. লঙ্কাপোড়া পান্তা খাচ্ছিলাম যে মা

সকাল সাড়ে তিনটেয় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে, মা করবী সাড়ে সাতটায় চাঁদপাড়া। তারপর তো ট্রেনে পৌঁছলাম তোদের কাছে দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ—তোদের আমাকে জড়িয়ে ধরে কী হাউ মাউ কান্না বাবা কী করে এলে. মা বেঁচে আছে তো?

বাবা বাড়িটা সত্যিই বেচে দেবে. ইছামতীর সংস্কার হয়ে যাবে বলছে তো সবাই. করবী বলল।

শ্রীকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এ জীবনে আর দেখব নারে. ফের জলস্রোত জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাই যদি। তোর মাকে নিয়ে ভয়.. তোদের নিয়ে..বন্যার সময় কতরকম বিপদ হতে পারে..

শোভার চোখ মুখ তখন স্থির, কিন্তু আলতো লেগেও থাকে এক টুকরো অমলিন হাসি..বন্যায় যদি ভেসেও যাই, বানভাসি হই—মরে যাই. সেই একদিনই যেতে চাই. বাড়ি বেচেবুচে নয়..

শ্রীকুমার স্ত্রীকে দেখেন, বলেন এটা তোমার মনের কথা!

হ্যাঁ তো, শোভা বলছেন অতই যদি ভাবনা তোমার বন্যার পরে দোতলা করলে কেন?

ধরা পড়ে গিয়ে শ্রীকুমার হাসতে চান, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেও তুমি এখানে পড়ে থাকবে?

—হ্যাঁ তো। তোমার কলকাতার জন্য মন কেমন করে, তুমি থাকবে হৃদয়পুরে কলকাতায় আর বন্যা হলে ? এখন আর ওরকম দৌড়দৌড়ি আমি পারব? দম বেরিয়ে যাবে?

—আবার তখন ভাবা যাবে .

মেয়েরা হৈ হৈ করে উঠল—'তখনও ছিল অন্ধকার তখনও ছিল বেলা..হৃদয়পুরে চলিতেছিল '

কী হচ্ছে হৃদয়পুরের বাবা, হেলেঞ্চার মা—টি.ভি সিরিয়াল .,

শ্রীকুমার হাসেন, সিরিয়াল হলে তোদের সামলে আবার তোর মাকে গিয়ে নিয়ে আসাটাও তো খাওয়াতে হবে! শোভা দেবী তো হেলেঞ্চাতে তোদের শোকে আর তোদের বাবা পৌঁছতে পারল কিনা ভেবে ভেবে .

শোভা বিছানায় আধশোয়া, পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, তুমি থামবে.. সেই এক গল্প বড় মেয়ে ছবি এসময় শ্রীকুমারের পাশে এসে বসে.

বাবার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বিলি কাটতে কাটতে মায়ের দিকে মুচকি হাসি হেসে বলল, মা, বাবা আর একবার বলুক না, বলতে ইচ্ছে করছে—বলো বাবা বলো

ছবির কথার ঢং-এ শোভা হেসে ফেললেন।

শ্রীকুমার বড় মেয়েকে দেখেন কত বড় হয়ে গেল মেয়েটা। মেয়েটা মুখটা গম্ভীর করে ফেলেছে।—তোদের সঙ্গে তিনদিন থেকে আসলে তোর মাকে তো ফোনেও জানাতে পারছি না করে যাবো—ফোনেও তো জল ঢুকে আছে বানের জল .মেয়েরা আবার হাসতে শুরু করে স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে নেয়, শ্রীকুমার থামেন না, এক নিঃশ্বাসে বলে যান ফার্স্ট ট্রেনে হাবড়া

নেমেছি। একটা জলেব লবির খালাসিকে টাকা কবুল কবে লবির পেছনে উঠে আটটায় বনগাঁ এক হাজার টাকা দিয়ে একটা নৌকো আপ ডাউন ভাড়া কবি.. পাঁচটা মাঝি...হেলেঞ্চা বিকেল পাঁচটায় .নৌকো ভাসিযে সন্ধ্যাব অন্ধকারে আবাব তোর মাকে নিয়ে ফিরি.. পঞ্চাব আকুল ক্রন্দন. .বৌটা বাবণ না শুনে আবার ছেলেব হাত ধবে আসতে গিযে রায ব্রিজেব কাছে ইছামতীব স্রোতে ভেসে যায...রুগ্ন অচৈতন্য ছেলেটাকে উদ্ধাব কবে কাবা বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে দিযেছিল .পঞ্চা তখনও তা জানে না বাত্রি সাড়ে বাবোটায ইলেকট্রিক পোস্টে দড়ি বেঁধে নৌকো নোঙব করে...ভযে ভয়ে সারা বাত্রি. সকালবেলা সূর্য উঠলে দিক ঠাওব করে আবাব নৌকো চলল...বনগাঁ বি.ডি ও অফিস, সকাল আটটায বাটাব মোড

দুই মেয়েই দুলে দুলে হাসছে। ছবি বাবাকে থামিযে দিয়ে বলল, আচ্ছা বাবা প্রত্যেক বাব দাড়ি কমা সমেত একই বকম বলো কী কবে!

ছোটো মেয়ে বলল. এই দিদি বাড়িটা কি বাবাকে বিক্রি করতে দেযা হবে?

ছবি বলল হাসতে হাসতে, বিক্রি কবতে তো পাবমিশন দেয়া হযনি. বাবাকে গল্প বলতে পাবমিশন দেযা হযেছে .

এই বোকা মেযে—বাড়িটা বিক্রি না করলে তোব বিযে কী কবে দেব?

—খুউব না? কববীব মুখে কপট রাগ, আমবা কোথায় যাব? মা, আমি? আব দিদিটা এত তাড়াতাড়ি বিযে কবলে পঞ্চাকাকুব বাঘবকে. মা মবা ছেলেটাকে বড কে কববে ? কে দেখবে?. ছ'বছবেব ছেলেটা এখনও দিদিব কোলে উঠে বসে থাকে যে—

ছবি বলল—বোন তুই ঠিক বলেছিস ..বাড়ি বিক্রি না কবে আমাব বিযে যদি না দেযা যায় অমন বিযে নাই বা কবলাম...

শোভা বড় মেযেব পিঠে হাত বুলিযে দিতে দিতে বললেন—এই তো আমাব বড মেযে.. এই না হলে .

আচ্ছা দিদি, কববী শ্রীকুমাবের দিকে তাকিযে হেসে হেসে বলল—বোববাব বোববাব আমাদেব বাড়িটা কি এবকম ইন্টাবভিউ দিযে যেতেই থাকবে .?

—হ্যাঁ কুঞ্জ ব্রোকারও থাকবে, পার্টি থাকবে, বাবা থাকবে.. পঞ্চা ঘরামি থুবি পঞ্চা কাকুও থাকবে .

আব বেজাল্ট হবে নট নট নট..

শ্রীকুমাবেব অবাক চাউনিব সামনে মা এবং দুই মেযে হো হো হাসতে থাকল

এ সমযেই ক্রন্দনধ্বনি . বাঘব ছুটতে ছুটতে এসে ছবিকে জড়িযে ধবে। দু-চোখে জলেব ধাবা. .বাবারে আবাব মাবিছে-বাবাবে আবাব মারিছে ..কুইন জো ধোপা—

চল্‌তো দেখি, ছবি বণং দেহি মূর্তিতে বেবিয়ে পড়ে ..কববী, শোভা শ্রীকুমাবকে বলতে থাকেন. .রাগেব গলায, কুঞ্জকে তুমি এখনই সাবধান কবে দাও...বাড়িব আর দালালি ওকে করতে হবে না

পঞ্চাব সব নিযেও ওব সাধ মেটেনি...ওব তো সব গেছে দাদাটা দেখে না...সিকিটাক জমিও কুঞ্জর চাটা না মাবলে চলছিল না-কি ফেবেব্বাজ্জ। পঞ্চাটাকে তো আমরাই বলেছি. .।

বাড়িটা আমবা বেচি আব বেনামে বাড়িটা কুঞ্জব হযে যাক। ব্যাটা বাস্তু ঘুঘু এবাব বিলিফ বোর্ডে আমরা ওব নামে চিঠি দেব। পঞ্চার গাযে হাত তোলার ও কে। ও খাওযায না পরায়! এত সাহস ওর আসে কোত্থেকে! আচ্ছা তুমি কী গো বাবা! বেশ রাগেব গলা করবীব, তুমি কি বুঝতে পারো না? যাবা কিনতে আসছে সবই তো ওব লোক, কম ঘোবেল ভেবেছ কুঞ্জ পোড়েল। ব্যাটা বজ্জাত .বন্যা শকুন...

বন্যায় ভিটে হাবানো স্বজন হাবানো কপর্দকহীন নেই মানুষরাই তো বন্যা বণিকদের বোড়ে। বন্যা কাকব সব নেয আবার কাউকে দু'হাত ভবে দেয়, ত্রাণের, পুনর্বাসনেব পযসায ভাগ বসিযে, থাবা বসিযে। কুঞ্জ পোডেলরা উচু গাছেব শকুনদের মতো আবও বড আশা নিযে ওত পেতে থাকে পরেব বর্ষাব জন্য, বন্যাব জন্য। শ্রীকুমাব কি জানেন না, সবই জানেন। শুধু এক ভয তাকে তাড়া কবে ফেরে—চোখ বন্ধ করলেও জল ঝডেব জলছবি তিনি দেখেন। দেখতে থাকেন।

শ্রেণীশত্রু

মলয় দাশগুপ্ত

এক

বঘুপতিব বাড়ি ফিবতে দেবি হয, দেবি মানে শেষ ট্রামে বাড়ি ফেবে বঘুপতি। বাসন্তীব ভেতরটায় উদ্বেগ থাকলেও বাইবে তা প্রকাশ করে না। তাব চিন্তা ববং ছেলে সমরকে নিযে, দিনদিন এমন বাউণ্ডুলে হযে উঠেছে যে কখন কী কবে, কোথাযই বা যায তা সে জানতে পারে না। অনেক কথাই গোপন বাখে ছেলে, অথচ ওর বয়েস মাত্র কুড়ি পেরিয়ে একুশ, এ বযসটাতেই তো বেশি ভয।

রঘুপতি বাড়ি এসে জামাকাপড ছেড়ে হাতমুখ ধোয়, লুঙ্গি পরে, তারপর চৌকিব ওপর সটান শুযে পড়ে। খালি গা, লুঙ্গিব নীচে কোনো অন্তর্বাস নেই, চিত হয়ে শুযে পডায বুকেব ঢিলে চামড়া আব খোদলে যাওয়া পেট বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয। বাসন্তীর কাছে এই ক্ষযে যাওযা রঘুপতি পুবোনো হযে গিযেছে, নতুন যা তা এই বাড়িতে এসেই সটান শুযে পড়া।

চিত থেকে পাশ ফিবে বঘুপতি বলে, ঘুম পেযেছে, বালিশটা দাও।

'সে কী, খাবে না কিছু?'

'না।'

'কেন?'

'শবীরটা কাহিল লাগছে।'

এবাব বাসন্তী ভয় পায়, দৌড়ে গিয়ে স্বামীব গায়ে, মাথায, হাতে হাত বুলিযে পবখ করে। না, গাযে জ্বর নেই, পেটও পাতাপাতা। তবু উঠে বসাব শক্তিটুকু হাবিযে নেতিযে পড়েছে। মাথাব তলায বালিশ গুঁজে দিযে ঘুমেব ব্যবস্থা কবে বাসন্তী। ঘুমোলে যদি শক্তি খুঁজে পায।

আলো নিভিয়ে চৌকিব অন্য পাশটাতে শুযে পডে ছেলে সমবের প্রতীক্ষা করতে থাকে। সমর এলে ওই বাবাকে তুলতে পাববে, তখন তিনজনে মিলে বাতেব খাবার খাওয়া। ততক্ষণ জিরিযে নিলে নির্ঘাত উঠতে পারবে লোকটা।

অন্ধকাব ঘবেই ঢোকে সমর। হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালে, চল্লিশ পাওযাবেব বালব্ যতটা অন্ধকার দূর কবতে পারে ততটাই দূব হয়। একবার ঘরেব অবস্থাটা দেখে নিযে কী করবে না করবে বোঝার আগেই বাসন্তী ধড়মডিযে উঠে বসে। চোখটা কেবল জড়িয়ে আসছিল এমন সময়ে সেই জড়ানো চোখে আলো পডায এই ধড়মড়িযে ওঠা। শোয়া

সময়ে মনের ভিতরে ছিল সমর আসবে, এখন তাই নতুন কোনো ভাবনা আসে না, বরং খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার পাট চুকিয়ে ফেলার কাজেই মন দেয় সে।

'হাত পা ধুয়েছিস?'

'না।'

'যা, হাত-পা ধুয়ে আয়, বাবাকে ডেকে তোল—'

'বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে? খায়নি কেন?'

'কেন আবার, খুব কাহিল লাগছিল—শুয়েই ঘুম—'

'ফিরতে দেরি হয়েছে, কখন এসেছে বাবা—?'

'কখন আবার, তুই আসার কিছু আগে, ঘড়ি আছে যে টাইম বলব—?'

সমর আন্দাজ করে নেয়। খেলা শেষ হয়েছে প্রায় সাড়ে দশটায়, তারপর গুলতানি—তা এগারোটা তো হবেই এখন।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে সমর বাবার গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকে। বাপ ও পাশ থেকে এ পাশ ফিরে শোয়, ঘুম ভাঙে না। এবার জোরে ধাক্কা, 'ওঠো না, খিদে পায় না—'

রঘুবীর চোখ খোলার অবসরে বাসন্তী ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই বা এ্যাত রাত অবধি কোথায় ছিলি, কী করছিলি?'

'বার ওঠো' বলে আরো জোরে ধাক্কা দেয় সমর, 'ক্লাবঘরে ছিলাম, টি. ভি-তে খেলা হচ্ছিল'।

'তুই তো খেলা দেখিস না, টি. ভি-ও দেখতে ভালো লাগে না তোর—'

'বাবা, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো, তুমি না খেলে আমারও তো—আমি তো খেলা দেখিনি, ওরা দেখেছে, হৈ হৈ করছে, ওদের সঙ্গে ছিলাম।'

রঘুবীর উঠে বসেছে, 'খোকা এসেছিস? কোথায় ছিলি এ্যাত রাত অবধি—?'

'খেলা হচ্ছিল, ক্লাব ঘরের টি ভি-তে, শ্রীলঙ্কা-ইন্ডিয়া।'

'যাও, হাত-মুখে জল দিয়ে এসো, আমি খেতে দিচ্ছি।'

'মা ইন্ডিয়া আবারও হেরেছে।'

'তুই তো খেলা দেখিস না, তবু রাত-অবধি ওখানে কী পাস, কেন বসে থাকিস?'

বাবা শব্দ করে হাতমুখ ধুচ্ছে, মা তিনটে থালায় রুটি আর আলু পিঁয়াজ ভাজা বেড়েছে, ছেলে বাপের জন্য অপেক্ষা করছে।

'বাড়ি ফিরে কী করব, অন্ধকারে বসে মশার কামড়—'

বাসন্তী ছেলের মুখের দিকে পূর্ণায়ত দৃষ্টি মেলে তাকায়, 'আর মা যে একা অন্ধকার ঘরে বসে থাকে—একা!' মার গলা ধরে আসে, এতক্ষণ বাদে ভিজে ওঠে চোখের পাতা। সমর কথা বলতে পারে না, এদিকটা সে ভাবেইনি এর আগে।

এ ঘরটা বেশ বড়, পুরোনো দিনের লোহাকাঠের তৈরি চৌকিটাও বড়, আট বাই সাত, তারপরেও অনেকটা জায়গা খালি থাকে। ঘরের লাগোয়া আর একটি ছোটো ঘর আছে, সমর ওটি দখল করে নিয়েছে। মা-বাপকে বড় ঘরে শুতে বাধ্য করে সমর একা

ও ঘবে ঘুমোয, ও বড হচ্ছে না? এ বাডিবই অন্য অংশে থাকে বঘুবীবেব ছোটোভাই বনবীব, সমান মাপেব ঘব-দোব ভাগ কবে নেওযা আপসে। বাডিটি পিতৃ-সম্পত্তি, দু'ভাইযে সমান ভাগ। আব এক ভাই ছিল রঘুবীব-বনবীবেব, ছোটোবেলায কলেরায মাবা গিযেছে, বেঁচে থাকলে আব একটা ভাগ হত, বেঁচে নেই তাই বক্ষে নইলে সত্যিই অসুবিধাব অন্ত থাকত না।

এ বাডি অনেক পুরোনো। বাযটের পব-এ বাডিব মালিক শহব ছেড়ে চলে যায দোব-দবজায় তালা দিযে। তবু লুঠপাট থামানো যাযনি, ফাঁকা ঘবেব শূন্যতা নিয়ে বাড়িটা পডেছিল। দাঙ্গাব প্রাপ্তি স্বাধীনতা, দাঙ্গার প্রাপ্তি দেশভাগ। বঘুবীবেব বাবা সত্যপ্রসন্ন তখন যুবা পুরুষ, দেশভাগেব পবে বিধবা মা আব বোনকে নিযে বাযটেব ভযে, ইজ্জতহানিব কল্পনায এ পাবে চলে আসে। হাতে কিছু টাকা ছিল, পিতৃপুরুষেব পেশা যজমানি ছেড়ে বাজাবে আলুব দোকান খুলে বসে। তখন খুব সুখেব সময ছিল না, খাদ্যেব হাহাকাব নিযে স্বপ্নেব দেশ গড়াব অলীক অলৌকিকতা ছিল। তবু মানুষেব প্রথম চাহিদা তো পেটেব চাহিদাই, আলুব ব্যবসা উঠে গেল না। সত্যবাবু বুঝতে পাবলেন দাঁতে দাঁত চিপে থাকতে পাবলে সুদিন আসবে—ইতিমধ্যে মৈনুদ্দিন খাঁব এই বাডিটিব সন্ধান আসে তাঁব কাছে। কেনাবেচাও হযে যায, মৈনুদ্দিন রেলে চাকবি কবত, নিজেব উপার্জনেই এ বাড়ি কবেছিল। বেতন আব উপবি উপার্জনেব টাকায। দেশভাগ হওযাব পরে অপশন দিযে চলে যায পাকশিতে, বক্তেব লেখায দুই বাষ্ট্রে স্থানান্তব ঘটে দুই ছিন্নমূল মানুষের। শূন্য বাডি পূবণেব কাজ খুব সহজ ছিল না, তবু ধীবে ধীবে এগোতে থাকে বঘুবীব বনবীবেব বাবা।

খুব সকালেই ঘুম ভাঙে বাসন্তীব, ঘুমোতে যত বাতই হোক উঠতে দেবি হয না তাব। বঘুবীবকেও ওঠাতে হয তাবপব, সকাল ন'টাব মধ্যে বেবিযে পডতে হয তাঁকে। বাসন্তী এবই মধ্যে হাতে গডে রুটি, কোনোদিন আখেব গুড আবাব কোনোদিন বা সেদ্ধ আলু দিযে সেই রুটি খেযে বেবোয বঘুবীর।

মুখ ফুটে কোনোদিন কোনো কথা বলে না, যা দেবে তাই মন দিযে খাবে, বাড়তি চাহিদা নেই, বাডতি কথাও না। এমন মানুষ নিযে সংসাব কবাব সুবিধা যেমন অসুবিধাও তেমনই। হেবে বসে থাকা মানুষেব কাছ থেকে কি সংসার সুখ পাওযা যায না চাওযা যায। তবে সুখের চেযে তো স্বস্তি সব সময়ই ভালো, স্বামীকে নিয়ে বাসন্তীব সে স্বস্তি আছে। মাসে যে কটি টাকা বেতন হিসাবে পায পুবোটাই তুলে দেয বৌ-এব হাতে। চাল-নুন-সব্জিব ভাবনা সবই তাবই ঘাডে। কেবল শবীরটাকে বযে নিযে চলা, টিঁকে থাকা আব টিঁকিযে বাখাব জন্যেই বঘুবীব।

সকালে উঠে স্নান করাব সঙ্গে পৈতে মাজাটা নিত্যদিনেব কাজ। পবিষ্কাব ঝকঝকে করে পৈতে কাচা হয়ে গেলে ধুলো মলিন প্যান্ট-শার্ট পবে নেয, যত্নে চুলে সিঁথি কেটে আঁচডায়—চুল পেকে ধবধবে শাদা, মুখে বেশিব ভাগ সময়েই না কামানো দাডি থাকে, তাও শাদা—কালোব চিহ্ন কোথাও নেই। স্নান সাবা হযে গেলে কপালে লম্বা কবে লাল সিঁদুবেব ফোঁটা দিযে, সকালেব খাবার খেযে বেবিযে পডে লোকটা।

বাসন্তী দেখে আর বিষাদে বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়। সামনের দিকে কতটা ঝুঁকে পড়েছে দ্যাখো, দেখাচ্ছো যেন আশি বছরের বুড়ো, একটু থপথপ করেও যেন চলে—মনে হয় বাসন্তীর। অথবা ষাট বছরও হয়নি বয়স, ওর সমবয়সিদের পাশে ওকে কত যে বুড়ো দেখায়। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঘরের কাজে মন দিতে চায় না, এই বোঝা বওয়া কি সহজ? তবু বইতে হয়, জীবন যখন আছে জীবনযাপনও তখন থাকবে।

সমরের ঘুম ভাঙে বাবা চলে যাবার পরে। ঘুম ভাঙার পরেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। বর্ষা চলে যাওয়ার আগে বিদায়ী মেঘ মাঝেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ে, তেমন ঝরঝর ধারার এক পশলা হয়ে গেল, বাতাসে তো ঠান্ডাঠান্ডা ভাব আছেই, যে ঠান্ডা কাতর করে তোলে কাতুরে করে। সেই কাতরতার জন্যই সমরের উঠতে আরো দেরি হয়। বাসন্তী ওর ঘরে এসে দেখে দুই হাঁটু এক করে কুঁকড়ে শুয়ে ছেলে। হাফ প্যান্টের বাইরে বেরোনো লোমশ পা দুটি হাড্ডিসারই, গায়ের মাংসের অভাবে চামড়ার সে রং-ও উজ্জ্বল-ফ্যাকাসে। ছেলেকে দেখে বড় মায়া হয়, কাছে গিয়ে বাসন্তী ওর রোগাটে গায়ে হাত বুলোতে থাকে। সমর টের পায়, টের পেয়েও চোখ বুজে থাকে।

'এবার ওঠ। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।' বাসন্তী উঠে দাঁড়ায়।

বাসন্তীর সঙ্গে সমতালে উঠে পড়ে সমর, 'আমি তো উঠেই আছি।'

'মুখ-হাত ধুয়ে আয়, বাজারে যাবি।'

একেবারে কথার পিঠে কথা, 'না আমি বাজার যেতে পারব না।'

বাজারে যেতে না চাওয়ার হেতু বাসন্তী জানে, কিন্তু ছেলেকে বুঝতে দেয় না সে জানার কথা, 'তুমি ধেড়ে ছেলে বাড়ি বসে থাকবে, আর আমি মা রোজ বাজার যাব। তাতে তোমার লজ্জা নেই?'

'না। যদি না চাও তো তুমিও যেও না।'

'বাজার না গেলে যা জুটছে তাও তো জুটবে না, না খেতে পেয়ে মরবি।'

'মরব, মা এ বেঁচে থাকায় লাভ কী?'

কথা বাড়তে বাড়তে এতটা দূর এগোবে ভাবতে পারেনি। সত্যিই শিউরে উঠে ছেলের আরো কাছে গিয়ে 'ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। যার, আমিই যাব—তুই রুটি দুটো খেয়ে নে।'

বাসন্তী জানে তার ছেলে কেন বাজারে যেতে চায় না। তাদের বাজার মানে তো সস্তার শাক-পাতা কেনা। আলুর দোকানে ওদের জন্য কাটা-আলু, ভেতরটা কালচেপানা আলু আলাদা করে সরিয়ে রাখে, গিয়ে দাঁড়ালেই কম দামে দিয়ে দেয়। মাছ-মাংসের বাজারে ওরা ঢোকেই না, মূল বাজারের সব্জি কেনার ক্ষমতাও নেই। পথের পাশে বসা সবজিওলারাও ওদের চেনে, কানা বেগুন আগের দিনে কাটা বাসি কুমড়ো—যা অন্যদের দেওয়া যায় না তা ওদের দেয় কম দামে। এ ছাড়া অন্য কিছু না, বাজার মানেই মাথা

নিচু করে গিযে দাঁড়ানো। অথচ বাজার বাড়ছে, সবজি এখন টাটকা বিক্রি হয়, ইলিশ মাছ বাজারে উপযুক্ত পবিমাণে না এলে হা-হুতাশের অন্ত থাকে না। দোকানে দোকানে কত রকমেব প্যাকেট আব প্যাকেট ভর্তি খাবাব। সমবের মতো একটা সমর্থ ছেলে এতসব ভোজ্য সামগ্রীর মধ্য দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যেতে বাধ্য হয—তাই বাজার তার কাছে লজ্জা আব বিভীষিকার জাযগা।

তবু আজ মাকে যেতে দেয না সমর। হঠাৎ তার মনে হয যে দুঃখবোধের জন্য সে বাজাবে পা ফেলতে চায় না সে দুঃখ তো মাযেরও হয, একটা দিন যদি মা তার থেকে রেহাই পেতে চায তো ছেলে হয়ে সে তা করবে না কেন? জোর করেই আজ সে মায়ের ইচ্ছেমতো বাজারে যায়। মাকে যেতে দেয না, অন্তত একদিনেব হেনস্থা থেকে রক্ষা পাক মা। হাতে কোনো ব্যাগ থাকে না, অন্যবা বুঝতেও পারে না কোথায় যাচ্ছে। কেউ জিজ্ঞেস কবলে নিরুদ্দেশ মাথা তুলে দেখায যার উত্তব যা কিছু তাই হতে পারে।

ক্লাবঘবেব পাশ দিযে যাবার সময সমব দেখতে পায ক্লাবের সেক্রেটাবি অনিদা ফিটফাট পোশাক পরা এক ভদ্রমহিলা আব এক ভদ্রলোকেব সঙ্গে কথা বলছে। দু'জনের পরনেই টাইট জিনস্, ফেডেড জিনস্ ওপবে হাফ হাতা শার্ট—দু'জনেরই। 'হেভি, ঘ্যাম' মনে মনে উচ্চাবণ করে সমর। 'যে যাই হোক আমার কী' ভেবে নিজের পথে, নিজেব মনে চলে। আব ঠিক এ মুহূর্তেই অনিদার ডাক, 'এই ভজু শোন।'

'আমাকে? ডাকছো?' বলে সমর অর্থাৎ ভজু দাঁড়িযে পড়ে।

'তুই ছাড়া ভজু কেবে? আয, শুনে যা, তোকেই দবকার।'

ছিপছিপে বৃষ্টিব ছাঁট এখনও হাওয়ায বেণু রেণু উডছে। সমবের তেল না দেওযা লালচে চুলে সেই জলকণাব যে সুন্দরতা ফিবেছে তা দেখার মতোই। সমর নিজে তো দেখতে পাচ্ছে না তাই বুঝতেও পাবে না। আকাশে মেঘে মাখামাখি শূন্য থেকে সূর্যের কণা সমবের রোগা ফর্সা টিকলো মুখে পড়েছে। তরুণটিকে দেখে আগন্তুকদেবও ভালো লাগে।

ক্লাবেব ভেতবে নয, বাইবেব বারন্দায যেখানে বসার চেযাব সাজানো ওবা তিনজন সেখানে দাঁড়িযে। অনিদার ডাকে সমব ওদেব মুখোমুখি হয়।

'হি ইজ্ গ্রান্ড-সন অব দ্যাট ইল-ফেটেড পাবসন অফ হুম আই ওযজ স্পিকিং' অনিন্দ্য, এলাকার সবচেযে বড় ক্লাবেব সেক্রেটাবি অনিন্দ সেনগুপ্ত ইংরাজিতে বলেন। সমর বোঝে সে যাতে না বুঝতে পারে সেজন্যই এ আড়াল। সে অনিদার কথার একটা শব্দও বোঝে না। বোঝে না বলেই বাগ হয। এতে সমবকে ছোটো কবা হয এ কথা অনিদাবা বুঝবে না কেন? ওরা অনেকেই এভাবে অপমান করে সমবদেব। তবু হজম করে সমব, কারণ বক্তার নাম অনিদা।

ওরা দুজন মাথা নাড়েন। কৌতূহলী ওদের দৃষ্টি। কথা বলেন না।

'কিছু বলবেন?' অনিন্দ্যকে জিজ্ঞেস কবে সমব।

'আয, তোর সঙ্গে ওবা কথা বলতে চাইছেন, তোর কাছ থেকে কিছু জানতে চান

ওরা।'

'আমার কাছ থেকে?' আকাশ থেকে পড়া যাকে বলে সমবেরও সেই দশা।

এবাব কথা বলেন মহিলা, '.শুনুন আপনাব ঠাকুদ্দা তো সত্যবাবু, মানে সত্যপ্রকাশ চক্রবর্তীই।'

চোখে সন্দেহের ছাযা নামে সমবের, 'এ্যা, হ্যাঁ' শব্দবা আপনি আপনি বেবিযে আসে গলা থেকে।

'তার সম্পর্কে তুমি কিছু জানো তো? যা জানো বলবে আমাদেব?'

'আমি কী জানব? আমি তো তাকে দেখিইনি—'সমর চোখ ঘুরিযে অনিন্দ্যর মুখে ফেলে। কী হচ্ছে অনিদা, এব মানে কী? আমার ঠাকুরদাকে নিয়ে এ টানাটানি কেন? মনে মনে বলে সমর, সন্দেহেব দৃষ্টি ঘুরতে থাকে।

'ভজু তুই ওদেব সাহায্য কব। ওবা একটা ভালো কাজ কবছে।'

''ওদেব ভালো কাজেব সঙ্গে আমাব দাদুব সম্পর্ক কী? আর আমি তো তাকে চোখেই দেখিনি—সে তো অনেক বছব আগেব ঘটনা।' সমব গুছিযে ভাবতেও পারে না, বলা তো দূবেব কথা।

'আপনি নিজে না দেখেন বাবার কাছ থেকে, মার কাছ থেকে শুনেছেন তো কিছু?'

'কী ওকে আপনি আপনি কবছেন, বাচ্চা ছেলে।' অনিদা মহিলাকে শোধবাতে চায়।

সমর পড়ে যায মহা ফাঁপড়ে, অজানা ফাঁদে। মনে মনে ঠিক কবে ঘাবডাবে না, ওদেব বুঝতে দেবে না যে ঘাবডেছে। বেশ বযস্ক লোকেব স্ববেই বলে, 'অনিদা, তোমাব সঙ্গে আলাদা একটু কথা আছে, আসবে এদিকে?' বলে ভেতর ঘবের দিকে যায়। ঘবেব কোনায আছে টেবিল-টেনিসেব টেবল তাব ওপষ ভর দিযে অনিন্দ্যকে বলে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। না বুঝে শুনে বলি কী?'

গলা খাটো করে অনিন্দ্য বলে, 'আমি বোঝালেও কি তুই বুঝতে পারবি? আমাব ওপব বিশ্বাস রেখে ওবা যা জানতে চাইছে তা বল। এরসঙ্গে আমাদের ক্লাবেব প্রেস্টিজও জড়িয়ে আছে।'

'অনিদা, ওবা আমায একটা চাকরি দিতে পাববে?'

'কী যা তা বলছিস ভজু, ওবা যা জানতে চায় বলে দে, তুই তো আমাদের ক্লাবের একজনই। চাঁদা দিতে পাবিস না বলে সদস্যপদ পাসনি, সেজন্য আমরা কি তোকে অন্য চোখে দেখি?' কথাগুলি বলে অনিন্দ্য সাগ্রহে তাকিযে থাকে।

'আমি কিন্তু কাযদা কবে আমাব একটা কাজেব কথাটা বলব, তুমি বাধা দিতে পাববে না। তুমি তো জানো আমাব একটা কাজ কত দবকাব।' অনিন্দ্যব মুখের দিকে তাকায় সমব।

'ওদের জানা শেষ হলে তুই যা খুশি বল না। আমি তাতে বাদ সাধতে যাব কেন?'

ওবা বাইরে এসে দেখি ভদ্রমহিলা আব ভদ্রলোক চেযাবে বসে পড়েছেন। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ রেখেছেন পাশের চেযাবে। কিছু দূবে ক্লাবেব সবার আদবেব কুকুর কেলো

দুই পা সামনে বেখে জিভ বার কবে হাঁপাতে হাঁপাতে দেখছে ওদেব।

অনিন্দ্যব মুখেব হাসি থলথলে ভুড়ি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, 'যু স্টার্ট ইওব বিজনেস, হি এগ্রিড টু গো উইথ যু।'

উঃ কী নিষ্ঠুব হতে পারে মানুষ! অন্য কেউ এ নিষ্ঠুবতা করলে সমবেব জ্বালা এত বেশি হত না, যে অনিদাকে সে সম্মান জানায, বিশ্বাস কবে সে কেন ইংবাজির অস্ত্র দিযে তাকে আঘাত কববে? ভেতরেব ক্ষোভ ভেতবেই বেখে শক্ত হযে বসে সমব, ওদেব পাশের একটা চেযাব নিজেব থেকেই টেনে নেয।

'ভালো হয আপনি আপনাব ঠাকুদ্দার কথা, বাবার কথা, কাকা বা মাযেব কথা যতটা জানেন আমাদেব জানালে। আমবা 'টেপ' এনেছি, আপনাব আপত্তি না থাকলে আমবা আপনাব কথা টেপ-এ বেকর্ড করে নেব। আমাদেব খুব কাজে লাগবে ভাই।'

'ঠিক আছে, আমি বেডি।' এক এক কবে তিনজনেই মুখেব ওপব চোখ ঘোরায় সমব। লাল বাবমুডা আব হলদে-সবুজে মেশানো গেঞ্জি পবনে। প্যান্টেব ঘেরটা বড, সেই বড় ঘেরেব মধ্যে দিযে সরুসরু পা, সদ্য যৌবনের কচি বোমে ঢাকা। কামানো দাড়ি, শুকনো মুখ, গর্তে ঢোকা ছোটো চোখ—এ সমবের অবযবী পবিচয।

'টেপ ফিট কবে ম্যাডাম বলেন, 'বলুন, শুরু করুন।'

'কী বলব? একটু, একটু ধবিযে দিন—।'

'আপনাব বাবা, আপনাব বাবার বাবা—'

'তাবও বাবা?' ফিক কবে হেসে ফেলে সমব। সত্যিকারেব হাসি, এত তোড়জোড় দেখে তাব হাসি পায।

বিবক্ত হয অনিন্দ্য, 'সমব, তুই কিন্তু কো-অপাবেট কবছিস না।'

অনিন্দ্যব বিবক্তি শামুকের মতো গুটিয়ে দেয সমবকে একেবাবে নিজেব মধ্যে ঢুকে পড়ে, আকাশেব দিকে মুখ কবে চোখ বুজে বসে, তাবপবে গড়গড় কবে বলতে থাকে।

সমবেব কথা

আমাব বাবা বঘুনাথ চক্রবর্তী, এক সময়ে কালীবাড়িব পূজাবি ছিল, এখন পূজার ঘবে ঢুকতে মানা তাব, যাবা পুজো দিতে আসে তাদেব ডালিটা এগিযে দেওয়া ও ফুল-বেলপাতা সাজানো, চন্দন ঘযা এসব বাইবেব কাজ কবে। এক কথায জোগাড়েও বলা চলে। আমাব বাবা একেবাবে বুড়ো হযে গেছে, শিবদাঁড়া বেঁকে ঝুকে পড়েছে, সামনেব দিকে, বযস কত জানি না, বাবা তো বোঝেই না অঙ্কেব হিসাব। তবে মা বলে, ওকে যত বুড়ো দেখায তত বুড়ো ও নয। অভাবে অভাবে বুড়ো হওযা, অভাব তো মানুষকে অকালেই ক্ষইযে দেয।

আমাব বাবা লেখা-পড়া শেখেনি। আমিও না। ক্লাশ সেভেন পড়তে পড়তেও পড়া ছেড়েছি। ইস্কুল যেতে আমাব একদম ভালো লাগে না। পডতে ভালো লাগে না, ইস্কুলেব অন্য ছেলেবা পডা পারলে মাস্টাববা যখন পিঠ চাপড়ে বাহবা দেয আব কান ধবে

দাঁড়িযে থেকে আমি দেখি তখন আমাব পড়াশোনার ওপবেই বাগ হত। আমবা দু'বেলা পেটপুরে খেতেই পাবি না তো পড়াশোনা করা? লেখাপডায মাথা থাকা কাকে বলে আমি জানি না? তবে আমাব যে কিছু হয়নি, হবাব নয়, বলেই হয়নি, তা আমি জানি। আমাব মা চেয়েছিল লেখা-পড়া শিখে আমি মানুষ হই—মাযেব সে-সাধ আমি বাখতে পাবিনি।

আমার বাবাও লেখা-পড়া শেখেনি, আমিও না। আমার বাবা গবিব, আমিও গবিব। এব বেশি আমাব কিছু বলাব নেই।

বাবার লেখাপড়া না হওযাব একটা অজুহাত আছে। বাবাব বযস যখন তেরো বছব তখন বাবাব বাবা তখন খুন হযে যায। আমাব ঠাকুন্দাব নাম ছিল সত্যপ্রসন্ন চক্রবর্তী, নাকি খুব ভালো মানুষ ছিল। বাজাবে আলুব আড়ত ছিল, পযসাকড়িব অভাব ছিল না। সে জন্যই কিনা বলতে পাবব না, আসলে নানা জনেব মুখ থেকে শোনা তো ঠিকঠিক বলতেই পাবব কিনা সে সন্দেহ আছে। ভুল হলে শুধবে নেবেন।

ঃ আপনি যা জানেন তাই বলবেন। শোনা কথা হলেও তা তো সত্য।

বাবাব মুখে শুনেছি, বাবা তখন স্কুলে যেত, ওই আমাব মতো যাওযা—পডাশোনায মন দিত না, ক্লাশে ফেলও কবত। বাজাবে চালু আডত, সত্যবাবু গেলে বঘুবীর মানে আমাব বাবা আব বনবীব মানে আমার কাকাই তো মালিক—এ কথা জানত বলেই বাবা লেখাপডায মন দিত না কিনা তা বলতে পাবব না। এটা মাব ধাবণা, মাব ধাবণাটাই আমি বললাম। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, কিছুতেই কিছু হযনি। আমাব বোবা মুখ্যুই বযে গেল, ঠাকুন্দার ব্যবসাও লাটে উঠল। হন্দ গবিব হযে গেলাম আমবা।

ঃ ঠাকুরদা খুন হল, এটুকুতে তো কিছুই বোঝা গেল না, কীভাবে কেন খুন শুনেছেন কিছু?

ঠাকুন্দাকে সবাই চক্কোতি বলে ডাকত। খুষ মিশুকে ছিল শুনেছি, বাবা যেমন ভোন্দা-মাবা তেমন না। লোকেব সঙ্গে খুব সদ্ভাব ছিল। চক্কোত্তি বা চক্কোত্তিদাকে সবাই ভালোবাসত, সে নাকি কবোকে ঠকাত না।

ঃ তবু খুন হল, শত্রুতা না থাকলে তো খুনাখাবাবি হয না।

তবু খুন হল ঠাকুন্দা। শোনা কথায ভেজাল থাকে, কিন্তু বাবাব মুখে শোনা বলেই বলছি ব্যাপাবটা খুব জল মেশানো নেই। আমাব বাবার একটা বড়গুণ মিথ্যে কথা বলতেই শেখেনি। নইলে, একটু ঘুবিযে বললেই যেখানে পূজাবিব কাজটা থেকে যায সেখানে সটান সত্য কথা বলায মন্দিবেব ভেতরে ঢোকাই বারণ হযে যায। আয়ও কমে যায অনেক। সংসাবের ব্যয সামলাতে না পাবায বাবা মাঝে মাঝে অগ্রদানীর কাজ কবছিল, জানেন বোধহয়, অগ্রদানী বামুনবা জাতে পতিত, বামুনই তবে পূজা আচ্চা করাব অধিকারী থাকে না আর। কালীবাড়ির সেবাইতবা বাবাব অগ্রদানী হওযার ব্যাপাবটা কানাঘুযায শুনতে পেল। বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল,.'সত্যি করে বলবে চক্কোত্তি তুমি কি অগ্রদানী হযেছ?' বাবা আমাব এত বোকা যে এককথায স্বীকাব কবে নিল, একটুও অন্যরকম

কিছু বলল না। এই বাবা যে নিজের বাবার খুন হওযা নিযে বানিযে বলবে না সে আপনি ধরে নিতে পারেন

আমাব ঠাকুদ্দা খুন হযেছিল নকশালীদের হাতে। তখন তো খুব নকশালী হাঙ্গামা ছিল। আমাব ঠাকুদ্দা সত্য চক্রবর্তী তাদেব হাতে খুন হয, কে বা কাবা খুন কবেছিল সবাই জানে। আমি আপনাদের বলব না, কিছুতেই না।

ঃ কেন অমন মিশুকে, সকলের প্রিয মানুষটিকে মাবা হল, শুনেছ কিছু?

আমার আর বলতে ভালো লাগছে না। একদম না। বাবাব কাছে শুনেছি ওবা নাকি খোচব সন্দেহে ঠাকুদ্দাকে খুন কবেছিল। খোচর মানে জানেন তো, পুলিসেব স্পাই। অথচ এ কথা একেবারেই মিথ্যে, আমাব ঠাকুদ্দা কোনো দু-নম্বরী কাজে থাকতেই পারে না, যারা মেবেছিল তাবা খুনি, ভাড়াটে খুনিব কাজ কবেছে। একেবাবেই 'সুপাবি'-র মতো কাজ, আমি কোনোদিন ক্ষমা কবব না ওদের, ওদেব জন্যই আমরা এত গবিব, এত হ্যাটা হওয়া মানুষ।

বাবাব তখন তেরো বছব বযস। দুই ছেলে আব একটা মেযে নিযে ঠাকুমা বিধবা। দোকান চালাবে কে, বাবার বযস যেমন অল্প, জ্ঞানবুদ্ধিও ব্যবসা চালাবার মতো ছিল না কাকা তো আবো ছোটো। বুঝুন অবস্থাটা। অনেকে বলল, পুলিশেব খোচব বলে যখন খুন কবেছে তখন পুলিসেব একটা দাযিত্ব আছে। ওই দশাতেই ঠাক্মাকে পরামর্শ দিযে থানায পাঠালো তাবা। সঙ্গে গেল না, সঙ্গে যাওযাব উপায ছিল না, সাহসও ছিল না কাবো। থানাব বড়বাবু কুত্তা তাডানোব মতো হ্যাটহ্যাট কবে তাডিযে দিযেছিল, 'চক্কোত্তি খুন হযেছে অন্য কারণে, জীবনে আমাদের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। আব এ-মুখো হবে না, ওবকম কোনো কথাও বলবে না, যাও যাও বলছি।' শুনে চোখ ফেটে জল বেবিযে আসে, ঠাক্মা আশা কবতে পাবেনি এমন দুর্ব্যবহার। আসলে কী জানেন দুর্বলকে সবাই ঠাসে, সুযোগ পেলেই ঠাসে, সে নক্শালীই হোক আব পুলিসই হোক।

ঠাকমা দোকান-ব্যবসা বাখতে পারল না। মহাজন ছিল কেষ্ট মণ্ডল একদিন এসে জানালো যে চক্কোত্তিদা যে টাকা ধাব নিযেছিল তা সুদে-মূলে এতেই হযেছে যে ব্যবসা বেচেও তা শোধ কবা সম্ভব নয, তবে যেহেতু চক্কোত্তিদা লোকটা ছিল ভালো, তাব বাল-বাচ্চাদেব অনাথ কবেই চলে গেছে, তাই কিছু তো দিতেই হয, কেষ্ট যৎসামান্য টাকায পুবো ব্যবসাটাই নিযে নেয।

বোঝো ঠ্যালা।

দুই

বেল বাজিযে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িযে থাকতে হয। শেষে সুভাষই দবজা খোলে, অনিন্দ্য আব দুই নবাগতকে দেখে কিঞ্চিৎ বিস্ময। হাতঘডিব দিকে তাকিযে দেখে প্রায বাবোটা, ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হয। দবজায দাঁড়িযেই জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিযে থাকে।

'এবা দু'জনেই যুনিভার্সিটিব সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের—নকশাল পিবিযড নিযে

একটা কম্প্রিহেন্সিভ স্টাডি করছেন—বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলব, না—' পবিচয় কবিয়ে দিযে অনিন্দ্য প্রশ্ন করে।

'আবে না, না। আসুন।' এবার অ্যাপ্যাযনই কবে সুভাষ।

সুভাষেব এ বসার ঘবে অনিন্দ্য আগে এসেছে। আহামবি জাঁক নিযে সাজানো নয, তবে আজকালকাব উচ্চ-মধ্যশ্রেণীব অন্য পাঁচজনেব ড্রইংরুমেব মতোই অনাড়ম্বব, আডম্বরের ছাপ সর্বত্র। সোফা, দেযাল-জোড়া আলমারি, আলমাবিতে বই আব বই, এসব যা যা থাকে সবই আছে। আছে দেয়ালে প্রতিষ্ঠিত পরিচিত শিল্পীব আঁকা পবিমিত সংখ্যাব ছবি। ঘবের কোনার টি ভি, টেলিফোন তো অপবিহার্যই, যেমন অপবিহার্য সেন্টাব টেবিলে 'ম্যাগস্ অ্যান্ড জার্নালস।'

ওরা যে যার জাযগায় বসলে সুভাষও নিজেব জায়গা নেয।

সেই ভদ্রমহিলা, যিনি সমরেব কথা টেপ করেছেন তিনিই বলেন, 'আসলে বিদেশি এক যুনিভার্সিটিব বিকোযেস্টে আমবা এ কাজ হাতে নিযেছি। সেভেন্টিজ-এর সেই টার্বুলেন্ট দিনগুলির সোসিও-ইকনমিক ইমপ্যাক্ট, এক্জাকট্ ডেটা কালেক্সানও বলতে পাবেন।'

মন দিযে শোনে সুভাষ।

'আমাব কাছে এসেছেন কেন? আমি তো আপনাদেবে এসব কাজেব কোনো ইউটিলিটিই বোধ কবি না। এসব তো সময, মেধা আব অর্থেব অপচয।'

'বোধহয ঠিক তা নয।' ভদ্রলোক বলেন, 'আপনি শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, একটু ভাবলে বুঝতে পাববেন যে এ ধবনেব স্টাডি ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনেব পক্ষে খুবই উপযোগী।'

দরজার পর্দাব সামনে কোনো মহিলার পা, সেই পায়েব গতিবিধি দেখে সুভাষ তাকে ডাকে, 'এসো, তুমিও এসো।'

সুভাষেব স্ত্রী ঘরে ঢোকেন, 'না আমি আপনাদেব ডিস্টার্ব কবতে চাই না। চা-না কফি, কী কবব আপনাদেব জন্য?'

'এই দুপুবে চা বা কফি কিছুই লাগবে না' অনিন্দ্যই ওদেব হযে উত্তর দেয়।

মহিলা একটু লজ্জা পাওযাব মুদ্রা ফোটান, 'তা হলে সববত, আমপোড়া সববত একদম দিশি প্রোডাক্ট।'

'এব পবেও কি আমাব প্রযোজন আছে?' সুভাষ জিজ্ঞেস কবে।

'আমবা ঠিক আমাদের প্রোগ্রাম নিযে আপনাব ওপিনিযন চাইতে আসিনি, আমবা আপনার কাছ থেকে একটি ঘটনাব বর্ণনা শুনতে এসেছি, তাব সত্যসত্য বুঝতে চাই।' মহিলা বললেন।

'ঘটনা!' চিন্তিত দেখায সুভাষকে।

'আপনাব ভাই তনু বা অতনু ঘোষাল ১৯৭১-এব ২৭ সেপ্টেম্বব পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মাবা গিয়েছিল?'

'তনু ওদিনেই মারা গিযেছিল, কিন্তু সংঘর্ষে নয, তনুকে রাস্তা থেকে তুলে নিযে

থানার পিছনেব মাঠে-দাঁড় কবিযে পযেন্ট-ব্ল্যাঙ্ক গুলি করে হত্যা করা হযেছিল। খুনি ছিল তখনকার থানার থার্ড অফিসার অশোক মণ্ডল। পুলিশ এনকাউন্টাবের গল্প ফেঁদেছিল।' এতদিন বাদেও ঘৃণা ঝবে সুভাষেব কণ্ঠে, 'প্লিজ্, আমাকে আব বকাবেন না, আমি চাই না হৃদয খুঁড়ে বেদনা জাগাতে।'

সকলেই কিছুক্ষণ নীবব হয, হতে বাধ্য হয।

একটি মেযেব হাতে ট্রে, ট্রেব ওপব আমপোডা সববতেব গ্লাস আব নবম পাকেব সন্দেশ.। পিছনে সুভাষেব স্ত্রী মীনাক্ষী।

নিজেকে সামলে নিয়ে সুভাষ বলে, 'নিন গলাটা ভেজান। আমি সত্যিই ফিলিং ভেরি শিক।'

'আপনি যদি ডিস্টার্বড্ ফিল কবেন তো আমবা জোর কবব না। কেবল একটা বিকোযেস্ট কবি?'

'বলুন।'

'আপনি যদি আপনাব ভাই অতনু সম্পর্কে কিছু বলেন, আব আমবা যদি তা এই টেপে ধবে রাখি তাতে খুব আপত্তি কববেন কি?'

'কেন, কী লাভ, আমাব দিকটা বুঝবেন না কেন?'

'ফেব গ্রেটাব ইন্টাবেস্ট ফব ইওব চিলড্রেনস্ ফিউচাব—'

'স্টপ প্রিজ, শুনুন আই ডু নট বিলিভ ইট।'

টেপ ফিট কবা হযে গিযেছে বেকর্ডার চালিযে ম্যাডাম বলেন, 'ঠিক আছে, আপনি আপনাব কথা বলুন, আপনাব বাবা মা, স্ত্রী, পুত্রব কথা, এতে তো আপত্তি নেই?'

সুভাষেব চোযাল শক্ত হতে থাকে। নাছোব এই গবেষকদেব নিযে কী কববে সে, ঘাড ধাক্কা দিযে তো আব বাব কবে দেওযা যায না। কিছুক্ষণ ওম হযে বসে থাকাব পবে বলে, 'ঠিক আছে ওপেন ইওব বেকর্ডাব—।'

সুভাষেব কথা

আমাব বাবা সুপ্রকাশ ঘোষাল যৌবনে ওযেট লিফটাব ছিলেন, একই সঙ্গে পডাশোনাযও নামডাক ছিল কলেজে। বুঝতেই পাবছেন জনপ্রিযতাব এই দু'টি চাবিকাঠি নিযে অনেক দূবই পৌঁছতে পেবেছিলেন তিনি। যখনকাব কথা জানতে চাইছেন তখন বাবা বেলওযে বোর্ডেব উচ্চতম পদ থেকে অবসব নিযে পেনশন ভোগ কবছেন, আমি সবে এঞ্জিনিযাবিং পাস কবে চাকবিতে ঢুকেছি, ভাই অতনু ক্লাস টেনেব ছাত্র। অসাধাবণ মেধাবী ছাত্র ছিল মশাই, আমবা ওব ধাব কাছ দিযেও যেতে পাবতাম না, ব্রিলিযান্ট যাকে বলে। আমাব বন্ধু আসল নামটা বলব না, সে এখন ভারী বুদ্ধিজীবী বলে নাম কবেছেন। আচ্ছা ধকন তাব নাম তমোনাশ, সেই তমোনাশ আমার বন্ধু হওযাব সুবাদে আমাদেব বাড়িতে সব সমযই আসত। কেবল আমাব কাছে না, আমাব মা-বাবা, ভাই-এব খুব পছন্দেব ছিল সে। লেখাপডায তমোনাশও ছিল তুখোড়, আমাব থেকে একাডেমিক হিসাবে এক বছবেব

জুনিযাব তমোনাশ। ও-ই অতনুকে নকশাল বাজনীতিতে টেনে নেয। বোঝো ষোলো বছবেব এক উজ্জ্বল ছাত্রব কাছে নকশালী বুলিব উন্মাদনা, ফোলানো ফাঁপানো বীরগাথা, মেকি হলেও দবিদ্রেব উত্থানেব কাঙ্ক্ষিত স্লোগান কতটা আকর্ষণীয হতে পাবে। অতনু একেবাবে ভেসে গিযেছিল, ইস্কুল কামাই কবে গোপন বৈঠক যোগ দেওযা, পবে গোপন এ্যাকশনেব মহড়া—আমার ভাইটাকে ফেবাবার আর পথই খোলা রাখেনি ওরা।

অতনু এ্যাকশনিস্ট হযে পড়ে।

না, আমাকে ইন্টাবভু করতে হবে না। বলতে যখন শুরু কবেছি তখন কিছুই লুকোবো না। লুকোলে অতনুব প্রতি অবিচাবই কবা হবে। বাই দ্য-বাই, আমি নিজে প্রত্যক্ষভাবে বাজনীতি না কবলেও তমোনাশদেব বলা আদর্শেব দিকে ঝোঁক আমাবও ছিল। এখন তো ভাবি আমাব ওই নিষ্ক্রিয ঝোঁকটা আমাব অমন হিবেব টুকবো ভাই-এব মৃত্যুব একটা কাবণ কিনা।

অতনু এ্যাকশনিস্ট হযে গিযেছিল, এ হওযা ছাড়া বিকল্প পথও বোধহয ওব জন্য খোলা ছিল না। ও খুনও কবেছিল। বাজাবেব আলু-ব্যবসাযী সত্য চক্রবর্তীকে ও ওদের অন্য-সঙ্গীদেব নিযে খুন কবেছিল। খুন কবাব পদ্ধতিও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। চক্কোত্তিকাকুকে আমবা কাকু বলেই ডাকতাম, খুবই খোলামেলা আমুদে লোক ছিলেন। অতনুবা তাকে ডেকে এনে ভাঁড়ে কবে বসগোল্লা খেতে দেয, চক্কোত্তিকাকুর মুখচোখে ভয চলে এসেছিল, তবু মাথা নিচু কবে রসগোল্লা খেতে খেতেই—মাথাব পেছনটায পাইপগান ঠেকিযে গুলি। গুলিটা অতনুই কবেছিল। অনেকদিন আব এ তল্লাটে ওকে দেখা যাযনি, অথচ এই খুনেব প্রত্যক্ষদর্শী ছিল—একজনও চক্কোত্তিকাকুকে বাঁচাতে এগিযে আসেনি।

তখন আগুন জ্বলছে। স্কুল কলেজগুলিতে বোমা আব আগুন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পোড়ানোব মহা উৎসব চলছে। বুর্জোযা শিক্ষাব্যবস্থাকে পুড়িযেই শেষ কবা হবে। এমনই এক দিনে, তনুব কোনো খবরই যখন পাচ্ছিলাম না তখন ন্যাশনাল লাইব্রেবিব পাশ দিযে যাবাব সময তমোনাশকে পেযে যাই। লাইব্রেবি থেকে বেবোচ্ছে তমোনাশ, আমায দেখে একটু চমকে ওঠে যেন।

কাছে গিযে ধবে ফেলি ওকে, 'আমাব ভাই তনুব কোনো খবব জানিস?' জিজ্ঞেস করেছিলাম। তমোনাশ বলেছিল না, সে আব তনু এক অঞ্চলেব নয বলেই তনুব খোঁজ দেওযা সম্ভব নয। বিশ্বাস করুন আমি কিছু বলিনি তমোনাশকে, বলাব অনেক কিছু থাকলেও বলিনি। আমাব ভাই যে তখন নিষ্ঠাব সঙ্গে স্কুল কলেজ পুড়িযে চলেছে, তমোনাশদেব জ্বালা আগুনে যে সে একদিন পড়ে ছাই হবে এ কথা নিশ্চিত জেনেও তমোনাশকে ছেড়ে দিযেছিলাম সে দিন। আমাব ভাই অতনু, যাকে আমবা তনু বলে ডাকতাম সে তো কোনোদিন দু'নম্বরী শেখেনি, তাকে তো মবতে হবেই।

তাবপব সেই সাতাশে সেপ্টেম্বব।

সাতাশে সেপ্টেম্বরেব আগেবও ঘটনা আছে। একদিন অতনু নিজেই বাড়িতে ফিবে আসে। আমবা ওকে কিছ্ছুটি বলিনি। ও বাড়িতে থাকতে শুরু কবে। আমাদেব জানায

যে একটা বছব নষ্ট হযে গেলেও আবাব পড়াশোনা করাব কথা ভাবছে সে। বোধহয ওই নর্মাল লাইফে আমাব ইচ্ছেটাই কাল হল। রাস্তা দিযে তুলে নিযে গিযে সারা বুকে স্টেনগানেব গুলিব মালা পবিযে তনুকে খুন কবল পুলিস। খুনের বদলা খুন, খুনিব বদলে খুনি।

বাড়িতে খুব বেশি দিন থাকতে পাবেনি তনু। তাবই মধ্যে একদিন জিজ্ঞেস কবেছিলাম, চক্কোত্তিকাকুকে মাবলি কেন? তনু একটা কথাই বলেছিল, নির্দেশ ছিল। থার্ড অফিসাব মণ্ডলকে ওই একই প্রশ্ন করলে সেও বলত, নির্দেশ ছিল।

শ্রেণীশত্রু খতমেব নির্দেশ।

ওবা টেপ বন্ধ কবে দেন। যা পেযেছে তা মোর দ্যান এক্সপেক্টেশন। অফ দ্য বেকর্ড সুভাষ জানায, তমোনাশ এখন নক্সালপন্থী রাজনীতিব ব্যাকগ্রাউন্ডধন্য এলিটিস্ট, সম্প্রতি নাকি গান্ধীবাদেব সাববত্তা নিযে দাকুণ সব চমৎকাব প্রবন্ধ লিখেছে। নিজে পডাব সময়ই বাব কবতে পাবি না, লোকমুখে শুনেছি অবশ্য।

ফোন বেজে ওঠে, বিসিভাব ধবে সুভাষ বলে, হ্যাঁ, তমোনাশ? আবে না না মুখ ফসকে তমোনাশ বলে ফেলেছি। তোব গলা চিনব না, ফাটাফাটি লিখছিস নাকি আজকাল। না, নিজে পডিনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালোই বলছে সবাই। ভিসা? অঙ্কনেব ভিসা তো বেডি। বিপ্লবেবও? তা-লে তো এখন প্লেনে উঠলেই হয—হাঃ, হাঃ।

অনিন্দ্যবা উঠে দাঁড়িযেছে। ফোন ছেড়ে সুভাষও উঠে দাঁডায, দবজাব দিকে এগোতে এগোতে বলে ওব ছেলে বিপ্লব আর আমাব ছেলে অঙ্কন দু'জনেই স্কলারশিপ নিযে চিকাগো যাচ্ছে—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

বুদ্ধদেব বসু ২০০৫

অমিয় দেব

লেখাব যেমন দেশকাল আছে তেমনি পাঠেবও বোধকবি দেশকাল আছে। 'কালো হয়ং নিববধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'-ব অভিমান অবশ্যমান্য, কিন্তু তাকে ভব কবে দেশকালব্যতিরেকী পাঠেব প্রস্তাব বোধকবি একদেশদর্শী। বুদ্ধদেব বসু ঠিক কীভাবে পড়তে হবে তা বুদ্ধদেব বসু নিজে বলে যাননি, তাঁব কোনো নিকট ভক্তেবও তা পুবো জানা নেই। বৌদ্ধ বৈষ্ণব ইত্যাদি বিশেষণের একদা যে-শ্লেষ ছিল তা আজ নেই। ববং আজ কেউ নিজেকে বৌদ্ধ বললে অর্থান্তবন্যাসের উপক্রম হতে পাবে । অন্তত গত পাঁচ দশকেব জীবনানন্দ-পাঠ প্রমাণ কবেছে যে পাঠেব গতিপ্রকৃতিব কোনো পূর্বনির্ধাবিত নিযন্তা নেই। তাব মানে এই নয যে পাঠ স্বৈব। তাব ইতিহাস আছে। তবে সেই ইতিহাস সর্বত্র মসৃণ নয। তাঁব জীবৎকালে যে খ্যাতিব অধিকাবী ছিলেন বুদ্ধদেব বসু—ত্রিশেব তো বটেই, চল্লিশের-পঞ্চাশেব, এমনকি ষাটের লেখক-পাঠকেব কাছেও, তাব কতটা এখন অবশিষ্ট আছে তা ভাবাব বিষয। আব শুধু বুদ্ধদেব বসুর কেন, জীবনানন্দ ছাড়া আব কোন ত্রিশেব কবিব কথা আমবা তেমন কবে মনে বেখেছি। শতবর্ষে সুধীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ পুনরুজ্জীবিত হযেছিলেন—আব তাব বেশ যে এখনও একেবাবে চলছে না তা নয, তাঁব বীতিব জন্য প্রশংসা দুইই এখনও পাচ্ছেন—কিন্তু শতবর্ষ সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তী আড়ালে থেকে গেলেন। বিষ্ণু দে-র নব্বই বছবেব জন্মোৎসবে বুদ্ধদেব বসুব নব্বইযেব মতো হল্ ভবে গিযেছিল বটে, কিন্তু তাব বড়ো অংশই বোধকবি ছিলেন একদা-অনুবাগীর বা তাঁদেব বন্ধুবান্ধবেব দল, স্বাধিকারপ্রবণ নবীনেরা খুব ভিড কবেছিলেন বলে মনে হয না। শতবর্ষে কি চেহাবা কিছু পাল্টাবে, অর্থাৎ যাঁরা আগে বিষ্ণু দে পড়েননি সেই তরুণেরা এবার বিষ্ণু দে পডবেন? কাবণ, যতদিন না তাঁবা পডছেন ততদিন বিষ্ণু দে, কি বুদ্ধদেব বসু, এক সগৌবব কিন্তু অতিক্রান্ত অতীত হযেই বইবেন, বর্তমানে প্রেরণা বা স্পন্দন জোগাবেন না। দুই শবৎ আগে যে-উপন্যাস বেবিযেছিল জীবনানন্দেব—এখন পুস্তকাকাবে লভ্য—নাম ভূমেন্দ্র গুহব সুচিন্তিত সংযোজন 'সফলতা নিষ্ফলতা', তাব অনেকখানি জুড়ে ছিলেন বুদ্ধেদেব বসু-বিষ্ণু দে-ব মতো লেখকেবা যাঁদেব নবযৌবন তঁদেব লেখা বিষয়ে কোনো গভীব অতৃপ্তি বা সংশযেব অবকাশ দিচ্ছিল না। বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছেন তিনি তখন একটা লেখা শেষ কবেই আবেকটা লেখা শুরু কবতে পাবতেন। জীবনানন্দেব এই উপন্যাস যে সহিত্য-সমালোচনা নয তা বলা বাহুল্য—'দারুণ মাস্তুলেব কর্ণধাবগণের প্রতি' যা তিনি কিছুদিন পরেই বলবেন তাব সঙ্গে এব যোগ নেই—তাঁব স্বেচ্ছাকৃত 'নিষ্ফলতা'ই হযতো এব মুখ্য উপাদান। সেইসঙ্গে এক সবলতা-জটিলতাব মাত্রাও হযতো এতে আছে। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুব এই অতিপ্রজ চেহাবাটা ও তৎসংলগ্ন আত্মবিশ্বাস যে অনেকটাই

পেশাদাবি কাবণে এবং পবে পাল্টেও গিযেছিল, তা আমাবা জানি। যিনি একদা বচনাশেযে 'I am feeling so perfectly happy that I cannot proceed any further' লিখেছেন, তিনিই শেযজীবনে তাঁব 'অতৃব-তৃপ্ত শোধন-স্পৃহা'-ব কথা বলবেন। এবং শুনেছি তাব বর্জনীয গ্রন্থেব এক তালিকাও তিনি কবে বেখেছিলেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে এই সালতামামি আমাব প্রশ্ন নয, আমাব প্রশ্ন বুদ্ধদেব বসু পাঠ। আমাদেব মানে আমবা যাবা এখন পাঠক তাদেব। যাবা 'সফলতা-নিষ্ফলতা' পডেছি এবং ভূমেন্দ্র গুহব পবামর্শমতো মেনে নিযেছি যে তাতে বাণেশ্বব মুখ্যত বুদ্ধদেব বসুব ছাঁচে গডা, তাবা কি বুদ্ধদেব বসুর প্রথমদিককাব বচনাবলি পডে দেখছি—খালি 'সাডা' 'বন্দীব-বন্দনা' নয, 'অভিনয, অভিনয নয' বা 'বেখাচিত্রে'ব বা গল্পগুচ্ছ ওরা এবং আবো অনেকেব' গল্পোপন্যাস কি একটি কথা'-ব কবিতাকটি অথবা উপন্যাস 'অকর্মণ্য', মন-দেযা-নেযা' বা 'যবনিকা পতন'—যাদেব বচনাকাল ১৯২৭ থেকে ১৯৩১, তাঁব উনিশ থেকে তেইশ বছব বযসেব মধ্যে? খুব যে পডছি তা মনে হয না, কেননা পডলে তাঁব স্বাচ্ছন্দ্যেব অন্তত সাক্ষী হযে থাকতাম। আব স্বাচ্ছন্দ্য যে আমাদেব অনভিপ্রেত তা আমাদেব সাম্প্রতিক পাঠ-প্রবণতা থেকে প্রমাণ পায না। অবশ্য আমবা পডি মুখ্যত সমসাময়িক লেখা, সমসাময়িক সুখদুঃখেব সঙ্গে যাব যোগ প্রত্যক্ষ। যদি কাউকে জিজ্ঞেস কবা যায তিনি একবছবে কী কী পডেছেন, তাহলে হযতো দেখা যাবে তিনি অপ্রত্যক্ষ কিছুই পডেননি অর্থাৎ সমযেব স্রোতেই মন ঢেলে দিযেছেন, উজান ঠেলেননি। ব্যতিক্রম জীবনানন্দ—তাঁব কোনো অপ্রকাশিত লেখা বেবোলে আমবা আগ্রহসহ পডি, তা সে ১৯৩১-৩২ বা অন্য যে-কোনো সমযের বচনাই হোক না কেন। অন্য উজান যে আমবা একেবাবে ঠেলি না তা নয, কিন্তু তা হযতো পুনর্বিচাবেব তাগিদে। গবেযণাব্যপদেশে, নিছক ভোক্তা হিসেবে নয। ধবা যাক আধুনিকতা নিযে তর্ক বেঁধেছে, তিরিশই কি যথার্থ আধুনিক নাকি কোনো উত্তবপর্বেব আধুনিকতা যথার্থতব—খোলো বুদ্ধদেব বসু, দেখো 'দময়ন্তী'-ব পরিশিষ্টে তিনি (এজবা পাউন্ড সদৃশ) কী পবামর্শ দিযেছিলেন অথবা গদ্যকবিতাব স্বপক্ষে কী জেহাদ তাঁব ছিল, কিংবা যোবোপীয আধুনিকতাব আদিগুরু বোদলেযাবকে তিনি কীভাবে বাংলায প্রতিষ্ঠা কবলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা কোনো গবেষক যদি দেখতে চান 'অতি-আধুনিকতা'ব বিতর্ক কী চেহাবা নিচ্ছিল ১৯৩০-এব আশেপাশে তাঁকে 'প্রগতি'-ব ফাইল ঘাঁটতেই হবে, খুঁজে বেব কবতে হবে 'মহাকাল' পত্রিকায প্রসঙ্গিক বচনাবলি এবং পডতে হবে 'বন্দীব বন্দনা' ও তাব সবকটি সমালোচনা। আব যদি জানতে চাই ত্রিশ-চল্লিশেব ফ্যাসিবিবোধী সাহিত্য-আন্দোলনে কতটা যুক্ত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাহলে তাঁব তৎকালীন কিছু লেখা পডতেই হবে, যেমন ১৯৩৮-এব কলকাতা সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁব ইংবেজি ভাষণ যা এখন দুষ্প্রাপ্য। দু-তিনটি পুস্তিকা যা আব পবে ছাপা হযনি, ইতস্তত অন্য গদ্য-পদ্যও, মায বন্দেমাতবম বিতর্কে ববীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁব দীর্ঘ চিঠি। অশ্লীল লেখক হিসেবে তিনি অনেকবাবই অভিযুক্ত হযেছেন, তা নিযে যদি কাবোব গবেণাব অভিপ্রাায থাকে তাহলে 'কল্লোল'-এ ছাপা "বজনী হ'লো উতলা" থেকে শুরু কবতে হবে, 'এবা

আর ওরা এবং আরো অনেকে' খালি পড়লেই হবে না, একে নিয়ে তাঁর লালবাজার হাজিরার কথাও জানতে হবে, আর যাটের দশকে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'র গল্প তো আছেই। সেইসঙ্গে সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'-র মামলায় তার বিবাদী পক্ষে বিবরণও পড়া দরকার। 'কৃষ্ণ' ও 'শিশ্ন'-র মিল নিয়ে রেডিয়োতে 'কালসন্ধ্যা' পাঠে কোনো আপত্তি উঠেছিল কিনা তাও জেনে নেওয়া দরকার হতে পারে। আর যদি কোনো গবেষকের উৎসাহ হয়, জানবেন কবিতা প্রকাশকে কিভাবে এক আন্দোলন করে তুলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাহলে তাঁকে অনেক কিছুই দেখতে হবে, বিচার করতে হবে, 'কবিতা' পত্রিকার ইতিহাস, কখন কার লেখা তিনি ছাপছেন, গ্রহণ-বর্জনের কী রীতি ছিল তাঁর, পরিবর্তন করতেন কিনা—। 'কবিতা' পূর্ববর্তী 'গ্রন্থকার-মণ্ডলী' থেকে শুরু করে 'কবিতাভবন' প্রকাশন ও 'এক পয়সায় একটি সিরিজ। অন্যদিকে তাঁর নিজের লেখার প্রকাশ-ইতিহাসও ঘাঁটা যায়, যেমন তিনি কখন কপিরাইট বেচতে বাধ্য হতেন তাঁর লেখার সংস্করণ কখন হত, কিংবা আদৌ হত কিনা, নাকি কেবল দু-তিনটি লেখাই ভালো বিক্রি হত, ইত্যাদি ইত্যাদি। গবেষক বা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা এও লক্ষ করতে পারেন, লেখকের অধিকার নিয়ে কতটা সচেতন তিনি ছিলেন, কোন সম্পাদককে লিখেছিলেন , কবিতা পাঠাতে পারি, পুরো পাতায় ছাপতে হবে, দক্ষিণা পঞ্চাশ।

কিন্তু ঈদৃশ উজান ঠেলতে গেলে সমর্পিত ভোক্তা না হলেও চলে। তবে পরোক্ষ ভোক্তা যে এই উজান-ঠেলিয়ের মধ্যে একেবারই নেই তা বোধহয় বলা যায় না। আছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু পড়বেন বলেই তাঁরা তাঁদের গবেষণায় বা বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাও বোধহয় বলা যায় না। অনেক তরুণ পাঠকের কাছে আমি বুদ্ধদেব বসুর নাম করে তেমন সাড়া পাইনি। আমার বয়সী পাঠক তো একসময় পড়েছেন, গ্রহণ করুন বা বর্জন করুন পড়েছেন। তাঁদের কথা আলাদা। আমি ভাবছি এখানকার পাঠকের কথা, বিশেষ করে সেইসব লেখক পাঠকের কথা যাঁরা বাংলা কবিতার মোড় ফেরাচ্ছেন বা ফেরাবেন। সেই পালাবদলে কি তির্যগভাবেও বুদ্ধদেব বসু ক্রিয়া করছেন, তাঁর পাঁচদশকের কাব্যচর্চার কোনো অন্তঃসলিলা ধারায় তা পুষ্টি পাচ্ছে! নাকি তাঁর পরের পরের কবিদের মধ্যেও তা খানিক উচ্ছ্রিত ছিল, এখন আর নেই। সেই জুগুপ্সাও আর নেই যাতে সত্তরের বিপ্লবীরা তাঁর 'শুধু তা-ই পবিত্র যা ব্যক্তিগত'-কে ভূষিত করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে 'শ্রেণীশত্রু' বলেও চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। সবই তো এখন অলীক। বুদ্ধদেব বসুও কি তা-ই, অলীক, বুদ্ধদেব বসু যিনি বৈচিত্র্যে-ব্যাপ্তিতে এক সার্থক উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথের। যারা আমরা পাঁচের-ছয়ের দশকে 'যে-আঁধারে আলোর অধিক' কি 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাঁর বোদলেয়ার-অনুবাদ হয়েছিলাম মথিত, তারা কী করে মানব বুদ্ধদেব বসুও অলীক হয়ে যেতে পারেন, থাকতে পারেন না বাস্তব। কাল কি এতই ক্ষমাহীন। নাকি দোষটা কালের নয়, আমাদের— জীবনানন্দের ছায়ায় স্থিত হয়ে আমরা ভুলতে বসেছি বুদ্ধদেব বসুকে।

নাকি আরো এক একদেশদর্শিতাও এই আপেক্ষিক বিস্মৃতির কারণ? বুদ্ধদেব বসুর

একদা অনেকেই ছিলেন মার্ক্সবাদী। মতাদর্শ ও সাহিত্যিকে তিনি তুল্যমূল্য জ্ঞান কবতেন না, যদিও কিঞ্চিৎ বামাচবণ তখন তাঁবও ছিল। তা স্থাযী হযনি। তাব কাবণ বোধহয় এই নয় যে তিনি অন্য কোনো মতাদর্শে ঝুঁকছিলেন, কাবণ বোধকবি এ-ই যে মতাদর্শেব জন্য তিনি সাহিত্যবোধ বিসর্জন দিতে বাজি ছিলেন না। তাছাড়া বামই প্রকৃষ্ট আব অ-বাম নিকৃষ্ট এমন সরলীকরণও তাঁকে হযতো পীড়া দিচ্ছিল। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-ব যে সংকলন অনেকটা তাঁবই উদ্যোগে এবং হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায ও আবু সযীদ আইযুবেব সম্প্রাদনায বেবোয তার নির্বাচনে যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না তা তাঁব আত্মকথায পবে বলেছেন। তাঁব মনে হযেছিল কবিতার চেযে মতাদর্শ কোথাও কোথাও জকবি হযে উঠেছিল নির্বাচকদেব কাছে। যেমন তিনি সবে আসছিলেন তেমনি তাঁব বামপন্থী বন্ধুবাও কেউ কেউ সরে যাচ্ছিলেন তাঁর কাছ থেকে। আব এই বিচ্ছেদেব ফলেই হোক বা তাঁব আপাত-শুদ্ধতাবাদী লেখাব ফলেই হোক, বা তাঁব মতামতেব সবিশেষ স্বাতন্ত্র্যেব ফলেই হোক, তিনি ধীবে ধীবে বামবিবোধী বলে চিহ্নিত হতে লাগলেন। অতি-বাম তাঁব মধ্যে পেল 'প্রতিক্রিযা'র আশঙ্কা আর অনতি-বাম অনৈতিহাসিক পক্ষপাত। আব সবটা তুঙ্গে উঠল যখন তিনি এক প্রত্যক্ষ বামবিবোধী সম্মেলনে যোগ দিযে ফেললেন। ভর্ৎসিত হলেন তিনি, একদা প্রগতিবাদী, যদিও পবে জানা গিযেছিল ওই দলাদলিতে তিনি আবাম পাননি। কিন্তু ওই যে বামে বর্জিত হলেন তিনি, আব উদ্ধাব বোধকবি ঘটেনি তাঁব—দলেব দীর্ঘ হাত হয়তো তা অনেকদিন ঘটতে দেযনি। এখন কে প্রজন্মেবও বেশি বাম-ঘেঁযা তরুণেবা হযতো বুদ্ধদেব বসু বিষযেই অনভিজ্ঞ। আব অবিমিশ্র না হলেও বামে ঝোঁক তো আমাদেব আজও অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আজও আমাদের অপবিচয বো অর্ধপরিচয অব্যাহত।

নাকি আমি বাড়িযে বলছি—তিনি আছেন আমাদেব লেখ্য ভাষাব তন্তুতে তন্তুতে, অলক্ষ্য কিন্তু সক্রিয়?

আব এই যে ধবা যাক জীবনচবিত চলেছে, তাঁব মানে কি এই নয যে তিনি আছেন। সাহিত্য অকাদেমিব 'মেকার্স অব ইন্ডিযান লিটাবেচার' গ্রন্থমেলায তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন আলোকবঞ্জন দাশগুপ্ত, সম্প্রতি ভুঁইযা ইকবাল ঢাকাব বাংলা একাডেমীর জন্য, সুদক্ষিণা ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিব জন্য আর সমীব সেনগুপ্ত বিকল্প প্রকাশনীব জন্য লিখেছেন। এবং এই যে আমি এই মুহূর্তে নিযুক্ত আছি বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব 'সাহিত্যসাধক চবিতামালা'য সুবীব বায়চৌধুবীব হাবিযে যাওযা পাণ্ডুলিপিব শূন্যস্থান পূরণ করতে—এগুলো কি প্রমাণ কবে না যে তাঁব জীবন ও রীতি বিষযে আমবা কৌতূহলী বোধহয নয, কাবণ ওই চাব প্রকাশকেব তিনটিই প্রতিষ্ঠান—তাদেব কাছে সাহিত্যেতিহাসেব ধাবণা অন্যতর আব একটি বুদ্ধদেব বসুব পুনরুজ্জীবনে দৃঢ়সংকল্প। কৌতূহলেব একটি প্রমাণ নিশ্চয়ই এই হত যে তাঁব বইযেব প্রচাব বেড়েছে 'আমাব ছেলেবেলা' বেবিযেছে সেই কবে, তাঁব মৃত্যুব আগেই, আর 'আমাব যৌবন'ও মৃত্যুব একটু পরেই—দুটোবই দু-তিনটি সংস্কবণ বোধহয এ-পর্যন্ত হয়েছে, অন্তত সাম্প্রতিক বইমেলা সেই সাক্ষ্য দেয আর অসমাপ্ত 'আমাদেব কবিতাভবন' তো বেবিযেছে এই ক' বছর মাত্র, সংস্কবণ ফুবোবা

প্রশ্নই হয়তো ওঠে না। অথচ হত যদি কোনো বর্তমান খ্যাতনামার স্মৃতিচারণ, সংস্করণের পর সংস্করণ হয়তো এতদিনে ফুরিয়ে যেত। অবশ্য বিক্রির উপর কোনো লেখকের বাঁচা-মরা নির্ভর করে না। যিনি সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই ফরাসি পার্নাসীয় কবি স্যুলি প্রুধোমকে কে মনে রেখেছে! বা সেই যে আঠারো শতকের শেষপাদের নাট্যকার কোয়েট্‌সেবু যিনি চোখের জল ভিজিয়ে দিয়েছিলেন জার্মানির বঙ্গ মঞ্চ গ্যেটেও যাঁর তুলনায় ছিলেন ঈষৎ নিষ্প্রভ, তাঁকে আজ কে মনে রেখেছে। তবে নগদ বিদায়ের একেবারে দাম নেই তাই বা কে বলবে।

না হয় জীবনচরিত এক প্রথাসিদ্ধ কর্ম আর তাতে প্রমাণ হয় না যে তিনি, বুদ্ধদেব বসু, সদাপঠিত (বরং মন্দ কেউ কেউ হয়তো বলবে উল্টোটাই প্রমাণ হয়), কিন্তু এই যে তাঁর লেখা নিয়ে এর মধ্যেই কয়েকটি বই ছাপা হয়ে গেছে এবং অনেক অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ—তা থেকে কি বুদ্ধদেব বসুর স্থায়িত্ববিষয়ক কোনো প্রমাণেই আমরা পৌঁছাই না? বোধহয় না কেননা, বইকটি হয় গবেষণাপত্র নয় ছাত্রপাঠ্য দীপিকাপুস্তক যা কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সহায় রচিত। অন্যদিকে প্রবন্ধ-নিবন্ধের সালতামামি করলে দেখা যাবে হালের লেখা খুব কম, বেশির ভাগই তৎকালীন—অর্থাৎ তাঁর কোনো সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা বা তার ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে সম্মাননা বা তাঁর মৃত্যুর পরে স্মরণ ও শ্রদ্ধা এবং মূল্যায়ন যার কোনো কোনোটি খালি সুচিন্তিত নয়, হৃদয়গ্রাহীও। অবশ্য কিছু লেখা আছে একটু পরের, ১৯৮৬, ৮৭, ৮৮-তে প্রতিভা বসু সম্পাদিত 'তিরিশে নভেম্বর কবিতাভবন বার্ষিকী'-তে প্রকাশিত। কিন্তু তাদের লেখকবৃন্দ মোটামুটি পুরোনো নতুন করে লিখেছেন এই মাত্র। নতুন এমন কারো উল্লেখযোগ্য লেখা নেই যিনি এই প্রথম বুদ্ধদেব বসু পড়লেন। অথচ তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হত। কারণ সাহিত্যের তো এক মজা এই-যে পুরোনো হয়ে গেলেও তা অনুপভোগ্য হয়ে যায় না। ঠিক কালোত্তীর্ণতার কথা আমি বলছি না, বলছি নব নব কালাশ্রয়ী পাঠের কথা। সম্প্রতি 'পরিকথা' বিশ শতকের বাংলা কবিতার উপর এক বিশেষ সংখ্যা বের করেছে, তাতে কবি ও কবিতা ধরে ধরে পাঠের প্রয়াস হয়েছে। এক নতুন পাঠ তাতে আছে বুদ্ধদেব বসুর—অত্যন্ত সংবেদশীল মর্মস্পর্শী। কিন্তু তা যদি আমার সমবয়সী কারোর লেখা না হয়ে হত একেবারে সদ্যপাঠক কারোর লেখা, কী ভালোই না হয়। বোঝা যেত এখনও নতুন করে তাকে পড়ছেন কেউ কেউ, শুধু নাম নন তিনি, পূজার্হ, সুদূর।

আমি ভাবছি এক নবীন কবির কথা যে বুদ্ধদেব বসুর কাছে কেবল নত হবে না, তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবে, বলবে, আপনি যা করেছেন আমি তা অতিক্রম করব, আপনি রাবীন্দ্রিক নির্মোক ভেঙে বেরিয়েছিলেন, আমিও রৌদ্র নির্মোক ছিঁড়ে বেরোব, আর তাতে ঋণশোধ হবে আমার, তাকে পরম্পর বা ইতিহাস যাই বলুন। সেই নবীন বুদ্ধদেব বসু কোথায়? সেই নবীন বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশে আমার আজকের এই পাঠ্য আমি নিবেদন করেছি।

২

তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে এক দীর্ঘ গল্প লেখেন বুদ্ধদেব বসু, নাম "প্রেমপত্র", তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থের (১৯৭২) অন্তর্গত। এই ১৯৬৯-এই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতাও তিনি লেখেন—তাদের একটি "কবির বার্ধক্য"। "প্রেমপত্র" আর "কবির বার্ধক্য" একটা যোগ আছে। "প্রেমপত্র" এক প্রৌঢ়ের কাহিনি, এক বহুভাষাবিদ ভাষাতাত্ত্বিক যিনি তাঁর এক ভিনদেশী প্রেমিকার লেখা এক রহস্যময় কালিমাহীন শুক্ল কাগজের স্বগত মহিমার লিপি উদ্ধার করতে করতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এমনিতেই তিনি ছিলেন এক আত্মবৃত গ্রন্থকীট, স্ত্রীপুত্রকন্যার স্থূল হস্তাবলেপ এড়িয়ে আপন অধ্যয়নে-গবেষণায় নিবিষ্ট—সমাজের সম্মাননাও যাঁকে শেষপর্যন্ত টলাতে পারেনি—এই চিঠি তাঁকে আরো নিবিষ্ট করে তুলল, আরো স্বেচ্ছানির্বাচিত কী বার্তা আছে এই শাদা কাগজের অন্তর্বর্তী অক্ষরমালায়? নিরন্তর উদ্দীপন, এমন কোনো শেষকথা যা প্রেমিকাই বলতে পারে, জগৎ ও জীবনবিষয়ক কোনো অন্তিম. পরামর্শ? সেই প্রেমিকার নাম তিনি আবার রেখেছিলেন এষা, সে কি তাঁর সূচীমুখ এষণারই মূর্তিমতী রূপ? বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, তিনি বৃদ্ধ হচ্ছেন, হচ্ছেন ক্ষীণ, অলক্ষ্য ও দুর্গম—এক ভগ্নাংশ আয়ত্ত হয়েছে তাঁর চিঠির। আরো আরো এষণা চাই? এইভাবে যখন তিনি সম্পূর্ণ প্রোথিত হয়ে আছেন সেই 'প্রেমপত্র' যখন তা তাঁর স্বপ্নের ও জাগরণের একমাত্র আধার, তখন সহসা এ৹দিন পত্রটি গেল প্রকৃতিক লীন হয়ে আর তার বার্তাও যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। একেবারে বদলে গেলেন, বৃদ্ধ, হলেন স্ত্রীপুত্রকন্যাপরিজনের সান্নিধ্যপ্রার্থী স্নেহকাঙ্ক্ষী, কাতর কিঞ্চিৎ ছেলেমানুষ—অবিশ্বাস্য—যেন বই নেই, লিপি নেই, অক্ষর লুপ্ত, যেন বিশেষ বিগত, আছে সাধারণ, নির্বিশেষ সাধারণ। মুক্তি ঘটল বৃদ্ধের। যেন 'ডাকঘর' চিনে নিয়েছেন তিন। বার্তা পৌঁছেছে। জীবনই সেই প্রেমপত্র যার জন্য এতদিন মায়াবী টেবিলে বসে দীপ জ্বালিয়েছিলেন। এবার মৃত্যু স্বাগত। গল্পের শেষ বাক্য 'কিছুক্ষণ পরে তাঁর প্রাতঃকালীন চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো, বিরূপাক্ষর মাথা বালিশ থেকে সরে এসেছে, একটা ঝুলে আছে খাটের বাইরে, তাঁর দেহ নিস্পন্দ, মুখে শান্তি, আর তাঁর ঠোঁটের রেখা দেখে মনে হয় তিনি যেন কিছু বলতে চান'। কী বলতে চান বৃদ্ধ বিরূপাক্ষ তথা নবলব্ধ ত্রিলোচন! আ। এতদিনে! তাহলে—সত্যি, সব সত্যি।'

একদিন যৌবন ছিল বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় কাল, এখন বার্ধক্য। কী চেহারা এই বার্ধক্যের। "কবির বার্ধক্য" নাম্নী কবিতায় খানিক ফুটে উঠেছে। এক 'অদ্ভুত ব্যামো'-র কথা বলা হচ্ছে গোড়ায় 'বড়ো বেশিদিন ধরে ভুগেছিলো অদ্ভুত ব্যামোতে।' কী তা? না, 'যা-কিছু দরাজ দান জীবনের—এই আসে, এই চলে যায়—সব তার মধ্য দিয়ে, তাকে ফুঁড়ে যেন চায় উদ্ভাসিত হতে কোনো অস্বাভাবিক আঁধারের উজ্জ্বলতায়।' আলোর অধিক এই আঁধার যে শিল্পসম্ভূত তা বলে দিতে হয় না। 'রূপান্তর' কাব্যগ্রন্থ থেকে, বস্তুত 'বন্দীর বন্দনা' থেকেই এর কথা ক্রমাগত বলে আসছেন বুদ্ধদেব বসু। এর জন্যই পেতে রেখেছেন মায়াবী টেবিল। বলেছেন নিজেকে, 'প্রান্তরে কিছুই নেই—জানালার পর্দা টেনে দে ওরা তোকে

কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ, /ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যকটাস, ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।' আর, 'যা তোর নিজের নয় তা শেখাতে পারে কোন মুনি? বরং তুলে নেন্ ঘাড়ে আদিবাসী সিন্‌বাদের বোঝা, কটি মাত্র মিল খুঁজে সারাদিন গাধার খাটুনি।' বারবার বলেছেন, 'না, তুই নিবি না আর। শূন্য ছেনে হৃদয় ভরাবি।' 'ভুলে যা ঝংকার, ঝর্না, বরদাত্রী কঙ্কাবতীকে,/যার ঠোঁটে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি লিখেছিলি তুই'। এত করে কেন বলছেন, কেন বলতে হচ্ছে? এ কি শিল্পীর প্রাণায়াম? নাকি বলতে হচ্ছে এইজন্য যে হাওয়া তুলে প্রান্তর মাঝে মাঝেই পর্দা উড়িয়ে দেয় বা 'কূট কুয়াশা 'ঋষি আর ধীরবযুবতী'র সেই আশ্চর্য ব্যাসপ্রোক্তব্য 'কেলি' সত্ত্বেও 'আসন্ন' কুরুক্ষেত্র মিথ্যে হয়ে যায় না (মহাভারত যে কী টানে টেনেছিল বুদ্ধদেব বসুকে তা তো ষাটের-সত্তরের পাঠকেরা জানি) কিংবা যখন দেবযানীর স্মরণে কচ চাঁদ উপড়ে আনতে চায়, আকাশকে টুকরো করে ন্যাকড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলতে চায় তখন 'দিগন্তরেও কাঁদে না ক্রন্দসী, /সপ্রতিভা প্রপঞ্চের/পূর্ণ প্রতিবাদ/বঞ্চিতের নিত্য করে দোষী', ইত্যাদি ইত্যাদি। পঞ্চাশের প্রান্তে এসে যখন তাঁর হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিময় আপাত-কলাকৈবল্যবাদী কবিতাবলি লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, তখনকার কথাই বলছি। আর তার একটু আগে যখন সতীকান্তর কাহিনি লিখছিলেন 'উদ্বাস্তু'র গদ্যছন্দে, তখন তো স্পষ্ট হল যে লেখক সতীকান্তর বন্ধ্যাত্ব ঘুচবার একমাত্র উপায় ফুটপাতে শয়ান নিরন্ন মা ও তার স্তন্যহীন শিশুর প্রতি জায়মান অনুকম্পা, যখন পাশেই আঁচ পড়ছে প্রাচুর্যের স্বার্থপর উনুনে। সম্প্রতি সৌরীন ভট্টাচার্য এই নাছোড় লেখক সতীকান্তকে নতুন করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, দেখেছেন শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাকরণ না আউড়েও এই লেখক শ্রেণীবৈষম্যের আঁচ পেয়ে গেছেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর পথ তথা ধর্ম লেখনাচালন তাই অনুকম্পাই বোধকরি তাঁর অন্যান্য সম্বল। 'তার মনে হলো/কেমন করে/অস্পষ্টভাবে ঘটে গেছে তার/একটু সংযোগ, স্পর্শের অনুকম্পা,/জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র।' কাছাকাছি সময়ে শুরু ও বছরদশেক পরে শেষ আরেকটি কবিতার কথা মাঝে মাঝেই বলেন সৌরীন ভট্টাচার্য যারও বিষয় শেষপর্ব বৈষম্য, নাম "এলা-দি" আছে, 'একদিন চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা কাব্যগ্রন্থে। 'শুধু তা-ই পবিত্র যা ব্যক্তিগত'-কে ধিক্কার দিয়ে যাঁরা বুদ্ধদেব বসুর বর্জনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রকারান্তরে অনুরোধ জানান সৌরীন ভট্টাচার্য, এসে আবার পড়ি, না-পড়লে কী করে জানব তিনি কতটা মিনারবাসী, বা সত্যিই মিনারবাসী কিনা। ওই 'একদিন চিরদিন'-এই "আমার মিনার" নামে কবিতাও আছে যাতে হয়তো এক প্রত্যক্ষ জবাবদিহি করেছেন বুদ্ধদেব বসু 'কেউ কেউ বলে আমার মিনার গজগন্তে তৈরি। ভুল বলে।' সারাজীবন লিখে ও অর্ধেক জীবন গজদন্ত-মিনারবাসী বলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি যে-গদ্য লিখেছিলেন "কবিতার শত্রু ও মিত্র" নামে, তাতেও কি কোনো জবাবদিহি নেই!

তাই শুধু শিল্পকলাই তাঁর শিরোধার্য ছিল এমন ভেবে নিলে হয়তো ভুল হবে। "রাত তিনটের সনেট-১"-কে শুধু সমষ্টি বিরোধী ব্যষ্টিবাদ বলে ধরে নিলে হয়তো হবে

আক্ষরিকতাই, হবে না মর্মানুসন্ধান। 'উদ্ধাবেব স্বত্বাধিকাবী' সেইসব পাণ্ডারা কারা যাঁদেব জগঝম্পে সত্তা শ্রবণেন্দ্রিয হাবায, যাঁদের চামবে চৈতন্য আচ্ছন্ন হযে পড়ে, আব যাঁদের পাহাবাব অর্থ যীশু-বুদ্ধদেব চোখে চোখে বাখা—কাবা তাঁবা? তাঁবাই কি নয সেই ক্ষমতাব জগৎ যাকে চূর্ণ কববাব অধীব আকাঙ্ক্ষাবই অন্য নাম বিপ্লব এবং 'হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম' কি হতে পারে না ভাবী বিপ্লবীব প্রতি পবামর্শ। একধরনেব আক্ষবিকতা যে কতদূর যেতে পাবে তাব একটা ছবি বোধকবি বুদ্ধদেব বসুব অন্যতম শ্রেষ গল্প "অনুদ্ধাবণীয" যার একটি পুনর্বিবেচনা সম্প্রতি শঙ্খ ঘোষ কবেছেন। "বাত তিনটেব সনেট-২" "১"-এবই সম্প্রসাবণ . 'এ নয তোমাব জন্য। ফুল, ফল, ঋতু, বাবো মাস/ঘুবে-ঘুবে যা বলে তা শিখে নাও।' "অনুদ্ধাবণীয" বা "কবিতাব শত্রু ও মিত্র"-তে যে নিঃসঙ্গ বেদনা প্রকাশ পেযেছে তাকে অবজ্ঞা কবে যে-ভুল আমবা কবেছি তা শোধনেব সময এখনও আছে। এখনও "যে-আঁধাব আলোব অধিক' কি মবচে পড়া পেবেকেব গান' খুলে দেখা যায কীভাবে শিল্পকলাব ফাঁকে, অক্ষবসাধনার পাশাপাশি উঁকি দিযে যাচ্ছে জীবন যা অন্ধ উপাসনা নয, নয 'ভাঁড়াব ঘবেব ব্যস্ত ইঁদুব আব আবশোলাব দৌড, ইতিহাসভ্রমে 'উচ্ছিষ্ট' ভোজন। এখনও আবেকবাব "শিল্পীব উত্তব" ও "ভিনদেশী" পডবাব প্রযোজন আছে—"শিল্পীব উত্তব নেহাত এইজন্যই নয যে যে-বিষণ্ণতা তিনি একদশক কাল পেবিযে যুধিষ্ঠিবে দেখবেন তাব পূর্বাভাস এখন অর্জুন পাচ্ছেন, এই জন্যও বোধহয যে শিল্পেব মূল্য তাব নিবন্তব সাধনাতেই, সিদ্ধিতে নয। অন্যদিকে "ভিনদেশী"-কে মনে হয় তাঁব পববর্তী কোনো কোনো কবিতাব প্রবেশদ্বাব, বিশেষ কবে বার্ধক্যসংক্রান্ত কবিতাকটিব। 'প্রেমিকাবা মৃত আজ', 'বন্ধু সব মৃত' ও প্রকৃতিও মৃত—এই তিন মৃত্যুঘোষণাব পব শোনা যাচ্ছে এমন এক জীবৎ-ঘোষণা যাকে প্রায বর্ববব বলা চলে : যতক্ষণে/গাছে-গাছে ডাকিণীবা মুণ্ডু নাড়ে, তাল দেয শূলবিদ্ধ বিডালীব আর্তনাদ—/বৃষ্টিব অস্পষ্ট বাতে ফুটপাতে প'ড়ে থাকে এক/ভিনদেশী হৃৎপিণ্ড/স্পর্শময়, ক্রমশ বিদ্বান।' ইন্দ্রিযযোগেই ক্রমপ্রজ্ঞা—এমন কথা হযতো আগে বলেননি বুদ্ধদেব বসু, একসময তো ইন্দ্রিয আব প্রজ্ঞাব মধ্যেই কেবল্ বিরোধই দেখেছেন।

মৃত্যুব পাঁচবছব আগেকাব এই "কবির বার্ধক্য" ফিবে গিযে দেখি সেই 'অদ্ভুত ব্যামো" আসলে শিল্প যাব প্রকোপ 'সুখ, স্বপ্ন, অবসাদ—ইন্দ্রিয বা হৃদযেব যত অনুভূতি,/তাবা যেন—সে মুহূর্তে যা দেখায, তা নয় আসলে,/দূবতব অন্তবালে রূপান্তব নিজেকেই কি প্রশ্ন কবছেন বুদ্ধদেব বসু?) খুঁজে পাব ব'লে/দাবি কবে তাব সহকর্মিতা, প্রস্তুতি।' কিন্তু 'সে এখন ভালো হ'যে গেছে।' কবিতাটিব মোদ্দা কথাটা তা-ই, 'এতদিনে স্বাস্থ্যবান, শান্ত ও নিশ্চল।' তাব অতীত, উপমানসংযোগে, 'সমুদ্রেব আন্দোলনে অবিবাম-ধ্বনিতে সৈকতে যে কোনো পিকনিকে আসা বালকেব কৌতূহলী পথে/পড়ে আছে একটি খোলশমাত্র—লোকশ্রুত সত্তব বছব।' আব তাব এই বোগমুক্তিব প্রমাণ ওই সেই হৃৎপিণ্ড যাব কথা একটু আগেই আমবা শুনেছি ধূমল, বিশাল,/তন্দ্রাব গুণ্ঠন ছিঁড়ে, মাংস ফুঁড়ে কাঁপিযে কঙ্কাল,/পতন, আবহমান, আগ্নেযঅভ্যাসে/অকস্মাৎ নড়ে উঠে—ফুলকি জ্বেলে—

থেমে যায।' এই হৃৎপিণ্ডই ছিল "বৃদ্ধ কবি"-ব মূল সম্পদ, তাব একদা-বচিত গ্রন্থাবলি নয, নয তাব খ্যাতি ('সকালে চিঠিব ঝুড়ি বাবান্দায ছেড়ে আসা জুতো,/জন্মদিনে শবানুগামীব ভিড—অগ্রিম এবং ববাহূত,/সব যেন কষ্টকর নড়া দাঁত, ফালতু কোনো উৎপাত, ঝামেলা,/কিংবা তাবই অতীতেব কীটদষ্ট টুকবো ছেঁড়া সুতো'), যদিও অনেক আগেই স্ত্রী তাকে বলেছিলেন লোলচর্ম কুৎসিত লম্পট। 'কবিব মৃত্যু-তেও শুদ্ধ শিল্প বিষযে ওই একই সংশয শোনা যায। 'তাব সর্বশেষ কী ছিলো ভাবনা?/কোনো স্বপ্ন—অবিবল ছিন্ন, তবু চিবকাল যা বয সম্ভব?/মেদমাংস-অতিক্রান্ত কোনো রূপেব বৈভব?/কোনো বমণীয মুখ? মনস্তাপ? জড়েব যাতনা?' 'না কি কোনো অনুচিত বিশেষণ, বর্জনীয কমা—/না কি সে, হঠাৎ দেখে অনন্তেব প্লাবিত উদ্ভাস,/ফেলেছিলো অচিন্ত্য পুলকে পূর্ণ অন্তিম নিশ্বাস,/মৃদু হেসে, অবশেযে, চেযেছিলো ক্ষমা?' ক্ষমা নিশ্চয়ই সেই মহাজীবনেব কাছে যাব ডাক সে আগে শোনেনি এবং যাপন কবে এসেছে তাব একপেশে জীবন। এই ক্ষমাপ্রর্থনাবই নামান্তব বোধকবি 'হনুমানেব জীবন ও মৃত্যু'-ব শেষ পঙক্তিকটি—হনুমান যে "প্রত্যাদেশ" পালন কবে সেই ক্বচিৎ-দ্রষ্টাব উদ্দেশে সমুদ্র পেবিযেছিল আব যে, অনেক পবে 'ক্লান্ত,/বৃদ্ধ,/ক্ষুদ্রকায/পবাঙ্মুখ ভঙ্গিতে শযান—'/ভাবে, "আমি কি কবেছিলাম? পেবেছিলাম?" আব তাব যখন—'তিলে-/তিলে,/ধীবে,/ধীবে,/নিঃস্বপ্ন,/আতঙ্কহীন,/বিনা আকাঙ্ক্ষায়,/বিকাবে,/বিভ্রমে,/বিস্মবণে,/যে-কোনো জন্তুব মতো মৃত্যু হ'ল', তার 'আবো পবে,/বিপুলদূবত্ব/পাবে আবো একবাব বর্ধিত বাতাস তাকে তুলে নিয়ে/ক'বে দিলো বির্দীণ দেশে ও কালে, যেন শস্যকণা,/যেন অন্ন, অজস্র, আবহমান,/স্বল্পবল ক্ষুধিতেব উৎসব, সান্ত্বনা, সর্বভূতে অর্পিত সম্মান।'

প্রৌঢ় বুদ্ধদেব বসুব মৃত্যুবোধ-জীবনবোধ যে পবস্পবেব কতটা প্রেথিত হযে ছিল তাব প্রমাণ যেমন তাঁব এই শেযপর্বেব কবিতা তেমনি অনুবাদ। বোদলেযারে যা তিনি পেযেছিলেন—আব বোদলেযাব তো মনে আছে তিনি পড়েছিলেন দস্তযেভস্কিব সাহচর্যে সেই এক গ্রীষ্মে দুই কবিব সন্ধিপর্ব—ক্লেদ ও দুঃখ ছেনে কবিতা বানাবাব প্রেবণা, তা পেবিযে তাঁকে হ্যোল্ডালিনেব দেবযানে মগ্ন হতে হযেছিলো, হতে হযেছিলো বিলকেব এলেজি ও সনেটের অন্তলীন মুগ্ধতায উদ্বুদ্ধ-এ। যদি 'যে-আঁদাব আলোব অধিক', এমনকি 'মরচে-পড়া পেবেকেব গান'-এও শেষ কবতেন বুদ্ধদেব বসু তাহলে তাঁর বিষযে হযতো এই প্রতীতি পূর্ণ হত না, জানতাম না তিনি শুধু শিল্পে নন জীবনেও উৎসাহী, শুধু জীবনে নন মৃত্যুতেও প্রাণিত। যদি বলি তাঁব শেষ বইযেব শেষ ছটি কবিতা—"দমযন্তী ও নল", "হনুমানের জীবন ও মৃত্যু", "সন্ধিলগ্ন", "সেতুবন্ধ", "স্বাগতবিদায" ও "সাবিত্রীব জন্য কবিতা"—অমবতাব দাবি কবে ভুল বলব? ধবা যাক এমন কিছু পঙক্তি আজ আমাদেব হাতে এসে পড়ল

১ কখনো ভেবেছি, শিল্পী প্রকৃতির প্রতিযোগী, তাব সব অভাব মেটান·
কিন্তু যদি প্রতিভাও প্রাণেব প্রকাশমাত্র, আব প্রাণ শবীবনির্ভব,
তাহলে কবিতা, ছবি কিছু নেই প্রকৃতিব অধীন যা নয।

তাই মনে হয, বুঝি জীব শুধু জন্ম দিতে পাবে,
সৃষ্টি এক অনাদি বহস্যে ঢাকা·
ফলত, তাবাই ধন্য যাবা শুধু ইন্দ্রিযচর্চাব বাঁচে,
আব যাবা অনুচ্চার্য জ্যোতিব সন্ধানী।
কিন্তু যাবা প্রক্ষিপ্ত, যেমন আমি, মধ্যপথে,
এপাবে বা ওপাবেও বাসিন্দা না-হ'যে, শুধু
ভ্রমণে ও বিনিমযে খুঁজে ফেবে অবৈধ কিমিযা,
যাতে হয ভাবনা ইন্দ্রিযগাহ্য, এবং যা ইন্দ্রিযেব দান,
তাও পায চিন্তনীয আযতন, বোধগম্য হয ধীরে-ধীবে—
কী বলবে তাদেব তুমি? কী তাদেব লক্ষ্য, লভ্য, ফলশ্রুতি?
আমি
যৌবনে ভেবেছিলাম কবিতাই প্রেম, কিংবা কামনাব উপচে-পডা
শোণিতেব মন্থনে উৎপন্ন আবো সুস্বাদু মাখনঃ
কিন্তু অন্য ধাবণা সম্প্রতি
মাঝে-মাঝে হানা দেয আমাকে—বিশেষভাবে
এইমতো স্তব্ধ বাতে সঙ্গহীনতায
মনে হয কবিতাও প্রবঞ্চনা—সান্ত্বনা—বিকল্পমাত্র,
কবিতাব চেযে কাম্য নাবীব অঙ্গেব মধু
কিন্তু আমি বৃদ্ধ, সব হাবিযেছি।

২ কিন্তু কোনো জীবিতেব কাম্য নয
অজন্তাব অমবতা—যদি তাকে অমবতা বলো।
তাবা মৃত্যুচেতনায বদ্ধমূল ব'লে
স্বভাবত জীবন-কাঙাল, ভাবে যতক্ষণ দেহে আছে তাপ
ততক্ষণ মৃত্যু নেই—যেমন অবোধ শিশু নিজে চক্ষু বুজে
ভাবে সেও অদৃশ্য, শত্রুব পক্ষে।
কিন্তু নয মৃত্যুও অনন্য, সেও বহু রূপে, বহু নামে খেলা কবে,
শুধু নয শবীব মবণশীল,
হৃদয, প্রণয, মন সবই ক্ষণকালীন, ভঙ্গুব।
তাই, যাবা বেঁচে আছে সমকালে এখনো, তাবাও
সমতালে নেয না নিশ্বাস,
মাঝে-মাঝে পবস্পবের পক্ষে ম'বে যায,
মাঝে-মাঝে নিজেও নিজেব পক্ষে ম'বে যায
অলক্ষিতে, অবিলাপে, ভোরবেলা লণ্ঠনেব মতো,

অথবা যেমন
ফটন্ত কেটলির বাষ্প মুক্তি পায় জলন্ত হাবিয়ে।

৩ কত ভাগ্য আমাদের, মৃতেরা সুদীর্ঘ কাল ধ'রে
অপেক্ষা ও ব্যর্থতার বিক্ষুব্ধ হ'য়েও
শান্তভাবে সহ্য করে জীবিতের বিস্মৃতি ও প্রগলভতা,
অকস্মাৎ অবরুদ্ধ চাপে
আমাদের মাটির তলার মাটি ফাটিয়ে দেয় না,
বিপর্যস্ত করে না দেয়াল, ছাদ, নিরাপত্তাবোধ,
নিঃশব্দ নিরভিমানে পৃথিবীর ঋতুচক্রে জানায় সম্মতি,
এমনকি সেতুনির্মাণের চেষ্টাতেও
মাঝে-মাঝে অংশ নেয়—অতি নম্র—
যেন মৃতে ও জীবিতে বিনিময়
সত্যই সম্ভব।

৪ সে নিত্য বিদায় বলে, স্বাগত জানায়।
খুলে দ্যাখো নিজের পুরোনো লেখা—
হয়তো বা অন্য কারো—কিন্তু তা তোমারই মনের নিঃসরণ।
তুমি আজ ঈষৎ বাঁকাও ঠোঁট, কিন্তু তুমি ওরই মধ্যে ছিলে,
এবং এখনো আছো। ভাবো, কতবার
পুরোনোকে লিখেছো নতুন ক'রে, একই বস্ত্রে বুনেছো কালের
দুই স্তর—বস্ত্র তবু সে-চাপে ফাটেনি।
সেইমতো তোমার সত্তাও
অনবস্থ অথচ ধারাবাহিক,
উপস্থিত, অন্তর্হিত, আসন্ন, আগত।
মনে করো কত রাত্রি স্বপ্নের টেবিলে দগ্ধ,
কত দিন ধাতুর সংঘাতে চূর্ণ,
তবু যেন বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ, দরজায় দেয় মৃদু টোকা,
যেন কিছু নতুন আরম্ভ হবে।
এখনো কি বোঝোনি, সে নয় কোনো বন্ধু বা প্রেমিকা,
সে কেবল পরবর্তী তুমি?

৫ কিন্তু, মন, তুমি শিখে নাও
এই যাকে আমরা মরত্ব বলি, তার মূল্য।

যেহেতু হাবিযে ফেলি সব প্রিয, অন্তঃপুবে অভাব জমিযে তুলি নিবন্তব,
তাই ক্ষতিপূবণেব দাবি ওঠে। মনে হয় যুদ্ধ চাই। দেবতাব সঙ্গে যুদ্ধ—অন্তত সংলাপ।
জানি, তুমি বিনা শুল্কে, অযাচিতভাবে
পেযেছিলে প্রেম আব প্রেমের উচ্ছ্বাসে ফুঁড়ে তোলা
দু-একটি কবিতাব পঙক্তিও, কখনো।
কিন্তু বলো, তাবা কি বিশ্বস্ত ছিলো?
তাবা কি জপিযেছিলো দিনে-দিনে বাঁচাব মন্ত্রণা?
এখনো সময আছে, শিখে নাও
যা তোমাব সঙ্গে থাকে—যেমন মৃতেবা,
আর মৃত তোমার নিজেব ভিড়,
আব সেই তৈবি ফাঁদ—এক ফালি ধবল কাগজ—
যাব মধ্যে মাঝে-মাঝে বন্দী হয তাবা,
বন্দী হয—উড়ে যায ফেব,
আব প্রত্যাবর্তনেব পথ চেযে কণ্টকিত অপেক্ষা তোমাব—
এই সব সম্বলেব ব্যবহাবে কোনো-এক মুহূর্তে তুমিও
হযতো বা ঈশ্বরেব শ্রুতিগম্য হ'তে পারো,
যেতে পাবো অবিবল-বর্ধমান বিচ্ছেদ পেবিযে।
সেই অতি কঠিন চেষ্টাবই নাম আত্মসমর্পণ,
যার মুখবন্ধে মৃত্যু, পবিণামে পুনরুজ্জীবন।

ধরা যাক, আজ ২০০৫-এ, এই পঙক্তিগুলো কেউ আমাদেব পড়ে শোনাল। আমবা কান পেতে কী শুনবো? এক প্রৌঢ কবি কথা বলছেন, হযতো আমাদেব সঙ্গে, হযতো তাঁবা নিজেব সঙ্গেই। যে-অতীত এই পঙক্তিগুলিতে ধ্বনিতে হয়ে উঠেছে তা কি আমাদের অচেনা, একান্তেই ব্যক্তিগত, নাকি কিঞ্চিৎ সাধাবণও? এমন কি ভাবা যায না যে এদেব লেখকই, তাঁব প্রথম যৌবনেব সব সংশয-শঙ্কা ভুলে, কামনাব সত্য খুঁজছেন 'তপস্বী ও তবঙ্গিণী'-তে বুঝতে চেযেছেন কী সম্পর্ক কামেব সঙ্গে প্রেমেব। হযতো একই সঙ্গে শঙ্কবাচার্যেব 'আনন্দলহবী'-তে স্পষ্ট হচ্ছেন। এত কি ভাবা যায না এই কবিই এবাব সেই বিপুল সত্যেব আধাব মহাভাবতেব মর্ম খুঁজতে বসবেন। আব তাব আগে এক ফাঁকে বাষ্ট্রপুঞ্জ-খ্যাত ডাগ হামাবশ্যেল্ডেনেব অন্তবঙ্গ ডাযেবি 'পথচিহ্ন' পড়ে তাব অন্তর্গত কযেকটি কবিতাব ভাবানুবাদ করে ফেলবেন। আব বললেন: অন্য এক সত্তা ছিল তাঁব। কবি মবমী ভাবুক, ঈশ্বেবব জন্য সতৃষ্ণ। জটিল চঞ্চল বিক্ষুব্ধ জগতেব কেন্দ্রবাসী এক নিঃসঙ্গ মানুয। ইতিহাস, সন্দেহ নেই-কর্মী হামাবশ্যেল্ডকেই মনে বাখবে। তাঁব কর্মজীবন ও নিভৃত ধ্যান পবস্পব-বিচ্ছিন্ন নয . তিনিই নমনীয আদর্শবাদী, মানুষের মঙ্গলে বিশ্বাসী ও তাব জন্য নিবন্তব সচেষ্ট—তিনি চেযেছিলেন নিজেকে এই মহৎ কর্মে যোগ্য ক'বে

তুলতে, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রয়াসের অর্থ হলো এই। অর্থাৎ তিনি ছিলেন গীতার ভাষায় কর্মযোগী—শুধু কর্মবীর নন, ইতিহাসের পুত্তলি বলে তিনি ভাবেননি নিজেকে ভেবেছিলেন কোনো ধ্রুব ভিত্তির উপর তাঁর কর্মের প্রতিষ্ঠা হোক। এই কথাগুলি কি আজ, চল্লিশ বছর পরে, আমরা বিশেষ প্রণিধানের সঙ্গে পড়ব না, যখন পৃথিবী মঙ্গল-অমঙ্গল দ্বিধায় আরো দীর্ণ, যখন কর্মের যোগভ্রষ্টতার নিদর্শন ছাড়িয়ে আছে চারদিকে যখন পরধর্মের প্রকোপ ক্রমেই চলেছে।

বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর 'মহাভারত কথা' কিছু সাড়া তুলেছিলো। আর মহাভারত কথা কোনো ভরকেন্দ্র যদি তাকে তা অবশ্যই স্বধর্ম-জিজ্ঞাসা ও যুধিষ্ঠিরের মহাভারতের কথা এখন কেবল বিদ্বানপাঠ্য কিনা জানি না, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুও যে অনেকদূর তাঁর স্বধর্মপালনে ব্রতী ছিলেন তাতে বোধকরি সন্দেহ নেই। আত্মজীবনীর অসমাপ্ত তৃতীয় পর্বে তিনি যামিনী রায়ের কথা বলেছেন, বিশেষ করে তাঁর ব্রতপালনের মতো জীবন যাপনের কথা, এবং এই ইঙ্গিতও করেছেন যে তিনিও আদর্শের অনুগামী। তিনি যে দিনের পর দিন বছরের পর বছর তাঁর জাগ্রত সময়ের বেশির ভাগটাই লেখার টেবিলে কাটিয়েছেন। তার নতুন করে মূল্য দেবার মুহূর্ত আজ এসেছে। এবং নতুন করে এই স্বীকৃতির সময়ও বোধকরি এসেছে যে বাংলা কবিতার জন্য তিনি যা করেছেন তা অতুলনীয়, আর বলা বাহুল্য তা শুধু তিনি নিজে কবিতা লিখে ও কবিতা অনুবাদ করে করেননি, অন্যদের দিয়েও অন্যদের কবিতা ছাপিয়েও আর অক্লান্তভাবে অন্যদের কবিতার আলোচনা করে ও করিয়ে, সেইসঙ্গে কবিতা মুদ্রণের এক নজির স্থাপন করেও, করেছেন। উত্তরসূরী-পূর্বসূরীর সম্পর্ক সবসময় সুখের হয় না, কিন্তু সম্পর্ক তো অস্বীকার করা চলে না, প্রজন্মান্তর ঘটলেও না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মানস সন্তানেরা কি তা জানাবেন না? 'তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরসা পেতো কবি, ছায়া পেতো, স্বচ্ছলতা পেতো' তো কথার কথা নয়। তাঁর স্বভাব থেকে যে কথাগুলি লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৪-এ, তার অনুরণন বাংলা কবিতা অন্তরমহলে এখনও বেজে চলেছে আবার কান পাতার সময় এবার হল।

অদ্ভুত অভিসারের কবিতা

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

গুহাব অন্ধকাবেই থেকে যাওয়াব কথা ছিল
আজও যাদেব
ঘাড উঁচু কবে তারা ঘুবে বেড়াচ্ছে এখন,
মানুষেব মতো বুক চিতিযে ঘুবে বেড়াত যাবা
গত শতাব্দীব সুপবিসব সূর্যালোকে
তাবা গিযে সেঁধিযেছে গুহায।
যাবা গতকালই রক্তে লাল কবে দিযেছে
গাঙুবেব নীল জল
তাবাই আজ বক্তদানশিবিবেব সিংহাসনে বসে
ভাষণ দিচ্ছে—
বক্তেব বিকল্প কিছু নেই,
আসুন বক্তদান কবুন.—স্বেচ্ছায, অবশ্যই স্বেচ্ছায
কেননা বক্তপাতেব পবিত্র কর্মসূচি
আপাতত আমাদেব তোলা আছে চড়কেব গাছে।
তরুণ কবিবা এখন কবি-সম্মেলনে কাক্ধ্বনি কবছে,
'ছি ছি! কবিবা আবাব মনীষী হবে কেন?
জীবনযাপন না কবেই কবি,
মদ্য না গিলেই মনীষী?
তাহলে শবীব কি কিছুই বলতে চাযনি
ফ্যাশন প্যাবেডেব ব্যাম্পে?'
সেখানে তো এখন ভিড জমিযেছে
প্রাক্তন বক্তবাদী নেতা থেকে শুরু কবে
আজকেব কবিমনীষীবাও—
জয জীবনেব জয—
কবিতা আসব ভেঙেচুবে দিযে
হুলুধ্বনি কবে ওবা চলে যায
নব নব তন্ত্রেব ঝলমলে অভিসাবেব দিকে—

আলোব জন্য এই অদ্ভুত আঁধাব-অভিসাব
দেখেছে আগে কখনো এ-পৃথিবী? দেখবে কি আব?

অধুনা প্রাপ্তিযোগ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান প্রকাশনা

★ Rasvihary Das Philosophical Essay : Ramprasad Das	150.00
★ Economic Theory, Trade and Quantitative Economics : Asis Banerjee & Biswajit Chatterjee	200.00
★ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৩০০.০০
★ বাংলার বাউল ঃ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী	৩০.০০
★ উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য্য	৯০.০০
★ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	১২৫.০০
★ বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ঃ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	৬০.০০
★ শাক্ত পদাবলী (চয়ন) ঃ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	৭০.০০
★ ভাষা পাঠ সঙ্কলন ঃ প্রাক্-স্নাতক ভাষা পাঠ-পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন	৫০.০০
★ বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) ঃ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত	৬০.০০
★ একালের ছোটগল্প সঙ্কলন	৬০.০০
★ একালের কবিতা সঙ্কলন	৪০.০০
★ একালের প্রবন্ধ সঙ্কলন	৭০.০০
★ আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান ঃ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০.০০
★ বামা বোধিনী পত্রিকা ঃ ডঃ ভারতী রায়	১৫০.০০
★ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৭৫.০০
★ পূর্ববঙ্গের কবিগান ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৯০.০০
★ ময়মনসিংহ গীতিকা ঃ রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন	৯০.০০
★ প্রাচীন কবিওয়ালার গান ঃ ডঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল	১২৫.০০
★ শ্রীপদামৃতসমুদ্র ঃ ডঃ উমা রায়	১৬০.০০
★ বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ ঃ কণক মুখোপাধ্যায়	২৫.০০
★ A Dictionary of Indian History : Sachchidananda Bhattacharyya	250.00
★ Elements of the Science of Language : Irach Jehangir Sorabji Taraporewala	60.00
★ A History of Sanskrit Literature : S. N. Dasgupta	60.00
★ Agrarian System of Ancient India : U. N. Ghoshal	15.00
★ The Science of Sulba : B. B. Dutta	40.00
★ Studies in Indian Antiques : H. C. Roychoudhuri	55.00
★ Studies of Accounting Thought : G. Sinha	100.00
★ Reading Keats Today : Prof. Surabhi Banerjee	60.00
★ Dynamics of the Lower Troposphere : D. K. Sinha, G. K. Sen & M. Chatterjee	150.00
★ Political History of Ancient India : Hemchandra Roy Choudhury	70.00
★ The History of Bengal : Narendra Krishna Sinha	200.00
★ An Enquiry into the Nature & Function of Art : S. K. Nandi	80.00
★ Romance of Indian Journalism : Jitendranath Basu	75.00
★ Yoga Philosophy of Patanjali with Bhasvati : Hariharananda Aranya	($40) 400.00

আরো বিশদ বিবরণের জন্য ঃ
Pradip Kumar Ghosh, Superintendent
Calcutta University Press
48, Hazra Road, Calcutta-700 019, Phone : 475-9466
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ আশুতোষ ভবনের একতলা, কলেজ স্ট্রীট চত্বর

EMTA GROUP OF COMPANIES

Many diverse activities .... one successful philosophy
Added a new dimension in mining of coal and other minerals.

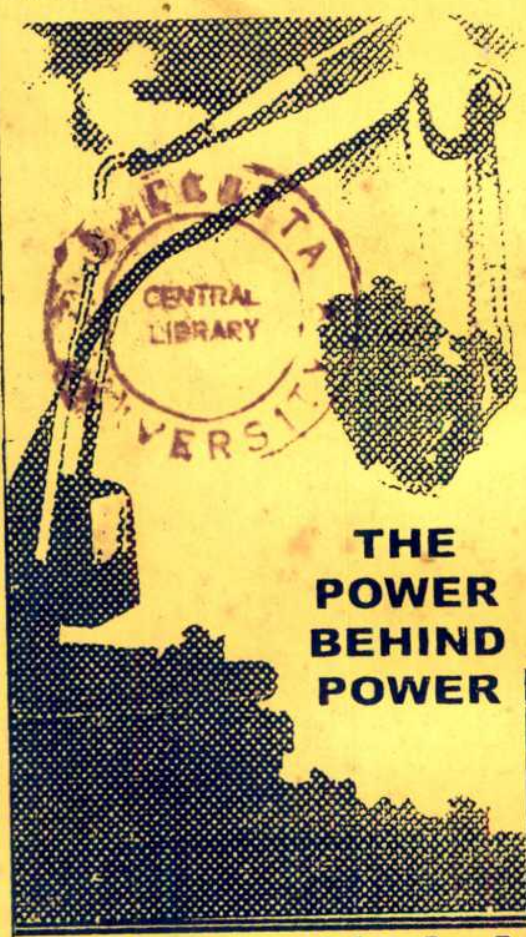

The success of the EMTA Group may be attributed to its philosophy that is based on professional management practices, regular upgradation of skills and knowledge and an unvarying commitment to customer satisfaction. A successful philosophy indeed...

THE POWER BEHIND POWER

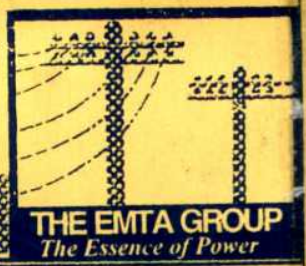

THE EMTA GROUP
The Essence of Power

105, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata-700 020
Ph. : 24759891 ● Fax : (91) (33) 2474 9695
E-mail : emta@cal2.vsnl.net.in

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭